ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার শিক্ষা ভাবনা ও সমাজ ভাবনাঃ একটি বিশ্লেষণমূলক আলোচনা

The Thesis Submitted to the Department of Education Jadavpur University, Kolkata for the Award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts

Submitted by

Payel Giri

Registration No: A00ED0501919

Supervised by

Prof. (Dr.) Bishnupada Nanda
(Professor, Department of Education, Jadavpur University)

Department of Education
Jadavpur University
Kolkata
2023

This Thesis is Dedicated to my Respected Jethu

Dr. Bibhash Chandra Sau

CERTIFICATE

Certified that the Thesis, entitled, "ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার শিক্ষা ভাবনা ও সমাজ ভাবনাঃ একটি বিশ্লেষণমূলক আলোচনা" submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Professor Bishnupada Nanda, Department of Education. And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any other Degree or Diploma anywhere/elswhere.

Countersigned by the Supervisor **Candidate**

Professor Bishnupada Nanda, Payel Giri

Department of Education.

Jadavpur University

Dated: Dated:

স্বীকারোক্তি
(Acknowledgement)

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি জমা দিতে পেরে আমি যারপরণাই বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ, যাঁরা এই গবেষণা অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত করতে আমাকে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনানুগ সাহায্য করেছেন এবং সহানুভূতি দেখিয়েছেন।

এই ব্যক্তি বর্গের মধ্যে আমি প্রথমেই আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় প্রফেসর (ড.) বিষ্ণুপদ নন্দ মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাই। অধ্যাপক নন্দ বিভিন্ন সময়ে উপযুক্ত নির্দেশনা, পরামর্শ এবং গঠনমূলক সমালোচনার দ্বারা এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে সম্পূর্ণ করতে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা ও নিঃশর্ত সহযোগিতায় এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে একটি নতুন মাত্রা দান করেছে্। গবেষণার পুরো সময়ই তিনি আমাকে গঠনমূলক সহায়তা দিয়েছেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক (ডঃ) মুক্তিপদ সিনহা মহাশয় বিভিন্ন সময়ে আমাকে পরামর্শ এবং সহযোগিতা দানের দ্বারা কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন ।

যাঁর সহায়তা ছাড়া একটি দিনও আমার পক্ষে চলা সম্ভব নয়, যিনি আমাকে দ্বাদশ শ্রেণী থেকে আজ পর্যন্ত সর্বত ভাবে সহায়তা করে চলেছেন, যাঁর নিঃশর্ত ভালোবাসায় আমার জীবন আলোকিত এবং আমার সমস্ত অপূর্ণতাকে পূর্ণতায় পরিপূর্ণ করেছেন, যাঁর সহায়তায় আমার জীবনের কাঁটাযুক্ত পথ অনেক বেশি সহজ ও মসৃণ হয়েছে। আমার সেই প্রিয় জেঠু এবং অভিভাবক ডঃ বিভাস সাউ কে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধা। একই সঙ্গে আমার জেঠিমা শ্রীমতী অপরাজিতা সাউকে সমস্ত ধরনের সহায়তা দানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগের সমস্ত শিক্ষক, শিক্ষিকা ও গবেষকরা বিভিন্ন সময়ে গঠনমূলক সমালোচনায় আমাকে সহায়তা এবং উৎসাহ দান করেছেন। তাঁদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

‘ভগিনী নিবেদিতা’ এবং ‘বেগম রোকেয়া’ চর্চায় যাঁরা বিশেষ ভাবে আমাকে তথ্য দান করে আমার গবেষণাকর্মটিকে

সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের সকলের নিকট রইলো আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগের সমস্ত অশিক্ষক কর্মীবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে আমাকে সহায়তা এবং ভালোবাসা দানে তৃপ্ত করেছেন। তাঁদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

গবেষণার সমস্ত সময়টিতে আমার কাকিমা শর্মিষ্ঠা নন্দ আমাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করার জন্য এবং পাশে থাকার জন্য কাকিমার প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম।

আমি আমার মা শ্রীমতী শেফালী গিরি, বাবা দিলীপ গিরি, মামা-মামীমা, দিদা-দাদু, মাসী, ভাই-বোন ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কাছে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। যাঁদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছাড়া চলার এই কঠিন পথে আমার পক্ষে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হত না। তাঁদের স্নেহ, ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা আমাকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করেছে।

বিভাগের বিভিন্ন সিনিয়র, জুনিয়র, দাদা- দিদি, ভাই-বোন বিশেষ করে বন্ধু প্রশান্ত মাহাত , ডঃ সৌরভী আটা, পিঙ্কি মণ্ডল, শম্পা দাস, অমল দাস, মানস ভুঁইয়া, প্রিতম বিশ্বাস কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তাদের সহযোগিতা আমার এই পথকে অনেক বেশি সুগম করে তুলেছে।

সবশেষে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগের লাইব্রেরিয়ান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের লাইব্রেরির বিভিন্ন কর্মীবৃন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সিটিউট অফ কালচার (গোলপার্ক) এর লাইব্রেরির কর্মীবৃন্দ প্রমুখদের কাছে আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ রইলাম। তাঁদের অকুণ্ঠ সহায়তা ছাড়া এই কাজ সুচারু ভাবে সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না।

তারিখঃ

পায়েল গিরি

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়	গবেষণার পটভূমি	5-81
১.১	ভূমিকা	5
১.১.১	প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে নারী প্রগতির বিকাশ	5
১.১.২	প্রাচীন ভারতে নারী শিক্ষা	9
১.১.৩	বৈদিক যুগে নারী শিক্ষা	11
১.১.৪	পরবর্তী বৈদিক যুগে নারীদের অবস্থান	16
১.১.৫	বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সময়কালে নারীদের অবস্থান	17
১.১.৬	নারীশিক্ষায় প্রাচীন ভারতের কিছু ব্যতিক্রমী চিত্র	17
১.১.৭	মধ্যযুগে নারীদের অবস্থান	20
১.১.৮	ব্রিটিশ শাসন কালে নারীদের অবস্থান	22
১.১.৯	রাজা রামমোহন রায়, ব্রাহ্ম সমাজ ও নারী	23
১.১.১০	পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর ও নারী জাগরণ	29
১.১.১১	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও নারী উন্নয়ন	33
১.১.১২	ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ও নারী উন্নয়ন	36
১.১.১৩	পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর নারী উন্নয়ন বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি	37
১.১.১৪	নারী জাগরণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা	39
১.১.১৫	নারী জাগরণে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা	42
১.১.১৬	বিংশ শতাব্দীতে নারী মুক্তির দুই পথিকৃৎঃ ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়া	51
১.১.১৭	ভগিনী নিবেদিতার ভাবাদর্শ	52
১.১.১৮	বেগম রোকেয়ার পূর্ব্ববর্তী বাংলায় নারী শিক্ষার প্রেক্ষাপট	59
১.১.১৯	বেগম রোকেয়ার জীবনাদর্শ	65
১.২	গবেষণার প্রয়োজনীয়তা এবং তাৎপর্য	72
১.৩	সমস্যার বিবৃতি	77
১.৪	গবেষণার প্রশ্ন সমূহ	78
১.৫	গবেষণার উদ্দেশ্য সমূহ	78
১.৬	গবেষণার সীমানির্দেশকরণ	79
	তথ্যসূত্র	80

দ্বিতীয় অধ্যায়	সংশ্লিষ্ট সাহিত্যের পর্যালোচনা	83-158
২.১	ভূমিকা	83
২.১.১	সম্পর্কিত গবেষণা সমূহের পর্যালোচনার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য	86
২.১.২	সম্পর্কিত গবেষণা সমূহের পর্যালোচনার উদ্দেশ্য	87
২.২	নিবেদিতা সম্বন্ধে সংঘটিত কিছু গবেষণার পর্যালোচনা	88
২.৩	রোকেয়া সম্বন্ধে সংঘটিত কিছু গবেষণার পর্যালোচনা	117
২.৪	গবেষণা সমূহের পর্যালোচনার ছক	139
	তথ্যসূত্র	153
তৃতীয় অধ্যায়	গবেষণার পদ্ধতি	159-167
৩:১.	ভূমিকা	159
৩.২	ঐতিহাসিক গবেষণার পদ্ধতি	160
৩.২.১	ঐতিহাসিক গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য	161
৩.২.২	পর্যবেক্ষণ	164
৩.২.৩	সাক্ষাৎকার পদ্ধতি	164
৩.২.৪	বর্তমান গবেষণার নক্সা	165
৩.২.৫	গবেষণায় ব্যবহৃত সহায়ক সরঞ্জাম সমূহ	166
৩.৩	তথ্যের বিশ্লেষণ	166
	তথ্যসূত্র	167
চতুর্থ অধ্যায়	ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনী	169-186
৪.১	ভূমিকা	169
৪.২	মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল থেকে সিস্টার নিবেদিতায় রূপান্তর	170
৪.৩	বেগম রোকেয়ার সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী	181
	তথ্যসূত্র	186
পঞ্চম অধ্যায়	ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার শিক্ষা ভাবনা	188-220
৫.১	ভূমিকা	188
৫.২	শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার মতামত	188
৫.৩	শিক্ষার পাঠ্যক্রম সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার মতামত	192
৫.৪	শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার মতামত	196

৫.৫	শৃঙ্খলা সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার মতামত	213
	তথ্যসূত্র	218
ষষ্ঠ অধ্যায়	**ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার সমাজ ভাবনা**	**222-261**
৬.১	ভূমিকা	222
৬.২	ভগিনী নিবেদিতার সমাজ ভাবনা	226
৬.৩	বেগম রোকেয়ার সমাজ ভাবনা	232
৬.৪	দারিদ্র্য দূরীকরণে নিবেদিতা ও রোকেয়ার ভাবনা	246
৬.৪.১	দারিদ্র্য দূরীকরণে নিবেদিতার ভাবনা	247
৬.৪.২	দারিদ্র্য দূরীকরণে রোকেয়ার ভাবনা	249
৬.৫	সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার চিন্তা ভাবনার দূরদর্শিতা	252
	তথ্যসূত্র	259
সপ্তম অধ্যায়	**আলোচনা**	**263-310**
৭.১	নিবেদিতা ও রোকেয়া সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মতামত	263
৭.২	আলোচনা	286
৭.৩	জাতীয় শিক্ষানীতি 2020—ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার ভাবনার প্রতিফলন	300
৭.৪	উপসংহার	303
৭.৫	বর্তমান কালে শিক্ষা ক্ষেত্রে ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার’ শিক্ষা ও সমাজ ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা	305
৭.৬	গবেষকের সুপারিশ	307
৭.৭	গবেষণার সীমাবদ্ধতা সমূহ	308
৭.৮	পরবর্তী গবেষণার পথ নির্দেশ	308
	তথ্যসূত্র	309
	গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)	312
	সারাংশ (Summary)	320

পরিশিষ্ট

(Appendices)

পরিশিষ্ট – I	ভগিনী নিবেদিতা	II
পরিশিষ্ট – II	বেগম রোকেয়া এবং তাঁর স্কুল	III
পরিশিষ্ট – III	তথ্য সংগ্রহ	IV
পরিশিষ্ট – IV	তথ্য সংগ্রহ	V
পরিশিষ্ট – V	তথ্য সংগ্রহ	VI
পরিশিষ্ট – VI	তথ্য সংগ্রহের অনুমতি পত্র	VII
পরিশিষ্ট – VII	সেমিনার উপস্থাপনার শংসাপত্র-১	VIII
পরিশিষ্ট – VIII	সেমিনার উপস্থাপনার শংসাপত্র-২	IX
পরিশিষ্ট – IX	গবেষণা পত্র পাবলিকেশন এর শংসাপত্র	X
পরিশিষ্ট – X	প্রকাশিত গবেষণাপত্র-১	XI
পরিশিষ্ট – XI	প্রকাশিত গবেষণাপত্র-২	XV
পরিশিষ্ট – XII	আনন্দবাজার পত্রিকাতে প্রকাশিত খবর-১	XXIII
পরিশিষ্ট – XIII	আনন্দবাজার পত্রিকাতে প্রকাশিত খবর-২	XXIV

মুখবন্ধ

১৮৬৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল্ এক প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী পরিবারে। তাঁর জীবনের স্বপ্ন ছিল শিক্ষিকা হওয়া। লন্ডনে তিনি একাধিক স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন এবং নিজে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে মার্গারেট ভারতবর্ষে এলেন মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে। স্বামী বিবেকানন্দের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তিনি ভগিনী নিবেদিতা নামে পরিচিতি লাভ করলেন। নিবেদিতা বঙ্গদেশে বিশেষত কলিকাতায় যে কেবলমাত্র নারী শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন তা নয়, তিনি একই সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। ভারতবর্ষে নারী শিক্ষা, জাতীয় শিক্ষা, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, চিত্রাঙ্কন, সশস্ত্র আন্দোলন প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। ১৯১১ সালের ১৩ই অক্টোবর শুক্রবার সকালে নিবেদিতা দার্জিলিং-এ দেহত্যাগ করেন। হিমালয়ের তুষার শিখরে সূর্যোদয়ে দয়ে প্রভাত সূর্যের প্রথম আলো যখন কক্ষের মধ্যে এসে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে নিবেদিতার আত্মা বিলীন হয়ে যায় অসীম অনন্ত সত্তায়। ভারতবর্ষকে তাঁর সর্বস্ব অর্পণ করে হিমালয়ের নির্জন ক্রোড়ে শ্মশান প্রান্তরে পবিত্র ভূমি খণ্ডে চিরশান্তিতে নিবেদিতা হলেন নিদ্রিতা। ভারতবর্ষকে তাঁর সর্বস্ব দান করে নিঃস্ব–রিক্ত নিবেদিতা হলেন চির নিদ্রিতা। নিবেদিতার পূর্বে বা পরে কোন বিদেশী বা বিদেশিনী নিবেদিতার মত করে ভারতবর্ষকে ভালবাসতে পারেননি।

নিবেদিতার জন্মের তের বছর পরে বাংলার মাটিতে এক মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বেগম রোকেয়া। বেগম রোকেয়ার পিতৃ পরিবারে মেয়েদের জন্য মাদ্রাসায় শিক্ষার যেমন ব্যবস্থা ছিল না তেমনি তাঁকে থাকতে হয়েছিল পর্দানসীন হয়ে। তাই প্রথাগত শিক্ষার তিনি বিশেষ সুযোগ পাননি। ব্যক্তিগত আগ্রহে এবং নিজের বড় দাদার ও দিদির সাহচর্যে তিনি বাংলা এবং ইংরেজি শেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। নিজের জীবনে তিনি অনুভব করেছিলেন মুসলমান সমাজে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ না থাকার কারণে তারা পর্দানসীন হয়ে থাকতে এবং পুরুষতন্ত্রের কাছে নতজানু হয়ে থাকতে বাধ্য হন। মুসলমান সমাজে পশ্চাদপদতার কারণই যে তাদের মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ লাভের ব্যবস্থা না থাকা, ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ইত্যাদি– এ কথা বেগম রোকেয়া তাঁর জীবন দিয়ে অনুভব করেছিলেন। তাই প্রথমে ভাগলপুরে এবং পরে কলকাতায় তিনি মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারের জন্য সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর অনবদ্য লেখনী পুরুষের বারংবার আঘাতেও থেমে থাকেনি, বরঞ্চ আরো ক্ষুরধার শানিত হয়েছে। তাঁর সাহিত্যকৃতি নিজের নাম বা যশের উদ্দেশ্যে নয় প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তিনি প্রবল পরাক্রান্ত পুরুষতান্ত্রিক মুসলমান সমাজের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করে গেছেন। তাঁর শিক্ষাদানের প্রধান লক্ষ্য যদিও ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করা, নারী জাগরণ ঘটানো, নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন, তবুও হিন্দু সম্প্রদায়ের নারীদের ক্ষেত্রেও তিনি একই ধরনের সুযোগ

সৃষ্টির স্বপক্ষে জোরালো যুক্তি দিয়েছেন। নিরন্তর লড়াই করে ১৯৩২ সালের ৯ ই ডিসেম্বর বেগম রোকেয়ার আত্মা মরদেহ ত্যাগ করে শূন্যে বিলীন হয়।

ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়া দুজনই কিছুটা সময় একই সময়কালে কলকাতায় সক্রিয় থাকলেও পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়েছিল কিনা বা পরস্পরের কার্যধারা সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে কোন প্রামাণ্য নথি আজও পাওয়া যায়নি। দুজনেই অবিভক্ত বঙ্গদেশে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেছেন, দুজনেই যথাক্রমে হিন্দু এবং মুসলমান সমাজের মেয়েদের জাগরণে, উন্নয়নে ও ক্ষমতায়নের জন্য সক্রিয় থেকেছেন; দুজনেই ছিলেন সে যুগের প্রতিষ্ঠিত লেখিকা এবং দুজনেই বাংলার সমাজের উন্নয়নের স্বপ্নে সক্রিয় থেকেছেন পর্বত প্রমাণ বাধার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও।

আজ ভারতবর্ষের তথা বাংলার বিশেষত মেয়েদের মধ্যে যে উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়ন আমরা লক্ষ্য করছি তার পিছনে রয়েছে ভগিনী নিবেদিতার এবং বেগম রোকেয়ার আমৃত্যু নিরলস প্রয়াস। কিন্তু এতদ্ সত্ত্বেও ভারতবর্ষে তথা বঙ্গভূমিতে এঁদের দুজনের শিক্ষা ও সমাজ ভাবনা নিয়ে কোন তুলনামূলক আলোচনা হয়েছে এরূপ প্রমাণ বহু বৎসর ধরে নিরন্তর সংশ্লিষ্ট সাহিত্যের পর্যালোচনার পরেও পাওয়া যায়নি। তাই বর্তমান গবেষণায় গবেষিকা এই দুই মহীয়সী নারীর শিক্ষা ভাবনা এবং সমাজ ভাবনা নিয়ে গবেষণায় ব্রতী হয়েছেন।

সমগ্র গবেষণাটি গবেষিকা মোট সাতটি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করেছেন। প্রথম অধ্যায়টি হল গবেষণার পটভূমি– যেখানে প্রাচীন ভারত থেকে রোকেয়া পর্যন্ত নারী শিক্ষার একটি প্রামাণ্য চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়াও এই অধ্যায়ে রয়েছে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা এবং তাৎপর্য, সমস্যার বিবৃতি, গবেষণার প্রশ্ন, গবেষণার উদ্দেশ্য এবং গবেষণার সীমা নির্দেশকরণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে গবেষিকা গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাহিত্য সমূহের পর্যালোচনার প্রয়াস পেয়েছেন। এই অধ্যায়ে গবেষণার সঙ্গে সম্পর্কিত গবেষণা সমূহের পর্যালোচনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়া সম্বন্ধে সংঘটিত কিছু গবেষণার পর্যালোচনা এবং গবেষণা সমূহের পর্যালোচনার ছককে তুলে ধরেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে গবেষিকা ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে গবেষিকা দুই মহীয়সী শিক্ষাবিদ ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনীর পর্যালোচনা করেছেন। পঞ্চম অধ্যায়ে ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার শিক্ষাভাবনার বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষিকা পর্যালোচনা করেছেন এবং তন্নিষ্ঠ হয়ে প্রাপ্ত তথ্যকে সামর্থ্য অনুযায়ী যথাযথভাবে বিচার ও বিশ্লেষণে সক্রিয় হয়েছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে গবেষিকা, ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার সমাজ ভাবনার একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। সপ্তম অধ্যায়ে গবেষিকা তার গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন এবং বর্তমান কালে

শিক্ষাক্ষেত্রে ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার শিক্ষা ও সমাজ ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

ভগিনী নিবেদিতা আদ্যন্ত অতি উন্নত গুণমানের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতা ছিলেন। অন্যদিকে বেগম রোকেয়া নিজ প্রচেষ্টায় সেই যুগের শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও স্বশিক্ষিকা হতে পেরেছিলেন। এই দুই ঐতিহাসিক চরিত্রকে বোঝার জন্য গবেষিকা যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা এঁদের সম্বন্ধে প্রাপ্ত তথ্যের প্রাথমিক উৎস এবং গৌণ উৎস থেকে। প্রাথমিক উৎস হিসাবে নিবেদিতার লেখা চিঠিপত্র, 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি' ('The Master as I saw him') ও 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে' ('Notes of some Wanderings with the Swami Vivekananda') ইত্যাদিকে গবেষিকা ব্যবহার করেছেন। গৌণ উৎস হিসেবে মূলত শঙ্করী প্রসাদ বসু লিখিত 'নিবেদিতা লোকমাতা' গ্রন্থের চারটি খণ্ড এবং বিষ্ণুপদ নন্দ রচিত 'সমকালের প্রেক্ষাপটে ভগিনী নিবেদিতা' (যন্ত্রস্থ) প্রভৃতি পুস্তকগুলিকে বহুলভাবে ব্যবহার করেছেন। এছাড়াও অন্যান্য লেখক লেখিকার বিভিন্ন পুস্তকের উপর, গবেষণা অভিসন্দর্ভের উপর এবং গবেষণা পত্রের উপর নির্ভর করেছেন। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা রচিত 'ভগিনী নিবেদিতা' গ্রন্থ এবং নির্ঝরিণী সরকার, যিনি নিবেদিতার প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন – তাঁদের লেখাকে বিশেষভাবে ব্যবহার করেছেন।

বেগম রোকেয়া সম্বন্ধে গবেষণার প্রাথমিক উৎসরূপে 'রোকেয়া রচনাবলী' আদ্যন্ত গবেষিকা ব্যবহার করেছেন। গৌণ উৎস হিসেবে গোলাম মুরশিদ রচিত 'রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া : নারী প্রগতির একশো বছর', খন্দকার আব্দুল মোমেন সম্পাদিত 'প্রেক্ষণ' ত্রৈমাসিক পত্রিকার বেগম রোকেয়ার স্মরণ সংখ্যা, সম্বুদ্ধ চক্রবর্তীর 'অন্দরে অন্তরে – উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা', রোকেয়া সম্বন্ধীয় গবেষণা অভিসন্দর্ভ এবং রোকেয়া সম্বন্ধে বিভিন্ন গবেষণা পত্রিকা ব্যবহৃত হয়েছে।

এই গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন পুস্তক পুস্তিকার এবং পত্রপত্রিকার জন্য গবেষিকা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্ক -এর গ্রন্থাগারকে বহুল পরিমাণে ব্যবহার করেছেন। এই দুই গ্রন্থাগারের গ্রন্থাকারীকগন বর্তমান গবেষিকাকে প্রয়োজন অনুযায়ী যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। সর্বোপরি এই গবেষণার দ্বারা গবেষিকা ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার প্রতি তার অন্তরের অকপট শ্রদ্ধা ভক্তিকে নিবেদন করেছেন।

প্রথম অধ্যায়

গবেষণার পটভূমি

১.১	ভূমিকা
১.১.১	প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে নারী প্রগতির বিকাশ
১.১.২	প্রাচীন ভারতে নারী শিক্ষা
১.১.৩	বৈদিক যুগে নারী শিক্ষা
১.১.৪	পরবর্তী বৈদিক যুগে নারীদের অবস্থান
১.১.৫	বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সময়কালে নারীদের অবস্থান
১.১.৬	নারীশিক্ষায় প্রাচীন ভারতের কিছু ব্যতিক্রমী চিত্র
১.১.৭	মধ্যযুগে নারীদের অবস্থান
১.১.৮	ব্রিটিশ শাসন কালে নারীদের অবস্থান
১.১.৯	রাজা রামমোহন রায়, ব্রাহ্ম সমাজ ও নারী
১.১.১০	পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর ও নারী জাগরণ
১.১.১১	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও নারী উন্নয়ন
১.১.১২	ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ও নারী উন্নয়ন
১.১.১৩	পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর নারী উন্নয়ন বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি
১.১.১৪	নারী জাগরণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা
১.১.১৫	নারী জাগরণে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা
১.১.১৬	বিংশ শতাব্দীতে নারী মুক্তির দুই পথিকৃৎঃ ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়া
১.১.১৭	ভগিনী নিবেদিতার ভাবাদর্শ
১.১.১৮	বেগম রোকেয়ার পূর্ববর্তী বাংলায় নারী শিক্ষার প্রেক্ষাপট
১.১.১৯	বেগম রোকেয়ার জীবনাদর্শ
১.২	গবেষণার প্রয়োজনীয়তা এবং তাৎপর্য
১.৩	সমস্যার বিবৃতি
১.৪	গবেষণার প্রশ্ন সমূহ
১.৫	গবেষণার উদ্দেশ্য সমূহ
১.৬	গবেষণার সীমানির্দেশকরণ
	তথ্যসূত্র

প্রথম অধ্যায়

গবেষণার পটভূমি

১.১ ভূমিকা :

১.১.১ প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে নারী প্রগতির বিকাশ :

আধুনিককালে সমগ্র পৃথিবী জুড়েই নারী প্রগতি একটি বিশেষভাবে আলোচিত বিষয়। এই ভাবনা থেকে উঠে এসেছে 'Women Study' বা 'Gender Study'। এই বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিক, মনোবিদ, শিক্ষাবিদ প্রমুখরা গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেছেন এবং একদল বুদ্ধিদীপ্ত শিক্ষার্থীকে এই বিষয়ে গবেষণা কর্মে যুক্ত করেছেন। পুরুষতন্ত্র যুগে যুগে নারীকে পরিবারের মধ্যে আটকে রেখেছে। নারীকে শৃঙ্খলিত করা পুরুষের কাজ ছিল। কারণ শক্তিশালী পুরুষরা নারীর দেহ এবং মনের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নারীকে করেছেন শৃঙ্খলিত। পুরুষ এমনভাবে যুগে যুগে নারীকে করায়ত্ত করেছে যাতে নারী ভাবতে শিখেছে যে সে অবলা। তার এককভাবে কোন কাজ করার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার অধিকারটুকুও ছিল না। এমনকি আজও অধিকাংশ শিক্ষিতা, উপার্জনশীলা নারী যে কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পুরুষের উপর নির্ভরশীল। নারী অবলা– এই ভাবনাকে মিথে পরিণত করার দায়িত্ব পালন করেছে পুরুষ। তাই শৃঙ্খলিত নারী যুগে যুগে বাধ্য হয়েছে সবকিছুকে সহ্য করতে। তার এই অনন্ত সহ্য শক্তিকে আমরা তুলনা করতে পারি কেবলমাত্র সর্বংসহা পৃথিবীর সঙ্গে। পুরুষ দাঁড়িয়েছে উৎপাদনশীলতার কেন্দ্রে, আর নারী সেখানে সন্তান উৎপাদনের এবং লালন পালনের জন্য নিজেকে করেছে দায়বদ্ধ। তাই নারী যুগে যুগে গৃহের গণ্ডিবদ্ধ জীবনে নিজেকে করেছে অন্তরীণ। প্রাচীনকালে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ক্রমশ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে পুরুষের আধিপত্য বিস্তারের কামনা থেকে। নারী হয়ে উঠেছে পুরুষের কাছে সম্পদ– যে সম্পদকে ভোগ করার, দখল করার, রক্ষা করার দায়িত্বও গ্রহণ করেছে পুরুষ। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী ভুলে গেছে তার অমিত বীর্য এবং বুদ্ধিমত্তাকে। নারী হয়ে উঠেছে একটি বিশেষ শ্রেণী যে সর্বতোভাবে পুরুষতন্ত্রের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল।

ফলে সমাজে তৈরি হল লিঙ্গ বৈষম্য বা নারী-পুরুষের অসম অবস্থান। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকবার এবং স্বনির্ভর হওয়ার ইচ্ছেটাই হারিয়ে ফেলে ফলে মানুষ হিসেবে নারীর যে বাঁচবার অধিকার রয়েছে, সাম্যের অধিকার রয়েছে সেকথা নারী ভুলে যায় অথবা পুরুষের চাপের কাছে সে ভুলে যেতে বাধ্য হয়। বাঁচবার এই অধিকারবোধ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে সাম্যবাদ তথা সমাজতন্ত্রের ভাবনা। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পড়লে পাওয়া যায় ভারতে সাম্যবাদী ভাবনার বিকাশ ঘটেছিল বৈদিক যুগ থেকে।

সাম্যবাদী ভাবনা তথা পরবর্তীকালের সমাজতন্ত্র নারী সমাজকে ক্রমশ বদলে দিয়েছে। নারী যে রক্তমাংসের মানুষ, তারও যে পুরুষের ন্যায় স্বাভাবিক চাহিদা রয়েছে এ কথা মেয়েরা বুঝতে শেখে সমাজতন্ত্রের পতকাতলে। এইভাবে নারী তার সম্বন্ধে পুরুষ সমাজের গড়ে তোলা অলীক দেবী প্রতিমার ছবি থেকে নিজেকে বের করে আনতে শুরু করে। গোপা মজুমদার (দাস) (২০১১) লিখেছেন, “নৈঃশব্দ্যের বাতাবরণ থেকে বেরিয়ে এসে নারী নিজেকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছে। আর এই ভাবেই নানা প্রশ্নে বিদীর্ণ হয়েছে নারীর মন ও মনন। সে প্রশ্ন করেছে, কেন নারী দণ্ডিতের মতো সমাজ থেকে শুধু সাজা পাবে? নিজেকেই নারী প্রশ্ন করেছে, কে সৃষ্টি করেছে নারীর বিরুদ্ধে সমাজের সব অনুশাসন? এযুগের নারীর সংগ্রাম তাই ঘুরে দাঁড়ানোর সংগ্রাম যেখানে সে নিজেকেই প্রশ্ন করেছে কেন হারবো? কেন ভাঙবো? কেন পরবশ হয়ে থাকবো? পুরুষ আছে যেখানে একইভাবে নারীও থাকবে সেখানে।” (গোপা মজুমদার (দাস), ২০১১। পৃ. ৩)

সুতরাং নারীবাদী ভাবনার কেন্দ্রে এলো পুরুষের দাসত্ব থেকে, শোষণ থেকে, শাসন থেকে নারীদের মুক্তি। নারীর মুক্তি তার সম্বন্ধে তৈরি করা প্রথাসিদ্ধ দেবী ভাবনা থেকে। নারীরা মুক্তি চাইল অশিক্ষা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা যথেষ্ট সংখ্যায় সন্তান জন্মদান না করার অধিকার থেকে। নারী প্রগতি ভাবনায় এই সমস্ত বিষয়েই যুক্তিসিদ্ধ ভাবনা পাঠক্রমের মধ্যে স্থান করে নিল।

ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯-১৮১৫), আমেরিকার শিল্পবিপ্লব, রাশিয়ার স্বাধীনতা বিপ্লব এবং পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেনের হাত ধরে যথাক্রমে পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য ভূমিতে ঘটলো নারীর নবজাগরণ। ভারতবর্ষে সহমরণ প্রথা রদ, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, বাল্যবিবাহ রদ, নারী শিক্ষার সুযোগ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নারী প্রগতির

ঢেউ এসে লাগলো শহর থেকে গ্রামের সমস্ত নারীতে। নারী-পুরুষের মধ্যে বিভেদ প্রাচীর ধীরে ধীরে ভেঙে পড়তে শুরু করে। পুরুষের হাত থেকে খসে পড়ে ইচ্ছেমত স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ বা স্ত্রীকে পথে বসানোর অধিকার থেকে মুক্তি। পরিবার তন্ত্রের মধ্যে মেয়েদের পক্ষে দাম্পত্য জীবনের বনিয়াদটি ক্রমশ সুস্থিতি লাভ করে। পিতা-মাতার মৃত্যুর পরে বিবাহিতা মেয়েরা পেল সম্পদের অর্ধেক ভাগ লাভের অধিকার, তাদের হাতে এলো স্বামীর হাত থেকে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার এবং শিশু সন্তানের অভিভাবকত্বের অধিকার।

নারী বিষয়ে গবেষণার ফসল হল নারী ও পুরুষের সমানাধিকার এবং পুরুষের প্রকৃতি ও যোগ্যতা লিঙ্গ নিরপেক্ষ। এর ফলে ধর্মকে নতুনভাবে বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। ভারতবর্ষে হিন্দু এবং মুসলিম সমাজে পুরুষের বহুবিবাহ প্রথা, হিন্দু সমাজের রাঁঢ়প্রথা, মুসলিম সমাজের বাঁদী প্রথা থেকে মেয়েদের ঘটলো মুক্তি। সমাজতন্ত্রে নারী বাস্তবে রক্তমাংসের নারীতে পরিণত হল পুরুষতন্ত্রের তলায় চাপা পড়ে থাকা থেকে মুক্ত হয়ে। নারী প্রমাণ করলো বিদ্যা, বুদ্ধি, মেধা, মননের বিভাজন হয় না। শিক্ষা নারীর মধ্যে সৃষ্টি করল চেতনা যা নারীর অন্তরলোককে স্পর্শ করল, আর এর থেকে দানা বাঁধল নারী প্রগতির সুনিশ্চিত ভাবনা ও সচেতনতা। নারী ক্রমশ পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব এমনকি বিদ্রোহের আঙিনায় নিজের সামর্থ্যকে করল প্রতিষ্ঠিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণ, ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন পাশ, ১৮৭২ সালে নতুন বিধবা বিধি আইন পাশ, ১৮৯১ সালে সহবাস সম্মতি আইন প্রবর্তন ও সঙ্গে কৌলীন্য প্রথা বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল এবং নারীর সচেতনতার বিকাশ ঘটল—যা বিস্তৃতি লাভ করল বিংশ শতাব্দী হয়ে একবিংশ শতাব্দীতে।

কাব্যে, সাহিত্যে, দর্শনে, রাজনীতিতে নারীচর্চা শুরু হল অবিভক্ত ভারতবর্ষে। ১৮২৪ থেকে ১৮৭৩ সালের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন-এর আবির্ভাব নারীকে দিল স্বাতন্ত্র্যের অধিকার। ১৮৬২ সালে বীরাঙ্গনা কাব্যে মধুসূদন নারীর ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের উদ্বোধন ঘটালেন। নারীর নিজের কথা বলার ক্ষেত্রে তৈরি হল মোক্ষদাদায়িনী মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'বঙ্গমহিলা' পত্রিকা (১৮৭০), থাকমনির সম্পাদনায় 'অনাথিনী' (১৮৭৫) পত্রিকায়, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) উপন্যাসে এবং দেবী চৌধুরানী (১৮৮৪)

উপন্যাসে, স্বর্ণকুমারী দেবীর ‘ভারতী’ পত্রিকায়, কৃষ্ণরঞ্জিনী বসু ও শ্যামাঙ্গিনী দের সম্পাদনায় ‘সোহাগিনী’ পত্রিকায় এবং ১৯০৮ সালে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের ‘সুলতানা’র স্বপ্ন’ প্রভৃতিতে মেয়েরা নিজেদের কথা বলেছেন, নিজেদের ক্ষমতায়নের স্বপ্নকে তুলে ধরেছেন। ১৯১৩ সালে শরৎচন্দ্রের ‘নারীর মূল্য’ এবং ১৯১৪ সালে রবীন্দ্রনাথের ‘স্ত্রীর পত্র’ প্রভৃতিতে নারী মুক্তি পেতে চেয়েছে পুরুষতান্ত্রিকতার দৃঢ় নাগপাশ থেকে প্রকৃতির উদার দাক্ষিণ্যের মধ্যে। তার শরীরে এসে লেগেছে মুক্তির ঢেউ, মনোজগতে পেয়েছে মুক্তির আস্বাদন।

রাজা রামমোহন রায়ের ‘ব্রাহ্মসমাজ’ (১৮২৮ সালের ২০ আগস্ট), কেশবচন্দ্র সেন এর ‘ব্রাহ্মিকা সমাজ’ (১৮৬৫) তৈরি করেছিল নারীমুক্তির বাতায়ন। মুম্বাইতে ড. আত্মারাম পান্ডুরঙ্গ এর প্রচেষ্টায় স্ত্রী শিক্ষার প্রসার এবং পর্দা প্রথার অবসান কল্পে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘প্রার্থনা সমাজ’ (১৮৬৭)। নারী জাতির উন্নতি এবং দরিদ্রের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ও কল্যাণের লক্ষ্যে কেশবচন্দ্র সেন স্থাপন করেন ‘ভারতীয় সংস্কার সমিতি’ (১৮৭০)। পণ্ডিতা রমা বাঈ এর প্রতিষ্ঠিত ‘আর্য সমিতি’ (১৮৮২), স্বর্ণকুমারী দেবী’র ‘সখী সমিতি’ (১৮৮৬) ও ‘নারী শিক্ষা সমিতি’ (১৯১০), কৃষ্ণভামিনী দাস এর ‘ভারত শ্রী মহামণ্ডল’ (১৯১৩) ইত্যাদি সমাজ কল্যাণকর সংগঠন মহিলারা নিজেরাই প্রতিষ্ঠা করেন এবং দক্ষ হাতে পরিচালনা করেন।

রাজনীতি ক্ষেত্রেও মেয়েদের আত্মপ্রকাশ ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এঁদের মধ্যে মাদাম কামা (১৮৬১ – ১৯৩৬), মোহিনী সেন (১৮৬৩ - ১৯৫৫), ভগিনী নিবেদিতা (১৮৬৭ - ১৯১১), জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি (১৮৮৯ - ১৯৪৫), মনোরমা বসু (১৮৯৪ – ১৯৭২), লীলা নাগ (১৯২৬) প্রমুখদের কর্মকাণ্ড মেয়েদের প্রতি পুরুষকে শ্রদ্ধাশীল করে তোলে। শ্রমিক আন্দোলনের নেত্রী সুধা রায়, চটকল শ্রমিক আন্দোলনের নেত্রী সন্তোষ কুমারী দেবী এবং বেগম সাকিনা ফারুক মোয়াজেদা প্রমুখ মহিলারা কিংবদন্তি শ্রমিক নেত্রী রূপে আত্মপ্রকাশ লাভ করেন এবং প্রমাণ করেন যে মেয়েরা কোন ক্ষেত্রেই পুরুষের থেকে কম নয়। ক্রমশ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং শ্রমিক আন্দোলনে মেয়েদের অংশগ্রহণ আরো তীব্রতর হয়ে ওঠে। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মহিলা শহর, মফঃস্বল, গ্রামেও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে জড়িয়ে পড়েন এবং নিজের কৃতিত্ব ও যোগ্যতাকে প্রমাণ করেন। এঁদের মধ্যে দুকড়ি বালা দেবী, কল্পনা দত্ত, উজ্জ্বলা মজুমদার, লীলা নাগ, ইন্দুমতী ভট্টাচার্য, ইলা সেন, আভা দত্ত, শান্তশীলা পালিত, ঊর্মিলা বালা পাইয়া, নির্মল নলিনী ঘোষ, প্রফুল্লমুখী বসু প্রমুখদের নাম উল্লেখযোগ্য (শ্যামলী

গুপ্ত, ১৪১৬)। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন লেডি আব্দুল কাদির, ফাতিমা বেগম, বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ প্রমুখ মহিলারা।

১.১.২ প্রাচীন ভারতে নারী শিক্ষা :

বেদ পূর্ববর্তী সময়ের লিখিত ইতিহাস এখনও পাওয়া যায়নি। কিন্তু বেদ পূর্ব কালে প্রাচীন ভারতের আদিম অধিবাসীরা যে শিক্ষিত ছিলেন তার যথেষ্ট প্রমাণ এখনও রয়েছে। যেমন আর্য পূর্ব কালে ভারতের পশ্চিম ভাগের আদিম জনজাতি অসুর সম্প্রদায়ের মানুষেরা লোহা গলানো এবং লোহার যন্ত্রপাতি তৈরির কাজে যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন। বর্তমান ঝাড়খণ্ডের ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে এখনও বিভিন্ন আদিম জনজাতির ইঁট ও পাথর দিয়ে তৈরি রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে, যেখানে প্রাচীন উন্নত স্থাপত্য বিজ্ঞানের প্রমাণ মেলে। আদিম অধিবাসীদের জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে যে **'Indigenous Knowledge System'** বা **'Ethnic Knowledge System'** নিয়ে বর্তমানে গবেষণা করা হচ্ছে তাতে প্রমাণিত জীবন-যাপনের প্রয়োজনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁরা জ্ঞান বিজ্ঞানকে ব্যবহার করতে জানতেন এবং সেই জ্ঞান বিজ্ঞানকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করে তাঁরা আজ পর্যন্ত নিজেদেরকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছেন, অবলুপ্ত হয়ে যাননি। আদিম জনজাতি সমাজে পুরুষ এবং নারী উভয়ই তাঁদের মতো করে অপ্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। সুতরাং আর্যদের আগমনের পূর্বে ভারতবর্ষে জনজাতি মানুষদের মধ্যে শিক্ষার যথেষ্ট প্রচার এবং প্রসার ছিল।

আর্যরা পশ্চিম দিক দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন এবং প্রথমে সিন্ধু নদীর অববাহিকা জুড়ে বসবাস করতে শুরু করেন। পরবর্তীতে প্রাচীন জনজাতি মানুষদের সাথে যুদ্ধ করে ক্রমশ ভারতের পূর্ব দিকে অগ্রসর হন এবং আর্য-অনার্য সংস্কৃতির মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটে।

অনার্য জনজাতি মহিলাদের সঙ্গে আর্য পুরুষদের বিবাহও এই সময় থেকে শুরু হয় বলে পণ্ডিতরা মনে করেন, যার ফলশ্রুতিতে আর্য-অনার্যর সংমিশ্রণে শঙ্কর জাতির উদ্ভব হয়। আর্য-অনার্যর সংমিশ্রণে সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও নতুনত্বের প্রতিষ্ঠা ঘটে। আর্যরা ভারতে আসার পর বিভিন্ন সময়ে যে দার্শনিক সত্য তাঁরা অনুভব করেছিলেন তাকে মন্ত্রের বা সূত্রের আকারে তৈরি করেন এবং বংশ পরম্পরায় বা শিষ্য-শিষ্যা পরম্পরায় সেই জ্ঞানকে

পরবর্তী প্রজন্মের হাতে ‘শ্রুতির’ মাধ্যমে তুলে দেন। অনেক পরে সংস্কৃত বর্ণমালার সৃষ্টি হয় এবং ক্রমশ বিভিন্ন সত্যদ্রষ্টা ঋষি এবং বিদূষীগণের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যকে তাঁরা মন্ত্রের আকারে লিপিবদ্ধ করেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দেন। সুতরাং বৈদিক যুগের প্রথম থেকেই পুরুষ এবং নারী উভয়ই যে শিক্ষা এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের অঙ্গনে দৃঢ়ভাবে পা ফেলেছিলেন তার যথেষ্ট প্রমাণ বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। সুতরাং এককথায় বলা যায় যে বৈদিক সাহিত্য কেবল মাত্র মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের দ্বারা পূর্ণতা পায়নি সেখানে বহু বিদুষী নারীর অবদান রয়েছে। তাই ভারতবর্ষে নারী শিক্ষার ইতিহাস যথেষ্ট প্রাচীন হলেও আজও এই বিষয়ে যথেষ্ট চর্চার সুযোগ রয়েছে। কারণ বৈদিক যুগে তথা বেদ পরবর্তী কালে নারীর শিক্ষা কিভাবে ভারতবর্ষের শিক্ষা সংস্কৃতি এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রকে পরিপুষ্ট করেছে তার বিজ্ঞান সম্মত আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আজও শেষ হয়নি।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় বিশেষত ঋক্‌বেদের যুগে ভারতবর্ষের নারীরা মর্যাদার সঙ্গে অতিউচ্চ স্থান অধিকার করতেন এবং তাঁরা ছিলেন সমাজের অন্যতম মূল স্তম্ভ। নারীরাও সর্বোচ্চ বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। নন্দ (২০২৩) এর কথায় “ভারতে স্ত্রী শিক্ষার গতি প্রকৃতি প্রাচীন কাল থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত অর্থাৎ স্বাধীনতার পূর্বকাল পর্যন্ত একটি বিপরীতধর্মিতার মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। কারণ প্রাচীনকালে স্ত্রী শিক্ষা এবং মেয়েদের অধিকারের চিত্র ছিল উজ্জ্বল। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার ব্যাপ্তি কমেছে, সঙ্কুচিত হয়েছে পরিধি। আবার ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে নারী শিক্ষার ব্যাপ্তি এবং প্রসারণ ঘটেছে। এই বিপরীতধর্মিতার কারণ বিশ্লেষণ করতে না পারলে নিবেদিতা, রোকেয়া এবং সমকালীন প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার অধিকারী ব্যক্তিদের সমাজ এবং নারী শিক্ষা ভাবনার প্রেক্ষাপটকে বোঝা সম্ভব নয়।”

সুপর্ণা গুপ্ত (২০১৪) ‘ইতিহাসে নারী : শিক্ষা’ গ্রন্থে ‘প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে মেয়েদের শিক্ষার অধিকার’ প্রবন্ধে লিখেছেন, “আজকের দিনে এই কারণ গুলি উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে যেহেতু ভারতীয় সমাজ মানসে নারী শিক্ষার প্রকৃতি ও পরিধি এবং নারীর পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে ধারণা এখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। স্মৃতিশাস্ত্র গুলির সঙ্গে যাঁদের কিছু পরিচয় আছে তাঁদের চোখে নিশ্চয় ধরা পড়েছে উদার এবং রক্ষণশীল, এই উভয় ধারায় দ্বন্দ্ব ও দ্বিধার মধ্য দিয়ে প্রাচীন কালে ভারতীয় নারীর অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত

হয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, প্রধানত শিক্ষার অভাবে পরাধীন নারী কখনোই নিজের অধিকার টুকু বুঝে নিতে পারেনি।”

১.১.৩ বৈদিক যুগে নারী শিক্ষা :

আধুনিক নারীবাদী লেখক লেখিকা এবং ঐতিহাসিকেরা যা-ই বলুন না কেন বৈদিক যুগে এমনকি বেদ পূর্ববর্তী যুগেও ভারতীয় নারীরা যে শিক্ষিতা ছিলেন এবং তাঁদের সামাজিক অবস্থান যে উচ্চাসনে ছিল তা বিভিন্ন ঐতিহাসিক তর্কাতিত ভাবে প্রমাণ করেছেন। বৈদিক সাহিত্যে বহু বিদুষী নারীর কথা আমরা জানতে পেরেছি যাঁরা ছিলেন সত্যদ্রষ্টা এবং মন্ত্রস্রষ্ঠা। ফলে স্বাভাবিক ভাবে বৈদিক যুগে ঋষিদের সমতুল্য আসনে এই সকল নারীরা অবস্থান করতেন। প্রায় ২০০০ বছর ধরে যে সকল প্রাতঃ স্মরণীয়া ভারতীয় নারীরা ভারতবর্ষের নারী জাতিকে গৌরবান্বিত এবং অনুপ্রাণিত করেছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন - ঘোষা, বিশ্ববারা, অপালা, লোপামুদ্রা, বাগাম্ভূনি, গার্গী, মৈত্রেয়ী, রোশা, কদ্রু, জুহু, ভাগাস্ত্রিনি, পৌলোমী, জরিতা, শ্রদ্ধা-কামায়নী, সিকতা, সুলভা, উর্বশী, সারঙ্গা, যমী, ইন্দ্রানী, সাবিত্রী, দেবযানী, নোধা, আকৃষ্ট ভাষা, পৌপায়ন, কুমারী (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৪/২৫/৪), বড়বা প্রাতিথেয়ী (আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র), প্রমুখ (নন্দ, ২০২৩)।

অথর্ব বেদে দেখতে পাই ব্রহ্মচর্য ব্রত পালনের পর শিক্ষিতা নারী বিবাহের অধিকার লাভ করেন। যেমন- ‘ব্রহ্মচর্যেণ কন্যা যুবাবং বিন্দতে পতিম’ (XI.5.18)। অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যব্রত পালনের মাধ্যমে কন্যা তার পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষা সম্পূর্ণ করে একজন যুবক পুরুষকে পতিরূপে লাভ করতে পারেন। সুতরাং অথর্ববেদও প্রতিটি কন্যাকে শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগদানের কথা বলেছেন। বেদ পরবর্তীকালেও মেয়েদের শিক্ষার এই ধারা ভারতবর্ষে অনুসরণ করা হত। সুতরাং অথর্ববেদও স্বীকার করেছেন নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে। কারণ একজন শিক্ষিতা নারী তার পরিবারকে আদর্শ পরিবার হিসাবে গড়ে তুলতে সক্ষম। তাই প্রত্যেক বাবা মা দীর্ঘজীবি এবং পণ্ডিত কন্যালাভের ইচ্ছা করতেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, “য ইচ্ছেদ্ দুহিতা মে পণ্ডিতা জায়েত সর্বামায়ুরিয়াদিতি স তিলৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষমন্তম শ্লীয়াতাম্ ইতি” (VI.4.17)।

শতপথ ব্রাহ্মণেও বলা হয়েছে,

"যদ্ গায়ন্তি উদ্‌গাতারঃ পত্নী কমৈব তৎ" (XIV. 3.1.35)

অর্থাৎ উত্তর বৈদিক যুগে উদগাতাগণ যজ্ঞ তে যে সামগান করতেন তা অতীতে যজমান পত্নীরই করনীয় ছিল। অর্থাৎ যজমান পত্নী যদি যথেষ্ট শিক্ষিতা না হতেন তা হলে তাঁর পক্ষে শুনে শুনে আয়ত্ত করে সামগান করা সম্ভব ছিল না। একথা থেকে এটুকু নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে বৈদিক যুগে মেয়েরা সকলেই শিক্ষিতা ছিলেন।

শতপথব্রাহ্মণ (1.7.2.1) এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (33.1) কেবলমাত্র পুত্র প্রাপ্তির আকাঙ্খার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং উল্টো দিকে কন্যাকে বেদ বিদ্যা দান না করে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে পুত্রবতী করানোর প্রতি সমাজের দৃষ্টি পড়েছে। সুতরাং উত্তর বৈদিক যুগ থেকে মেয়েদের শিক্ষার সার্বিক সুযোগ ক্রমশ সঙ্কুচিত হতে থাকে।

উত্তর বৈদিক যুগে আর্যরা অনার্যদের হারিয়ে ক্রমশ কোনঠাসা করতে থাকেন এবং তাঁদের যুবতী স্ত্রীদের বিবাহ করেন। অনার্য পত্নীরা যেহেতু শিক্ষিতা ছিলেন না তাই তাঁদের পক্ষে বিশুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ সম্ভব ছিল না। তাই যজ্ঞে স্বামীর সঙ্গে অনার্য স্ত্রীর বসার এবং যজ্ঞ কর্মে অংশগ্রহণ করার অধিকার ক্রমশ সঙ্কুচিত হতে থাকে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ব্যাকরণবিদ্ পাণিনি লিখেছেন,

"পত্যুর্নো যজ্ঞ সংযোগ"।

কারণ উত্তর বৈদিগ যুগে ব্রাহ্মণরা মনে করতেন যে, ভুল মন্ত্র উচ্চারণে যজ্ঞ সম্পূর্ণতা পাবে না, যজ্ঞে অভীষ্ট ফললাভ হবে না এমন কি ভুল মন্ত্র উচ্চারণকারীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তাই বশিষ্ঠ ধর্ম সূত্রে (XVIII.18) বলা হয়েছে,

"কৃষ্ণবর্ণা তু জা বামা সা রমণায় ন ধর্মায়"।

অর্থাৎ কালো রঙের অনার্য মেয়েরা কেবলমাত্র পতিকে রমণে পরিতৃপ্তি দেবে, ধর্মক্ষেত্রে বা যজ্ঞে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। যেহেতু অনার্য মেয়েরা বেদপাঠ করে বেদের মন্ত্র উচ্চারণের সামর্থ্য লাভ করেনা তাই অনার্য পত্নী গ্রহণ করলে সে কেবলমাত্র স্বামীকে যৌন পরিতৃপ্তি দেবে কিন্তু স্বামীর সঙ্গে যজ্ঞ কর্মে বা অন্যান্য ধর্ম কর্মে

অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তাই স্বাভাবিক ভাবেই অনার্য নারীকে ধর্মসঙ্গিনী না করার বিধান আরোপ করেছিলেন তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। যেহেতু ধর্মপত্নী ছাড়া পুরুষ একাকী যজ্ঞে অংশগ্রহণের অধিকারী নন, তাই সেই যুগে পুরুষদের পক্ষে যজ্ঞ কর্মে অধিকার লাভের জন্য নিজের বর্ণের শিক্ষিতা স্ত্রীকে বিবাহ করা বাধ্যতামূলক হয়ে উঠেছিল।

বহু ব্রাহ্মণ, রাজা, শ্রেষ্ঠী, বা ধনীরা যাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছেন তাকে যজ্ঞ কর্মে অংশগ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার সাহস ও সামর্থ্য ধর্মশাস্ত্র প্রণেতাদের ছিল না। তাই ব্রাহ্মণরা কৌশলে সমস্ত নারীর প্রণবমন্ত্র (ওঁ) উচ্চারণের অধিকার কেড়ে নেন। প্রণব মন্ত্র উচ্চারণের অধিকার না থাকায় মেয়েরা ক্রমশঃ সামগানে অংশগ্রহণের অধিকার হারান এবং যজ্ঞকর্মে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। তাই উত্তর বৈদিক যুগ থেকে নারীর শিক্ষার অধিকার সঙ্কুচিত হতে থাকে।

খ্রিষ্ট জন্মপুর্ব ৬০০-৩০০ অব্দে পাণিনির ব্যাকরণে, 'ছাত্রীশালা' ("ছাত্র্যাদয়ঃ শালায়াম", VI.2.86) থাকার কথা জানা যায়। পাণিনির ব্যাকরণে 'উপাধ্যায়া' ও 'আচার্যা' শব্দের ব্যবহারে প্রমাণ হয় যে প্রাচীনকালে নারীরা অধ্যাপনা করতেন। নারদ স্মৃতিতে বলা হয়েছে মেয়েরা শিক্ষার অধিকার হারানোয় ক্রমশ স্বাতন্ত্র্য তথা স্বাধীনতা হারিয়েছেন (XIII.30)। ঋগ্বেদের 'সূর্যা বিবাহসূক্তে' স্বীকার করা হয়েছে যে, পরিবার ও সমাজে নারীর স্থান সুউচ্চে রয়েছে(X.85)।

বৈদিক যুগে বাল্য বিবাহের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদ (১০/২৭/১২), যজুর্বেদ (৮/১) এবং অথর্ববেদের (১১/৫) সূত্রে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মচর্যাবস্থায় যথাযথ ভাবে শিক্ষালাভ করার পর মেয়েরা স্বয়ং পতি নির্বাচন করবেন। মেয়েদের বিবাহ করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা ঋগ্বেদে পাওয়া যায়নি। ঋগ্বেদের ২/১৭/৭ সূত্রে দেখা যায় অবিবাহিতা কুমারী মেয়েরা পিতৃগৃহে বসবাস করছেন।

বৈদিক যুগে যে সকল নারী দীর্ঘ দিন বা সারাজীবন বিবাহ না করে শিক্ষালাভ এবং জ্ঞান চর্চা করতেন তাঁদের বলা হত 'ব্রহ্মবাদিনী' এবং যে সকল নারী শিক্ষাদান করতেন তাঁদের বলা হত 'উপাধ্যায়া"। শিক্ষাদানের অধিকারী এবং মন্ত্রস্রষ্টা নারীরও উল্লেখ পাওয়া যায় বৈদিক শাস্ত্র সমূহে। বহু নারী ঐ যুগে ললিত কলাতেও

পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন (শতপথব্রাহ্মণ,৩/২/৪/৬) মুদগলিনী, বিশপলা, বধ্রিমতি, শশীয়সী, প্রমুখদের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জনের জন্য (ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে ১০২ সূক্ত লক্ষনীয়)।

ঋগ্‌বেদের যুগে বহু নারী মন্ত্র রচনা করেছেন। যেমন- রোমশা (১.১২৬), লোপামুদ্রা(১.১৭৯), বিশ্ববারা (৫.২৮), অপালা (৮.৯১.৭), যমী (১০.১০), বসুক্রজায়া (১০.২৭ - ২৮), ঘোষা (১০.৩৯), সূর্যা (১০.৮৫), ঊর্বশী (১০.৯৫), সরমা(১০.১০৮), বাক (১০.১৫৪), ইন্দ্রানী (১০.১৪৫), ইন্দ্রজননী (১০.১৫৩), বিবস্বৎকন্যা যমী (১০.১৫৪), শচী (১০.১৫৯), সার্পরাঙ্গি (১০.১৮৯) প্রমুখদের নাম উল্লেখযোগ্য। বেদ পরবর্তী কালে বহু নারী শিক্ষা ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন মন্ত্রস্রষ্টা, যেমন- গার্গী, মৈত্রেয়ী, বাৎসী। পুরাকালে বেদ অধ্যয়নকারী এমনকি বেদের মন্ত্রস্রষ্টারা অনেকেই অধ্যাপনাও করতেন। মেয়েরা সাবিত্রী মন্ত্র ও গায়ত্রী মন্ত্র জপেরও অধিকারী ছিলেন।

“পুরাকালে তু নারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনম্ ঈষ্যতে।
অধ্যাপনং তু বেদানাং সাবিত্রী বচনং তথা”।। (গৌতমস্মৃতি)

হারীত স্মৃতিতে বলা হয়েছে ব্রহ্মবাদিনী নারীরা আজীবন অবিবাহিতা থেকে ব্রহ্মচর্য রক্ষা, উপনয়ন, অগ্নিসমিন্ধন, বেদাধ্যয়ন ইত্যাদি সমস্ত কাজই করবার অধিকারী ছিলেন।

যদিও বৈদিক যুগে মেয়েদের সম্বন্ধে অনেক ইতিবাচক উক্তি রয়েছে কিন্তু একই সঙ্গে অনেক নেতিবাচক উক্তিও লক্ষ্য করা যায়। ঋগ্‌বেদে পর্যন্ত মেয়েদের সম্বন্ধে নেতিবাচক উক্তি লক্ষ্য করি।

“ইন্দ্রশ্চিদ্ধা তদব্রবীৎ স্ত্রিয়া অশাস্যং মনঃ
উতো অহ ক্রতুং লঘুম্”।। (৮/৩৩/১৮)
“ন বৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি
সালাবৃকাণাং হৃদয়ান্যেতা”।।(১০/৯৫/১৫)

ঋগ্‌বেদের উল্লিখিত প্রথম সূত্রটিতে বলা হয়েছে যে, ইন্দ্রের মতে নারীর মনকে শাষণ করা যায় না, তার বুদ্ধি ও শাসন জ্ঞান লঘু। দ্বিতীয় সূত্রটিতে বলা হয়েছে যে, ইন্দ্র প্রকৃতই বলেছেন নারীর প্রণয় স্থায়ী নয়। তার হৃদয়টি বৃকের (নেকড়ে বাঘ, শেয়াল, কাক বা ক্ষত্রিয়দের) ন্যায়।

শতপথব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক উপনিষদ, বায়ুপুরাণ ইত্যাদিতে মেয়েদের সম্বন্ধে নেতিবাচক বক্তব্য রয়েছে। শ্রীমদ্ভগবৎ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ মেয়েদেরকে বৈশ্য এবং শূদ্রদের সঙ্গে পাপযোনি বলেছেন। মহাকাব্যের যুগেও নারীরা উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন, এবং মন্ত্রোচ্চারণ ও যজ্ঞানুষ্ঠানের অধিকারিণী ছিলেন। রামায়নে দশরথের স্ত্রী কৌশল্যা (রামায়ণ - ২.২০.১৫), বালীর স্ত্রী তারা (রামায়ণ - ৪.১৬.১২), রামের স্ত্রী সীতা (রামায়ণ - ৪.১৫.৪৮), কুন্তি (মহাভারত ৩.৩০৫.২০) প্রমুখদের জীবনে প্রমান পাওয়া যাই যে তাঁরা শিক্ষিতা ছিলেন। দ্রৌপদীও যে যথেষ্ট শিক্ষিতা ছিলেন তার প্রমাণ পাই তাঁর রাজনীতি, ন্যায়নীতি এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান থেকে। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' কাব্যে আমরা দেখি কণ্বমুনির জন্য শকুন্তলা নানা শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। অত্রিমুণীর স্ত্রী অনসূয়া নানা শাস্ত্র পাঠ করেছিলেন এবং সীতাকে সে সম্বন্ধে উপদেশও দিয়েছিলেন। কালীদাস রচিত 'কুমারসম্ভব' কাব্যেও পাওয়া যায় উচ্চশিক্ষিতা নারীর কথা। তবে মহাভারতে ভীষ্ম নারীর সম্বন্ধে নিকৃষ্ট কথা বলেছেন।

'মনুসংহিতায়' কখনো নারীর সম্বন্ধে ইতিবাচক কথা আবার পরক্ষণে নেতিবাচক কথাও বলা হয়েছে। মনুসংহিতার বিভিন্ন শ্লোকে (৩.৬২, ৯, ২৬, ৯.২৭ – ২৮, ৩.৬০, ৯.৪৬, ৯.৩, ৯.১০) মেয়েদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা পোষণ করা হয়েছে। তবে স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে হয় তিনি নীরব থেকেছেন অথবা মেয়েদের শিক্ষার বিরোধিতা করেছেন। বিবাহিতা নারীদের সম্বন্ধে মনু সুউচ্চ ধারণা পোষন করেছেন (৩.৫৬, ৩.৫৭), পিতার সম্পত্তিতে পুত্র ও কন্যার সমান অধিকারকে মনু নিজে স্বীকৃতি দিয়েছেন (৯.১৩০), আবার বহু সূত্রে তিনি মেয়েদের সম্বন্ধে নেতিবাচক কথাও বলেছেন (২.১৬, ৯.১০, ১১.৩৬ - ৩৭)।

স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে মনু স্পষ্ট করে কিছু না বললেও ছেলেদের ন্যায় মেয়েদেরকেও যে সযত্নে লালনপালন এবং শিক্ষাদান করতে হবে সেকথা স্বীকার করেছেন। যেমন-

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষানীয়েতি যত্নতঃ"।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মনে করেন যে, মনু সর্বাঙ্গীন শিক্ষা প্রণালীর প্রবক্তা ছিলেন। কারণ মনু প্রবর্তিত শিক্ষা শিক্ষার্থীর শরীর, চিত্ত, মন, বুদ্ধি, আত্মা, এই সকলেরই বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে প্রবর্তিত। ডা. জি. এস. অ্যারান্ডেল বলেছেন,

মনু যেভাবে সুস্থ জীবন যাপনের জন্য নির্দিষ্ট মৌলিক নীতিগুলি প্রণয়ন করেছেন সেরূপ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতে পূর্বে চালু ছিল না। (মনুর "বর্নাশ্রমধর্ম", পৃ- ১৪২)

১.১.৪ পরবর্তী বৈদিক যুগে নারীদের অবস্থানঃ

পরবর্তী বৈদিক যুগে (১০০০ খ্রীঃপূঃ -৬০০ খ্রীঃপূঃ) নারীরা মাতৃরূপে ও দেবীরূপে পূজিতা হতেন। তাঁরা সম্মান ও সম্ভ্রমে দেবত্ব লাভ করতেন যা ঐ সময়কার বিভিন্ন মহাকাব্যে খোদিত হয়েছে। সীতা, দ্রৌপদী, কৈকেয়ী, রুক্মিণী, সাবিত্রী, সত্যভামা প্রমুখরা ছিলেন তৎকালীন সমাজের নৈতিকতা, দৃঢ়মানসিকতা, সাহসিকতা, সাম্মানিক পদমর্যাদার মূর্ত প্রতীক। নারীত্বকে পবিত্রতার প্রতীক রূপে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন সীতা, সাবিত্রী, অনসূয়া, এবং দময়ন্তী তাঁদের অপার পতিভক্তির মাধ্যমে। সম্পত্তির উপর নারীদের শর্তহীন অসীম অধিকার এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছিল পুরুষের মতোই। সে যুগে মাতৃরূপা গঙ্গা, গান্ধারী, পার্বতী, উত্তরা এবং কুন্তী দেবী রূপেই পরিগনিত হতেন। যেসব নারীরা বিভিন্ন দেবতাকে মনে মনে বিয়ে করতেন তাদেরকে বিভিন্ন মন্দিরে পুরোহিতদের সেবায় সারাজীবন কাটাতে হত। এই নারীরা পরিচিতা ছিলেন দেবদাসী নামে। ক্ষত্রিয় নারীরা যুদ্ধক্ষেত্রে যোগদান করতেন এবং পুরুষ সৈনিকদের সঙ্গে সমান তালে যুদ্ধ করতেন। যুদ্ধবিদ্যায় তাঁদের পারদর্শীতা সত্যিই আজও আমাদের বিস্মিত করে। পুরুষেরা সম্পূর্ণভাবে যৌনতার জন্য নারীদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। নারীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁরা যৌনাচারে লিপ্ত হতে পারতেন না।

১.১.৫ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সময়কালে নারীদের অবস্থানঃ

আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দে বৌদ্ধধর্মের সুচনা হয়। বৌদ্ধধর্মের মূলকথা শান্তি এবং পার্থিব মোহ থেকে মুক্তি। এমন এক বৃহৎ মানব ধর্মের ক্ষেত্রেও গৌতমবুদ্ধ প্রথম দিকে নারীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিলেন। পরবর্তীতে বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য এবং ভ্রাতুষ্পুত্র আনন্দ এবং পালিকা মাতা গৌতমীর অনুরোধে বৌদ্ধ সংঘে মেয়েদের প্রবেশ অধিকার দান করেন গৌতম বুদ্ধ। যাঁরা বৌদ্ধ ভিক্ষুণী হতেন তাঁরা বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের মতোই বিদ্যা চর্চার সুযোগ পেতেন এবং সামাজিক মর্যাদাও লাভ করতেন। 'মাধব মালতী' নাটকে দেখা যায়, কামন্দকি নামে এক বৌদ্ধ ভিক্ষুণী যখন বিদ্যা চর্চা করতেন সেই সময় বহু ছাত্র তাঁকে সহযোগিতা করতেন। কামন্দকির মতো অন্যান্য বহু বৌদ্ধ ভিক্ষুণী শাস্ত্র চর্চায় ও ধর্মের অনুশীলনে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বিশাখার মতো ধনী পরিবারের মেয়েরা নানা রকম বিদ্যাচর্চার সুযোগ পেতেন। পরবর্তী কালে শীলভট্টারিকা, বিজয়ংকা, মন্ডন মিশ্রের স্ত্রী উভয় ভারতী এবং আরো পরে রানী লক্ষীবাঈ প্রমূখ স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের নাম উল্লেখযোগ্য।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সময়কালে (৬০০ খ্রীঃপূঃ -২০০ খ্রীঃপূঃ) লিঙ্গ সমতা সার্বিক ক্ষেত্রে পালন করা হত যেমন- শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম। সঙ্ঘমিত্রা ছিলেন বৌদ্ধধর্মের শিক্ষিকা। জয়ন্তী জীবনব্যাপী অবিবাহিতা ছিলেন দর্শন বিষয়ে চর্চা করার জন্য, যা তৎকালীন নারীদের জ্ঞানচর্চার স্বাধীনতাকেই প্রমাণ করে। যে কোন নারী বৌদ্ধভিক্ষুনী সঙ্ঘের সদস্যা হয়ে দিন কাটাতে পারতেন। সেই যুগে নারীদের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা তেমন একটা সন্তোষজনক ছিল না।

১.১.৬ নারীশিক্ষায় প্রাচীন ভারতের কিছু ব্যতিক্রমী চিত্রঃ

প্রাচীন ভারতে এরকম একটি সামাজিক অবক্ষয় মূলক অবস্থার মধ্যেও কিছু ব্যতিক্রমী চিত্র পরিলক্ষিত হয়। সাহিত্য ও শিল্প ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয় মহিলাদের অবদান গভীর ছাপ রেখেছে। অসংখ্য শিক্ষিতা নারী তাঁদের প্রতিভার মাধ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠা রক্ষায় কার্যকরী হয়েছেন। সেই সময় শিক্ষিতা মহিলাদের দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে- (১) ব্রহ্মবাদিনীস - যারা সারা জীবন অবিবাহিত থেকে বেদের চর্চা করতেন। (২) সদ্যোৎভাস -

যারা বিবাহের পূর্বসময় পর্যন্ত বেদ চর্চা করতেন। মহর্ষি কাত্যায়ন মহিলা শিক্ষকদের উপাধ্যায় বা উপাধ্যায়ী নাম দিয়েছেন। সম্রাট অশোক তাঁর নিজের কন্যাকে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। অপরদিকে জৈন ধর্মগ্রন্থ থেকে জানা যায় রাজকুমারী কোসাম্বী, জয়ন্তী, প্রমুখরা জীবনভর কোমার্য ধর্ম পালন করেছেন শুধুমাত্র ধর্ম এবং দর্শন চর্চার জন্য। বৌদ্ধ ভিক্ষুণীরা বহু স্তোত্র রচনা করেছেন যেগুলি আজও বহুল প্রচলিত। সংস্কৃত সাহিত্যে পারদর্শিতা প্রমাণ করার পাশাপাশি সঙ্গীত, শিল্প এবং অঙ্কন বিদ্যাতেও চমৎকার প্রতিভার প্রকাশ রয়েছে। রাজনীতি এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও নারীদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। সাতবাহন সম্রাজ্ঞী, নয়নীকা তাঁর অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রের পরিবর্তে নিজে রাজ্যভার সামলেছেন। একই রকম ভাবে প্রভাবতী, দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্তের কন্যা তার শিশু পুত্র বক্তক-এর হয়ে গুপ্ত সাম্রাজ্যের শাসনভার সামলেছেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পরবর্তী সময়ে কাশ্মীর, ওড়িষ্যা, অন্ধ্র প্রভৃতি রাজ্যে নারীদের দ্বারা শাসনের দৃষ্টান্ত রয়েছে। চালুক্য রাজবংশের রাজা প্রথম বিক্রমাদিত্যের সময় প্রাদেশিক শাসন ভার সামলাতেন রাজকুমারী বিজয়ভট্টরিকা। কন্নড় অঞ্চলে গ্রাম এবং প্রাদেশিক শাসন ভার ছিল মহিলাদের উপরই। তবে সম্ভ্রান্ত মহিলারা শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ সুবিধা পেলেও সাধারণ মহিলারা অবহেলা ও লাঞ্ছনার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলেন। ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন ভারতের সময়সীমা হল ২৫০০ খ্রীঃপূঃ - ২৫০ খ্রীঃপূঃ পর্যন্ত। প্রত্নতত্ব বিদ্যা, প্রাচীন গ্রন্থ সমূহ ও শিল্পকলা নারীদের জীবনযাত্রার একটি জীবন্ত চিত্র তুলে ধরে। খনন কার্যের ফলে প্রাপ্ত উপাদান সমূহ পরিষ্কার করে দেয় যে দেবী মূর্তীর আরাধনা প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল। বিশ্বাস করা হত যে দেবি শক্তিই জীবনকে ধারণ করত এবং বাঁচিয়ে রাখত। আর্যরা ভারত আক্রমণের পর ধীরে ধীরে হিন্দু ধর্মের উত্থান, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্মের প্রসার মানব জাতিকে জ্ঞানের আলো এনে দেয়। আর্যরা প্রধানত বসবাস শুরু করে সিন্ধু নদীর তীরে এবং কালক্রমে বিশাল সিন্ধু সভ্যতার পতন হয় (২৫০০ খ্রীঃপূঃ - ১৫০০ খ্রীঃপূঃ)। বর্তমানে এই স্থানটি পাকিস্থানের অন্তর্গত যা একসময় অখন্ড ভারত ভূমির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার একটি অন্যতম গুরুত্তপূর্ণ স্থান হল 'লোথাল', বর্তমানে যা গুজরাট। অন্যান্য উন্নত শহর গুলি মহেঞ্জোদড়ো এবং হরপ্পা। এই প্রাচীন শহরগুলি বিখ্যাত তাদের সুন্দর নগর পরিকাঠামো এবং জীবনযাত্রার জন্য। এই শহরগুলির উন্নত কৃষিপ্রণালী এবং বানিজ্যিক পদ্ধতি বর্তমান সভ্যতার কৃষি বানিজ্যকেও হার মানায়। প্রাচীন এই সভ্যতায় একটি সুন্দর নারী মূর্তি পাওয়া যায় যার অবস্থান ভঙ্গীমা দেখে মনে হয় যে এই সময় মেয়েরা ছিল আত্মবিশ্বাসী এবং সম্মানের অধিকারিণী। এছাড়া অসংখ্য মাটির মূর্তি

ও খেলনা পাওয়া যায় যা প্রমাণ করে সুন্দর পরিবার পরিকাঠামোকে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে এই সিন্ধু সভ্যতা বিশেষ কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে সিন্ধু নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়ে যাওয়ায় ধংসপ্রাপ্ত হয়। এই থেকে এটা বিশ্বাস করা হয় যে আর্যরা যে সময় এদেশের ভূমিপুত্রদের উপর আক্রমন করে তার পূর্বেই সিন্ধু সভ্যতা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এই আর্য জাতিরা ছিল সুদীর্ঘকায় ও গৌরবর্ণ—এখানকার মূলবাসীদের তুলনায়। আর্যরা এই মূল বাসীদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে তাদের দাসত্ব বৃত্তিতে বাধ্য করে। যার ফলস্বরূপ জাতিভেদ প্রথার উত্থান হয়। আর্যদের মধ্যে যারা বেদ রচনা করল এবং বেদ চর্চার সঙ্গে যুক্ত থাকল তারা কালক্রমে ব্রাহ্মণ পুরোহিতে পরিণত হল। ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষমতার আধিপত্য অপর তিন শ্রেণির (ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) উপর কায়েম করতে শুরু করে। ব্রাহ্মণদের রচিত বেদই পরবর্তীকালে হয়ে ওঠে হিন্দু ধর্মের মূল সারবস্তু। সবচেয়ে প্রাচীন বেদটি হল ঋগ্বেদ। যা রচিত হয়েছে ব্রাহ্মণদের দ্বারা। এই ধর্মীয় গ্রন্থটি প্রথম বিভিন্ন দেব দেবীর সম্পর্কে বর্ণনা দেয়। পৃথিবী সৃষ্টির একটি ইতিহাস পাওয়া যায় এই গ্রন্থে, যেখানে বর্ণিত হয়েছে দেবী অদিতি পৃথিবী সৃষ্টি করেন। এই পৃথিবী দেবি পৃথ্বী নামে মর্তে পূজিতা হন। ঋগ্বেদে যে আদর্শ নারীমূর্তির চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা কন্যারুপী। এই কন্যাটি সৌন্দর্য্য, ঔজ্জ্বল্য এবং আনন্দের প্রতীক। ঋগ্বেদে বর্ণিত এই নারী চিত্রটি পৃথিবীর সম্ভাব্য মানব জীবনের উৎস রূপে পরিগণিত হয়। সম্ভবত বৈদিক যুগের শেষ দিকে ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ভীত শক্ত হতে থাকে। একথা প্রমানিত হয় ঋগ্বেদে (X.১৪.৯) যেখানে সমস্ত পিতৃপুরুষগনের সমবেত পূজার কথা বলা হয়েছে। অথর্ব বেদে (xvii.২.৪৯) কেবলমাত্র পারিবারিক ভিত্তিতে পিতৃপূজার রীতি প্রবর্তিত হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণ (I.৭.২.১) এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৩৩.১) কেবলমাত্র পুত্র প্রাপ্তির জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজনের কথা উল্লিখিত হয়েছে। কারণ এতে বর্ণিত হয়েছে যে পুত্র হবে পিতার উত্তরসূরি এবং ইহলোকের পরিত্রাতা।

১.১.৭ মধ্যযুগে নারীদের অবস্থানঃ

ভারতের ইতিহাসে মধ্যযুগের সূচনা হয় মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। এই সময় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মেয়েরাই মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত হত। পরিবারের মধ্যে থেকে যেটুকু সম্ভব হত তৎকালীন মেয়েরা সেইটুকু শিক্ষা অর্জন করতে পারত। এদের পুরুষাধীন সম্পত্তি মনে করা হত এবং খুব কমই সুযোগ থাকত বাড়ির বাইরে বেরোনোর। ফিরোজশাহ তুঘলক (১৩০৯-১৩৮৮) মেয়েদের মন্দির মসজিদ গমনে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। এইরকমটা বিশ্বাস করা হত যে যদি তারা বাড়ির বাইরে যায় তবে অনৈতিক কর্মে লিপ্ত হতে পারে, তৎকালীন শাসক ধনী ব্যক্তিরা অনেকগুলি বিবাহ করতে পারত এবং একটি জায়গাতে অনেকগুলি পরিচারিকা রাখতে পারত যেটির নাম ছিল 'হারেম'। যেখানে পরিবারের মেয়েরা সম্মানজনক আসন পেত না, সেখানে পুরুষেরা যথেষ্ঠ সম্মানজনক আসন লাভ করত। এমনকি রাজপুত্ররাও যুদ্ধে পরাজয়ের পর তাদের স্ত্রীদের ও দাসীদের হত্যা করত নিজেদের সম্মান রক্ষার জন্য। কারণ এই সময় যুদ্ধে কোন রাজা পরাজিত হওয়ার পর পরাজিত রাজার সমস্ত সম্পত্তি এমনকি মেয়েদেরও জয়ী রাজা ও সৈন্যদের মধ্যে সে সম্পত্তির সমান বন্টন হত। এই সময় নারীদের বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা ছিল না। তাদের জীবন ছিল অত্যন্ত কঠিন, সম্মান ও ভালোবাসাহীন। হিন্দু ধর্মের মধ্যে সহমরণ প্রথা এই সময় কঠোর ভাবে পালিত হত। তবে রাজ পরিবার, জমিদার বাড়ীতে জন্মগ্রহণকারী মেয়েরা কিছুটা সুবিধা ভোগ করত। অন্দরমহলে থেকেই প্রারম্ভিক শিক্ষা অর্জন করতে পারত এবং পরে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও পরিবারের কর্তাদেরও পরামর্শ দিতে পারত। সুলতানা রাজিয়া তার পিতা ইলতুৎমিসের (১২১১-১২৩৬) মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন। রাজিয়া তার প্রতিভা, বুদ্ধি এবং অসাধারণ শাসন দক্ষতায় নারী জাতির ক্ষমতায়ন করেছিলেন। তিনি যুদ্ধবিদ্যা, সৈনদের পরিচালনা এবং প্রশাসনিক কার্যভার সামলানোর প্রশিক্ষন লাভ করেছিলেন ছোটবেলায়। তিনি মুসলমান নারীদের পর্দা প্রথা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং যে কোন ক্ষেত্রেই পুরুষদের মতোই সমান অধিকারে উপস্থিত থাকার অনুমতি দান করেছিলেন। সুলতানা রাজিয়া যেখানে বসতেন তার চারপাশে মহিলা দেহরক্ষী থাকতো (ইরফান হাবিব)। একথা উল্লেখযোগ্য মধ্যযুগের প্রথম দিকে বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্যই সহমরণ প্রথা ছিল।

মুঘলদের শাসনকালে নারী জাতির উপর বাধা নিষেধের বেড়াজাল আরও বৃদ্ধি পায়। শ্রেণি, সম্প্রদায়, ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত নারীর উপরই পুরুষের অবিচার সীমা ছাড়িয়ে যায়। এই সময় সাধারণ পরিবারের মেয়েরা পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার হওয়ার অধিকার পেত না সম্পত্তির উপর। জাট, আহির, মেওয়াটি গোষ্ঠীর মধ্যে বিধবাদের পুনর্বিবাহের রীতি ছিল। নারীরা গৃহস্থালির সমস্ত কাজ করার পর চাষবাসের কাজেও যোগ দিত। মুঘল শাসকেরা সহমরণ প্রথার উপর কিছুটা হস্তক্ষেপ করেন এবং এটিকে ঐচ্ছিক প্রথায় রূপান্তরিত করেন। সম্রাট হুমায়ুন এই প্রথাটিকে সম্পূর্ন নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারেননি। সম্রাট আকবর তাঁর ২২ বছরের রাজত্বকালে কিছু পরিদর্শক নিযুক্ত করেছিলেন যাদের কাজ ছিল এটা সুনিশ্চিত করা যে কোন বিধবাই যেন তার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বামীর চিতায় নিজেকে না পুড়িয়ে মারে। উত্তর ভারতের রাজ পরিবার গুলির মধ্যে বিশেষ করে রাজপুতনার রাজ পরিবারে সহমরণ প্রথা অতিমাত্রায় প্রচলিত ছিল। তার প্রমান মেলে যখন ১৭২৪ সালে রাজা অজিত সিং এর মৃত্যুর পরে মোট ৬৪ জন তাঁর চিতায় নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন। বুন্ডির রাজা বুদ্ধ সিং এর যখন সলিল সমাধি হয় ৮৪ জন নারী তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে নিজেদের উৎসর্গ করেন। পুরো ভারতভূমির মধ্যে মুঘল সাম্রাজ্যের আমলে বাংলাতেই সবচেয়ে বেশি সতী মৃত্যু হয়েছে। এই সময় মুসলিম সম্প্রদায় ভুক্ত নারীরা মক্তবে গিয়ে বা পরিবারের মধ্যে থেকেই আরবি, ফারসি ভাষা শিখতে পারতো। তার পাশাপাশি মেয়েরা যাতে কোরাণ পাঠ করতে পারে তার জন্য তাদের নিয়মিত কোরাণ পাঠের অভ্যাস করানো হত। ১৭০০ শতকে গুজরাটের মহাফেজ খানায় সংরক্ষিত দলিল, দস্তাবেজ থেকে এই সম্বন্ধে অনেক তথ্যই পাওয়া যায়। আকবর এবং অন্যান্য মুসলমান সম্রাটরা কেউ কেউ রাজস্ব থেকে বালিকাদের জন্য শিক্ষার আয়োজন করতেন। মধ্যযুগে মুসলমান সমাজের ন্যায় হিন্দু সমাজের মেয়েদেরও শিক্ষা ছিল পরিবার কেন্দ্রীক। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে এর উদাহরণ মেলে। এই সময়কার মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মুসলমান শাসনের অবসান এবং ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাত নারী সমাজের ক্ষেত্রে একটি বড় আঘাত হানে। মধ্যযুগে যেটুকু প্রগতির দৃষ্টান্ত মেলে ব্রিটিশ শাসন কালে তার চূড়ান্ত অবনতি হয়।

১.১.৮ ব্রিটিশ শাসন কালে নারীদের অবস্থানঃ

ঊনিশ শতকের শুরুতে শিক্ষা, অধিকার এবং স্বাধীনতায় মেয়েরা ক্রমশ কোন ঠাসা হয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব, অন্যদিকে জমিদার শ্রেণির অত্যাচারে এবং ধর্মীয় নিপীড়নে আর্থসামাজিক পরিকাঠামোতে চরম বৈষম্যের সূচনা হয়। পুরুষ প্রধান সমাজ ব্যবস্থায় নারী জাতির উপর নেমে আসে রক্ষণশীলতা ও নিয়ম নীতির বেড়াজাল। ধর্মের দোহাই দিয়ে সমাজ নারীদের দমন করে রাখত এবং তাদের নিতান্ত ভোগ্য বস্তুতে পরিণত করে। হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্য বলতে কিছুই ছিল না। সমাজ কেবল ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের দেখানো পথে চলতে থাকে এবং তাদের প্রস্তাবিত আচার অনুষ্ঠানগুলিকেই গুরুত্ব দিতে থাকে। সমাজে নারীদের অমর্যাদা, নারী নির্যাতন, বধূ নির্যাতন, বধূ হত্যা একটি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে খ্রীষ্টান মিশনারীরা ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের উদ্দেশ্যই ছিল খ্রীষ্টান ধর্মের যে মানব প্রেম তা অসহায় সম্বলহীন মানুষদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া। ধর্ম প্রচারকালে ভারতের অসহায় নারী সমাজের দুর্দশা তাদের চোখে পড়ে। বাংলার তথা ভারতের নারী কল্যাণের উদ্দেশ্যে তাদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মান করেন খ্রীষ্টান মিশনারীরা। ওই সময় বহু শিক্ষিত বাঙালী মেয়েরা তাদের সহযোগিতা করতে আগ্রহ প্রকাশ করলে মিশনারীরাও বেশ উৎসাহ পান। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মিসেস হোজেস কলকাতায় প্রথম মেয়েদের জন্য একটি স্কুল স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ে মেয়েদের ফরাসি ভাষা এবং নৃত্যকলা শেখানো হত। তবে কেরি বলেছেন কলকাতায় প্রথম মহিলাদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব মিসেস পিট্স এর। ১৭৯২ সালে বাঙালী মেয়েদের লেখা, পড়া, ও সূচীর কাজ শেখানোর জন্য মিসেস কোপল্যান্ড একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। মিসেস পাইন মেয়েদের জন্য একটি বোর্ডিং স্কুল স্থাপন করেন। কেরি ১৭৯৬ সালে দিনাজপুরে মেয়েদের শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তবে বিদ্যালয়গুলিতে সাধারণ ঘরের মেয়েরা আসত না। খ্রীষ্ঠান মিশনারীরা এদেশের মেয়েদের শিক্ষাদানে আগ্রহী ছিল শুধুমাত্র ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্যেই। যাইহোক, তৎকালীন সমাজের উঁচুতলার মানুষদের একটা বড় অংশ নারী শিক্ষা বিস্তারে প্রতিরোধ করেছিল। এই সময় শোভা বাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব গোঁড়াপন্থীদের প্রতিরোধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন এবং নারী শিক্ষার প্রয়োজনীতা নিয়ে সচেতনতা

বিস্তারের জন্য পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারকে দিয়ে একটি শাস্ত্রীয় যুক্তি সমেত পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকটির নাম হল 'স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক', যেটি প্রকাশিত হয় ১৮২২ সালে।

১.১.৯ রাজা রামমোহন রায়, ব্রাহ্ম সমাজ ও নারীঃ

এইরূপ পরস্পর বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া যুক্ত সামাজিক প্রেক্ষাপটে আধুনিক ভারতের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায় ভারতের মাটিতে জন্ম নেন ১৭৭২ সালের ২২ মে। অবিভক্ত বাংলার হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে তাঁর জন্ম হয় একটি অতি উচ্চ ব্রাহ্মণ পরিবারে। শৈশবকাল থেকেই প্রতিভাবান রামমোহন বিদ্যাচর্চার প্রতি গভীর আগ্রহী ছিলেন। প্রথম জীবনের পড়াশুনা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এটুকু পরিষ্কার যে তিনি গ্রামের পাঠশালাতেই তাঁর বাংলা, সংস্কৃত এবং পারসি ভাষার শিক্ষা অর্জন করেছিলেন। পরবর্তীতে পাটনার একটি মাদ্রাসাতে পার্সি এবং আরবি ভাষার চর্চা করেন। তারপর তাঁকে বেনারসে পাঠানো হয় সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা লাভ করার জন্য। রামমোহন রায় সংস্কৃত শেখেন হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রগুলি পাঠ করার জন্য। এছাড়া তাঁর ইংরেজী, ল্যাটিন এবং গ্রীক ভাষার উপর যে পান্ডিত্য তা বিস্ময়কর। রামমোহন তাঁর সমাজ, শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক চেতনায় একজন সম্পূর্ন মানুষ ছিলেন। তাঁর পান্ডিত্য আর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তাঁকে 'রাজা' উপাধি এনে দিয়েছিল মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আকবরের কাছ থেকে। বেদান্ত এবং উপনিষদ পাঠের পর যে দর্শন উপলব্ধি করেন তা তাঁর যুক্তিবাদী একেশ্বরবাদকে মজবুত করে। তিনি হিন্দু ধর্মের মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। ১৭৯৬-১৭৯৭ সালে উইলিয়াম কেরি, সংস্কৃত পণ্ডিত সৈহারদন বিদ্যাবাগীশ, এবং রামমোহন রায় এই তিনজন মিলে একটি ধর্মীয় বই রচনা করেন, "The One True God"। রাজা রামমোহন রায়ের বহুবিধ সমাজ সংস্কার মূলক কাজের মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং ব্রাহ্ম সমাজের কর্মসূচী গুলিকে রূপায়ন করা সবচেয়ে বেশি প্রশংসার দাবী রাখে।

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মের যে গোঁড়া সংস্কার ছিল তাকে উৎখাত করার জন্য ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন রাজা রামমোহন রায়। মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে ব্রাহ্ম সমাজ নিরন্তর কাজ করেছে। যুক্তিহীন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানগুলি ক্রমশ সাধারণ মানুষকে ধর্মের রাস্তা থেকে ভ্রষ্ট করতে থাকে। বেদ বেদান্ত উপনিষদের

ভাবনা গুলির ভ্রান্ত রূপ জনসমক্ষে পৌছানোর ফলে সমাজ দিন দিন কুসংস্কারের পাঁকে নিমজ্জিত হচ্ছিল যার থেকে মুক্তি পেতে সমকালীন সমাজ ব্রাহ্ম সমাজকে অনুসরণ করত। এছাড়া ব্রাহ্ম সমাজের অপর একটি কর্মসূচি ছিল লাঞ্ছিত নারী সমাজের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা। সতীদাহ প্রথা রামমোহনের অন্তরকে নিরন্তর দগ্ধ করত। শৈশবেই রামমোহন প্রত্যক্ষ করেছিলেন মাত্র ১৭ বছর বয়সে তাঁর বৌদির নিদারুণ মর্মস্পর্শী সহমরণ। তিনি দেখেছিলেন কয়েকজন মানুষ তাঁর বড় ভাই জগমোহনের বিধবা স্ত্রী অলকামঞ্জরীকে টানতে টানতে চিতার দিকে নিয়ে যায়। রামমোহন সেসময় প্রতিবাদ করেছিলেন কিন্তু একজন শিশুর কথা কেই বা শোনে! পরবর্তীকালে রামমোহন তাঁর বিভিন্ন লেখা এবং বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিধবারা স্বেচ্ছায় সহমরণ বরণ করত না, তাদের আত্মীয়, প্রতিবেশীরা জোর পূর্বক তাদের স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারতো কেবল পরিবারের সম্মান রক্ষার জন্য। তিনি এও বলেছেন যে প্রায়শই দেখা যেত বিধবার লোভী আত্মীয়-পরিজনেরা মৃত স্বামীর সম্পত্তির অধিকার লাভের জন্য বিধবাকে সহমরণে বাধ্য করত। জ্বলন্ত চিতায় বিধবার প্রচন্ড আর্তনাদে যখন সমস্ত প্রকৃতি শিহরিত হত তখন পরিজনেরা সমস্বরে বলে উঠত “মহাসতী! মহাসতী! মহাসতী!” রামমোহন যখন রঙপুরে ছিলেন তিনি খবর পান অপর এক বিধবা বৌদির সহমরণের যাঁকে তিনি অত্যন্ত সম্মান করতেন, সেদিনই গোপনে তিনি প্রতিজ্ঞা নেন, যতদিন না পর্যন্ত এই নিষ্ঠুর প্রথার বিলোপ সাধন করতে পারেন, তিনি বিশ্রাম নেবেন না। রামমোহন কলকাতার শ্মশান ভূমিতে যেতেন বিধবা মহিলাদের বুঝিয়ে সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে। এমনকি যারা সহমরণের জন্য আসতেন তাদেরকেও বুঝিয়ে নিরস্ত করতেন। বিধবা নারীদের সমবেত করে তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে একটি আবেদন পত্র জমা দেন সতীদাহের বিরুদ্ধে। এবং রচনা করেন একটি ছোট্ট পুস্তিকা – “A conference between an Advocate for, and an Opponents of the practice of burning widows Alive” (1818 Published in Bengali and English)। এই পুস্তিকাটি তিনি প্রস্তুত করেন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ গুলির সঠিক মূল্যায়ন এবং তার বাস্তব নৈতিকতা উপস্থাপনের জন্য। ১৮২০ সালে প্রকাশিত অন্য একটি রচনা “A Second Conference” এ সমালোচনা করেছেন নারী জাতির অধিকার নিয়ে। নারীরা সে সময় নিকৃষ্ট প্রাণী রূপে পরিগনিত হত। রামমোহনের মতে, নারীদের পিছিয়ে থাকার কারণ তাদের প্রকৃতি নয়, বরং তাদের উপযুক্ত পরিচর্যা ও শিক্ষার অভাবই পিছিয়ে থাকার মূল কারণ। রামমোহন তীব্র ভর্ৎসনার সঙ্গে বলেছেন “What I lament, is that seeing the

women thus dependent and exposed to every misery, you feel for them no compassion that might exempt them from being tied down and burnt to death"। ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভে রামমোহন রায় যে সমাজ ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলন শুরু করেছিলেন তার সুফল ভারতবাসী বর্তমান দিনে ভোগ করছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাটি এর সার্থক প্রমাণ,-

রামমোহন রায় যে সময়ে (১৮২৫ মতান্তরে, ১৮১৪) কলকাতায় আসিয়া উপস্থিত হলেন তখন সমুদয় বঙ্গভূমি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; পৌত্তলিকতার বাহ্যাড়ম্বর তার সীমা থেকে সীমান্তে পরিব্যাপ্ত ছিল... বঙ্গভূমি তিমিরাবৃত অরণ্যভূমি রাক্ষসভূমি ছিল, ভ্রষ্টাচারের পিশাচ সকল তাহাতে রাজত্ব করিত। রামমোহন যে সময় তাঁর কর্মযজ্ঞ শুরু করেন সেসময় তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে সাহায্য করার মতো লোকের বড়োই অভাব ছিল। মিথ্যা, অজ্ঞানতা- দূর্নীতিগ্রস্থ সমাজপতিদের তীব্র প্রতিরোধের বিরুদ্ধে তিনি একাই লড়ে গেছেন। কালো অন্ধকার রাত্রির মধ্যে তিনি আলোর শিখা জ্বালিয়েছেন। রামমোহন রায় যখন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন তখন এখানে চতুর্দিকে কালরাত্রির অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল। মিথ্যা ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল।... অজ্ঞানের মধ্যে মানুষ যেমন নিরুপায়, যেমন অসহায়, এমন আর কোথায়? রামমোহন রায় যখন জাগ্রত হইয়া বঙ্গ সমাজের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন তখন বঙ্গ সমাজ সেই প্রেতভূমি ছিল। তখন শ্মশান-স্থলে প্রাচীনকালের জীবন্ত হিন্দুধর্মের প্রেতমাত্র রাজত্ব করিতেছিল। তাহার জীবন নাই; অস্তিত্ব নাই, কেবল অনুশাসন ও ভয় আছে মাত্র। (রামমোহনঃ চরিত্রপূজা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ৫১৭)। ১৮০০-১৮৬০ সাল পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে সমগ্র বঙ্গভূমি এক গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তখন বিদ্যাচর্চা বলতে কিছু মানুষ স্বেচ্ছায় তাদের অর্জিত জ্ঞান কিছু ছেলেদের মধ্যে জোর করে ছড়িয়ে দেন। এই ব্যবস্থাটি টোল বা চতুষ্পাঠী ব্যবস্থা নামে পরিচিত ছিল। এই সময় ছাত্ররা সংস্কৃত, ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন, বেদ প্রভৃতি বিষয়ে চর্চা করত। স্ত্রী শিক্ষা ছিল এইসময় অকল্পনীয়। আট নয় বছর বয়সে মেয়েদের বিবাহ সম্পন্ন হত। তারপর শ্বশুর বাড়ীর কাজকর্ম, রান্না করা এবং লোকজনদের খাওয়ানো এটাই জীবনের সর্বস্ব। সন্তান প্রসব ও সন্তান প্রতিপালন এবং স্বামীর সেবা এর বাইরে তার নিজের জীবন বলতে আর কিছুই ছিল না। স্বামী ও সন্তানের মঙ্গল কামনায় ব্রত উপবাস করে কেটে যেত যৌবনের স্বর্নময় দিনগুলি। পেটে বিদ্যা না থাকায় তারা বুঝতেই পারতনা যে তাদেরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে

সমাজের জন্য। ১৮২৩ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে বার্ষিক একলক্ষ টাকা ব্যায় করার প্রস্তাব দিলে একদিকে হিন্দু পন্ডিতেরা নিজেদের সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতির কথা ভাবে অন্যদিকে কিছু মানুষ পাশ্চাত্য শিক্ষা জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার জন্য সেই টাকা ব্যয় করতে চান। এই সময় রাজা রামমোহন রায় শিক্ষাখাতে বরাদ্দ অর্থের বিষয়ে বড়লাট লর্ড আর্মহাস্টকে একটি চিঠি লেখেন (১৮২৩, ডিসম্বর ১১)।

চিঠির বিষয় বস্তু হল এরূপ---"মহামান্য সরকার বাহাদুর যদি উপরি উল্লিখিত উদ্ভট শিক্ষাকে উৎসাহ দেওয়ার নিরর্থকতা সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি করতে চান, তবে আমি অনুরোধ করব মহামান্য যেন অনুগ্রহ করে লর্ড বেকনের পূর্ববর্তী কালের ইউরোপের বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অবস্থানের সঙ্গে বেকনের পরবর্তী সময়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে তার তুলনা করে দেখেন।"

ব্রিটিশ জাতিকে যদি প্রকৃত জ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ন অজ্ঞ রাখাই উদ্দেশ্য হত তবে স্কুলমান্যদের দ্বারা পরিবেশিত শিক্ষা বা প্রথাকে বেকনের দর্শন দ্বারা কখনোই স্থানচ্যুত হতে দেওয়া হত না। ব্রিটিশ আইন সভার উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, এই দেশকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রাখতে হবে, তবে তার জন্য সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থা সবচেয়ে উপযুক্ত। কিন্তু যেহেতু সরকারের উদ্দেশ্য হল, দেশীয় লোকেদের উন্নতি বিধান করা, তাই সরকার অবশ্যই আরও উদার ও উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করবেন। যার মধ্যে থাকবে অঙ্ক, প্রকৃতিবিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র, শরীর বিজ্ঞান, ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান। মঞ্জুরিকৃত অর্থে ইউরোপে শিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েকজন মেধাবী ও পন্ডিত ব্যক্তিকে নিয়োগ করে এবং প্রয়োজনীয় পুস্তক সাজসরঞ্জামসহ একটি কলেজের ব্যবস্থা করেই তা করা সম্ভব ।

শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী, রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ যুক্তিবাদী ব্যক্তিরা ভারতের উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন। ভারতের সমাজ পরিকাঠামোর মধ্যে আধুনিকতার কোন ছোঁয়া ছিল না। জ্ঞান আহরনের কোন ক্ষুধা ছিল না, যা দেখে তাঁরা নিরন্তর দাবী জানিয়েছিলেন ব্রিটিশ সরকারের কাছে যাতে ভারতের শিক্ষার সমৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়। এরই ফলশ্রুতিতে হিন্দু কলেজ ১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারী কলকাতায় স্থাপিত হয়। রামমোহনের সমসাময়িক কালে যে ধরনের শিক্ষার উপযোগিতা ছিল তার থেকেও বহুগুন আধুনিক ভাবনা ছিল রাজা

রামমোহন রায়ের। তিনি ভারতীয়দের জন্য যে ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তাব রেখেছিলেন তা তাঁর দূরদর্শিতা এবং অগাধ জ্ঞানের পরিচয়। তাঁর মতে সংস্কৃত শিক্ষার চেয়ে ইংরেজি শিক্ষা ও বিজ্ঞান শিক্ষা অনেক বেশি উপযোগী এবং বিজ্ঞান সম্মত। তিনি বিশ্বাস করতেন পাশ্চাত্য শিক্ষার অগ্রগতি হলেই দেশীয় মানুষদের আধুনিক শিক্ষায় আলোকিত করা সম্ভব। এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বিষয় রূপায়নে রামমোহনের প্রস্তাব ছিল গনিত, দর্শন, প্রকৃতি বিজ্ঞান, রসায়ন এবং অ্যানাটমি। এই বিষয়টি জানতে পারা যায় ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল লর্ড আর্মহাস্টকে লেখা তার একটি চিঠি থেকে,- "ব্রিটিশ আইন সভার নীতি যদি হত এদেশকে অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখা, তাহলে সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থা সে নীতি রূপায়ণে সর্বাপেক্ষা সহায়ক হত। কিন্তু যেহেতু এদেশীয় জনগনের উন্নতিসাধনই সরকারের উদ্দেশ্য, তাই তাঁরা প্রয়াসী হোন হন উদার ও কুসংস্কারমুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকতায়, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে গনিত, প্রকৃতি বিজ্ঞান, দর্শন, রসায়ন এবং অ্যানাটমির মত অতি প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান।"

নারী শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রথম এবং প্রধান যে কাজটি রামমোহন করেছিলেন তা হল ১৮২৯ সালে লর্ড বেন্টিং এর আমলে সতীদাহ প্রথা রোধের জন্য আইন প্রণয়ন। আধুনিক ভারতে রামমোহন রায় শুধু একাই সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন তা নয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগেও কেউ কেউ এই প্রথার বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছিলেন। স্বপন বসু তাঁর 'সতী' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, "প্রাচীন কালেই সতীদাহ প্রথার কঠোরতম সমালোচনা করেন হর্ষবর্ধনের সভাকবি বানভট্ট। সপ্তম শতাব্দীর এই লেখক 'কাদম্বরী'-তে লেখেন— শাস্ত্রকারেরা অনুমরণকে যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রণালী বলিয়া নির্দেশ করেন উহা বাহ্যত মোহ মাত্র। মূঢ় ব্যক্তিরাই মোহ বশতঃ ঐ পথে পদার্পণ করেন। ভর্তা উপরত হইলে তাহার অনুগমন করা মুর্খতা প্রকাশ করা মাত্র। ইহাতে কিছুই উপকার নাই। অনুমরণ পতিব্রতার লক্ষণ নয়। বিবেচনা করিলে স্বার্থপর লোকেরাই দুঃসহ বিরহ যন্ত্রনা সহ্য করিতে না পারিয়া অনুমরণ অবলম্বন করেন। কেহ বা অহংকার প্রকাশের নিমিত্ত এই পথে প্রবৃত্ত হন। ফলতঃ ধর্ম বুদ্ধিতে প্রায় কেহ অনুমৃত হয় না। কয়েক শতাব্দী প্রাচীনে এই কুপ্রথাটি যে আসলে সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয় তার স্বপক্ষে বেশ কয়েকটি অকাট্য প্রমাণ দিয়েছেন শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে –

১) শাস্ত্রানুযায়ী পতির অনুগমন অবশ্য কর্তব্য নয়।

২) শাস্ত্রে কোন কাম্য বা প্রাপ্তির জন্য কাজকে অর্থাৎ ‘কাম্যকর্ম’-কে নিন্দা করা হয়েছে। এ অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য শ্রেয়।

৩) শাস্ত্রের বিধানে মৃতের স্ত্রী স্বেচ্ছায় সহমরণ করতে পারেন, অর্থাৎ ‘সহমৃতা’ হতে পারেন। কিন্তু প্রচন্ড বল প্রয়োগে সহমরণে বাধ্য করা হচ্ছে। তাই এই অমানবিক প্রথা বন্ধ হওয়া উচিত।

১৮১৯ এর আগষ্টে রামমোহন ব্রিটিশ সরকারের কাছে পুনরায় আবেদন করেন। ১৮২৩ সালে পুলিশের রিপোর্টে এই বাংলাদেশে কেবলমাত্র ৫৭৫ টি সহমরণের ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে ৩২ জনের বয়স ২০ বছর বয়সেরও নিচে, ২০৮ জনের বয়স ২০-৪০ বছর। বিভিন্ন সতীদাহের স্থানে ঘুরে ঘুরে রামমোহন বিধবাদের সহমরণ থেকে বিরত করতেন। এর জন্য তাঁকে সমাজের উচ্চবর্গের মানুষেরা সমাজচ্যুত করেছিলেন। তিনি নিজে তাঁর প্রবন্ধ ‘বিধবার পুনরায় বিবাহ’-তে একথা স্পষ্ট করেছেন। রামমোহন রায় ‘আত্মীয় সভা বৈঠকে’ স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যে গভীর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছিলেন তা হিন্দুদের গোঁড়ামিকে ভেদ করে মেয়েদের জীবনের উদ্দেশ্যকে ছুঁতে পেরেছিল এবং ধর্ম ব্যবসায়ী গোঁড়া হিন্দুদের শত বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও সেই আলো নিভতে এমনকি ম্লান হতে পারেনি, বরং ক্রমশ প্রদীপ্ত হয়েছে। রামমোহনের সময়কালে গোঁড়া পন্থীরা মেয়েদের শিক্ষার বিরোধিতা করতেন। কারণ তাঁদের মতে মেয়েরা বুদ্ধিহীনা| রামমোহন ধর্মব্যবসায়ীদের তথা সমাজপতিদের বিরোধীতা করেছিলেন এই ভাবে যে, “প্রথমত বুদ্ধির বিষয়ে স্ত্রীলোকদের বুদ্ধির পরীক্ষা কোনকালে লইয়াছেন যে অনয়াসেই তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই| তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরুপে নিশ্চয় করেন?” রামমোহন বুঝেছিলেন যে নারীর শিক্ষা ব্যতীত সতীদাহ প্রথা নিবারণ সম্ভব নয় এবং নারীর চেতনারও জাগরণ ঘটানো প্রায় অসম্ভব|

এইসব কিছুর পরেও রামমোহন তাঁর নিজের জীবদ্দশায় তেমন কোন সম্মান পাননি। বিদ্যাসাগর তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়েছেন তাঁর প্রতিকৃতির প্রতি জোড় হাতে নমস্কার করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা উজাড় করে দিয়েছেন নিজের লেখায়।

“হে রামমোহন, আজি শতেক বৎসর করি পার
মিলিল তোমার নামে দেশের সকল নমস্কার
মৃত্যু অন্তরাল ভেদি দাও তব অন্তহীন দান
যাহাকিছু জরাজীর্ণ তাহাতে জাগাও নবপ্রাণ।
যাহা কিছু মূঢ় তাহে চিত্তের পরশমনি তব
এনে দিক উদ্বোধন, এনে দিক শক্তি অভিনব।”

রাজা রামমোহন রায় আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক কারণ তিনি যে আধুনিক বিজ্ঞান মনস্ক কুসংস্কারমুক্ত ভারতীয় সমাজ চেয়েছিলেন তার আংশিক রূপায়ন হয়েছে, আরও অনেকটাই বাকি। ভারতের সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে এখনও বহু কুসংস্কারের মধ্য দিয়ে ভারতীয়দের জীবনস্রোত বয়ে চলেছে। যাই হোক রামমোহন ছাড়া বঙ্গভূমি তথা সমগ্র ভারত সামাজিক অগ্রগতিতে একশো বছর পিছিয়ে যেত।

১.১.১০ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও নারী জাগরণ :

সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে এবং নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য, কুসংস্কার মুক্ত সমাজ গঠনের জন্য রাজা রামমোহন রায় যে শিলাস্থাপন করেছিলেন সেই কাজেই ব্রতী হয়ে তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে বঙ্গভূমিতে জন্ম নেন আর এক মহামানব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি বাংলার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে পিতা ঠাকুরদাস বন্দোপাধ্যায় এবং মাতা ভগবতী দেবীর কোলে জন্ম নেন ১৮২০ সালের ২৬ শে সেপ্টেম্বর। মাত্র ৯ বছর বয়সে বিদ্যাসাগর যখন বড়বাজারে ভাগবত চরনের বাড়িতে পিতার সঙ্গে থাকা শুরু করেন, এইসময় ভাগবতের ছোট মেয়ে রাসমনির গভীর মাতৃস্নেহ ঈশ্বরচন্দ্রকে স্পর্শ করেছিল যা তাঁর মধ্যে পরবর্তী বৈপ্লবিক মানসিকতায় ভারতীয় নারীদের অবস্থার উন্নতির সংকল্প নিতে সাহায্য করে। জ্ঞানের প্রতি গভীর আগ্রহ ঈশ্বরচন্দ্রকে বিভিন্ন বিষয়ে পান্ডিত্য অর্জনে সাহায্য করেছিল। যে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রের আবির্ভাব অর্থাৎ তার ছাত্র জীবন সেই সময় রামমোহনের জীবনকাল শেষের দিকে। রামমোহনের আবির্ভাবে সমাজ ও সংসারে যে আলোড়ন তৈরি হয়েছিল, যে যুক্তিবাদী ভাবনার উন্মোচন হয়েছিল, বিদ্যাসাগর তার সূত্র ধরেই বাঙালীর জীবনকে সুন্দর করার কাজে নিজেকে সমর্পণ করেন। তিনি পাশ্চত্যের জ্ঞান বিজ্ঞান এবং মুক্ত চিন্তার সঙ্গে প্রাচীন সাহিত্যে

ও জ্ঞানের মিলন ঘটালেন। সেই সঙ্গে নারীমুক্তির আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে স্ত্রী শিক্ষার দায়িত্বটি দৃঢ়ভাবে তুলে নেন নিজের হাতে। বাংলার গৃহবন্দি নারী সমাজকে মুক্তির পথ দেখাতে কর্মযজ্ঞ শুরু করেন। এই প্রসঙ্গে কেদারনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাসাগরের সম্পর্কে লিখেছেন–"ওইসব যুক্তিবাদী ধ্যান ধারণা সম্পর্কে বিদ্যাসাগর অবহিত ছিলেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু তাঁর পথটা ছিল স্বতন্ত্র। উন্নত দেশ থেকে উন্নত চিন্তা অবশ্যই আসতে পারে, কিন্তু দেশের বা জাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে না বুঝলে, না জানলে শুধু অনুকরণ আর ওপরের তলার আলোড়ন বেশিদূর যেতে পারে না। সমাজটাকে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে চিনতেন। কেননা তিনি এসেছেন নিচের তলা থেকে। তিনি জানতেন শিল্প বিপ্লবের চেতনা ও মূল্যবোধ আমদানি করে মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় তা আরোপ করা যায় না। বহুমুখি সামাজিক সংগ্রামের ব্যাপক কর্মকান্ডে তাঁর এমন একক দক্ষতা বাংলাদেশের ইতিহাসে সত্যিই দুর্লভ ও বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সেইজন্য বিদ্যাসাগর এই বঙ্গ দেশে একক ছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁর 'বর্ণ পরিচয়' রচনার মাধ্যমে জনগনের মধ্যে মাতৃভাষায় শিক্ষার পথকে সুগম করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সাংবাদিকতার জীবনের থেকে তিনি সমাজের বিভিন্ন সমস্যাগুলির সম্পর্কে সম্যক ধারণা পান। এছাড়া বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের জীবনচরিত রচনার মাধ্যমে বিজ্ঞান চেতনাকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর ছিলেন যুক্তিবাদী ও আধুনিক মানসিকতার মানুষ। তিনি সমস্ত রকমের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের ঘোর বিরোধিতা করতেন এবং ব্যক্তিগতভাবে সবকিছুকে যুক্তি দিয়ে বিশ্বাস করতেন। ধর্মের নামে অন্ধ হয়ে তিনি আজগুবি ধর্মাচরণকে অনুসরণ করতেন না। অন্যায়, অবিচার ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করাই ছিল বিদ্যাসাগরের মূল লক্ষ্য। জাত-পাত-ধর্ম বর্ণের ভেদাভেদকে মিটিয়ে ফেলতে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন সকল ধর্মের ও বর্ণের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ভর্তির সুযোগ করে দিয়েছিলেন। সম্ভবত বিদ্যাসাগরই প্রথম অবৈতনিক গণশিক্ষার কথা বলেছিলেন। আজ থেকে প্রায় ১৬০ বছর আগে (সেপ্টেম্বর ২৯, ১৮৫৯) ছোট লাটকে চিঠি লিখে সরকারী ভাবে অবৈতনিক গণশিক্ষার তিনি দাবী তোলেন যেটি অপূর্ণই থেকে যায়। তাঁর লেখা চিঠির একটি অংশ দেওয়া হল–তাছাড়া দেশের সম্ভ্রান্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকেরাই যখন শিক্ষার সুফল সম্পর্কে তেমন সচেতন নয়, তখন শ্রমিক শ্রেণির সে বোধ থাকতে পারে না। এই অবস্থায় শ্রমিক শ্রেণির শিক্ষা বিষয়ে চিন্তা করে কোন লাভ নেই। সরকারের সত্যিই যদি তাদের শিক্ষা দেওয়ার সাধু উদ্দেশ্য থাকে তাহলে যেন তাঁরা

অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। প্রসঙ্গত বলছি এরকম ব্যবস্থা বেসরকারী ভাবে যেটুকু করা হয়েছে তাতে কোন ফল হয়নি। আত্মীয় সভার বৈঠকে রাজা রামমোহন রায় স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জ্ঞানের যে আলো জ্বালিয়েছিলেন, ধর্ম ব্যবসায়ীদের শত প্রতিরোধ, সত্ত্বেও প্রদীপ্ত হয়েছে ঈশ্বরের হাতে। তিনি এটি বুঝেছিলেন যে আইন প্রনয়ণ করে বহু বিবাহ, বাল্যবিবাহ ও অন্যান্য কুপ্রথাগুলিকে সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিলোপ করা সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি, বিশেষ করে সর্বজনীন স্ত্রীশিক্ষার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল।

১৮৫৪ সালে উডের ডেসপ্যাচ প্রকাশিত হয়। তাতে পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারের উপর জোর দেওয়া হয়। বিদ্যাসাগর প্রাচীন ভারতের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে সেই পাশ্চাত্য চেতনার সঙ্গে মেলবন্ধন করান। এখানে উল্লেখযোগ্য যে সেসময়ে নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তি আন্দোলনের ধারক ও বাহক ছিলেন বিদ্যাসাগর। তবে রাধাকান্ত দেব(১৭৮৪-১৮৬৭), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), কেরি সাহেব (১৭৬১-১৮৩৪), ডেভিড হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২), বেথুন (১৮০১-১৮৫১), ডাফ সাহেব, ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১), রামতনু লাহিড়ি (১৮১৩-১৮৯৮), রেভারেন্ড কৃষ্ণ মোহন (১৮১৩-১৮৮৫), তারিণী চরণ মিত্র (১৭৭২-১৮৩৭), হটু বিদ্যালঙ্কার (১৭৭৫-১৮৭৫), রামকমল সেন (১৭৮৩-১৮৪৪), ভবানী চরণ বন্দোপাধ্যায় (১৭৮৭–১৮৪৮), মতিলাল শীল (১৭৯২-১৮৫৪), জন ক্লার্ক মার্শম্যান (১৭৯৪-১৮৭৭), নীলমনি বসাক (১৮০৮-১৮৬৪), প্যারিচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩) এবং মহাত্মা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), প্রমুখ মণীষীদের নারী শিক্ষা ও সর্বজনীন শিক্ষা বিষয়ে সদর্থক ভাবনা ও উৎসাহ ঈশ্বরচন্দ্রের নারী মুক্তি আন্দোলনের পথকে সুগম করেছিল সন্দেহ নেই। তাই সামাজিক কুসংস্কারের ঘাঁটিকেই ঈশ্বরচন্দ্র ভাঙতে চেয়েছিলেন।

১৮১৯ সালে কয়েকজন ব্রিটিশ মহিলার আর্থিক সাহায্যে ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি তৈরী হয় যা মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করে। অপরদিকে ইয়ংবেঙ্গল দল স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে। ঐ সময় ডিরোজিওর অনুগামী রামগোপাল ঘোষ এবং দক্ষিনারঞ্জন মুখার্জী স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে বিশেষ ভূমিকা নেন। দক্ষিনারঞ্জন বিনা ভাড়ায় নিজ বাড়িতে চালু করলেন 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' (১৮৪৯)। ১৮৫০ সালে বিদ্যাসাগর এই বিদ্যালয়ে সেক্রেটারি পদে দায়িত্ব নেন। বেথুন সাহেবের উদ্যোগে এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

ঠাকুরের সাহায্যে বিদ্যালয়টির শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। ১৮৫৭ সালের ১৫ই এপ্রিল বিদ্যাসাগর বর্ধমানের জৌগ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বাবু নবগোপাল মজুমদারের বাড়িতে ২৮ টি মেয়ে নিয়ে স্কুলটি শুরু হয়। তিনি এই বিদ্যালয়টিকে চালানোর জন্য মাসিক ৪৭ টাকা সরকারের তরফ থেকে অনুদান প্রার্থণা করেন। কিন্তু সরকার এই স্কুলটির জন্য মাত্র ৩২ টাকা মঞ্জুর করেন। সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়ে বিদ্যাসাগর তাই অনেক বেশি উৎসাহিত বোধ করেছিলেন। তাই মাত্র ৬ মাসের মধ্যে বর্ধমান, নদীয়া, মেদিনীপুর, হুগলি এই চারটি জেলায় মোট ৩৫ টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই ৩৫ টি স্কুলে ছাত্র- ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১৩৮০ জন । এই ৩৫ টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর সেগুলো পরিচালনা করার জন্য উপযুক্ত ব্যয়ভার ব্রিটিশ সরকার দিতে নারাজ হলে বিদ্যাসাগর ডি.পি.আই কে একটি পত্র লিখলেন, “হুগলি, বর্ধমান, নদীয়া এবং মেদিনীপুর জেলায় অনেকগুলি গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম। বিশ্বাস ছিল, সরকার হইতে মঞ্জুরী পাওয়া যাইবে। স্থানীয় অধিবাসীরা স্কুল গৃহ তৈয়ারি করাইয়া দিলে সরকার খরচ পত্র চালাইবেন। ভারত সরকার কিন্তু ওই শর্তে সাহায্য করিতে নারাজ, কাজেই স্কুলগুলি তুলিয়া দিতে হইবে। কিন্তু শিক্ষকবর্গ গোড়া হইতে মাইনা পান নাই। আশাকরি সরকার এই ব্যয় মঞ্জুর করিবেন।” (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, ১৩৬২। পৃ. ৭০) স্কুল অফ ডিরেক্টর বিদ্যসাগরের চিঠির কথা জানিয়ে বাংলা সরকারকে লিখেছেন,- “পণ্ডিতের পত্রের সহিত সংযুক্ত বিবরণীর প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি; কেননা, স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে এই কর্মচারীর স্বেচ্ছাকৃত এবং অনাড়ম্বর পরিশ্রমের কথা সরকারের না জানাই সম্ভব। দূরবর্তী স্থানের অন্যবিধ কর্তব্যের গুরুভার যাঁহার উপর ন্যস্ত; কর্তৃত্বের বিশেষ উচ্চ পদেও যিনি অবস্থিত নন, এমন এক ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের বিশেষ সাহায্য ও সহানুভূতি ব্যতিতও গ্রাম সমূহে যদি এতটা করিয়া থাকিতে পারেন, সরকারের অনুমোদন ও সাহায্য পাইলে সেই দিকে কতটাই তিনি করিতে পারিতেন। আর যদি আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ইহাতে সেই কর্মচারীর অপমান ও আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে স্ত্রী শিক্ষার প্রচারে কি নিরুৎসাহের ভাবই না আসিয়া পড়িবে?” (তদেব, পৃ. ৭১) ১৮৫৮ সালে ২২ শে জুলাই স্কুল ডিরেক্টরের চিঠি ভারত সরকারের কাছে পাঠানো হয়। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার ২২ শে ডিসেম্বর ১৮৫৮ সালে পত্রটির উত্তরে জানান যে পণ্ডিতের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির প্রকৃত খরচ ৩৪৩৯৫ টাকা সরকার বহন করবেন। আর বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত এবং সরকার সমর্থিত মডেল স্কুলের জন্য ভারত সরকার অনধিক একহাজার টাকা ব্যয়ের অনুমতি দিতেছেন যার কিছু পরিমান টাকা

বিদ্যাসাগর নির্মিত বিদ্যালয়ে ব্যয় হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার বিদ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলিকে অনুমোদন দেননি। ফলস্বরূপ ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। তাঁর প্রতি ব্রিটিশ সরকারের এই ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে পণ্ডিত বিদ্যাসাগর স্কুল এস. আই পদ থেকে ইস্তফা দেন। কম হোক কি বেশি তিনি উভয় পরিসরেই স্ত্রীশিক্ষার প্রতি প্রবল আগ্রহী ছিলেন। তাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জনকারী কুমারী চন্দ্রমুখী বসুকে পুরস্কৃত করতে এবং তাঁর অন্তরের গভীর আনন্দকে প্রকাশ করতে চন্দ্রমুখী বসুকে একটি শেক্সপিয়র রচনাবলী উপহার দেন। বইতে চন্দ্রমুখীর প্রতি লেখাটি হল–

SRIMATI KUMARI CHANDRAMUKHI BASU
The first bengali lady,
Who has obtained the degree Master of Arts,
Of the Calcutta University,
From her sincere well-wisher
ISWARCHANDRA SHARMA

১.১.১১ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও নারী উন্নয়নঃ

ঊনিশ শতকের অপর একজন বিশিষ্ট বাঙালী সাহিত্যিক, সাহিত্য সমালোচক এবং আধুনিক বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ যিনি বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক ছিলেন তিনি আর কেউ নন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বর্তমান উত্তর ২৪ পরগনা জেলার নৈহাটি শহরের নিকট স্থানীয় কাঁঠালপাড়া গ্রামে ২৬ শে জুন ১৮৩৮ সালে জন্ম নেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আদি নিবাস ছিল হুগলি জেলার দেশমুখো গ্রামে। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বপুরুষ রামজীবন চট্টোপাধ্যায় কাঁঠাল পাড়ার রঘুদেব ঘোষালের কন্যাকে বিবাহ করেন। রামজীবনের পুত্র অর্থাৎ বঙ্কিমের প্রপিতামহ রামহরি চট্টোপাধ্যায় মাতামহের সম্পত্তি পেয়ে কাঁঠাল পাড়ায় চলে আসেন এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। রামহরির পৌত্র যাদব চন্দ্রের তৃতীয় পুত্র হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শৈশব কাল থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার কথা বহুল আলোচিত। সংস্কৃত ও বাংলা উভয় সাহিত্যেই তিনি অসাধারণ প্রতিভার প্রকাশ দেখিয়েছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে জ্ঞান থাকায় শ্রীমদ্ভগবৎগীতার উপর তিনি সীমাহীন জ্ঞান আহরণ করেন। বাংলা ভাষার প্রথম

সার্থক ঔপন্যাসিক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দূর্গেশনন্দিনী হল প্রথম সার্থক উপন্যাস যেটি বাংলা সাহিত্যের দ্বার খুলে দেয়। বিদ্যাসাগরের প্রায় সমকালীন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের মাধ্যমে মেয়েদের বিধবা বিবাহ, বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ এবং সর্বোপরি নারী শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাগুলি তাঁর উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি তাঁর সাহিত্যের মধ্যেই অত্যাচারিতা নারীকে তুলে ধরেছেন পুরুষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে। লড়াই করতে শিখিয়েছেন নারীকে তার নিজের অধিকার বুঝে নিতে, তাই তাঁর সাহিত্যে অনেকাংশে নারীর প্রাধান্য দেখতে পাই। "নারী শিক্ষিতা হলে বিধবা হবে" এই কুসংস্কারটিকে তিনি ভেঙে ফেলেছেন তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসে প্রফুল্ল তথা দেবী চৌধুরানী জ্ঞানে গরিমায় ঐশ্বর্যে এক অসামান্য ব্যক্তিত্ব। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে শৈবলিনীর প্রেমকে ভালোবাসার পক্ষে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বার বার প্রেমের জয় দেখিয়েছেন। 'কপালকুন্ডলা' উপন্যাসে কপালকুন্ডলার উক্তি আজও বহু নারীবাদীকে চমকিত করে "যদি জানিতাম স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।" বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম সামাজিক উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ'-তে তৎকালীন সমাজের পটভূমিতে বিধবা কুন্দনন্দিনীর প্রেমের চিত্রকে অঙ্কন করেছেন যা তাঁর প্রগতিশীল আধুনিক মানসিকতারই পরিচয় বহন করে। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম নারীর অন্তরলোকের গূঢ় রহস্যকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'কৃষ্ণ কান্তের উইল' উপন্যাসে রোহিনীও তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে রীতি নীতির বিরুদ্ধে এক যুগোপোযোগী প্রবল প্রতিবাদী নারী চরিত্র। আবার 'সীতারাম' উপন্যাসে শ্রী যেন একেবারে আধুনিক চরিত্র। তাই সে নির্দ্বিধায় বলতে পারে —"আমি তোমার বিবাহিত স্ত্রী, তোমার সর্বস্বের অধিকারিণী, আমি শুধু তোমার দয়া লইব কেন?" বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু বিবাহের কট্টর গোঁড়ামি তথা ব্রাহ্মণ্যবাদের শিকল ছিঁড়ে তার বাইরেও জীবনকে অন্যভাবে উপভোগ করার মন্ত্রনা দিয়েছেন। বঙ্কিম পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক রামমোহন, বিদ্যাসাগর, প্যারিচাঁদ মিত্র, রাধানাথ সিকদার প্রমুখরা যা চিন্তাও করতে পারেননি, সমাজ নামে প্রতিষ্ঠানটির সেই বহুমুখী ভাবনা গুলিকে তিনি তাঁর উপন্যাসের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন "স্ত্রী পুরুষের সমান ভাগের সমষ্টিকে সমাজ বলে।" উভয়ের সমান উন্নতিতে সমাজের উন্নতি। বঙ্কিমচন্দ্র যে আসলেই একজন সমাজের শুভাকাঙ্খী যিনি সর্বদাই, নারী জাতির মুক্তির কথা চিন্তা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র নারীকে সংসার, পরিবার এবং সমাজের কেন্দ্রবিন্দু মনে করতেন। একই সঙ্গে নারী পুরুষের

ক্ষেত্রে সমাজের বৈষম্যমূলক আচরণকে মেনে নিতে পারেননি। তাই মেয়েদের সামগ্রীক শিক্ষার জন্য নিজে একটি শিক্ষা প্রকল্প 'চতুর্বিধা বৃত্তি'র সুসামঞ্জস্য অনুশীলনের ব্যবস্থা নেন। তাঁদের জন্য শরীরচর্চা, সঙ্গীতবিদ্যা এবং গৃহকর্মের পাঠের প্রতিও গুরুত্ব দেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' নামক প্রবন্ধের পঞ্চম অর্থাৎ শেষ পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্রের নারীবাদী চরিত্রের দৃষ্টান্ত পাই।এখানে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যিক কম, সমাজবাদী বেশি। প্রবন্ধের কয়েকটি লাইন তাঁর এই নারীবাদকে প্রতিষ্ঠিত করে।

ক) "মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকার বিশিষ্ট। স্ত্রীগণও মনুষ্য জাতি, অতএব স্ত্রীগণও পুরুষের তুল্য অধিকারশালিনী। যে যে কার্যে পুরুষের অধিকার আছে, স্ত্রীগণেরও সেই সেই কার্যে অধিকার থাকা ন্যায়সঙ্গত।"

খ) "স্বভাবগত বৈষম্য থাকিলেই যে অধিকারগত বৈষম্য থাকা ন্যায়সঙ্গত, ইহা আমরা স্বীকার করি না। এ কথাটি সাম্যতত্বের মূলোচ্ছেদক।" যে সকল বিষয়ে স্ত্রী পুরুষের অধিকার বৈষম্য দেখা যায়, সে সকল বিষয়ে স্ত্রী পুরুষে যথার্থ প্রকৃতিগত বৈষম্য দেখা যায় না। যতটুকু দেখা যায় ততটুকু কেবল সামাজিক নিয়মের দোষে। সেই সকল সামাজিক নিয়মের সংশোধনই সাম্য নীতির উদ্দেশ্য। বিধবা বিবাহ কতটা জরুরি ছিল সেই সময় তা বঙ্কিমচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি যেহেতু জানতেন যে বাল্য বিবাহের কারণে বহু মেয়ে অত্যন্ত কম বয়সে পতি হারা হত আর পতি বিয়োগের পর বাকি জীবনটা চূড়ান্ত কষ্টের মধ্যে কাটানো তার পক্ষে কতটা বিভীষিকাময় তা নীচের উদ্ধৃতি থেকে পরিস্ফুট হয়। যেটি 'প্রচার' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ধর্ম ও সাহিত্য' প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়, "আট বৎসরের কুমারী কন্যা বিধবা হইয়াছে, যে ব্রহ্মচর্যের কিছু জানে না যাহা ষাট বৎসরের বুড়ারও দূরাচরণীয় সেই ব্রহ্মচর্যের পীড়নে পীড়িত করিয়া তাহাকে কাঁদাইতে হইবে। আপনি কাঁদিতে হইবে, পরিবারবর্গকে কাঁদাইতে হইবে, নহিলে ধর্ম থাকে না।" বহু বিবাহের বিরোধীতা করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন "মনুষ্য জাতির মধ্যে কাহারই বহু বিবাহ নীতি সঙ্গত হইতে পারে না। কেহই বলিবে না যে ওই স্ত্রীগনও পুরুষের ন্যায় বহু বিবাহের অধিকারিণী হউন; সকলেই বলিবে, পুরুষের স্ত্রী'র ন্যায় একমাত্র বিবাহে অধিকার।" বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান সম্প্রদায়কেও বহু বিবাহ থেকে নিবৃত্ত থাকার পক্ষে যুক্তি খাড়া করে দেন। তাঁর কথায়, "এদেশে অর্ধেক হিন্দু, অর্ধেক মুসলমান। যদি বহু বিবাহ নিবারণের জন্য আইন হওয়া উচিত হয়, তবে হিন্দু মুসলমান উভয়ের সম্বন্ধেই সেই আইন হওয়া উচিত।"এই থেকে প্রমানিত হয় যে বঙ্কিমচন্দ্র শুধুমাত্র নিজের নাম যশ প্রতিষ্ঠার জন্য সাহিত্য

চর্চা করতেন না, বরং তার একমাত্র উদ্দশ্য ছিল সমাজের চিত্রটিকে তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে জনসমক্ষে ফুটিয়ে তোলা। আক্ষরিক অর্থে সমাজ সংস্কারক উপাধিটি না পেলেও মননে ও চিন্তনে বঙ্কিমচন্দ্র আসলে একজন সমাজ সংস্কারক, শিক্ষানুরাগী, আধুনিকমনস্ক, নারীবাদী, সর্বোপরি একজন সমাজবাদী।

১.১.১২ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ও নারী উন্নয়নঃ

১৮৪৯ সালের মে মাসে বাঙালী ভদ্র ঘরের মেয়েদের সুশিক্ষার উদ্দেশ্যে বেথুন সাহেব এবং অন্যান্য গুণীজনদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তৈরি হয়েছিল ‘কলিকাতা ফিমেল স্কুল’, যেটির নামকরণ বিদ্যাসাগর নিজে করেছিলন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাদেশে নারী শিক্ষায় এক নতুন ঢেউ লাগে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নারী শিক্ষার যে পদ্ধতি ছিল তা দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। একটি হল ধর্মের থেকে বিচ্যুত হয়ে সম্পূর্ণ আধুনিক উপায়ে নারী শিক্ষার প্রচার যার প্রচেষ্টা করেছিলেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়, বেথুন প্রতিষ্ঠিত কলকাতা ফিমেল স্কুল, এবং কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় প্রভৃতিতে ধর্ম সংস্রবহীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল। অপরদিকে ধর্মের বন্ধনে থেকে স্ত্রী শিক্ষার প্রসার কিভাবে করা সম্ভব তার প্রয়াস চালিয়েছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম নেতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। তিনি এবং তাঁর অনুগামীরা সকলে বিশ্বাস করতেন যে, “ধর্মশুন্যশিক্ষা শিক্ষাই নহে, সেই শিক্ষা অধঃপতনের মূল। কেশবচন্দ্র সেন শিক্ষাক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকারের উপর সর্বদা গুরুত্ব দিতেন। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর ভাবনা ছিল সর্ব যুগের উপযোগী যথা, মেয়েদের এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা উপযুক্ত মা, আদর্শ স্ত্রী, বোন এবং কন্যা হয়ে উঠতে পারে। তবে তাঁর শিক্ষা ভাবনায় নারী পুরুষের মধ্যে শিক্ষার বৈষম্য লক্ষ্য করা যায় যার যথার্থতা আধুনিক ভারতে অনুপযোগী। তাঁর মত অনুসারে যে বিষয়গুলি মেয়েদের শেখানোর প্রয়োজন নেই সেগুলি হল উঁচু স্তরের বনিক বিদ্যা, জ্যামিতি, লজিক, মেটা ফিজিক্স এবং মেন্টাল সাইন্স। তিনি চাইতেন মেয়েদের শিক্ষা সীমাবদ্ধ থাক ধর্মতত্ব এবং নীতি বিষয়ক বই যেমন- ইতিহাস, ভূগোল, পাটিগনিত, ব্যাকরণ, বোধোদয়, ‘চরিতাবলী’, ‘চারুপাঠ’, ‘সুশীলার উপাখ্যান’ সদ্ভাবশতক, বামারঞ্জিকা, Elementary Principles of Science প্রভৃতি। তাঁর মতে স্ত্রীশিক্ষা হবে স্ত্রীজনোচিত,

শিক্ষার মধ্যে কোন পুরুষালী ভাব বিশিষ্ট শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু থাকবে না। তিনি মনে করতেন মেয়েদের প্রধান কাজ হবে সন্তান লালন পালন এবং গৃহস্থালি রক্ষা। নারীত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ এবং আত্মমর্যাদাবোধের কথা তিনি ভাবেন নি। স্ত্রী শিক্ষার বিষয়ে কেশবচন্দ্রের এই গোঁড়ামীর জন্য পরবর্তী কালে তাঁর অনুগামীরা আলাদা হয়ে গিয়ে পৃথক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এইসব অনুগামীদের মধ্যে ছিলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দূর্গামোহন দাস, আনন্দ মোহন বসু প্রমুখেরা।

১.১.১৩ পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর নারী উন্নয়ন বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গিঃ

কেশবচন্দ্র সেনের সমসাময়িক আরেক মহাপুরুষ যিনি বঙ্গভূমির নারী শিক্ষা এবং সমাজ কল্যানের কাজে অনুঘটকের মতো কাজ করেছিলেন তিনি হলেন পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-৩০.০৯.১৯১৯)। তাঁর নিজের কথা থেকেই তাঁর জীবন আদর্শ সম্পর্কে অনেকখানি আভাস পাওয়া যায়। 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সংস্রবে যাহা কিছু করিয়াছি তাহাই আমার জীবনের প্রধান কাজ'। ধর্মপ্রাণ পুরুষ হিসেবে পরিচিত থাকা সত্ত্বেও তাঁর কর্মজীবনকে কোন ভাবে অবহেলা করা যায় না। তাঁর কর্ম জীবনের বিস্তারকে তিনটি ধারায় বিভক্ত করা যায়। প্রথমটি হল শিক্ষকতা, দ্বিতীয়টি হল সমাজ সেবা ও সমাজ সংস্কার এবং তৃতীয় ও সর্বশেষটি হল স্বদেশ সাধনা। রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষেরা সমাজ সংস্কারের যে বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন তার ঢেউ বঙ্গভূমির সীমানা ছাড়িয়ে সারা ভারতভূমিকে স্পর্শ করেছিল। ঠিক এই সময়ে বর্তমান দক্ষিন চব্বিশ পরগনা জেলার চাবেড়ি পৌঁতা অঞ্চলে পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য এবং মাতা গোলকমনি দেবীর কোলে ৩১ শে জানুয়ারী ১৮৪৭ সালে জন্ম নেন শিবনাথ শাস্ত্রী। বিদ্যাসাগরের পথ অনুসরণ করেই শিবনাথ শাস্ত্রী সমাজের নেতিবাচক সংস্কার যেমন- জাতিভেদ, বহুবিবাহ, ধনী গরীব বৈষম্য প্রভৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান। জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাবনায় ফরাসি বিপ্লবের সামাজিক সাম্যের আদর্শ প্রতিফলিত হয়। রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ জাতিভেদ প্রথার কুফল সম্পর্কে অবহিত ছিলেন তবুও তাঁরা জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে

আন্দোলনের পথে অগ্রসর হননি। কারণ সেই সময় সমাজ জাতিভেদ প্রথা বিলুপ্তির জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুত ছিল না। তাঁদের মতে শিক্ষার মাধ্যমে সচেতনতা সবার আগে প্রয়োজন। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনে শিবনাথ শাস্ত্রী প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। শিবনাথশাস্ত্রী কোচবিহারে বাল্য বিবাহের পর কেশবচন্দ্রের নিকট যে প্রতিবাদ পত্র পাঠান তাতে পরিষ্কার লেখেন- 'আমরা বাল্য বিবাহকে পাপ মনে করি।' শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর নিজের চিন্তা ভাবনার অনুরূপ ভাবনা সম্পন্ন কিছু যুবক নিয়ে নিজের একটি সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন এবং প্রত্যেককে দিয়ে শপথ করিয়েছিলেন যে,- 'আমরা নিজের একুশ বৎসরের পূর্বে বিবাহ করিব না, কোন বালিকাকে তাহার ষোড়শ বৎসরের পূর্বে পত্নীরূপে গ্রহণ করব না, এবং যে বিবাহে পুরুষের বয়স একুশের এবং বালিকার বয়স ষোড়শ বৎসরের কম সেরূপ বিবাহে কোন প্রকার সাহায্য করিব না।' (বিপিনচন্দ্র পাল, সত্তর বৎসর। পৃ. ২২৩)

নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে শিবনাথ শাস্ত্রীর পদক্ষেপ আজও কার্যকরী। তাঁর মতে উঁচু স্তরের গনিত, জ্যামিতি, লজিক, মেটাফিজিক্স, মেটেরিয়াল সায়েন্স ইতাদি বিষয় নারী শিক্ষার পাঠ্যসূচীর মধ্যে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। ২২ নং বেনেপুকুর লেনে মাত্র পাঁচটি ছাত্রী নিয়ে তিনি একটি উচ্চ শ্রেনীর বোর্ডিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। স্কুলের নাম দেন 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়'। বিদ্যালয়ের দেখাশুনার দায়িত্বে নিযুক্ত হন ইংল্যান্ড থেকে আগত কুমারী এক্রয়েড এবং পণ্ডিত নিযুক্ত হন অবলাবান্ধব দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। যদিও এই বিদ্যালয়টি পরে বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ১৯৭৬ সালে মার্চ মাসে শিবনাথ, দ্বারকানাথ, আনন্দমোহন বসু, দূর্গামোহন দাস মিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীকে অনুসরণ করে বালিগঞ্জ রোডে একটি পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যালয়টির নামকরণ করেন 'বঙ্গ মহিলা' বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ছিল সমস্ত খ্যাতনামা মানুষদের আত্মীয়। এইরূপ কয়েকজন উল্লেখযোগ্য হলেন আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোসের ভগিনী স্বর্নপ্রভা বসু (আনন্দমোহনের পত্নী), দূর্গামোহন দাসের দুই কন্যা লেডি অবলা বসু যিনি ছিলেন আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোসের স্ত্রী এবং সরলা রায় যিনি ছিলেন প্রসন্ন কুমার রায়ের পত্নী প্রমুখরা। শিবনাথ শাস্ত্রী যখন ১৮৮৮ সালে ইংল্যান্ড ভ্রমণে যান সেখানে কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে ধারণা লাভ করেন এবং দেশে ফেরার সময় তিনি ফ্রয়েডের জীবনীসহ কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাব্যবস্থার পদ্ধতির উপর রচিত কয়েকটি বই নিয়ে আসেন। দেশে ফিরে কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতি অনুসরণ করে ব্রাহ্ম বালিকা

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। শিবনাথ শাস্ত্রীই ছিলেন কলকাতায় কিন্ডারগার্টেন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পথিকৃৎ। তিনি তাঁর 'আত্মচরিত' এ লিখেছেন -"শিশুদের এই (কিন্ডারগার্টেন) শিক্ষা প্রণালী আমার এত ভালো লাগিয়াছিল যে আমি আসিবার সময় কিন্ডারগার্টেনের প্রতিষ্ঠাতা ফ্রয়েবেলের জীবন চরিত ও মুক্ত শিক্ষা প্রণালীর কয়েকখানি গ্রন্থ কিনিয়া আনিলাম।" (শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃ. ২২)। ইংল্যান্ডে নারী আন্দোলনের নেতৃ মিসেস বার্টলারকে দেখার পর শিবনাথ শাস্ত্রীর মনে নারী শক্তির উপর এক বিশেষ প্রত্যয় গড়ে উঠে। তিনি ভাবতে শুরু করেন ইংল্যান্ডের নারী শক্তি যেমন দেশের একটি বিশেষ সম্পদ এ দেশের নারীগনও যদি শিক্ষার মাধ্যমে চেতনা, আর চেতনা থেকে মুক্তির পথে অগ্রসর হয় তবে ভারতভূমির পরিবর্তন সুনিশচিত। তিনি বিশ্বাস করতেন স্ত্রী শিক্ষা এবং জন শিক্ষার উন্নতি ছাড়া সামাজিক উন্নতি অসম্ভব। তাঁর কথায় "আমরা দেশ হিতকর বা সমাজ সংস্কার সাধক যে কিছু আলোচনা করি তাহার প্রভাব আমাদের গৃহে বা সমাজের নিম্নস্তরে পৌঁছায়। নারীগনের ও জনসাধারনের শিক্ষার অভাবই ইহার প্রধান কারণ"।

১.১.১৪ নারী জাগরণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকাঃ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বঙ্গভূমি এমন এক বহুমুখী প্রতিভাধর মহামানবের জন্ম দেয় যার কৃতিত্ব আসমুদ্র হিমাচল পেরিয়ে সমগ্র বিশ্বকে স্পর্শ করে। এই মহামানব আর কেউ নন একজন বাঙালী কবি, লেখক, গীতিকার, দার্শনিক, এবং সর্বোপরি একজন সমাজ সংস্কারক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি জন্মগ্রহণ করেন তৎকালীন কলকাতার এক বিখ্যাত জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে ৭ই মে ১৮৬১ সালে। শৈশব থেকেই প্রতিভাবান এই মানুষ প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও বিভিন্ন বিষয় ও ভাষার উপর অসাধারণ পান্ডিত্য অর্জন করেন। মাত্র আট বছর বয়সে কবিতা লেখা শুরু করেন এবং যুবাবস্থাতেই সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে নিজের ব্যতিক্রমী সত্ত্বার প্রকাশ ঘটান। ব্রিটিশ সরকারের শোষণ নীতির তীব্র সমালোচক ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। বঙ্গভূমি তথা ভারতে সামাজিক পরিস্থিতি এবং নারী শিক্ষার অবস্থার সমালোচনা তাঁর সাহিত্য কর্মের

উপর বার বার ফুটে উঠেছে। পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থে সাধারণ মেয়ে কবিতাটিতে স্ত্রী শিক্ষার বিষয়টির উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে একটি সাধারণ মেয়ে শরৎচন্দ্রের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছে–

‘পায়ে পড়ি তোমার, একটা গল্প লেখো তুমি শরৎবাবু...
মালতি পাস করুক এম.এ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে,
গনিতে হোক প্রথম তোমার কলমের এক আঁচড়ে।....
মেয়েটাকে পাঠিয়ে দাও ইউরোপে।
সেখানে যারা জ্ঞানী, যারা বিদ্বান....যারা শিল্পী
দল বেঁধে আসুক ওর চারদিকে
জোতির্বিদের মত আবিষ্কার করুক ওকে,
শুধু বিদুষী বলে নয়, নারী বলে।”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধুমাত্র কবি, প্রাবন্ধিক, উপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, সঙ্গীত স্রষ্টা নন, তিনি একই সঙ্গে মানবতার পূজারী এবং সামগ্রিক বোধ বা চেতনার অধিকারী এক মহান ঋষি, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানুষের কল্যাণ, দেশ জাতি এবং বিশ্বমানের মঙ্গল চিন্তা, আর শিক্ষার দ্বারাই সেই কল্যাণ সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন সর্বব্যাপি শিক্ষার প্রকাশ। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, ক্ষমতা বা অক্ষমতা যেখানে কোন ভাবে বিচার্য বিষয় নয়।

শিক্ষা যেহেতু মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র পথ, তাই শিক্ষাই সকলের সমান অধিকার। এখানে ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নিচ, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, নারী-পুরুষের কোন ভেদাভেদ নেই। “যাহা কিছু জানিবার যোগ্য তাহাই বিদ্যা, তাহা পুরুষকেও জানিতে হইবে মেয়েকেও জানিতে হইবে - শুধু কাজেই খাটাইবার জন্য যে তাহা নয়, জানিবার জন্যই।” (স্ত্রী শিক্ষা, শিক্ষা)। রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট তাঁকে নারী জাতির শিক্ষা ও বিদ্যা চর্চার বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী করে তোলে। ১৯২২ সালে তিনি স্ত্রী শিক্ষার বিষয়ে ক্ষীতিশ চন্দ্র দত্তকে যে চিঠি লেখেন তাতে তাঁর ভাবনার কিছুটা পরিচয় মেলে – “আমাদের পুরুষেরা বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াও মনের ভিতর মুক্তি লাভ করতে পারে নাই। অন্তঃপুরে শিক্ষার প্রবেশ না ঘটিলে আমাদের মরণং ধ্রুবং। নিশ্চয় জানিবেন সাধ্যমত স্ত্রীশিক্ষার সম্বন্ধে লক্ষ্যপথে চলিতে চেষ্টা করিব।”

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার শিক্ষা এবং সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল। রবীন্দ্রনাথ শৈশবেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে ঠাকুর পরিবারে কিভাবে প্রাচ্যের গোঁড়া ধ্যান ধারণাকে পেছনে ফেলে বৌঠান এবং মেয়েরা বিদ্যা চর্চা, সঙ্গীত চর্চা, সাংস্কৃতিক চর্চা এমনকি অভিনয়েও অংশগ্রহণ করতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বড় মেয়ে সৌদামিনীকে বেথুন সাহেবের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ১৮৫২ সালে ভর্তি করেন। এই থেকে প্রমাণিত হয় যে তৎকালীন নারী শিক্ষার সম্পর্কে যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল যেমন, মেয়েরা শিক্ষিতা হলেই বিধবা হবে তা থেকে মুক্তির আলো ছড়াতে সাহায্য করে ঠাকুর পরিবার। রবীন্দ্রনাথের মতে বিদ্যা দুই প্রকার। একটি বিশুদ্ধ জ্ঞানের, অপরটি হল ব্যবহারিক। বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে মেয়ে পুরুষের কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনে মেয়ে পুরুষের পার্থক্য থাকায় স্বাভাবিক কারণে সমাজে পুরুষ যে সব ভূমিকা পালন করে মেয়েরা সব ক্ষেত্রে একই ভূমিকা পালন করে না। মেয়েদের মনের প্রকৃতি পুরুষের থেকে আলাদা সেই কারণে তাদের জীবনে বিদ্যার ব্যবহারও স্বতন্ত্র। আজকাল বিদ্রোহের ঝোঁকে একদল মেয়ে এই প্রাথমিক ধারণাটিকে অস্বীকার করেন। তারা মনে করেন মেয়ে পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যার ব্যবহার ও উপযোগীতা সমান। এটা নিতান্তই তাদের ক্ষোভের কথা। ক্ষোভের কারণ হল এই যে পুরুষ তার আপন কর্ম পথে চলতে চলতে সমাজে এক বিশেষ কর্তৃত্ব লাভ করেছে। মেয়েদের কোন কোন ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে পুরুষের আনুগত্য স্বীকার করতে হয়েছে। কবি এই আনুগত্যকে অনিবার্য বলে মনে করেন না। কবি বলেছেন "...ভালোবাসার অংশ মেয়েদের স্বভাবে বেশি আছে– এই নহিলে সন্তান মানুষ হইত না, সংসার টিকিত না। স্নেহ আছে বলিয়াই মা সন্তানের সেবা করে, তার মধ্যে দয়া নাই। প্রেম আছে বলিয়াই স্ত্রী স্বামীর সেবা করে, তার মধ্যে দয়া নাই।" যারা একথা মানতে চায় না তারা আসলে একেশ্বর শাসন কর্তার মনোবৃত্তিই পালন করে। সমাজ ও সভ্যতায় যেমন নারী পুরুষের সামঞ্জস্যতার প্রয়োজন আছে তেমনই মানসিক স্তরেও সামঞ্জস্যতার প্রয়োজন আছে। কবির কথায় – "....স্বামী যেখানে ঝাঁজালো সোডা ওয়াটার চায়, স্ত্রী সেখানে সুশীতল ডাবের জল এনে হাজির করে।" যে জীবনের মাহাত্ম্য নারী পুরুষে সম্মিলিত অখন্ড সম্পদ তাতে উভয়েরই সমান অধিকার সভ্যতাকে পূর্ণতা এনে দিতে সহায়তা করে। কিন্তু যুগ যুগ ধরে সমাজে নারীরা কেন পিছিয়ে রয়েছে তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে কবি সমাজের অসম ব্যবস্থা, সামাজিক বিধি বিধান, সংস্কার, সর্বোপরি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন। রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন

'চিত্তের বন্দিশালা' থেকে মুক্তির জন্য সবার আগে প্রয়োজন শিক্ষা। সমাজ সংসারে পুরুষের পাশে সমান অধিকার নিয়ে মর্যাদার সঙ্গে মাথা তুলে বেঁচে থাকার মানসিকতায় ফুটে উঠেছে রবীন্দ্র সৃষ্ট চিত্রাঙ্গদার উক্তিতে :

"আমি চিত্রাঙ্গদা, দেবী নহি, নহি আমি সামান্য রমনী
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সে-ও আমি নই,
অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে পিছে, সেও আমি নহি...।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য রচনায় নারীকে সর্বদা আত্মবিশ্বাসী, সংবেদনশীল, ব্যক্তিত্বময়ী এবং মানবিকতায় অতি উজ্জ্বলরূপে সৃষ্টি করেছেন। এই রূপ নারী চিত্র ফুটে উঠেছে কবির 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের সবলা কবিতায়–

"শুধু শূন্যে চেয়ে রব? কেন নিজে নাহি লব চিনে
সার্থকের পথ
কেননা ছুটাব তেজে সন্ধানের রথ
দুর্ধর্ষ অশ্বেরে বাঁধি দৃঢ় বলগা পাশে"।

'নারীর মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে তাই রবীন্দ্রনাথের উক্তি– "জ্ঞান ছাড়া, আত্মোপলব্ধি ছাড়া স্বাধীনতা হতেই পারে না... আজ এল এমন যুগ যখন মেয়েরা মানবত্বের পূর্ণ মূল্য দাবী করেছে। জননার্থং মহাভাগা বলে তাদের গণনা করা হবে না। সম্পূর্ন ব্যক্তি বিশেষ বলেই তারা হবে গণ্য। মানব সমাজে এই আত্মশ্রদ্ধা বিস্তারের মত এত বড়ো সম্পদ আর কিছুই হতে পারে না। গণনায় মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় না, পূর্ণতাতে তার পরিমাণ।" শিক্ষার ক্ষেত্রে একীভবন যতক্ষন না হচ্ছে ততক্ষন পর্যন্ত শিক্ষার সাফল্য সমাজে উপলব্ধ হওয়া সম্ভব নয়। আর শিক্ষার এই একীভবন তখনই সম্ভব যখন ধনী-দরিদ্র, জাতি-ধর্ম, বর্ণ, ক্ষমতা, অক্ষমতা, শহর- গ্রাম, উপজাতির বৈশিষ্ট্য এবং ভাষাগত চরিত্র নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান শিক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করা হবেড়

১.১.১৫ নারী জাগরণে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকাঃ

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক আর এক মহাত্মার জন্ম হয় ভারতভূমিতে যাঁর বেদান্ত দর্শন এবং উৎসীর্গকৃত মনোভাব ভারতের সমাজ জীবন, ধর্মীয় চেতনা এবং জনগণের শিক্ষার প্রগতিকে ত্বরান্বিত করে বহুগুন। এই মহামানবের জন্ম হয় ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারী ব্রিটিশ ভারতের কলকাতায়। বাঙালী কায়স্থ পরিবারে জন্ম বিবেকানন্দের।

পূর্বনাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। শৈশব কাল থেকেই ধর্ম এবং আধ্যাত্মিক চিন্তায় তাঁর গভীর মনোযোগ ছিল। পরবর্তীতে গুরু রামকৃষ্ণ দেবের সান্নিধ্য লাভের পর সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং বিবেকানন্দ নামে নব আত্মায় রূপান্তরিত হন। রামকৃষ্ণ দেবের মৃত্যুর পর বিবেকানন্দ সারা ভারত পরিভ্রমন করেন এবং ভারতীয় জনগণ ও সমাজ জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করেন। ভারতীয় সমাজের দূরবস্থা পর্যবেক্ষণ করেণ বিবেকানন্দ এতটাই ব্যথিত হয়েছিলেন যে দূর্দশাগ্রস্থ অসহায় মানুষের জন্য নিজের জীবন পণ রাখেন। তিনি শপথ নেন, যতদিন ভারতে অসহায়, ক্ষুধার্ত মানুষের জীবনে সুখ না আসে তিনি সুখের শয্যা নেবেন না। তিনি স্বপ্ন দেখতেন নিম্ন জাতি রূপে পরিগনিত অসহায় নারী সমাজ একদিন জেগে উঠবে, সমাজে সমান অধিকার লাভ করবে। বিবেকানন্দ মনে করতেন নারী এবং শূদ্র জাতি উন্নত না হলে সমাজের আসল উন্নতি অধরাই থেকে যাবে; আর এই দুই শ্রেনির উপর নিপীড়ন ভারতীয় সমাজের প্রধান ব্যাধি। তাঁর কথায়- “In India, There are two great evils -trampling on the women and grinding the poor কিংবা “Never forget! women and the people - they have to be raised first.”

তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মেয়েদেরকে নিজেদের ভাগ্য জয় করতে নিজেদেরকেই সচেষ্ট হতে হবে। তিনি বলেছেন- “মেয়েদের শিক্ষা ব্যাপারে আমাদের ধর্ম বাধা দেয় না।... মেয়েদের শিক্ষা দিতে হইবে, তাহাদিগকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। প্রাচীন পুস্তকে আমরা আরও দেখি- ছেলে ও মেয়েরা উভয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু পরবর্তীকালে সমস্ত জাতির শিক্ষাই অবহেলিত হইয়াছে।” ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবে স্ত্রী জাতির প্রতি হীন ভাব সমাজে প্রকট হতে থাকে। এই বিষয়ে প্রতিবাদের সুরে বিবেকানন্দ বলেছেন- “মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে। যে দেশে যে জাতে মেয়েদের পূজা নেই, সেই দেশ সেই জাত কখনও বড় হতে পারেনি, কস্মিনকালে পারবেও না। তোদের জাতের যে এত অধঃপতন ঘটেছে তার প্রধান কারণ এই সব শক্তি মূর্তির অবমাননা করা।” নারীরা হলেন শক্তি রূপিনী, এই শক্তির অবমাননা হলে, দেশ ও জাতির অবক্ষয় নিশ্চিত। ইউরোপীয় দেশগুলি উন্নত হয়েছে পরোক্ষভাবে কামের দ্বারা নারীদের পূজা করে। এক শতাব্দী পূর্বেই বিবেকানন্দ নারী শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি নারীদের জন্য যে প্রকার শিক্ষার কথা বলেছেন তা তাদেরকে শেখাবে বিনয়, নম্রতা, ধৈর্য এবং নিজের স্বতন্ত্র্য স্বাধীনতা। তিনি এমন এক নারী মূর্তি চেয়েছিলেন

যিনি গৃহকর্মের পাশাপাশি সমাজ ও সংস্কৃতির গৌরবকে গ্রহণ করবেন। বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন, ছাত্রীনিবাস গড়ে তোলা বা বিধবাদের জন্য আশ্রম গড়ে তোলা প্রভৃতি কাজের মধ্যেই কেবল বিবেকানন্দের নারী শিক্ষা ভাবনা সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর ভাবনা ছিল কিভাবে নারী জাতির মধ্যে এক অনন্ত শক্তির সঞ্চার করা সম্ভব। বিবেকানন্দের কথায় -"কীভাবে তাদের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দেওয়া যায়, যাতে তারা মশাল হয়ে উঠতে পারে যার শিক্ষায় অগনিত নারী নিজেদের জ্বালিয়ে তুলতে পারবে।" নারী শক্তির উপর স্বামীজীর অগাধ আস্থা ছিল। এই বিষয়ে তিনি বলেছেন– 'পাঁচশ পুরুষের সাহায্যে ভারতবর্ষকে জয় করতে পঞ্চাশ বছর লাগতে পারে, কিন্তু পাঁচশ নারীর দ্বারা সে কাজ করা যেতে পারে মাত্র কয়েক সপ্তাহে।" কিন্তু নারীর এই সম্ভাব্য শক্তির বিকাশ অধরাই থেকেছে যার আর্তনাদ বারে বারে বিবাকানন্দের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে – "কোথায় সেই নারী?" তিনি চেয়েছিলেন নারীর সমান অধিকার, আধ্যাত্মিক অধিকার, মানব সভ্যতা সৃষ্টিতে পুরুষের ন্যায় সমান অধিকার। বিবেকানন্দ আমেরিকা ভ্রমণে আমেরিকান নারীদের সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার পর বুঝেছিলেন যে এই রকম নিঃস্বার্থ মহৎমনা এবং পবিত্র নারীদের তুলনায় ভারতীয় নারীরা না কতটা পদদলিত এবং বঞ্চিত। তিনি আমেরিকান মহিলাদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন,- "কতশত সুন্দর পারিবারিক জীবন আমি দেখেছি। কতশত জননী দেখেছি, যাদের নির্মল চরিত্রের, নিঃস্বার্থ অপত্য স্নেহের বন্দনা করার ভাষা আমার নেই। কতশত কন্যা ও কুমারী দেখেছি, যারা 'ডায়ানা দেবীর ললাটস্থ তুষার কনিকার ন্যায় নির্মল'- আবার সেই সঙ্গে তাঁরা বিলক্ষণ শিক্ষিতা এবং আধ্যাত্মিক উচ্চ গুন সম্পন্না।" আমেরিকান নারীদের অনুরূপ চরিত্রে উন্নীত করতে ভারতীয় মহিলাদের সবার আগে প্রয়োজন আধুনিক শিক্ষা। স্ত্রী শিক্ষা কেমন হবে,কীভাবে তা প্রদান করা সম্ভব হবে, এই নিয়ে স্বামীজী বিস্তর ভাবনা চিন্তা করতেন, কখনও কখনও এমন সব আকাশ কুসুম কল্পনা করতেন যার হয়ত বাস্তবায়ন একেবারেই সম্ভব নয়। তিনি ভারতীয় নারীদের জন্য যে রকম শিক্ষা পরিকল্পনা করেছিলেন তা ছিল ধর্ম কেন্দ্রিক এবং বিজ্ঞান কেন্দ্রিক। মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব তার বহিঃপ্রকাশ করাই ছিল বিবেকানন্দের শিক্ষা ভাবনার মূল উদ্দেশ্য। বিবেকানন্দের ভাবনায় যে বিষয়গুলি নারী শিক্ষার পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভূক্তির প্রয়োজন –

প্রথমত, নারীদের বিজ্ঞান বিষয়ক পাঠদান করতে হবে, তবে তা ধর্মকে সরিয়ে নয়।

দ্বিতীয়ত, স্বামীজীর মতে ধ্যান পরায়ন ভাবনাই বৈজ্ঞানিক সূক্ষ দৃষ্টি লাভের উপায়।

তৃতীয়ত, পুরান, ইতিহাস, গৃহকার্য, ঘরকন্নার নিয়ম ও আদর্শ চরিত্র গঠনের নীতি গুলি বিজ্ঞানের সহায়তায় শিখতে হবে।

চতুর্থত, মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চাই, তারপর সংস্কৃত, ইংলিশ, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, গনিত, পাশাপাশি হাতের কাজ, সূচীশিল্প, বুনন, বয়ন, কুটির শিল্পের অনেক কিছু, রন্ধন ও শুশ্রুষা। পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান যেমন শিখতে হবে তেমনই ভারতীয় দর্শনকেও জানতে হবে।

পঞ্চমত, গনিতকে এমন ভাবে শিখতে হবে যাতে মনের শৃঙ্খলা আসে এবং নিখুঁত ও নির্ভুল ভাবে সত্য সন্ধানে প্রবণতা আনে। ইতিহাস জানতে হবে এমনভাবে যাতে কার্যের সঙ্গে কারণের সম্পর্ক সাধন করতে সক্ষম হবে। শিক্ষা কেবল বস্তু কেন্দ্রিক হবে না বরং তা বোধে রূপান্তরিত হবে।

ষষ্ঠত, নারী এবং পুরুষ উভয়কেই কৃষি ও বানিজ্য, শিল্প এবং বিক্রয় শালা সম্পর্কে পাঠ দান করা উচিত।

সপ্তমত, দেশের সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় চেতনার উপর ভিত্তি করে শিক্ষা নীতি নির্ধারণ করা উচিত। তাতে মানুষের অতি সহজে চিত্তস্ফূর্তি ঘটে।

স্বামীজী দেখেছেন পাশ্চাত্যের নারীবাদী মেয়েরা সমান অধিকারের জন্য লড়াই করেছেন। কিন্তু এই লড়াই করার মানসিকতা ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে তিনি খুঁজে পাননি, তার কারণ হয়ত দীর্ঘদিন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পদদলিত হতে হতে মেয়েরা নিজেদের অধিকারের কথা ভুলতে বসেছে। তাদের অন্তর আত্মাকে চেতনার আলোকে আলোকিত করতে কোন এক সাহসিনী, উদার মনস্কা এবং দেশের জন্য নিবেদিত প্রাণ নারীর প্রয়োজন ছিল। বিবেকানন্দের নিরন্তর ভাবনা ছিল একজন নারীর যিনি তাঁর কাঙ্খিত কর্মযজ্ঞে সামিল হবেন। তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন প্রথম দিকে ভারতীয় নারীদের কাছ থেকেই এই সহযোগিতা পাওয়া যাবে। সে আশা তিনি করেছিলেন 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সরলা ঘোষালের কাছ থেকে। এই সরলা দেবীও ছিলেন স্বদেশের কল্যাণ কামিনী, যার উপর স্বামীজীর অপার আস্থার কথা জানতে পারা যায় তাঁর লেখা ছয় ও চব্বিশে এপ্রিলের লেখা দুটি পত্র থেকে - "প্রভু করুন, যেন আপনার মতো অনেক রমনী এদেশে জন্মগ্রহণ করেন, এবং স্বদেশের উন্নতি কল্পে জীবন উৎসর্গ করেন।" কিন্তু স্বামীজীর আশাপূর্ন হয়নি। লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত, লাঞ্ছিত নর

নারীর দুঃখ বেদনায় অধীর স্বামী বিবেকানন্দের মর্মস্পর্শী আবেদন কোন ভারতীয়কে নয়, বিদেশীনিকে সর্বস্ব ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

১৮৯৫ এর ১০ ই নভেম্বর রবিবার তারিখে ইংল্যান্ডের লন্ডনস্থিত একটি শৌখিন বসতি এলাকা চেলসির অদূরবর্তী পিয়লিকো অথবা দক্ষিন বেলগ্রাভিয়ার ৬৩ সেন্ট জর্জেস রোডে (বর্তমান নাম সেন্ট জর্জেস ড্রাইভ) লেডি ইসাবেল মার্গেসনের আমন্ত্রনে তাঁর বাড়ির বৈঠক খানার ঘরে স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল মিস এলিজাবেথ মার্গারেট নোবেলের। এই ঐতিহাসিক সাক্ষাত কেবলমাত্র একটি মানুষের সাথে আর একটি মানুষের নয় বরঞ্চ "একটি দেশের সঙ্গে আর একটি দেশের, একটি সভ্যতার সঙ্গে আর একটি সভ্যতার, একটি সংস্কৃতির সাথে আর একটি সংস্কৃতির, একটি ধর্মের সাথে আর একটি ধর্মের মিলন।" (সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, ভারতের স্বামীজিঃ স্বামীজীর ভারত)। এ যেন হিন্দু ধর্মের পৌত্তলিক বিশ্বাসের সঙ্গে অপৌত্তলিক খ্রীষ্টিয় প্রোটেস্টান্ট ধর্মের মহামিলন, এক আইরিশ জাতির কেল্টিক রক্তের সাথে ভারতীয় আর্য রক্তের মহাসমন্বয়। মাত্র দশ বছর বয়সেই মার্গারেট তার বাবার এক প্রোটেস্টান্ট ধর্মযাজক বন্ধুর কাছে দিব্য ভবিষ্যৎবাণী শুনেছিলেন যে ভারতবর্ষ একদিন মার্গারেটকে আকুল আহ্বান করবে। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে মার্গারেটকে ভারতে যেতে হবে। সেই থেকে নীরবে যেন মার্গারেট নিজেকে প্রস্তুত করে চলেছিলেন ভারতের বৃহৎ কর্মযজ্ঞে সামিল হতে। মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল যখন মাতৃগর্ভে আসেন তখন মা মেরী হ্যামিলটন (১৮৪৫-১৯০৯) ঈশ্বরের কাছে ভাবি সন্তানকে নিবেদন করে বলেছেন যে, তাঁর প্রথম সন্তান সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে জন্মগ্রহণ করলে তিনি সেই সন্তানকে ঈশ্বরের কাজে দেবেন। মার্গারেটের পিতা স্যামুয়েল নোব্‌ল (১৮৪৩-১৮৭৭),প্রোটেস্টান্ট চার্চের ধর্মযাজক ছিলেন। ধর্মপ্রাণ এই মানুষটি মৃত্যুর পূর্বে শেষ শয্যায় স্ত্রীকে ডেকে বলেছিলেন যে এলিজাবেথের জীবনে একদিন ঐশী আহ্বান আসবে। সেদিন যেন মেরী হ্যামিলটন মার্গারেটের ঐশী জীবনে পদক্ষেপ ফেলার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে না দাঁড়ান। যদিও মার্গারেটের সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাতের বিষয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। নিবেদিতা নিজে 'The master as I saw Him' গ্রন্থে বলেছেন স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত ১৮৯৪ এর নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি 'ওয়েস্ট এন্ডের' একটি ড্রয়িং রুমে হয়। নারীবাদী এবং উদারপন্থী লেডি ইসাবেল মার্জেসন কাগজের বিজ্ঞাপন থেকে জানতে পারেন প্রিন্সেপ হলের বিবেকানন্দের ভাষণ দানের সম্পর্কে। তিনি স্বামীজীর ভাষণ শুনে চমৎকৃত হয়ে তাঁকে

তাঁর নিজের বৈঠক খানায় ভাষণ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রন জানান। সেই সঙ্গে স্বল্প কয়েক জন বিশেষ পরিচিত মহিলাদের স্বামীজীর ভাষণ শুনতে আহ্বান করেছিলেন আর তাদের মধ্যে ছিলেন আঠারো বৎসর বয়সি মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল স্বামীজী দ্বিতীয় বারের জন্য লন্ডনে আসেন এবং লন্ডনের পিকাডিলির রয়্যাল ইনস্টিটিউট অফ পেন্টাসের গ্যালারিতে রাজযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, সর্বজনীন ধর্ম, ধর্মের প্রয়োজনীয়তা এবং আত্মার ধারণা সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। এই সময় থেকেই নিবেদিতা ক্রমাগত বলতে থাকেন যে তিনি ভারতবর্ষে আসতে চান এবং ভারতবর্ষের মানুষের জন্য কাজ করতে চান। নিবেদিতা ভারতে গিয়ে তাঁর কাজে আত্মনিয়োগ করতে আগ্রহী - সে সম্বন্ধে স্বামীজী সম্যকভাবে অবহিত ছিলেন, তাই ৭ই জুন(১৮৯৬) তারিখে তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্য মার্গারেটকে আবেগ ভরে একটি অসাধারণ চিঠি লিখেন যার মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন ভাবীকালের বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। চিঠিটি নিম্নরূপ...

'৬৩, সেন্ট জর্জেস রোড, লন্ডন, ৭ই জুন, ১৮৯৬

প্রিয় মিস নোব্‌ল,

আমার আদর্শকে বস্তুতঃ অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতে পারে - মানুষের কাছে তাহার অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রচার এবং জীবনের প্রতি কার্যে সেই দেবত্ব - বিকাশের পন্থা নির্ধারণ।

কুসংস্কারের নিগড়ে আবদ্ধ এই সংসার। যে উৎপীড়িত, সে পুরুষ হউক অথবা নারীই হউক, তাহাকে আমি করুণা করি; আর যে উৎপীড়ক সে আমার অধিকতর করুণার পাত্র।

এই একটা ধারণা আমার নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, সকল দুঃখের মূল অজ্ঞতা, আর কিছু নহে। জগৎকে আলোক দিবে কে? আত্মোৎসর্গই ছিল অতীতের নীতি, এবং হায়! যুগ যুগ ধরিয়া তাহাই চলিতে থাকবে। যাঁহারা জগতে সর্বাপেক্ষা সাহসী ও বরেণ্য, "বহু জনহিতায় বহুজনসুখায়" তাঁহাদের আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে। অনন্ত প্রেম ও করুণায় পূর্ণ শত শত বুদ্ধের আবির্ভাব প্রয়োজন।

জগতের ধর্মগুলি এখন প্রাণহীন ব্যঙ্গমাত্রে পর্যবসিত। জগৎ চায় চরিত্র। জগতে আজ সেইরূপ লোকেরই প্রয়োজন, যাহাদের জীবন প্রেম-প্রদীপ্ত, যাহারা সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য। সেই প্রেম প্রত্যেক বাক্যকে বজ্রের ন্যায় শক্তিশালী করিয়া তুলিবে। ইহা আর তোমার নিকট কুসংস্কার নহে নিশ্চিত। তোমার মধ্যে একটা জগৎ-আলোড়নকারী শক্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। আর ধীরে ধীরে আরও অনেক আসিবে। আমরা চাই সাহসপূর্ণ বাণী, আর তাহার অপেক্ষা অধিক সাহসিক কর্ম। হে মহাপ্রাণ; উঠ, জাগো! জগৎ যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতেছে, তোমার কি নিদ্রা সাজে? এস আমরা আহ্বান করিতে থাকি, যতক্ষণ পর্যন্ত নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত না হন, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরের দেবতা এই আহ্বানে সাড়া না দেন। জীবনে ইহা অপেক্ষা বড় আর কি আছে, ইহা অপেক্ষা আর কোন্ কাজ মহত্তর? আমার অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে বিস্তৃত কর্ম-পন্থা আসিয়া পড়িবে। আমি কোন পরিকল্পনা করি না। কার্যপ্রণালী আপনি গড়িয়া ওঠে ও কার্য সাধন করে। আমি শুধু বলি জাগো, জাগো। অনন্ত কালের জন্য আমার অফুরন্ত আশীর্বাদ।' (প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, ১৯৮৫। পৃ. ৩৯-৪০)

ইতি
শুভাশীর্বাদক
বিবেকানন্দ

স্বামীজীর আধ্যাত্ম চেতনায় এবং বেদান্ত দর্শনে প্রভাবিত হয়ে মার্গারেট নোব্‌ল স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বিবেকানন্দ নিজেও মার্গারেটের বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন, তিনি নিরন্তর নিবেদিতার হৃদয়ে আগুন জ্বালানোর জন্য অগ্নিগর্ভ বাণীর প্রয়োগ করতেন। যেমন একদিন কথা প্রসঙ্গে সামান্য উপলক্ষে স্বামীজী মার্গারেটের উদ্দেশ্যে বললেন,-- "স্বদেশের নারীগণের কল্যাণকল্পে আমার কতকগুলি সংকল্প আছে, আমার মনে হয় সেগুলিকে কার্যে পরিণত করতে তুমি বিশেষভাবে সাহায্য করতে পার।" (তদেব, পৃ. ৪০) নিবেদিতার সমস্ত সত্ত্বা জেগে উঠেছিল স্বামীজীর সেই বজ্রনির্ঘোষে উচ্চারিত আহ্বানে। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিবেদিতার ভিতরকার মহাপ্রাণ সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত বাধা বন্ধন উপেক্ষা করে ত্যাগ, প্রেম ও করুণার মূর্তিমান বিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দের নিকট আত্ম উৎসর্গের মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন।

স্বামীজী তাঁর এই ভবিষ্যতের কর্মপন্থার কথা তুলে ধরেছেন, কিন্তু কোথাও নিবেদিতাকে ভারতে এসে কাজ করার জন্য আহ্বান জানাননি। নিবেদিতা কিছুটা হতাশ হলেও মনে মনে স্থির করেই নিয়েছিলেন যে ভারতভূমিই তাঁর দ্বিতীয় জন্মভূমি অর্থাৎ কর্ম যজ্ঞের পীঠস্থান। ১৮৯৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বামীজী লন্ডন থেকে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন, ওদিকে ইংল্যান্ডে স্বামীজীর বেদান্ত ভাবনা প্রচারের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন নিবেদিতা। কিন্তু তিনি মনে প্রাণে চাইছিলেন ভারতে এসে স্বামীজীর কাজে আত্মনিয়োগ করতে। তাঁর সমস্ত চিন্তা, চেতনা, স্বপ্ন ও জাগরণ, বুদ্ধি ও সত্তা জুড়ে ছিল ভারতবর্ষ। স্বামীজীর কাছ থেকে যখনই কোন চিঠি পেতেন তখনই নিবেদিতার মনে আকাঙ্খা জেগে উঠত হয়তো স্বামীজী তাঁকে ভারতে আসার নির্দেশ দেবেন। ১৮৯৭ এর ২০শে জুন, ৪ঠা জুলাই এবং ২৩ শে জুলাই স্বামীজী মার্গারেটকে লন্ডনে থেকেই ভারতের জন্য কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। স্বামীজীর এহেন নিরাশ জনক আচরণের কারণ ছিল মার্গারেট ভারতের জলবায়ুতে কতখানি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবেন? এই ভাবনা ভারতের অজ্ঞতা, কুসংস্কার, সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করে ভারতের সেবায় তিনি অগ্রসর হতে পারবেন কিনা, এছাড়া ভারতীয়দের উপেক্ষা, ঘৃনা, এবং নির্মম সমালোচনা সহ্য করে একজন বিদেশীনির পক্ষে কাজ করার মতো প্রচন্ড মানসিক দৃঢ়তা এবং উদার প্রেমদৃষ্টি, শারীরিক সামর্থ্য প্রভৃতি রয়েছে কিনা তা যাচাই করে নিতেই স্বামীজীর কিছু কালবিলম্ব মার্গারেটকে ভারতে আসার নির্দেশ দিতে। কিন্তু স্বামীজীর সব পরীক্ষাতেই মার্গারেট কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। এই সময় বিশেষ ভাবে স্বামীজী অনুভব করেছিলেন যে ভারতের এই চরম দুর্দশার দিনে নারী শিক্ষার বিস্তার, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, এবং সর্বোপরি জনজাগরণের জন্য মার্গারেটের মতোই বহুবিধ গুন সম্পন্ন একজন নারীর প্রয়োজন। তাই ১৮৯৭ সালে ২৯ শে জুলাই স্বামীজী আবেগ ভরা বাক্যে নিবেদিতাকে লেখেন ভারতভূমিতে আসার জন্য।

এই চিঠির প্রত্যেকটি লাইন ছিল প্রচন্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনা ব্যাঞ্জক যা পড়ে মার্গারেট হলেন আরও শুদ্ধ, দৃঢ়, ইস্পাত, কঠিন। তাঁর ভিতরে জেগে উঠল এক ঘুমন্ত সিংহী। তিনি বুঝতে পারলেন ভারতবর্ষে তাঁকে কাজ করতে হবে অসংখ্য বাধা বিপত্তির মধ্যে-- কিন্তু তিনি তো প্রস্তুত ভারতের কাজে, দেশমাতৃকার কাজে, গুরুর কাজে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য এবং আত্মোৎসর্গের জন্য। এমনকি নিজের সবটুকু বিলিয়ে দেওয়ার জন্য। স্বামীজীরও মার্গারেটের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা জেগে ওঠে যা তাঁর লেখার মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়- “তোমাকে

অকপটভাবে বলিতেছি, এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, ভারতের সেবা কাজে তোমার অশেষ সাফল্য লাভ হইবে। ভারতের জন্য, বিশেষত নারী সমাজের জন্য, পুরুষ অপেক্ষা নারীর একজন প্রকৃত সিংহিনীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী নারীর জন্মদান করিতে পারিতেছে না, তাই অন্য জাতি হইতে তাহাকে ধার লইতে হইবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, দৃঢ়তা, অসীম প্রীতি, সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তই তোমাকে সর্বদা সেই উপযুক্ত নারী রূপে গঠন করিয়াছে। কিন্তু 'শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি'। এদেশের দুঃখ, কুসংস্কার, দাসত্ব প্রভৃতি কিদৃশ, তুমি ধারণা করিতে পারিবে না। এদেশে আসিবার পর তুমি নিজেকে অর্ধ উলঙ্গ অসংখ্য নরনারী পরিবেষ্টিত দেখিতে পাইবে। তাহাদের জাতি ও বর্ণ সম্বন্ধে বিকট ধারণা, তাহারা শ্বেতাঙ্গদিগকে ভয়েই হউক বা ঘৃনায় হউক এড়াইয়া চলে; এবং তাহারাও ইহাদিগকে তীব্র ঘৃনা করে। পক্ষান্তরে, শ্বেতাঙ্গরা তোমাকে ছিটগ্রস্ত মনে করিবে এবং তোমার প্রত্যেকটি গতিবিধি সন্দেহের চক্ষে দেখিবে।... যদি এসব সত্বেও তুমি কর্মে প্রবৃত্ত হইতে সাহস কর, তবে অবশ্যই তোমাকে শতবার স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি। কর্মে ঝাঁপ দিবার পূর্বে বিশেষভাবে চিন্তা করিও এবং কর্মান্তে যদি বিফল হও, কিংবা কখনও কর্মে বিরক্ত আসে, তবে আমার দিক হইতে নিশ্চিত জানিও যে, আমাকে আমরণ তোমার পাশেই পাইবে তা তুমি ভারতবর্ষের জন্য কাজ কর আর নাই কর, বেদান্ত ধর্ম ত্যাগই কর আর ধরিয়াই থাক, 'মরদ্‌কী বাত, হাথীকে দাঁত'। একবার বাহির হইলে আর ভিতরে যাওয়া যায় না। তোমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে। মিস মূলার কিংবা অন্য কাহারও কাছে আশ্রয় লইলে চলিবে না। অনন্ত ভালোবাসা জানিবে (২৯ শে জুলাই, ১৮৯৭)। নিবেদিতা এবার সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে মানসিক ভাবে প্রস্তুত হলেন ভারতভূমিতে আসার জন্য। নিবেদিতা তাঁর আত্মীয়-স্বজন, স্বদেশ, প্রতিষ্ঠা সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়ে প্রস্তুত ইংল্যান্ড ছাড়তে। প্রথম দিকে নিবেদিতার এই আত্মবলিদানের ভাবনা ছিল কেবল স্বামীজীর মুখ চেয়ে, অন্যদিকে স্বামীজী তখন পর্যন্ত মার্গারেট সম্পর্কে উদাসীন। আসলে স্বামীজী এমনই এক মানুষ ছিলেন যে কাউকে গ্রহণ করার আগে তাঁকে সনাক্তকরণ করে তাঁকে চিনে নিতেন। কিন্তু নিবেদিতার গভীর ভালোবাসা এবং গুরুর প্রতি অগাধ ভক্তি অনায়াসেই স্বামীজীর মন জয় করে নেয়। মানসিক দোলাচল যতই কঠিন হোক না কেন মার্গারেট তাঁর নিজের সেবাকার্যে নিজেকে উৎসর্গ করার চিন্তায় ছিলেন অটল। তিনি পরে উপলব্ধি করেছেন যে এই মহৎ সেবা কার্য কেবল কোন ব্যক্তিগত মধুর সম্পর্কের উপর নির্ভর

করে সম্ভব নয়। কারো প্রীতির জন্য কিছু করা আনন্দদায়ক, কিন্তু কোন শ্রেষ্ঠ আদর্শ কোন ব্যক্তি বিশেষে প্রীতির থেকে অনেক বড়। বিবেকানন্দের ইচ্ছাও ছিল অনুরূপ – নিবেদিতা যেন ব্যক্তিত্বেই আবদ্ধ না থাকেন - ব্যক্তির উর্ধে যে অনন্ত সত্তা, সকল দৃষ্ট বস্তু যার অতি তুচ্ছ ও বিকৃত বহিঃপ্রকাশ মাত্র, সে অনির্বচণীয় সত্তার বিমল জ্যোতিকে নিবেদিতার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হউক এই ছিল স্বামীজীর অভিপ্রায়। এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা সহজ ছিল না, কিন্তু যতই নিবেদিতার নিকট গুরু শিষ্যের প্রকৃত সম্পর্ক পরিস্ফুট হয়েছে ততই ঘাত প্রতিঘাতের অবসান হয়ে তাঁর হৃদয় মধুর স্নিগ্ধ রসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

১.১.১৬ বিংশ শতাব্দীতে নারী মুক্তির দুই পথিকৃৎঃ ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়া

ভগিনী নিবেদিতা একজন অ্যাংলো আইরিশ বংশোদ্ভুত সমাজকর্মী, লেখিকা এবং স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা হিসেবে বেশি পরিচিত। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর থেকে তিনি মনস্থির করেন ভারতকে তাঁর কর্মক্ষেত্র হিসাবে মেনে নিতে। ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ নভেম্বর তিনি কলকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর সঙ্গে তিনি নানা ধরনের কল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। সকল বর্ণের ভারতীয় নারীর জীবন যাত্রার উন্নতির লক্ষ্যে তিনি কাজ শুরু করেন। স্বনামধন্য ভারতীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশ চন্দ্র বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছিলেন নিবেদিতার বন্ধু স্থানীয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে 'লোকমাতা' আখ্যা দিয়েছিলেন।

অপরদিকে বেগম রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেন ৯ ই ডিসেম্বর ১৮৮০ সালে। তিনি একজন বাঙালী নারীবাদী, লেখিকা, মহিলা শিক্ষাবিদ এবং রাজনৈতিক কর্মী। তিনি দক্ষিন এশিয়ার নারী মুক্তির জন্য কাজ করেন এবং নারী পুরুষ উভয় শ্রেণির সাম্যতার কথা বলেছেন। নারী ও পুরুষ উভয় জাতির মধ্যে যে ভেদ বা পার্থক্য রয়েছে তার কারণ হিসাবে তিনি নারী জাতির অশিক্ষাকেই দায়ী করেছেন। তিনি দাবী করেন যে, আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে নারী জাতি পিছিয়ে বলেই সামাজিক ক্ষেত্রে অবহেলিত, আবার আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার কারণ শিক্ষার অভাব। বেগম রোকেয়া তাঁর 'মতিচূর' গ্রন্থে বলেছেন যে সভ্যতার আদিলগ্নে কোন এক অজানা কারণে মানব জাতির এক অংশ (পুরুষ) ক্রমে নানা বিষয়ে উন্নতি করতে থাকে। অপর এক অংশ (নারী) সঙ্গে সঙ্গে সেরূপ

উন্নতি করতে না পেরে পুরুষের সহচরী বা সহধর্মিনী না হয়ে দাসী হয়ে গেল। তিনি আরো যোগ করেন যে স্ত্রী জাতি বহুকাল ধরে দাসীপনা করতে করতে দাসত্বে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। 'মতিচূর' গ্রন্থের প্রথম খন্ডে রোকেয়া আলোচনা করেছেন 'স্ত্রী'জাতির অবনতি এবং অর্ধাঙ্গিনী হিসাবে কিভাবে নিজেদেরকে সর্বদা পুরুষ জাতির থেকে দুর্বল মনে করত। এইভাবে মানসিক স্তরে একপ্রকার নিম্নবর্গীয় প্রাণী হিসাবে সমাজের কাছে বিবেচিত যা কম বেশি আজও সমাজের সর্বস্তরে বিরাজমান। রোকেয়া সেই নারী জাতির হারিয়ে যাওয়া মর্যাদা, সম্মান ও গৌরব পুনরায় ফিরিয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন। যা পরবর্তী সময়ে সমান তালে সরকারের দ্বারা বা সমাজের বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা খুব একটা উৎসাহ পায়নি। সেই কারণেই আজও রোকেয়ার ভাবাদর্শ ও নারী জাতির উন্নতির প্রয়োজনীয়তা আলোচনা ও গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

১.১.১৭ ভগিনী নিবেদিতার ভাবাদর্শঃ

"হে মহাপ্রান, ওঠো জাগো, জগৎ যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতেছে, তোমার কি নিদ্রা সাজে? এস আমরা আহ্বান করিতে থাকি, যতক্ষণ পর্যন্ত নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত না হন, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরের দেবতা এই আহ্বানে সাড়া না দেন। জীবনে ইহা অপেক্ষা বড় আর কী আছে, ইহা অপেক্ষা আর কোন কাজ মহত্তর।... আমি শুধু বলি জাগো, জাগো.."। (মিস মার্গারেট নোব্‌লকে ৭জুন ১৮৯৬ লন্ডন থেকে স্বামীজী যে চিঠি লেখেন তাঁর অংশবিশেষ) (প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, ১৯৮৫। পৃ. ৩৯-৪০)

এই সংসার কুসংস্কারে আবদ্ধ। সকল রকম দুঃখের মূলে অজ্ঞতা, আর কিছু নয়। জগতকে আলো দেবে কে? আত্ম উৎসর্গই ছিল অতীতের নীতি, যুগ যুগ ধরে তাই চলতে থাকবে। যাঁহারা জগতে সর্বাপেক্ষা সাহসী তাঁদেরই আত্মোৎসর্গ করতে হবে। "হে মহাপ্রান, জাগো! জগৎ যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতেছে, তোমার কি নিদ্রা সাজে?" (তদেব) ধর্মের নামে, মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের নামে সমগ্র বিশ্বের মানুষের কল্যাণ কামনায় স্বামীজীর সেই উদাত্ত আহ্বান নিবেদিতার সমগ্র চিত্তকে নাড়িয়ে দিল। স্বামীজী এই চিঠিটি লিখেছিলেন লন্ডন থেকে ৭ জুন ১৮৯৬ আয়ারল্যান্ড দুহিতা মিস্ মার্গারেট নোব্‌লকে। মার্গারেট চিঠিটি পড়ে স্তব্ধ, অভিভূত। ত্যাগ- প্রেম - করুণায়

পরিপূর্ণ মার্গারেটের মন, সমস্তরকম ব্যক্তিগত বাধাবন্ধনকে উপেক্ষা করে মনস্থির করলেন- ভারত ভুমিতে আসার জন্য।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুনের পত্রে স্বামীজী আবেগ ভরে মার্গারেটের যে অন্তরদেবতাকে আহ্বান করে ছিলেন, ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ শে জুলাই সেই জাগ্রত অন্তরদেবতাকেই তিনি স্বাগত জানালেন। ২৯ শে জুলাই এর পত্র ৭ই জুনের পত্রের পরিণতি।

"... তোমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে, মিস মূলার কিংবা অন্য কাহারও আশ্রয় লইলে চলিবে না"।
"... যদি এসব সত্ত্বেও তুমি কর্মে প্রবৃত্ত হইতে সাহস কর, তবে অবশ্য তোমাকে শতবার স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি"।
"...আমি আমরণ তোমাকে সাহায্য করিব...| "মরদ্‌কী বাত হাথীকে দাঁত" - একবার বাহির হইলে আর ভিতরে যাওয়া যায় না"|

"...অনন্ত ভালোবাসা জানিবে" (২৯ শে জুলাই, ১৮৯৭)।(তদেব, পৃ. ৫১)

নিবেদিতাকে ভারতে আহ্বান জানিয়েই নিজের দায়িত্ব শেষ করলেন না স্বামীজী| স্বামীজী মিস নোবল্‌কে পরিচিত করানোর কাজ শুরু করে দিলেন — ১৯ আগস্ট ১৮৯৭ মিসেস ওলি বুলকে লেখেন, "মিস মার্গারেট নোব্‌ল নামে এক ইংরেজ তরুণী ভারতে আসতে এবং এখানকার অবস্থা জানতে খুবই আগ্রহী, যাতে সে ইংলন্ডে ফিরে গিয়ে ভারতের জন্য কিছু কাজ করতে পারে"| ১৮৯৮ সালের ২৮ শে জানুয়ারী স্বামীজীর আহ্বানে মিস্‌ মার্গারেট নোব্‌ল ভারতবর্ষে এলেন। কলকাতার খিদিরপুর জেটিতে তিনি জাহাজ থেকে নামলেন। প্রথম কিছুদিন কলকাতার চৌরঙ্গীর ইংরেজ পল্লীতে থেকে স্বামীজীর ব্যবস্থাপনায় এলেন বাগবাজার পল্লীর ১৬ নং বোসপাড়া লেনে। মায়ের নিবিড় সান্নিধ্যলাভ এবং প্রাচ্য ভাব সমূহ আত্মীকরণের জন্য নিবেদিতা বাগবাজারে ১০/২ বোসপাড়া লেনে প্রথম ৮-১০ দিন থাকলেন - স্বামীজীর অভিপ্রায় অনুযায়ী| নিবেদিতা শ্রীমায়ের, মাতৃস্নেহে আবদ্ধ - হতে থাকলেন এবং মায়ের কর্মসমূহ লক্ষ্য করতে থাকলেন। সারদা মা এবং নিবেদিতা দুজন-দুজনকে গভীরভাবে ভালোবাসেন এবং দুজনেই ছিলেন বুদ্ধিমতী। দুজনের মধ্যে ভাবের বিনিময়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতো ভাষা তাই নিবেদিতা বাঙালা ভাষা শেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লেন, কারণ ভাষা ছাড়া তিনি মায়ের সাথে কথা বলতে

পারবেন না। নিবেদিতা অত্যন্ত যত্নসহকারে থেমে থেমে বাংলা ভাষা বলতেন - তা ছিল সাধু বাংলা। শঙ্করী প্রসাদ বসু লিখেছেন- "নিবেদিতার বাংলা শুনে [শ্রীমা] খুব হাসতেন; বলতেন, ও বাংলা বেদের সময়ের, নিবেদিতা সাধু বাংলা বলতেন, অত্যন্ত থেমে থেমে যত্ন করে। সিস্টার ক্রিস্টিন অনেক দ্রুত বলতে পারতেন| চলতি[চলিত] ভঙ্গীতে। তবে শ্রীমা সকলের কথা বুঝতে পেরেই খুশী"। ('নিবেদিতা লোকমাতা', প্রথম খণ্ড, প্রথম পর্ব, পৃ. ২৬৭) ২৮ এপ্রিল ১৮৯৮ স্বামী স্বরুপানন্দের নিকট থেকে নিবেদিতার বাংলা শিক্ষা শুরু হয়। (প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, ২০০৫। পৃ. ৮৬) খুব দ্রুত নিবেদিতা বাংলা ভাষা আয়ত্ত করেন। তাঁর বাংলা শেখার উদ্দেশ্য দুটি ছিল - শ্রীমার কথা ঠিকমত ভাবে অনুধাবন করা এবং স্কুলের ছাত্রীদের সঙ্গে সহজ ভাবে কথা বলা।

বিবেকানন্দ মনে করতেন - 'নারী ও জনগনের' উন্নতির উপরই ভারতের উন্নতি নির্ভরশীল; এবং শিক্ষার দ্বারা সেই উন্নতি সাধন সম্ভবপর, স্বামীজী তাই নিবেদিতাকে আহ্বান করলেন ভারতে নারী শিক্ষার কাজে। (শঙ্করী প্রসাদ বসু, নিবেদিতা লোকমাতা, দ্বিতীয় খণ্ড। পৃ. ৬)।

কারণ প্রথম পরিচয়ের সময়েই স্বামীজী বুঝেছিলেন যে, নিবেদিতা একজন দক্ষ কর্মী, বুদ্ধিমতী, শিক্ষাব্রতী এবং শিক্ষাতাত্ত্বিক। নিবেদিতার এই পরিচয়কে গুরুত্ব দিয়ে এস. কে র‍্যাটক্লিফ লিখেছেন- "নিবেদিতা ফ্রয়েবেলের শিক্ষানীতির ঘনিষ্ট অনুশীলনকারী। তাঁর শিক্ষকদের একজন ছিলেন পেস্তালৎসির শিক্ষাতত্ত্বের সর্বাধিক মৌলিক এক ইংরেজ অনুগামী"। এই শিক্ষানীতি নিবেদিতা কিভাবে তাঁর স্কুলে বাস্তবরূপ দিয়েছিলেন তাও র‍্যাটক্লিফ জানিয়েছেন। (তদেব)।

শিক্ষা সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে নিবেদিতা যা সব লিখেছেন তাকে একত্রিত করে তাঁর দেহরক্ষার পর একটি বই বের হয় 'Hints on Education'। মর্ডান রিভিউ তাঁর শিক্ষাচিন্তার শ্রেষ্ঠত্বের সম্পর্কে লেখে (আগস্ট ১৯১৫), "অন্য সকল বিষয় অপেক্ষা যে - জিনিসটি ভগিনী নিবেদিতার একেবারে প্রাণের জিনিস, সেটি নিঃসন্দেহে ভারতীয় গনের শিক্ষা। ... আমাদের বিশ্বাস, গোখলে প্রমুখের প্রচেষ্টার ফলে বর্তমান ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক মানুষ শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন সম্বন্ধে অবহিত, কিন্তু খুব অল্পসংখ্যক মানুষই শিক্ষার রূপ কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে অবহিত। নিবেদিতা আমাদের নিখুঁত শিক্ষার বিষয়ে মূল্যবান ধারণা দান করেছেন।" (তদেব)।

নিবেদিতার শিক্ষাচিন্তা পূর্ণতায় পৌঁছানো প্রসঙ্গে 'বেঙ্গলী' পত্রিকা (২৪ মার্চ ১৯১২ সংখ্যা) লিখেছিল – "পাশ্চাত্যে তাঁর জন্ম, ভারতে কর্মজীবন ও মৃত্যু – ইনি পৃথিবীকে দুই দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। ভারতের সুন্দর সুকুমার নারী আদর্শের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন ইউরোপীয় ঐতিহ্যপ্রাপ্ত সুদৃঢ় মনস্বিতা এবং দৃষ্টি ভঙ্গির আধুনিকতা"।

আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিন্তু প্রাচীন কালের মৌনতা, মাধুর্য, নিষ্ঠা, ধর্মভাব বিসর্জন দিয়ে নয়। যে শিক্ষা বর্তমান কালের প্রত্যেক নারীকে একাধারে ভারতের অতীত কালের সকল নারীর শ্রেষ্ঠত্ব বিকাশে সহায়তা করতে সমর্থ, তাই হবে আদর্শ শিক্ষা।

ড. যদুনাথ সরকারের লেখায় দেখা যায় শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে নিবেদিতার হৃদয়ের ব্যাকুলতা এবং যন্ত্রণাদায়ক আকুতি। তিনি লিখেছেন – "নিবেদিতা বলতেন, শিক্ষা! আ –হা ! সেই হল ভারতের সমস্যা। কিভাবে ভারতে খাঁটি শিক্ষা, জাতীয় ধারায় শিক্ষা দিতে হবে; কিভাবে তাদের পুরো মানুষ করে তুলতে হবে, ভারতবর্ষের খাঁটি সন্তান করে তুলতে হবে – ইউরোপের বাজে নকল নয় – সেই - হল সমস্যা। তোমাদের শিক্ষা হবে যতখানি মস্তিষ্কের, সেই পরিমান হৃদয়ের এবং সত্ত্বার। তা হবে জীবন্ত যোগসূত্র - তোমাদের সঙ্গে অতীতের এবং আধুনিক পৃথিবীর।" (তদেব, পৃ. ৬-৭)

১৮৯৮ সালের ২৮ শে জানুয়ারী নিবেদিতা ভারতে আসেন নারী শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য কারণ স্বামীজী চাইতেন নারীদেরকে শিক্ষা দিতে হবে আর তাই নিবেদিতা যেহেতু স্বামীজীকে তাঁর গুরু, আচার্য্য, পিতা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন তাই তিনি ওই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ১৯৩০ সালের ১৩ই জানুয়ারী স্বামীজীকে লিখেছেন নিবেদিতা, ..."আগে ভাবতাম, আমি ভারতের নারীদের জন্য কাজ করতে চাই; এই ধরনের নানা সুমহান নৈর্ব্যক্তিক ভাবরাজি পূর্ণ থাকত মস্তিষ্কে, কিন্তু ক্রমেই নিশ্চিত ভাবে সেই উচ্চ শিখর থেকে নেমে এসেছি; আজ আমি যদি কিছু করতে চাই, তার একমাত্র কারণ - আমার পিতার ইচ্ছা তাই...।"

২২শে সেপ্টেম্বর ১৯০০ তারিখে লেখা তাঁর চিঠিতে স্বামীজী নিবেদিতাকে আশীর্বাদ করেছিলেন,

'ভারতের ভবিষ্যৎ সন্তানের তরে
তুমি হও বন্ধু, দাসী, গুরু – একাধারে'।

স্বামীজীর সঙ্কল্পিত যে ব্রত তা নিবেদিতা উদ্‌যাপন করতে প্রাণপাত করেছিলেন কারণ এর ফলেই ভারতের কল্যাণ সম্ভব। নিবেদিতার ত্যাগ ও সেবা ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ।

নিবেদিতা যখন ভারতে আসেন তখন তাঁর দুই পাশে ছিলেন দুই মহামানব, স্বামী বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বামীজীর কাছ থেকে তিনি শিখেছিলেন 'শিক্ষা হল অন্তর্নিহিত পূর্নত্বের বিকাশ'। আর রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন 'ব্রহ্মলাভের দ্বারা মনুষ্যত্ব অর্জনই শিক্ষা'। ভগিনী নিবেদিতা এই দুই মহামানবের,সাহচর্যে এসেও তাঁর নিজস্বতা বজায় রেখেছিলেন, তাই তিনি বলেছিলেন- "শিক্ষার মাধ্যমে ভিতরের জাগ্রত শক্তিকে জাতীয় জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে ব্যক্তিগত জীবনকে জাতীয় জীবনের কাছে বলিদান করাই শিক্ষা। জাতিনৈপুণ্য আর ব্যক্তিগত ক্ষমতা হিসেবে মানুষের ভিতরে যা আছে তাকে জাগিয়ে তোলাই শিক্ষা। এই ভাবেই গড়ে ওঠে উচ্চ জাতীয়তাবোধ। জাতির বৈশিষ্ট্যগুলি শিক্ষার্থীর দেহে-মনে-প্রাণে ফুটে ওঠে। দেশ জাগে, দেশ এগিয়ে চলে, অসীম শক্তির উপর নির্ভর করে প্রতিটি জীবন জেগে ওঠে। এরফলে ছাত্র ছাত্রীরা বিদেশী ভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়।" (স্বামী সুপর্ণানন্দ, ২০১৭, পৃ. ৪৯০) নিবেদিতা বুঝেছিলেন, শিক্ষক হতে গেলে দেশ ও জাতির ঐতিহ্যকে বুঝতে হবে, ঐতিহ্যের পাঠ নিতে হবে -তবেই ঐতিহ্যের পাঠদান সম্ভব। কারণ ঐতিহ্যের মধ্যেই তো ভবিষ্যতের প্রয়োজনকে খুঁজতে হবে। এভাবেই তিনি ভারতীয়দের চেয়েও ভারতীয় হয়ে আমাদের ভারততত্ত্ব শিখিয়েছেন, তাঁর ছাত্রীদের শিখিয়েছেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই নভেম্বর স্বামীজীর ইচ্ছায় বাগবাজারে বোসপাড়া লেনে নিবেদিতা মেয়েদের জাতীয় আদর্শে শিক্ষা দেবার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। প্রধানত ক্রিস্টিন ও সুধীরা দেবী ছিলেন স্কুলের শিক্ষিকা। লাবন্যপ্রভা বসু ও আরও কেউ কেউ আসতেন এই কাজে সহায়তা করার জন্য। স্কুলটি ধীরে ধীরে বড় হতে লাগল। নিবেদিতা কখনও কখনও ছাত্রীদের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে নিয়ে যেতেন বেড়াতে এবং এভাবে তিনি শিক্ষা দান করতেন। স্কুলের খরচ চালানোর জন্য তিনি বই ও পত্র পত্রিকায় লেখালেখি করতেন এবং বক্তৃতা দানের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতেন, যে টুকু অর্থ উপার্জন হত পুরোটাই থাকত স্কুলের জন্য। স্কুলটির নামেরও পরিবর্তন হয়। প্রথমে নাম ছিল 'রামকৃষ্ণ স্কুল ফর গার্লস'। পাশ্চাত্য বন্ধুরা নাম দিয়েছিলেন 'বিবেকানন্দ স্কুল'। স্থানীয় লোকেরা বলত 'নিবেদিতার স্কুল'। ১৯১৮ সালে রামকৃষ্ণ

মিশন এই স্কুলটির দায়িত্ব নেওয়ার পর নাম হয় ‘রামকৃষ্ণ মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল’। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে স্কুলটির দায়িত্ব নেয় রামকৃষ্ণ সারদা মিশন। তখন নাম হয় ‘রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল’ | সরকারের বিরোধিতা সত্ত্বেও স্কুলে প্রার্থনার সময় ‘বন্দে মাতরম্’ গান করাতেন। বাচ্চাদেরও তিনি এই রকম শিক্ষা দিতেন। প্রতিটি ছাত্রীর রিপোর্ট তিনি নিজেই তৈরি করতেন। তাতে শিক্ষার্থীর পরিবার, পারিপার্শ্বিক অবস্থা সব কিছুরই উল্লেখ থাকত। পাড়ার সকলের সাথে তিনি মিশতেন। কখনও তিনি শিক্ষয়িত্রী, কখনও স্নেহময়ী জননী, কখনও বা একনিষ্ঠ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কর্মী, কখনও ছাত্রী, কখনও সেবিকা, আবার কখনও গভীর আধ্যাত্মিকতায় নিমগ্না, প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি অনন্যা, অসাধারণ। তিনি শিক্ষার্থীদের শেখাতেন দেশকে ভালোবাসতে। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রতিটি মানুষের মধ্যে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে যদি ‘আমার ভারত’ এই বোধ জাগ্রত হয় তবে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা আসতে বাধ্য। তিনি বিশ্বাস করতেন ভালোবেসে যে কোন কাজ করলে, একদিন না একদিন সেই কাজে পূর্ণতা আসবেই। সমাজের উন্নতির মূল কেন্দ্রবিন্দু হলেন ‘মা’, কারণ নারীজাতি সমাজের মা। মায়ের জ্ঞানের আলোকেই শিশু বেড়ে ওঠে, ভবিষ্যতে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

নিবেদিতা বীরাঙ্গনার ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়ে মেয়েদের পূর্ণমাত্রায় প্রস্ফুটিত করলেন দেশ ও দশের কল্যাণকল্পে। নিবেদিতার কথায়- “নারীকে নিঃসন্দেহে সকল কার্যে নিপুণ হতে হবে। এই ভাবে যে কোন অবস্থায় সমান দক্ষতা লাভ, পত্নীত্বের পূর্বে নারীত্ব এবং নারীত্বের পূর্বে মানবত্বে আরুঢ় হওয়ার বৈশিষ্ট্য অর্জন- প্রত্যেক যুগে নারীশিক্ষার লক্ষ্য বলে গণ্য হওয়া উচিত।” (ভারতবাণী, শ্রীসারদা মঠ, ১৯৯৯, পৃ. ২২)

রবীন্দ্রনাথ বলছেন - “আমরা সকল নিয়ে বসে আছি... গোপন ভালোবাসায়”। নিবেদিতা তাঁর গোপন ভালোবাসাকে নিঃশব্দে ঢেলে দিয়েছিলেন ভারতমাতার রাঙা চরণে। তাই মাতৃস্নেহে ভালোবেসে জীবন্ত শিব সেবার আদর্শ নিয়ে ছাত্রীদের জীবনকে উন্নত আদর্শে এবং বাস্তবমুখী শিক্ষায় গড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের লোকমাতা নিবেদিতা। নিবেদিতা হয়ে ওঠেছিলেন আদর্শ শিক্ষয়িত্রী। পরিশেষে প্রব্রাজিকা সত্যব্রতপ্রাণার উক্তিটি না বললেই নয়, তা হল – “এই যে ভারত এখন একবিংশ শতাব্দীর চওড়া সিঁড়িটিতে দাঁড়িয়ে ইঙ্গিত করছে একটু একটু করে সেই শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী সুফলটিকে- তার বীজটি কিন্তু নিবেদিতা বোসপাড়ার কানাগলির স্কুল বাড়িতে ছোট্ট

ছোট্ট মেয়েগুলির অপরিণত কোমল মনে অতি সতর্ক ভাবে রোপন করেছিলেন। আমরা নারীজাতি তাদেরই উত্তরসূরী, কিন্তু কি নির্বিকার উপেক্ষার ইতিহাস! এমনকি এই একবিংশ শতাব্দীতেও পুরুষের অধিকার সমাজের তলায় তলায় প্রচ্ছন্ন থাকলেও কয়েকটি ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া বেশ অনেকাংশেই নির্লজ্জের মতো প্রকট হয়ে উঠে। নারীর ঊর্ধ্বতনের ইতিহাসের খোঁজে পায়ে পায়ে ঠিক পৌঁছে যেতে হবেই ১৬ নম্বর বোস পাড়া লেন, বাগবাজারের দরজায়-- যেখানে ঘটেছিল নারীচৈতন্যের অন্তঃপ্লাবী বিপ্লব। আর ঐ একচিলতে বারান্দায়, ছোট্ট ছোট্ট ঘরে, একটু খানি আকাশ উঠোনে জলপ্রপাতের মতো আছড়ে পড়েছিল ব্রত পালনের শক্তি" । (প্রব্রাজিকা সত্যপ্রানা, পৃ. ৪৮৪ - ৪৮৫)।

নিবেদিতাকে ভারতে আহ্বান জানিয়েছিলেন স্বামীজী নারী শিক্ষা ও নারী জাগরণের প্রসার ঘটানোর জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভগিনী নিবেদিতা, স্বামীজীর আশানুরূপ হয়ে উঠেছিলেন ভারতবাসির ভগিনী, সেবিকা, মাতা এবং বান্ধবী হয়ে - এখানেই নিবেদিতার নিবেদিতা হয়ে ওঠার সার্থকতা।

স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভগিনী নিবেদিতা যে বঙ্গনারীর তথা ভারত নারীর কথা বলেছেন তাতে আলাদা করে হিন্দু- মুসলমান, খ্রিস্টান নারীর কথা বলা হচ্ছে না। সেখানে সমস্ত মহিলার কথা বলা হয়েছে। এর প্রমাণ পাই আমরা ৪ ঠা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত প্রত্যেক বক্তৃতার বিষয় বস্তুতে – 'আজিকার সমস্যা', 'শিক্ষা', 'বুদ্ধগয়া ও হিন্দু ধর্মে ইহার স্থান', 'ভারতে মুসলমান', 'প্রকৃত গুরুভক্তি' ও 'হিন্দু মুসলমানের মিলন'। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি বুঝেছিলেন জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসি এক না হলে দেশ কখনও শক্তিশালী হতে পারে না।

ব্রিটিশ ভারতে নারী শিক্ষা এবং নারীজাগরণ ঊনবিংশ শতক থেকেই ধীরে ধীরে এগিয়েছে। মুসলমান নারীদের ও শিক্ষার সূচনা হয় ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। মুসলমান সমাজ থেকে বহু মানব হিতৈষী নারী ও পুরুষ অনুধাবন করতে শুরু করেন নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা। হিন্দু সমাজের কোন কোন এগিয়ে থাকা ব্যক্তির ন্যায় মুসলমান সমাজেও বহু নারী এবং পুরুষ অন্তঃপুরবাসিনীদের শিক্ষাদান কার্যে এগিয়ে আসেন।

১.১.১৮ বেগম রোকেয়া পূর্ববর্তী বাংলায় নারী শিক্ষার প্রেক্ষাপটঃ

নিবেদিতা কলকাতায় বঙ্গনারীদের কে শিক্ষিত করে তোলার জন্য যখন লড়াই করেছিলেন তখন বঙ্গদেশে কিছু মুসলমানরাও নারীদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হন। মহম্মদ গজনী যখন ভারতবর্ষের সম্পদকে লুণ্ঠন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভারতবর্ষকে আক্রমণ করেছিলেন তখন থেকেই ভারতে মুসলমানরা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে কতুবুদ্দিন আইবক স্থায়ীভাবে ভারতে প্রশাসন পরিচালনা ও সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজে মনোনিবেশ করেন। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে কতুবুদ্দিন আইবকের সময়কালে ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন ও প্রসার ঘটে। মোঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবস্থান এবং ইসলামের প্রসার চূড়ান্ত রূপ পায়। মধ্যযুগে মুসলমান মেয়েরা জনশিক্ষার অঙ্গ ছিলেন না, কারণ বৃহত্তর মুসলমান সমাজে ওই যুগে নারী ছিলেন ব্রাত্য এবং অপাংক্তেয়। ব্রিটিশ সরকার ভারতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে পুরুষের শিক্ষার হার ছিল ১২% এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে এই হার ছিল ০.৫%। মুসলমান রাজত্বকালে ভারতবর্ষে চিরাচরিত টোল এবং চতুষ্পাঠী ভিত্তিক সংস্কৃত শিক্ষা ভেঙে পড়তে থাকে, এবং আরবি-ফারসি ভিত্তিক ইসলামি শিক্ষার বাড়বাড়ন্ত হতে থাকে মক্তব এবং মাদ্রাসার মধ্য দিয়ে। মক্তব স্তরে অর্থাৎ প্রাথমিক স্তরে ছেলেদের তুলনায় অধিক সংখ্যক মেয়ে লেখাপড়া করলেও মাদ্রাসা বা মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে মেয়েদের সংখ্যা ছেলেদের তুলনায় কম থাকতো। মেয়েদের পক্ষে ধর্মশিক্ষা ছিল অবশ্য প্রয়োজনীয়। মুসলমান পুরুষদের তুলনায় মুসলমান নারীদের স্বাক্ষরতার হার ছিল বেশি - ৩৫% (শিরিন মুসভি, ২০১৪)। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে বাংলার মুসলমান সমাজে আধুনিকতার সূচনা হয় এবং কোন কোন মুসলমান পুরুষ বুঝতে শুরু করেন যে, নারী শিক্ষা এবং নারী জাগরণ ছাড়া মুসলমান সমাজের পরিবর্তন সম্ভব নয়। ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকেই মুসলমান মেয়েরা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক প্রথাগত শিক্ষায় প্রবেশ করতে শুরু করেন কারণ তাঁরা বুঝতে পারেন যে, নারীমুক্তি এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য প্রয়োজন মেয়েদের শিক্ষা।

Gile and Smoke (1977) এর কথায়, "Education for women has both microscopic and macroscopic implications, that is, education may transform the attitude and self-image of the individual women." এ সম্বন্ধে Boulding (1977) এর উক্তিটি হল, "When you educate a male

you invest only in one person when you educate a female you invest not only in that one person, but all the children she will bear.” সুতরাং দেরিতে হলেও শিক্ষিত মুসলমানরা বুঝতে সমর্থ হয়েছিলেন যে মেয়েরা শিক্ষিতা হলে সংসারের বিভিন্ন কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজেই মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ সুযোগ ছিল না। ইংরেজ শাসনকালে রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেন প্রমুখদের চেষ্টায় হিন্দু সমাজে নারী শিক্ষার কিছুটা অগ্রগতি ঘটলেও মুসলমান সমাজে তখনও পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে বিশেষ কোন ইতিবাচক ভাবনা গ্রহণ করা হয়নি। (আব্দুল লতিফ, ‘Mohamedan Education in Bengal’)। মেয়েদের প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক শিক্ষার বিরোধীতা করেছেন কলকাতা মাদ্রাসার মৌলবী আব্দুল হাকিম। কারণ হিসেবে আব্দুল হাকিম বলেছেন যে, মেয়েদের পর্দানসীন রাখতে হবে এবং ধর্মীয় আচরণ বিধি মানতে হবে। স্যার সৈয়দ আহমেদ খাঁ নিজেও মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার বিরোধীতা করেছেন (গ্রাহাম, ১৯০৯)। তাঁর মত ছিল মুসলমান মেয়েদের আর্থ সামাজিক অবস্থা তাদের শিক্ষার অনুকুল নয়। কিন্তু ইসলাম ধর্ম মেয়েদের শিক্ষার অধিকার দিয়েছে। উপার্জন করে সমাজের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেও তাদের উপর কোন বিধিনিষেধ নেই। এমনকি উপার্জিত অর্থ নিজের ইচ্ছামত খরচ করতে পারে, ব্যবসায় লাগাতে পারে বা কোন দুঃস্থ আত্মীয়কে সাহায্য করতে পারে। হজরত মহম্মদ মহিলাদেরকে সব ধরনের আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা এবং ভূমিকা পালনে পুরুষের সঙ্গে নিখুঁতভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন (সফীউন্নেসা, ১৪২৯, পৃ. ১৬৮ - ১৬৯)।

১৮৮৪ সালে ‘সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান’ এর পক্ষ থেকে লর্ড রিপনের কাছে মুসলমানদের শিক্ষার বিষয়ে যে দাবী পেশ করা হয় তাতে মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে কোন বক্তব্য ছিল না অর্থাৎ লর্ড রিপনের কাছে মুসলমানদের শিক্ষা বিষয়ে যে বক্তব্য পেশ করা হয়েছিল তাতে আব্দুল লতিফ, মৌলবী আব্দুল হাকিম, স্যার সৈয়দ আহমেদ খাঁ প্রমুখদের নারী শিক্ষা বিষয়ে মতের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শিক্ষিত এবং চিন্তাশীল কোন কোন মুসলমান তাঁদের মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন ফলে ১৮৯৭ সালে কলকাতায় মুসলমান মেয়েদের জন্য স্কুল খোলা হয় (মুসলিম গার্লস স্কুল, জানুয়ারী ১৭, ১৮৯৭)। ১৯০৩ সালে ‘বঙ্গীয় প্রাদেশীক মুসলমান শিক্ষা সমিতি’-র পক্ষ

থেকে সৈয়দ ওয়াজেদ হোসেন মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার পক্ষে জোরালো বক্তব্য প্রকাশ করেন এবং ঐ সভায় মিরজা সুজাত আলী বেগ, মেসেরুদ্দিন আহমেদ প্রমুখ শিক্ষিত মুসলমানরা মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার স্বপক্ষে জোরালো মত দেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে মুসলমান পুরুষ-মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় মুসলমান লেখক লেখিকার মুসলমান সমাজের উন্নয়নে তাদের মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে মত দান করেন। এরূপ কয়েকটি পত্রিকা হল 'মিহির ও সুধার' (১৩০৯ বঙ্গাব্দ), 'আল ইসলাম পত্রিকা' (১৩২৬ বঙ্গাব্দ), 'সওগাত পত্রিকা' (১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ), 'মিলকি সওগাত'(১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ) প্রভৃতি।

সৈয়দ আমীর আলী তাঁর লেখা বই 'The Real Status of Women in India' তে মুসলমান সমাজের মেয়েদের শিক্ষায় পিছিয়ে থাকার পেছনে পুরুষদের নেতিবাচক মনোভাবকে দায়ী করেন। Ali, Ameer (1899), এর লেখা বই 'The Influence of Women in Islam' এ তাঁর মতের সপক্ষে জোরালো যুক্তি তুলে ধরেন- "The honest reformer can take heart by the example of the brahmo ladies who for the last fifty years held their position in Indian society with dignity and self respect"।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে মুসলমান মেয়েদের জন্য কখনো পৃথক স্কুলে, কখনো হিন্দু মুসলমান মেয়েদের একই স্কুলে শিক্ষা দানের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। যেমন বেথুন স্কুল ও কলেজ কলকাতা (১৮৪৯), ইডেন গার্লস স্কুল, ঢাকা (১৮৯৬-১৮৯৭), লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজ, (১৯৩৯), মুসলিম গার্লস স্কুল (জানুয়ারী ১৭, ১৮৯৭), আখতার বানু মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল (১৯০৯), সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল (১৯১১) ইত্যাদি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বাঙালী মুসলমান মেয়েরা নিয়মিত লিখতে থাকেন মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা এবং কল্যান বিষয়ে। এরূপ কয়েকটি পত্রিকা হল- 'নবনূর' (১৮০৩-১৯০৭), 'দি মুসলমান' (১৯০৬-১৯৩৬), 'প্রবাসী ইসলাম প্রচারক' (১৯০০-১৯৩৬), 'বাসনা' (১৯০৯), 'মুসলমান ক্রনিক্যাল' (১৯০৮), 'বঙ্গনূর', 'মহম্মদী', 'মোয়াজিন' (১৯৩০), 'কোহিনূর' (১৯১১), 'সওগাত' (১৯১৮-১৯৪৬), 'বুলবুল', 'বেগম', 'অন্বেষা' (১৯২১, সম্পাদিকা সুফিয়া খাতুন)।

'অন্বেষা' পত্রিকাটি নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে জনমত গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এই সময় মুসলমান মেয়েদের শিক্ষাকে সমর্থন করে এবং পর্দা প্রথার ন্যায় সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে বহু শিক্ষিতা মুসলমান নারী। এদের মধ্যে বেগম রোকেয়া, জোবেদা খাতুন, মিসেস এম. রহমান, খায়রুন্নেষা, করিমুন্নেষা, সহিফা বানু, সুফিয়া কামাল, সামসুন্নাহার মাদুর, ফজিলাতুন্নেসা প্রমুখদের নাম উল্লেখযোগ্য স্যার সৈয়দ আহমেদ খাঁ (আলিগড় আন্দোলনের জনক) মুসলমান মেয়েদের পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি বিমুখতার কারণ বিশ্লেষণ করে বলেছেন, "সরকারী ভাষা হিসেবে ইংরেজী ভাষার ব্যবহারকে মুসলমানরা ধর্ম বিরোধী বলে মনে করতেন। তাছাড়া অর্থের অভাব, অবিভাবকদের অবহেলা, পরিশ্রম বিমুখতা, হিন্দুদের বিরোধীতা, সরকারী উৎসাহের অভাব, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমান সরকারী কর্মচারীদের অপ্রতুলতা প্রভৃতিও আংশিক ভাবে দায়ী ছিল" (রচনা চক্রবর্তী, পৃ. ৮৩)। মুসলিম মেয়েদের শিক্ষায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে যারা নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে এসেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন,

১) ছাওলাতুন্নেসা (১৮৩২-১৯১০)-- এই মহিয়সী নারী নিজে স্কুলে পড়ার সুযোগ না পেলেও সমাজ সেবা এবং নারী শিক্ষার স্বপক্ষে সংগ্রাম করেন। ভাষালিয়া গ্রামে প্রতিষ্ঠিত তার স্কুল থেকে যেসকল কৃতীরা বের হয়েছেন তাদের মধ্যে বিশিষ্ট ভাষাবিদ ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ, ভাষা আন্দোলন কারী মুসলিম আবদুল করিম, ডঃ মুর্তাজা বসির, প্যারিচরণ সরকার প্রমুখদের নাম উল্লেখযোগ্য।

২) নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরি (১৮৩৪-১৯০৩)-- এই মহিয়সী মহিলা তাঁর নারী শিক্ষা ও নারীর অধিকার রক্ষায় সংগ্রামী ভূমিকা পালনের জন্য ইতিহাসে চির অমর হয়ে থাকবেন। পূর্ব বাংলার অজ পাড়াগাঁয়ের এই মহিলা নারী শিক্ষা এবং জাগরণের মশাল জ্বালালেন এবং বিনিময়ে পেলেন সমাজের কটুক্তি, অত্যাচার ও অসংখ্য বাধা। তিনি অনুভব করেছিলেন নারী শিক্ষার উন্নয়ন, ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা এবং নারীর উন্নয়নের গুরুত্ব। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে তার কৃতিত্ব গুলি হল--

ক) নিজ জন্মভূমি পশ্চিম গাঁ' তে একটি মাদ্রাসা স্থাপন,

খ) কুমিল্লা শহরে শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য স্থাপন করেন একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, যা কালক্রমে শৈল নারী বালিকা বিদ্যালয়ের সাথে মিশে যায়,

গ) ১৮৭৩ সালে কুমিল্লা শহরে একটি হাইস্কুল স্থাপন করেন, বর্তমানে এটি ফয়জুন্নেসা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় এবং ফয়জুন্নেসা মহিলা কলেজ নামে পরিচিত, (নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধূরানী, ২০০৫, আজকাল পত্রিকা, ১৯ শে ফেব্রুয়ারী,)

ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মতান্ত্রিকে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করেন,

ঙ) পুরুষের উপর অর্থনৈতিক ভাবে নির্ভরশীল অশিক্ষিতা নারী সমাজ ও অবিভাবকদের দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া অন্যায়, অইসলামিক অনৈতিক বোঝাকে চাপিয়ে দেওয়া মুসলিম মহিলাদের উপর জগদ্দল পাথরের ন্যায় চেপে বসে অন্যায়। এখান থেকে মুক্তির জন্য ফয়জুন্নেসা নারী শিক্ষাকে স্বাবলম্বী হওয়া প্রয়োজন বুঝেছিলেন,

চ) ছেলেদের শিক্ষার জন্য তিনি তৈরি করেন স্কুল, হোস্টেল এবং খেলাধূলারও ব্যবস্থা করেন,

ছ) সমাজ সেবার কাজে শিক্ষিত যুবক যুবতীদের উদ্বুদ্ধ করেন,

জ) তাঁর ব্যক্তিগত পাঠাগারের দরজাও আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। এক কথায় জমিদারির অর্থকে সঠিক ভাবে শিক্ষার উন্নতিতে ব্যয় করেন।

১৮৯৮ সালে মহারানী ভিক্টোরিয়া ফয়জুন্নেসাকে তাঁর মহানুভবতা ও জনহিতকর কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ‘নবাব’ উপাধিতে ভূষিত করেন। ফয়জুন্নেসা প্রথম মহিলা যিনি ‘নবাব’ উপাধিতে ভূষিত হন।

৩. খুজিস্তা আখতার বানু (১৮৭৩-১৯১৯)-- মেদিনীপুরের বিখ্যাত সুহরাওয়ার্দি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন খুজিস্তা আখতার বানু। তখনকার দিনে পর্দাপ্রথা এবং পারিবারিক রক্ষণশীলতার মধ্যে জন্মে এবং বড় হয়েও ভারতীয় মুসলিম মহিলাদের মধ্যে তিনি প্রথম কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিনিয়র ডিগ্রি লাভ করেন।

('সাপ্তাহিক কলম' ইদ সংখ্যা, ২০০৬। পৃ. ৫০-৫১, ২২-২৯ অক্টোবর)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি প্রথম চাকুরি করা মুসলিম মহিলা যিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. ক্লাসে পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রিপোর্ট, ১৯০৪)। ১৯০৯ সালে খুজিস্তা আক্তার বানু কলকাতায় প্রথম মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এই স্কুলটির নাম পরিবর্তিত হয়ে 'সুহরাওয়ার্দি বেগম মুসলিম গার্লস স্কুল' হয়। তিনি অনুভব করেছিলেন সমাজকে উন্নত করতে হলে মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজন এবং আরও ভালো হয় যদি মেয়েরা শিক্ষিকা হতে পারে। স্কুলে মুসলিম মেয়েরা শিক্ষিকা হয়ে এলে তাকে দেখে অন্য মুসলিম ছাত্রীরা যেমন শিক্ষা গ্রহণের জন্য উদ্দীপিত হবে তেমনি মুসলমান ছেলে এবং পুরুষরাও মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করবে। তিনি তার দক্ষতার কর্ম কুশলতা দিয়ে মেয়েরা যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে এবং নিজেদেরকে গড়ে তুলতে পারে তার জন্য সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাই জীবনের সব থেকে স্বর্ণালী দিন গুলিকে স্কুলের উন্নতির কাজে ব্যয় করেন। ১৯০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি ১৯১৩ সালের ১৬ ই ফেব্রুয়ারী ৫৬ নং মিরজা গালিব স্ট্রীটে স্থানান্তরিত হয় ('হাজার বছরে বাঙালী নারী', মহম্মদ সামসুল হক, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০০০)। খুজিস্তা আখতার বানু কেবলমাত্র একজন উচ্চশিক্ষিতা বাঙালী মুসলিম মহিলা ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন নারী শিক্ষাবিদ। অবিভক্ত বাংলায় মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারে খুজিস্তা আখতার বানু উজ্বল দৃষ্টান্ত। ১৯১২ সালের ১২ ই জানুয়ারী কলকাতার বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে ঘুরে কাজ করবার সময় তিনি কলেরা রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান।

৪) বিবি তাহেরননেছা - ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবল ঢেউ হিন্দু সমাজকে উদ্বেলিত যেমন করেছিল তেমনি মুসলমান সমাজকেও কোন কোন ক্ষেত্রে নাড়া দিতে পেরেছিল। বিবি তাহেরননেছাকেও ইংরেজী শিক্ষা প্রভাবিত করেছিল। তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু জানা না গেলেও এটুকু জানা গেছে যে তিনি প্রথম মুসলমান মহিলা যিনি বিশুদ্ধ গদ্যে তাঁর রচনা প্রকাশ করেন সে যুগের বিখ্যাত বাংলা পত্রিকা 'বামাবোধিনী'র 'বামা রচনা বিভাগে'। ১৮৬৪ সালের অক্টোবর নভেম্বর মাসের আগেই 'বামাবোধিনী' পত্রিকার দপ্তরে বিবি তাহেরননেছা তার লেখাটি পাঠান (গোলাম মুর্শিদ, ১৯৯৩। পৃ. ৯০)। 'বামাবোধিনী' পত্রিকাতে এই সময়ে একটি বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছিল যাতে পাঁচজন মুসলিম মহিলার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল যে এই লেখাগুলি প্রকৃতই তাঁদের, একথা "রচয়িত্রীরা অনুগ্রহ

পূর্বক ভালো করিয়া প্রমান দিয়া পাঠাইলে” তাঁদের রচনা প্রকাশ করা হবে। (‘বামাবোধিনী পত্রিকা’, অক্টোবর-নভেম্বর, ১৮৬৪)। ‘বামাবোধিনী পত্রিকা’য় তাহেরননেছা তখনকার গদ্য ভাষায় যা লিখেছিলেন তার পেছনে রয়েছে ‘পঞ্চতন্ত্রকথামুখম’এর সুস্পষ্ট প্রভাব। পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা ‘পঞ্চতন্ত্র’ এর ভুমিকাতে লিখেছেন,

“অজাতমৃত মূর্খেভ্যোঃ
মৃতাজাতৌ সুতো বরম্
যতস্তৌ স্বল্পদুঃখায়
যাবৎ জীবং জড়োদহেৎ।”

‘বামাবোধিনী পত্রিকায়’ তাহেরননেছা যে লেখা পাঠান তাতে লেখেন যে, “এই আমাদের সংসারে মূর্খ হইয়া কূলকামিনী গনের কলেবর ধারণ করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। অজাত এবং মৃত পুত্র কেবল একবার দুঃখদায়ক, কিন্তু মূর্খ সন্তান যে কত দুঃখ দায়ক ইহা কাহার না চিত্ত ক্ষেত্রে জাগরিত হইয়াছে।” এখানে স্পষ্ট তাহেরননেছা ‘পঞ্চতন্ত্র’ বইটি পাঠ করেছিলেন। এই বইটির প্রকাশ মোটামুটি ৩০০০-৩৫০০ হাজার বছর পূর্বে বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন।

১.১.১৯ বেগম রোকেয়ার জীবনাদর্শ :

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতভূমি সমৃদ্ধ হয়েছে মহর্ষি মহাত্মাদের পদার্পণে। ভারতের সমাজ পরিকাঠামো বিচার করে তার পরিবর্তনের জন্য জীবনব্যাপী সংগ্রাম করে গেছেন প্রত্যেকেই। প্রাচীন ঋষি অগস্ত্য, অত্রি, ভরদ্বাজ ও গৌতম থেকে শুরু করে আধুনিক ভারতে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, ভীমরাও আম্বেদকর, জ্যোতিরাদিত্যফুলে, এ্যানিবেসান্ত এবং মাদার টেরেজা প্রমুখরা প্রত্যেকেই নিজেদের জ্ঞান, অনুভূতি আর চেতনাকে কাজে লাগিয়ে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার এক আমূল পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। ভারত হল একটি বিবিধ ধর্ম - জাতি এবং সম্প্রদায়ের বাসভূমি আর এই বিবিধের মধ্যে মিলন ঘটানো সম্ভব হয়েছে এইসব বিভিন্ন মহাত্মাদের ভাবনা ও আদর্শকে ছড়িয়ে দিয়ে চেতনার বিকাশের মাধ্যমে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এমনই এক মহিয়সী নারীর জন্ম হয় বাঙালী মুসলিম পরিবারে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে। তিনি জন্মসূত্রে

একজন প্রভাবশালী বংশের সন্তান। তাঁর পিতা জাহিরুদ্দিন মহম্মদ আবুআলি হায়দার সাবের ছিলেন একজন জমিদার এবং বহুভাষী। তিনি চারবার বিবাহ করেন। রহতুন্নিসা সাবেরা চৌধুরানীর সঙ্গে তাঁর বিবাহের ফলে রোকেয়ার জন্ম হয়। অন্যান্য আরও দুই বোন ও তিন ভাইয়ের সঙ্গে রোকেয়া বড়ো হন। রোকেয়ার বড়ো ভাই হলেন ইব্রাহিম সাবের এবং দিদি করিমুন্নেসা খাতুন চৌধুরানী। এই দুজনেরই রোকেয়ার জীবনের উপরেই অনেক প্রভাব রয়েছে। করিমুন্নেসা চেয়েছিলেন বাংলা ভাষা পড়তে যেখানে তার পরিবার চেয়েছিলেন তিনি আরবি বা পার্সি মাধ্যমে পড়াশুনা করুন। বড় ভাই ইব্রাহিম রোকেয়া এবং করিমুন্নেসাকে ইংরেজী এবং বাংলা শেখান। করিমুন্নেসা চৌদ্দ বছর বয়সে বিয়ে করেন এবং পরে একজন মহিলা কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর দুই সন্তান আবদুল করিম গজনাবী এবং আবদুল হালিম গজনাবী। এঁরা দুজন রাজনীতিবিদ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ব্রিটিশ সরকারের আমলে। বেগম রোকেয়া আঠারো বছর বয়সে ১৮৯৮ সালে ৩৮ বছর বয়সী খান বাহাদুর সাখাওয়াত হোসেনকে বিবাহ করেন। যিনি ছিলেন উর্দুভাষী ভাগলপুর ডিস্ট্রিক্টের ডেপুটি মেজিস্ট্রেট (ভাগলপুর বর্তমানে বিহার)। খান বাহাদুর কৃষি বিদ্যার উপর ব্যাচেলার ডিগ্রি অর্জন করেন ইংল্যান্ড থেকে এবং তিনি ইংল্যান্ডের রয়েল এগ্রিকালচারাল সোসাইটির সদস্য ছিলেন। তাঁর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর রোকেয়া খাতুনকে বিবাহ করেন। একজন মুক্ত চিন্তার অধিকারী এই মানুষটি রোকেয়াকে বাংলা এবং ইংরেজি ভাষার শিক্ষা চালিয়ে যেতে সাহায্য করেন। তিনি উৎসাহদান করেন লেখার জন্য এবং তাঁর উপদেশে রোকেয়া বাংলা ভাষাকে তাঁর সাহিত্য চর্চার প্রধান ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেন। ১৯০২ সালে 'পিপাসা' নামক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে তাঁর সাহিত্য জীবনের সূচনা হয়। পরবর্তী সময়ে একের পর এক মূল্যবান সাহিত্য সৃষ্টি উপহার দিয়েছেন। তাঁর লেখা বই গুলি হল- 'মতিচূর', প্রথম খন্ড (১৯০৪), 'সুলতানাস ড্রিম' (১৯০৮), এটি প্রকাশিত হয় ঠিক তাঁর স্বামীর মৃত্যুর (১৯০৯ সাল) আগে। সুলতানাস ড্রিম এই গ্রন্থে রোকেয়া দেখিয়েছেন নারী সমাজ রয়েছে উঁচু স্তরে এবং পুরুষ সমাজ তার অধীনে। তিনি এই গ্রন্থে এও দেখিয়েছেন নারী বিদ্যার চিন্তার জ্ঞান যেমন– সৌরশক্তি চালিত উনান, উড়ন্ত গাড়ী এবং মেঘ ঘনীভবনকারী যন্ত্র যা সমাজের উপকারে আসতে পারে। এটিকে একটি বিদ্রুপাত্মক লেখা বলে মনে করা হয়। ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয় 'মতিচূর' এর দ্বিতীয় খন্ড। এরপর ১৯২৪ এ

প্রকাশিত হয় ‘পদ্মরাগ’ নামে একটি উপন্যাস, ‘God gives, Man robs’ এটি প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। একই বছরে প্রকাশিত হয় ‘Education Ideas for the Modern Indian Girl’।

‘অবরোধবাসীনি’ প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে। ‘বলিগত’ নামে ছোট গল্পটিও এই সময়ে প্রকাশিত হয়। ‘নারীর অধিকার’ একটি অসম্পূর্ন প্রবন্ধ। বেগম রোকেয়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা যেমন- (সওগাত, মহম্মদী, নবপ্রভা, মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি করতেন। স্বামীর মৃত্যুর পাঁচমাস পরে বেগম রোকেয়া একটি উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন-- ‘সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস হাইস্কুল’। এই বিদ্যালয়টি ভাগলপুরে মাত্র পাঁচজন উর্দুভাষী ছাত্রী নিয়ে শুরু হয়। স্বামীর পরিবারের সঙ্গে সম্পত্তিগত বিবাদের ফলস্বরূপ তিনি বাধ্য হন তাঁর বিদ্যালয়টিকে ১৯১১ সালে কলকাতায় স্থানান্তরিত করতে। তিনি এই বিদ্যালয়টি সুন্দরভাবে চব্বিশ বছর ধরে চালিয়েছেন।

বেগম রোকেয়ার জীবন বিশ্লেষণ করে দেখলে এটা বোঝা যায় যে তিনি একজন মুসলিম পরিবারের মেয়ে হওয়ার কারণে সরাসরি প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ পাননি। যেটুকু শিখেছেন পরোক্ষভাবে নিজের বড়ো ভাই ইব্রাহিম সাবেরের কাছ থেকে এবং পরবর্তী কালে স্বামীর সহযোগিতায়। ধর্মীয় গোঁড়ামী এবং পুরুষ জাতির আধিপত্যে কোনঠাসা হয়ে কেটেছে বেগম রোকেয়ার শৈশব ও কৈশোর। তিনি নিজের উপলব্ধি দিয়ে বুঝেছিলেন নারী সমাজ রয়েছে এক গভীর অন্ধকারে আর মুসলিম নারী সমাজ তো চরম দুর্দশায়। পুরুষদের দ্বারা নির্মিত কৃত্রিম নিয়মগুলি কঠোর ভাবে পালন করতে বাধ্য হত নারী সমাজ। মুসলিম নারী সমাজের অন্ধকার ভবিষ্যৎ দেখে বেগম রোকেয়া নিজেকে স্থির রাখতে পারেননি। তিনি শুধুই চিন্তা করেছেন যে কোন উপায়ে মহিলা সমাজকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে হবে যেন তারা সমানভাবে পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সম্পূর্ন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। আর এই অনুভূতি ও তাগিদ থেকে তিনি লেখালেখি শুরু করেন। এছাড়া তিনি মুসলিম নারী সমাজের শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থার পর্যালোচনা করার জন্য একটি ইসলামিক মহিলা সংগঠন তৈরী করেন। সেই সংগঠন ছিল ‘আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম’। তাঁর সমাজ সংস্কারর বিভিন্ন পদক্ষেপগুলি এই সংস্থার আলোচনা চক্রের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্রহণ করতেন, বিশেষভাবে নারী সমাজকেন্দ্রীক সমস্যাগুলি নিয়ে। বেগম রোকেয়ার ‘মতিচূর’ (প্রথমখন্ড) গ্রন্থটি কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন। ‘স্ত্রীজাতির অবনতি’, - যেখানে তিনি

ভারতীয় নারী সমাজের দূর্দশার এক জ্বলন্ত চিত্র অঙ্কন করেছেন। পারিবারিক জীবনে একজন দাসীর থেকে বেশিকিছু সুবিধা পেত না পরিবারের মহিলারা। যেখানে তিনি দেখিয়েছেন অলঙ্কার বা ভূষণ পরনের রীতি তাদেরকে গৃহের চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী করে রাখার একটি গোপন ষড়যন্ত্র, বিশেষ করে বিবাহিতা নারীরা সম্পূর্ণরূপে দাসীবৃত্তি করেই জীবন কাটাত। অন্য আর একটি প্রবন্ধ 'অর্ধাঙ্গিনী' তে পর্যালোচনা করেছেন পর্দা প্রথার উপর, যেখানে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন নারীরা অর্ধাঙ্গিনী হওয়া সত্ত্বেও সমাজের সঠিক সুযোগ না পাওয়ায় মানসিক দাসত্বে পরিণত হয়েছিল। সম্পূর্ন সমাজ থেকে নারীদের আলাদা করে রাখার উদ্দেশ্য এই পর্দা প্রথার প্রচলন। তিনি এই গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন নারী জাতির উন্নতি এবং অগ্রগতির জন্য যে প্রকারের সম্পদ এবং বস্তুর আয়োজন থাকা জরুরি তার অভাব।

'মতিচুর' (দ্বিতীয় খন্ডে) এ বেগম রোকেয়া সমালোচনা করেছেন পুরুষতান্ত্রিক পরিকাঠামোতে ধর্মীয় গ্রন্থগুলিকে কিভাবে নিজেদের অনুকুলে ব্যাখ্যা করে তার দ্বারা নারী সমাজের জীবন এবং কর্তব্য গুলিকে পরিচালনা করত। এই গ্রন্থে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কঠোর সমালোচনা করে আধুনিক সমাজে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার উপায় গুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মতে আধুনিকতা বলতে বোঝায় আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি যা মেয়েদের ধর্মের ভাষা শেখানোর পাশাপাশি উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের সুযোগ করে দেয়। এছাড়া তিনি মনে করতেন অন্ধভাবে পশ্চিমী সভ্যতা সংস্কৃতির অনুকরণ একটি ভ্রান্তি মাত্র। বরং একেবারে শিশু সময় থেকে মজবুত শিক্ষা পরিকাঠামোই মেয়েদের বিশ্বজোড়া খ্যাতি এবং নারী পুরুষ নির্বিশেষে সাম্যতা এনে দিতে পারে। তিনি এটাও পরিষ্কার করেছেন ভারতের এই ব্যাতিক্রমী পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা আরও খারাপ হয়েছে ঔপনিবেশিকতার পর থেকেই।

বেগম রোকেয়ার একটি ব্যতিক্রমী সৃষ্টি যা নারী ক্ষমতায়নের পক্ষে বিশদে সমালোচনা করে নিষ্ঠুর ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান গুলির বিরুদ্ধে মত পোষণ করেছোর Sultana's dream' নামক গ্রন্থটিতে নারী সমাজের সবদিকে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করেছেন এবং পুরুষতান্ত্রিক অবিচারের সম্মুখীন হয়ে তাদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে নিজেদের অনুভূতি ও মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই গ্রন্থে নারীজাতিকে পুরুষজাতির থেকে বেশি শক্তিশালী ও উন্নত করে দেখানো হয়েছে। বেগম রোকেয়া তাঁর 'সৌরজগৎ' এ দেখিয়েছেন পিতা গওহর তাঁর নয়জন পুত্রী

নিয়ে বেজায় খুশি তাদের শত আহ্লাদ যথাসাধ্য পূরণের চেষ্টা করেন, সমাজের সবরকম গোঁড়ামিকে উপেক্ষা করে। তিনি তাঁর মেয়েদের শিখিয়েছেন মিথ্যা কথা না বলতে এবং সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচতে। আর তার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা যে আবশ্যক সে বিষয়েও যথেষ্ঠ উৎসাহ প্রদান করতেন মেয়েদের, তাতে গওহর এর স্ত্রী নূরজাহান খুবই গর্বিত কারন তাঁর নিজের মেয়েরা রক্ষণশীলতার বাইরে গিয়ে জগৎকে জানার চেষ্টায় রয়েছে। অপরদিকে জাফওর আলি গওহর এর শ্যালক অর্থাৎ মেয়েগুলির মামা একজন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতীক। যিনি চেয়েছেন মেয়েরা ঘরের অন্দরেই জীবন কাটাক, তাদের মধ্যে শিক্ষার সঞ্চার হলেই তারা মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে এবং পুরুষজাতির সিদ্ধান্ত গুলিকে স্বীকার করতে অস্বীকার করবে। এই প্রবন্ধে গওহর আলি বেগম রোকেয়ার মুখপাত্র যার মুখ দিয়ে তিনি বলিয়েছেন মেয়েরা শিক্ষা পেলে তবেই সমাজ এগোবে। প্রথাগত ধ্যান ধারণার বাইরে গিয়ে নতুনকে গ্রহণ করার উদারতা ভীষণ জরুরী। এই প্রসঙ্গে গওহর জাফওর এর রক্ষণশীল কথার প্রসঙ্গে বলেছেন- "আমাদের পূর্বপুরুষেরা রেলপথে ভ্রমণ করেন নাই, টেলিগ্রাফে সংবাদ পাঠান নাই, সেজন্য তাঁহাদের কিছু আটকাইয়া ছিল কি? তবে আমরা টেলিগ্রাফ পাঠাই কেন, রেলগাড়িতে উঠি কেন?" আরও একধাপ এগিয়ে গওহর পুরুষ এবং নারীর সমান দায়িত্ব কর্তব্য নিয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন,- "যাহা আমাদের জন্য আবশ্যক, তাহা আমাদের মহিলাদের জন্যও প্রয়োজন। তাঁহারা আমাদের আব্যশক অনুযায়ী বস্তুই তো জোগাইয়া থাকেন। গ্রাম্য চাষার স্ত্রীরা জমির কাজ জানে, আচার মোরব্বা প্রস্তুত করিতে জানে না, কারণ চাষাদের তাহা আবশ্যক হয় না। ইউরোপীয় কামিনীরা পান সাজিতে জানে না; কারণ ইউরোপীয় পুরুষদের তাহা আবশ্যক হয় না। আবার আমাদের কুলবালারা চাষা স্ত্রীদের মতো ধান ঝাড়িতে জানে না, যেহেতু আমাদের তাহা প্রয়োজন হয় না। ক্রমে আমরা কারি, কাটলেট, পুড়িয়ং খাইতে শিখিতেছি, আমাদের গৃহিনীরাও তাহা রাঁধিতে শিখিতেছেন। আমাদের ছাড়া তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কই? এবং তাহাদের ছাড়া আমাদের নিরপেক্ষ অস্তিত্ব কই? স্কুল কলেজের শিক্ষা যেমন আমাদের আবশ্যক, তদ্রুপ তাঁহাদের প্রয়োজন। তোমার পারিবারিক জীবন অপেক্ষা আমার গার্হস্থ্য জীবন অধিক সুখের, ইহা তুমি অবশ্যই স্বীকার করিবে। তোমার সমস্ত সুখ - দুঃখ তোমার স্ত্রী কখনোও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না।" (Sultana's dream).

জাফরের ব্যক্তিত্বের মধ্যদিয়ে স্বৈরাচারী পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন বেগম রোকেয়া যখন গওহর অভিযোগ করেন, "তোমার সমস্ত সুখ - দুঃখ তোমার স্ত্রী কখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না"। উত্তরে জাফওর আলী বলেন, - "তাহা না পারুন; কিন্তু আমার মতের বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করেন না। আমি যদি দিনকে রাত্রি বলি, তিনিও বলেন --'হ্যাঁ, দিব্য জ্যোৎস্না।' আবার যদি আমি অমাবস্যা রাত্রিকে দিন বলি, তিনিও বলিবেন 'হ্যাঁ, রৌদ্র বড়ো প্রখর"।

উদার মনের অধিকারী পিতা গওহর যখন তার মেয়েদের সৌরজগৎ এর পরিচয় করালেন এবং তাদের প্রত্যেককে সৌরজগৎ এর এক একটি স্বাধীন গ্রহ হিসাবে বর্ণনা করলেন, তার মেয়েরা নিজেদের অবস্থান ও অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হল। মেয়েগুলির মামা জফওর আলীর শত বিদ্রুপ সত্বেও মেয়েগুলির সৌরজগৎ এর জ্ঞান আহরণের আকাঙ্খা অটুট ছিল। তারা উপলব্ধি করেছিল যে, নিজ নিজ গুরুত্ব ও মর্যাদায় যেমন গ্রহ নক্ষত্র বর্তমান তারা প্রত্যেকেই এক একটি কোহিনূর, যা জ্ঞান স্বরূপ আলোকে উজ্জ্বল। গওহর এর এক মেয়ে আখতারের কথায় – "অদ্য আব্বা আমাদের জন্য কয়লা হইতে কোহিনূর বাহির করিয়াছেন"।

'সৌরজগৎ' নামক প্রবন্ধ থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, সমাজের অন্তর্গত প্রতিটি মানুষই বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী, প্রত্যেকে উপযুক্ত সুযোগ, স্বাধীনতা এবং সহযোগিতা পেলে নিজ নিজ গুণে প্রত্যেকেই কোহিনূর হয়ে উঠবে। আবার কোন একটি অংশ সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলে তারাই সমাজকে পশ্চাতে টেনে রাখবে। জাফর আলী ধর্মীয় গোঁড়ামী থেকে মেয়েদের স্বাধীনতা দিতে চাননি কারণ নিজের আধিপত্য বজায় রাখার নেশায় সত্য কি তা জানতে তাদের বিবেক কখনো সাড়া দেয়নি। সুতরাং সত্য অনুসন্ধান করতে হলে এবং প্রকৃত উন্নতির স্বাদ পেতে গেলে নিজের মনের সমস্ত বৃত্তিগুলিকে উন্মুক্ত করে দিতে হবে, নতুনকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

অনেকের ধারণা যে পশ্চিমের দেশে বিংশ শতাব্দীতে নারী মুক্তি আন্দোলনের হাত ধরে নারী জাতীর ক্ষমতায়ন হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সপ্তম শতাব্দীতে ইসলাম ধর্মের পয়গম্বর পুরুষ মহম্মদ নারী জাতির উন্নতি ও সর্বস্তরে সমান অধিকারের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। ইসলাম ধর্ম নারী জাতিকে সবরকম স্বাধীনতা দেওয়ার কথা বললেও তার

বাস্তবে ব্যবহারিক প্রয়োগ হয়নি। ফলস্বরূপ নারী জাতির অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে এবং যখন আজ আমরা একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে নারী মুক্তি ও নারী শিক্ষার প্রসারের কথা বলি তখন অন্যতম নারীবাদী মহীয়সী বেগম রোকেয়ার কথা মাথায় আসে যিনি চেয়েছিলেন নারী জাতির বুদ্ধি ও মুক্তিবাদী মানসিকতার বিকাশ।

বেগম রোকেয়া একটি বিখ্যাত মুসলিম পরিবারে জন্মেছিলেন এবং সারাজীবন কখনই মুসলিম ধর্মের আবেগ ও রীতি রেওয়াজ থেকে বেরিয়ে আসেননি বরং তিনি বিশ্বাস করতেন যে "ধর্মই হল জাতীয়তাবোধ, আধ্যাত্মিকতা, নৈতিক অগ্রগতির উৎস" ('মতিচূর', ২য় খণ্ড, প্রবন্ধ 'নূর'- ই- ইসলাম', পৃ. ৭১)। যদিও আজকের দিনে মেয়েরা অনেকাংশ ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা লাভ করেছে। তবে তার বেশিরভাগই পুরুষ জাতির ইচ্ছা আর সহানুভূতির সার্বিক ক্ষমতায়নে সহায়ক নয়। তিনি লিখেছেন, "আমরা ভিক্ষা বা সহানুভূতি চাই না, আমরা চাই জন্মগত অধিকার, যা ইসলাম ধর্ম মহিলাদের ১৩০০ বছর পূর্বেই দেওয়ার কথা বলেছেন।"

মুসলমান সমাজে বর্তমানে নারী শিক্ষার প্রসার কিছুটা হলেও, এরা দ্বিতীয় শ্রেনির নাগরিক হয়েই থেকে গেছে। বাড়িতে এদের দিন অতিবাহিত হয় গৃহস্থালীর কাজের মধ্যেই। আবার যে কিছু জন বাড়ির বাইরে বেরিয়ে সরকারি বেসরকারি দপ্তরে কর্মরত তারা একজন পুরুষ কর্মীর সমান মর্যাদা পায়না।

শক্তিশালী নারীবাদী প্রবক্তা বেগম রোকেয়া তাঁর 'উন্নতির পথে' ('The way of Advancement') প্রবন্ধে নারীদের যে প্রকারের উন্নতির কথা বলেছেন তা হল, প্রকৃত শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে জীবনের সর্বস্তরে, সর্বক্ষেত্রে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করা। কিন্তু বর্তমানে নারীজাতি কেবল বাড়ির বাইরে বেরিয়ে কিছু করাকেই স্বাধীনতা এবং অগ্রগতি বলে। রোকেয়া এইরকম স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেননি। আমাদের আজকের মেয়েরা সাধারণ বিজ্ঞান, ইংরেজী, অঙ্ক, সমাজ বিজ্ঞান এবং দর্শন সব বিষয়ের উপর চর্চা করা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কোনও উন্নতিই হয়নি যা প্রমাণ করে যে আমাদের দেশের শিক্ষা নীতি জাতির সার্বিক উন্নতিতে সহায়ক নয়; শিক্ষানীতিতে সংশোধনের প্রয়োজন। আমরা আমাদের আক্ষরিক অর্থে শিক্ষিত করেছি বটে, কিন্তু পরিপূর্ণ আদর্শ নাগরিক গড়ে তুলতে পারছি না। যদি আমরা একটু ভালো করে নজর দিই সমাজের আসল চিত্রটা এরূপ যে, আমাদের মেয়েরা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত নয়, সুরক্ষিত বোধ করে না যা নারী জাতির স্বাধীনতা ও অগ্রগতির অভাবকেই

ইঙ্গিত করে। আজও আমাদের বাড়ির মেয়েরা রাস্তায় বেরোলে যৌন হেনস্থা ও অ্যাসিড আক্রমণের শিকার হয়, বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যে গার্হস্থ্য হিংসা ও পণের জন্য মৃত্যু বরণ করে। এই সবকিছু পুরো সমাজকে এক প্রশ্নের মুখে ফেলে দেয় যে বাস্তবিক অর্থে নারী সমাজ কতটা মুক্তি পেয়েছে বা স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে যে উত্তরটি পাওয়া যায় তা হল আমরা শিক্ষিত হয়েছি, কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত আলোয় নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করতে পারিনি; আমরা শিক্ষার ব্যবহার কেবল পার্থিব উন্নতির জন্য করে থাকি, নৈতিক চেতনা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিকাশের জন্য নয়।

বেগম রোকেয়া যে ধরণের শিক্ষানীতির কথা বলেছেন তার আদর্শ রূপ হল তাঁর রচিত উপন্যাস “পদ্মরাগ” এর ‘তারিণীভবন’ যেখানে তিনি শিক্ষানীতির প্রস্তাব দিয়েছেন যা এক আদর্শ সমাজ গঠনে সহায়ক। তাঁর প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে মিথ্যা ইতিহাস পাঠে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন এবং নীতি ও ধর্ম শিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন। রোকেয়া চাননি তথাকথিত শিক্ষিতা নারী, বরং তাঁর লক্ষ্য ছিল একজন ভালো মেয়ে, ভালো গৃহবধূ, একজন ভালো মহিলা - যা সর্বোপরি একজন ভালো নাগরিক তৈরি করবে, যে তার নিজের সংস্কৃতিকে ভালোবাসবে, এবং জাতি ও দেশের মর্যাদা রক্ষায় সচেষ্ট থাকবে। বেগম রোকেয়ার মতে ভারতের ক্ষেত্রে বিশেষ করে পুরুষতান্ত্রিক যে সামাজিক পরিকাঠামো সেটাই ভারতীয় নারী জাতিকে একটু একটু করে পেছনে নিয়ে গেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শিকার হওয়ার কারণে নারীদের এই দূরবস্থা চরমে ওঠে। বেগম রোকেয়া তাঁর ভাব ও আদর্শকে কেবল মুসলিম মহিলাদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্যই ব্যবহার করেননি বরং এশিয়া মহাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সামাজিক পরিসরে অধিকার প্রতিষ্ঠা, সাম্যতা ও শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি নারী জাতির সম্ভাব্য প্রতিভার সার্বিক বিকাশের উপর জোর দিয়েছেন।

১.২ গবেষণার প্রয়োজনীয়তা এবং তাৎপর্য :

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন কালে স্বামী বিবেকানন্দ এবং সে যুগের অন্যান্য মহামানবরা অনুভব করেছিলেন যে মেয়েদের উন্নতি এবং ক্ষমতায়ন ছাড়া কেবলমাত্র পুরুষদের পক্ষে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। রাজা রামমোহন রায় থেকে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত শিবনাথ

শাস্ত্রী, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ভারতীয় মনীষীরা তাই পুরুষদের শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন-এর পাশাপাশি মেয়েদের শিক্ষা এবং ক্ষমতায়নের উপর গুরুত্বদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। বিদ্যাসাগর এবং অন্যান্য সে যুগের মনীষীদের চেষ্টায় অবিভক্ত বঙ্গদেশে অনেক গুলি নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠান গুলিতে ভারতীয় নারীদের জন্য ভারতীয় ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল না এমন কি সেই সময়ে তাঁরা কোনরূপ চিন্তা করেছিলেন কিনা তারও নিশ্চিত প্রমাণ বর্তমান গবেষিকার হাতে নেই। আধুনিক কালে সম্ভবত নিবেদিতা প্রথম ভারতীয় ভাবে ভারতীয় নারীদের শিক্ষিতা করে তোলার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। আয়ারল্যান্ডে প্রোটেস্টান্ট ধর্মাবলম্বী পরিবারে নিবেদিতা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। খুব ছোট বেলা থেকেই তিনি মনের মধ্যে অসংখ্য গুরু গম্ভীর প্রশ্ন করতেন এবং স্কুলের শিক্ষিকাদের নিকট সেই প্রশ্ন গুলি রাখতেন, যা তাঁর মতো অল্পবয়সী মেয়ের কাছ থেকে সে যুগে প্রত্যাশিত ছিল না। আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত নিবেদিতা অতি উন্নত গুণমানের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতা হন। ছোটবেলা থেকেই প্রাচ্য ভাবধারার প্রতি তাঁর অন্তরে শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠার ভাব জেগেছিল। আঠারো বছর বয়সে তিনি বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার পদে যোগ দেন। ইংল্যান্ডে থাকা কালীন তিনি সে দেশের বহু যশস্বী সাহিত্যিক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী এবং চিত্র শিল্পীর সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তাঁদের সঙ্গে ভাবের আদান- প্রদানে সমর্থ হন। ঐ সময়ে তিনি প্রচুর বই পড়ারও সুযোগ পেয়েছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর পক্ষে নারীবাদী এবং নারী মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত হয়ে ওঠা, স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা ভাবনাকে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সমস্ত ক্ষেত্রের মহা মানবদের প্রভাবিত করা ছিল সময়ের অপেক্ষা মাত্র। স্বামী বিবেকানন্দ সেই মহা তেজস্বিনী অগ্নি কন্যার মনে আগুন ধরাতে পেরেছিলেন। লন্ডনে থাকা নিবেদিতাকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "ভারতের জন্য, বিশেষত ভারতের নারী সমাজের জন্য পুরুষের চেয়ে নারীর, একজন প্রকৃত সিংহিনীর প্রয়োজন।... তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম প্রীতি, দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তই তোমাকে সর্বথা সেই উপযুক্ত নারী রূপে গঠন করেছে" (প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, ১৮৯৫। পৃ. ৫০-৫১)। ইংল্যান্ডে মার্গারেট নোবেলের মধ্যে স্বামীজী দেখেছিলেন এক জগৎ আলোড়নকারী শক্তিকে। চিঠিতে বিবেকানন্দ তাই সর্বান্তঃ করণে নিবেদিতাকে ভারতে নারীশিক্ষা এবং নারীমুক্তি

আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আহ্বান কর্রেণ। বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন নিবেদিতা ভারতীয় ভাবে ভারতীয় নারীদের শিক্ষাদানের জন্য তিনি প্রকৃতই প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহন করতে পারবে।

মার্গারেট ছিলেন সেই কেল্টিক রক্ত বহনকারী সিংহিনী, যাঁর ঐকান্তিকতা, শিক্ষা, পবিত্রতা, তাঁকে করে তুলেছিল অন্যন্যা। তাই স্বামীজী নিবেদিতার যোগ্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলেন বলেই নিবেদিতাকে সর্বান্তঃকরণে স্বাগত জানিয়েছিলেন ভারতবর্ষে। নিবেদিতাকে সম্পূর্ণ ভারতীয়ভাবে ভাবিত করে তাঁর অন্তররাজ্যে এক বিরাট পরিবর্তন ও প্রস্তুতি ঘটিয়ে তাঁকে নারী শিক্ষার দায়িত্ব নিতে বলেন। নিবেদিতা প্রকৃত হিন্দু নারীর চোখ দিয়ে জগৎকে দেখতে শিখলেন। তিনি গড়ে তুললেন মেয়েদের জন্য এমন একটি বিদ্যালয় যেখানে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের যা কিছু সুন্দর, নির্মল এবং পবিত্র তা একত্রিত হয়ে গড়ে তুলবে তাঁর স্কুলের ছাত্রীদের। প্রকৃতপক্ষে নিবেদিতা হয়ে উঠেছিলেন ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্বের নারী মুক্তির প্রতীক।

নিবেদিতার মতে শিক্ষা সবসময়েই আত্মশিক্ষা। কেউ কাউকে কিছু শেখাতে পারে না। None is really taught by another. True teaching is always self teaching. তাঁর মতে নারী শিক্ষা এবং ভারতে প্রতিটি নারীর জাতীয়তাবোধের পাঠ লাভ করা অত্যন্ত জরুরী। তাই নিবেদিতা গড়ে তুললেন বালিকা বিদ্যালয় যেখানে প্রতিটি মেয়ের ভিতরে থাকা অনন্ত শক্তি শিক্ষারূপ চাবিকাঠির দ্বারা উন্মোচিত হবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর আর এক মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া বর্তমান বাংলাদেশের রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রামে এক ঐতিহ্যবাহী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রোকেয়ার বাবা উর্দু, ফারসি এবং আরবি ভালো জানতেন কিনা তার কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই । ধর্মীয় দাসত্বের দৃঢ় বন্ধনের মধ্যে থাকার কারণে রোকেয়ার পিতা রোকেয়াকে কেবলমাত্র কোরাণ পড়তেই শিখিয়েছিলেন। রোকেয়া তাঁর দিদি করিমুন্নেসার কাছে উর্দু, ফারসি, আরবি এবং বাংলা শেখেন। তাঁর বড়ভাই ইব্রাহিম সাবেরের কাছে ইংরেজি শেখেন। মাত্র পাঁচ বছর বয়স থেকেই তাঁকে পর্দানসীন থাকতে হতো। রোকেয়ার বিয়ে হয় তাঁর থেকে প্রায় আঠারো/ উনিশ বছরের বড় সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সাথে। স্বামীর সাহচর্যে তিনি অসাধারণ ঔদার্য লাভ করেছিলেন এবং পারিবারিক পর্দানসীন জীবন থেকে মুক্তি লাভ করেন। গোলাম মুরশিদ (১৯৯৩) লিখেছেন, "রোকেয়াকে তাঁর স্বামী সাখাওয়াত হোসেন নারী

মুক্তির ধারণা দিয়ে রীতিমতো অনুপ্রাণিত করেছিলেন, নারীর স্বাধীনতা এবং নারী পুরুষের সক্ষমতার কথা বোঝাতে সমর্থ হয়েছিলেন"। (গোলাম মুরশিদ, ১৯৯৩। পৃ. ১৭৪-১৭৫)। স্বামীর মৃত্যুর পর অনেক বাধা বিপত্তিকে এড়িয়ে ভাগলপুরে মাত্র পাঁচটি মেয়েকে নিয়ে একটি স্কুল শুরু করেন। আত্মীয়দের প্রতিকূলতায় কলকাতায় এসে ১৯১১ সালের ১৬ ই মার্চ আটটি ছাত্রীকে নিয়ে স্বামীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শুরু করেন 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'। প্রথম দিকে স্কুলটি কেবলমাত্র উর্দুভাষী ছাত্রীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান সত্ত্বেও রোকেয়ার সবচেয়ে বড়ো পরিচিতি নারীমুক্তি আন্দালনের কর্মী এবং প্রেরণা দাত্রী হিসেবে। তাঁর মতে দাস ব্যবসা যদিও নিষিদ্ধ কিন্তু প্রতিটি ঘরেই এ ব্যবসা পুরোপরি বিরাজ করছে; কারণ মেয়েদের অবস্থা ক্রীতদাসীদের চেয়ে কোনঅংশে উন্নত নয়। কেবল তাই নয় মেয়েদের মন চিরদাসীতে পরিণত হয়েছে। সমাজে প্রচলিত ভাষায় এবং মূল্যবোধে এই দাসত্ব স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত। নারীর অসীম দাসত্ব, অপমান এবং আত্মসম্মানবোধের অভাবের কারণ দীর্ঘকালের অশিক্ষা। পুরুষ শাসিত সমাজ ধর্মের নামে নারীর দাসত্বকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে, তাকে চিরস্থায়িত্ব দিয়েছে অলৌকিক মহিমা দিয়ে।

বেগম রোকেয়া প্রথম নারী পুরুষের সমকক্ষতার দাবী তোলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি চেয়ে ছিলেন নারী পুরুষকে ছাড়িয়ে যাবে। পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য তিনি চেয়েছিলেন মেয়েরা স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জন করবে -কেরানি থেকে জর্জ, ব্যারিস্টার, ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদি হবে। যে সময়ে রোকেয়া এই প্রত্যাশা করেছিলেন তখন তাঁর উক্তি ছিল সেযুগের সমাজের কাছে অবান্তর দুরাশা এবং দুঃসাহসের, এমনকি উপহাসের।

রোকেয়ার মতে নারীকে পুরুষের সমকক্ষতা পেতে হলে নারীর আত্মার বিকাশ ঘটাতে হবে। আত্মার বিকাশ নির্ভর করে শিক্ষার ওপর। তিনি লিখেছেন তাঁর কালে মেয়েদের যেমন জেগে ওঠার ইচ্ছা নেই তেমনি সমাজের শাশ্বত মূল্যবোধ ও নারীর জেগে ওঠার পক্ষে সহায়ক নয়। তাই মেয়েদেরকে আপন প্রচেষ্টায় শিক্ষিতা হতে হবে। যেখানে এই প্রচেষ্টার অভাব সেখানে ঈশ্বরও সহায়ক নন। তাই রোকেয়া চেয়েছিলেন সংকীর্ণতা মুক্ত নারী শিক্ষা যার মধ্য দিয়ে মেয়েদের ক্ষমতায়ন ঘটবে।

নিবেদিতা এবং রোকেয়া দুজনেই নারী শিক্ষা, নারী জাগরণ এবং নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলেছেন। এজন্য দুজনেই আপন প্রচেষ্টায় বহু বাধাকে অতিক্রম করে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। প্রায় একই সময়ে দুজনেই কলকাতায় কাজ করেছেন। অথচ দুজনে পরস্পরকে চিনতেন বা পরস্পরের কাজের সম্বন্ধে কিছু জানতেন এ সম্বন্ধে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নিবেদিতা এবং রোকেয়া এই দুই মহীয়সী নারী, মেয়েদের শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং সেই যুগের তথা পরবর্তীযুগের সমাজ ব্যবস্থার উপযোগী করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন সমস্ত নারীকে। তাই নিবেদিতার চিন্তায় নারী শক্তি উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে শূদ্র শক্তির উত্থানের কথাও আছে। স্বামীজীর স্বপ্নকে অণুধাবন করে তিনি অনুভব করেছিলেন – নারীশক্তির জাগরণ ঘটছে, শূদ্র জাগছে। শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলছে। ঘটনার পট পরিবর্তন হতে বোধ হয় রাত্রিও কাটবেনা। নিবেদিতা চেয়েছেন বিবেকানন্দের সাম্যবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে আর তাই নিজেও ঝাঁপিয়ে পড়েছেন সেকালের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে। স্বামীজীর ন্যায় নিবেদিতাও বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের মধ্যে যে শক্তি আছে তাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। তাদেরকে বের করে আনতে হবে তাদের বর্তমান অবস্থা থেকে। প্রয়োজনে ধর্মকেও এ কাজে ব্যবহার করতে হবে, নিবেদিতার এই শিক্ষা ও সমাজ ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে ‘মডার্ন রিভিউ’ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায়।

নিবেদিতার প্রায় সমসাময়িক ছিলেন বেগম রোকেয়া। তাঁর সমাজ ভাবনাতেও সরল অথচ বলিষ্ঠ কণ্ঠে ১৯০৪ সালে মাত্র ২৬ বছর বয়সে পুরুষ শাষিত সমাজের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করেছেন এবং বঞ্চিত মেয়েদের সকল ন্যায্য অধিকারকে ছিনিয়ে নেওয়ার কথা বলেছেন। খেয়াল রাখতে হবে রোকেয়া কোন আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেননি, জন্মেছিলেন রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রামের এক ঐতিহ্যশালী মুসলিম পরিবারে। রোকেয়া নারীর স্বাধীনতা এবং নারী-পুরুষের সমকক্ষতার কথা জোর দিয়ে বলেছেন। রোকেয়ার সমকালে যে সমস্ত নারী নারীমুক্তি সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করে তোলার কাজে নিজেদের ব্যাপৃত করে রেখেছিলেন “তাঁরা কেউ রোকেয়ার মত একই সঙ্গে তাঁদের রচনায় এবং বাস্তব জীবনে নারী জাগরণের জন্য সর্বাত্মক প্রয়াসে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেননি, বোধ হয় কৃষ্ণভামিনী দাস অথবা সরলা ঘোষালও নন।”

(তদেব, পৃ. ১৭৭)। কৃষ্ণভামিনীর প্রধান লক্ষ্য ছিল স্বদেশের নারীদের হীনদশা থেকে টেনে তোলা, কিন্তু কৃষ্ণভামিনী শিক্ষিতা মেয়েদের উপার্জন করা উচিত বলে স্বীকার করেননি। এছাড়াও হিন্দু-মুসলানের মিলিত জাতীয়তার ধারণা তাঁর পরিচয়ে প্রকটিত ছিল না। তিনি হিন্দু পরিচয়ে ছিলেন অতন্ত প্রকট। তিন মনে করতেন ভারতের দুর্দশার জন্য মুসলমান এবং খ্রিস্টানরা দায়ী। কিন্তু কৃষ্ণভামিনীর কনিষ্ঠা রোকেয়া যুক্তিসহকারে সোচ্চার হয়েছিলেন যে মেয়েরা শুধুমাত্র শিক্ষিতা হলেই হবেনা তাঁদের উপার্জনশীলাও হতে হবে, তবেই তারা হবে স্বাধীন।

আজ একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক সবেমাত্র অতিক্রান্ত। বর্তমান গবেষণায় প্রায় একশো বছর পিছনে ফিরে আবার এই দুই নারীর সমাজ ভাবনা এবং শিক্ষা ভাবনাকে নতুন ভাবে বিশ্লেষণ করার এবং ফিরে দেখবার প্রয়োজনীয়তা তথা বর্তমানের নারী শিক্ষায় এই দুই মহীয়সী নারীর সমাজ এবং শিক্ষা ভাবনার প্রাসঙ্গিকতাকে আলোচনা করবার চেষ্টা করা হয়েছে ।

১.৩ সমস্যার বিবৃতি :

বর্তমান এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার শিক্ষা ভাবনা ও সমাজ ভাবনা তুলে ধরা এবং বর্তমান সমাজে তার প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে বের করা। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির এই অভাবনীয় উন্নয়নের যুগে মানুষ অনেক বেশি যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে এবং মানবিকতা ক্রমশই লোপ পাচ্ছে। এর ফলে সমাজে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এমনকি শিক্ষাক্ষেত্রেও এই ধরনের মূল্যবোধ হীনতার প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নিবেদিতা এবং রোকেয়া দুজনেই ছিলেন মহীয়সী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। দুজনেই ছিলেন মানবিকতার পথ প্রদর্শিকা। তাই বর্তমান গবেষিকার মনে এই প্রশ্নের আবির্ভাব ঘটেছে যে, এই ধরনের পুরোধা ব্যক্তিত্বের স্পর্শ থাকার পরেও বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার গতি প্রকৃতি পাল্টে যাচ্ছে কেন? তাহলে কি আমরা অর্থাৎ বর্তমান প্রজন্ম এঁদের দেখানো পথের উল্টো পথে হাঁটছি? এই প্রশ্ন গবেষিকার মাথায় বার বার জেগে উঠেছে। এবং এই সমস্যার সমাধানের খোঁজে নিবেদিতা ও রোকেয়ার দূরদর্শিতাকে পুনরায় জাগ্রত করে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে

পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন বলে গবেষিকা মনে করেছেন। এমনকি সংশ্লিষ্ট সাহিত্যের পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, এঁদের আদর্শকে খুঁজে বের করে জনমানসে বিলিয়ে দেওয়ার এখনও অনেক সুযোগ রয়েছে। তাই বর্তমান গবেষণার মূল সমস্যাটি হল **"ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার শিক্ষা ভাবনা ও সমাজ ভাবনাঃ একটি বিশ্লেষণমূলক আলোচনা।"**

১.৪ গবেষণার প্রশ্ন সমূহ :

১. শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার মতামত কী এবং তার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা কতখানি?

২. শিক্ষার পাঠ্যক্রম সম্পর্কে নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার মতামত কী এবং তার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা কতখানি?

৩। শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার মতামত কী এবং তার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা কতখানি?

৪। শৃঙ্খলা সম্পর্কে নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার মতামত কী এবং তার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা কতখানি?

৫. বর্তমান সমাজের সাম্প্রদায়িক সমস্যা দূরীকরণে নিবেদিতা ও রোকেয়ার মতাদর্শ কতখানি প্রাসঙ্গিক?

৬. বর্তমান সমাজের সামাজিক সমস্যা দারিদ্রের নিবারণ কল্পে নিবেদিতা ও রোকেয়ার ভাবনা চিন্তা কতখানি প্রাসঙ্গিক?

১.৫ গবেষণার উদ্দেশ্য সমূহ :

১. শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে নিবেদিতা এবং রোকেয়ার চিন্তা ভাবনাকে খুঁজে বের করা এবং তার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণ করা।

২. শিক্ষার পাঠ্যক্রম সম্পর্কে নিবেদিতা এবং রোকেয়ার চিন্তা ভাবনাকে খুঁজে বের করা এবং তার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা নিরূপণ করা।

৩. শিক্ষা দানের পদ্ধতি সম্পর্কে নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার যে দৃষ্টিভঙ্গি তা খুঁজে বের করা এবং তার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা নিরূপণ করা।

৪. শৃঙ্খলা সম্পর্কে নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার মনোভাবকে খুঁজে বের করা এবং তার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা বোঝার চেষ্টা করা|

৫. ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার সমাজ ভাবনাকে আলোচনা করা এবং তার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করা|

৬. ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার শিক্ষাভাবনা এবং সমাজভাবনা বর্তমান সমাজের সাম্প্রদায়িক হিংসা দূরীকরণে কতখানি প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করা।

৭. সাম্প্রতিক কালের সমস্যা – দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য তাঁদের চিন্তাভাবনার যে দূরদর্শিতা তা খুঁজে বের করা।

১.৬ গবেষণার সীমানির্দেশকরণ :

বর্তমান গবেষণার মূল সমস্যাটি হল "ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার শিক্ষা ভাবনা ও সমাজ ভাবনাঃ একটি বিশ্লেষণ মূলক আলোচনা।" ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার সম্পূর্ণ জীবনাদর্শ তুলে ধরা এবং তার প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণ করা একজন গবেষিকার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তাই উক্ত সমস্যাটিকে নিয়ে গবেষণা করা এবং নির্দিষ্ট সময়ে তা সম্পূর্ণ করার জন্য এর সীমানির্দেশকরণ প্রয়োজন বলে গবেষিকা মনে করেছেন। এই গবেষণার সীমায়িতকরণের ক্ষেত্র গুলি হল :

১। শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা অর্থাৎ শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠ্যক্রম, পদ্ধতি ও শৃঙ্খলা সম্পর্কে নিবেদিতা ও রোকেয়ার চিন্তা ভাবনার পুনরালোচোনা।

২। বর্তমান বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা যেমন দারিদ্র্য, সাম্প্রদায়িক সমস্যা ইত্যাদি দূরীকরণে তাঁদের চিন্তা ভাবনার দূরদর্শিতা তুলে ধরা।

তথ্যসূত্রঃ

- গোপা মজুমদার (দাস) (২০১১)। *নারী প্রগতির ধারায় বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন।* পিএইচ.ডি (বাংলা) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অবিসন্দর্ভ, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ৩
- শ্যামলী গুপ্ত (সম্পা) (আষাঢ় ১৪১৬)। *একসাথে।* গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, কলকাতা।
- রামমোহনঃ চরিত্রপূজা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্ররচনাবলী চতুর্থ খন্ড, বিশ্বভারতী পৃ. ৫১৭
- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় (১৩৬২)।*সাহিত্য সাধক রচিত মালা।* ২য় খন্ড, ৫ম সংস্করণ,কলকাতা, পৃ. ৭০
- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় (১৩৬২) । তদেব, পৃ.৭১
- স্বপন বসু (১৪০৪)। বাঙালি সমাজে স্ত্রী শিক্ষাঃ শিবনাথ শাস্ত্রী ভূমিকা। ‘পশ্চিমবঙ্গ শিবনাথ শাস্ত্রী সংখ্যা, কোলকাতা।
- বিপিনচন্দ্র পাল (পুস্তক প্রকাশনার সময় অজ্ঞাত)। *সত্তর বৎসর।* পৃ. ২২৩
- সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় (পুস্তক প্রকাশনার সময় অজ্ঞাত)। *ভারতের স্বামীজিঃ স্বামীজীর ভারত।*
- প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা (১৯৮৫)। *ভগিনী নিবেদিতা।* সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, বাগবাজার, কোলকাতা। পৃ. ৩৯-৪০
- প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা (১৯৮৫)। *তদেব,* পৃ. ৪০
- প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা (১৯৮৫)। *তদেব,* পৃ. ৩৯-৪০
- প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা (১৯৮৫)। *তদেব।*
- প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা (১৯৮৫)। *তদেব* পৃ. ৫১
- শঙ্করী প্রসাদ বসু। নিবেদিতা লোকমাতা, প্রথম খণ্ড, প্রথম পর্ব, পৃ. ২৬৭)
- প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা (২০০৫)। *ভগিনী নিবেদিতা।* সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, বাগবাজার, কোলকাতা। পৃ. ৮৬
- শঙ্করী প্রসাদ বসু। *নিবেদিতা লোকমাতা।* দ্বিতীয় খণ্ড। পৃ. ৬
- শঙ্করীপ্রসাদ বসু (১৯১১)। *মর্ডান রিভিউ।* কলকাতা।
- শঙ্করীপ্রসাদ বসু (১৯১১)। *তদেব* ।
- শঙ্করীপ্রসাদ বসু (১৯১১)। *মর্ডান রিভিউ।* কলকাতা। পৃ. ৬-৭
- স্বামী-চৈতন্যানন্দ (সম্পা.) (২০১৭)। *ভারত চেতনায় ভগিনী নিবেদিতা।* উদ্বোধন কার্যালয়, কোলকাতা। পৃ. ৪৯০
- ভারতবাণী (১৯৯৯)। শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা, পৃ. ২২

- সুপর্না গুপ্ত (সম্পাদনা)। *ইতিহাসে নারী : শিক্ষা।* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা- ৭৩
- সফীউন্নেসা (১৪২৯)। *ইসলাম ধর্মে নারীর অধিকার রক্ষা।* সঙ্খসাথী, চতুর্থ -পঞ্চম সংখ্যা, পৃ. ১৬৮ – ১৬৯
- নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধূরানী, একরাম আলী (২০০৫)। *রবিবাসরীয়, আজকাল পত্রিকা,* ১৯ শে ফেব্রুয়ারী
- সাপ্তাহিক কলম (২০০৬)। ইদ সংখ্যা, বর্ষ -২৫, পৃ. ৫০-৫১, ২২-২৯ অক্টোবর
- মহম্মদ সামসুল হক (২০০০)। হাজার বছরে বাঙালি নারী। পাঠক সমাবেস ঢাকা।
- গোলাম মুরশিদ (১৯৯৩)। *নারীপ্রগতির একশো বছরঃ রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া* অবসর প্রকাশনা সংস্থা। পৃ. ৯০
- বামাবোধিনী পত্রিকা (১৮৬৪) অক্টোবর – নভেম্বর।
- আবদুল কাদির (সম্পা) (২০০৬)। ‘মতিচূর’, ২য় খণ্ড, প্রবন্ধ ‘নূর’-ই-ইসলাম’, রোকেয়া রচনাবলী। পৃ. ৭১
- প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা (১৯৮৫)। *ভগিনী নিবেদিতা।* সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, বাগবাজার, কোলকাতা। - পৃ. ৫০-৫১,
- গোলাম মুরশিদ (১৯৯৩)। *নারীপ্রগতির একশো বছরঃ রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া* অবসর প্রকাশনা সংস্থা। পৃ. ১৭৪-১৭৫
- গোলাম মুরশিদ (১৯৯৩)। *তদেব* পৃ. ১৭৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংশ্লিষ্ট সাহিত্যের পর্যালোচনা

২.১	ভুমিকা
২.১.১	সম্পর্কিত গবেষণা সমূহের পর্যালোচনার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য
২.১.২	সম্পর্কিত গবেষণা সমূহের পর্যালোচনার উদ্দেশ্য
২.২	নিবেদিতা সম্বন্ধে সংঘটিত কিছু গবেষণার পর্যালোচনা
২.৩	রোকেয়া সম্বন্ধে সংঘটিত কিছু গবেষণার পর্যালোচনা
২.৪	গবেষণা সমূহের পর্যালোচনার ছক
	তথ্যসূত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংশ্লিষ্ট সাহিত্যের পর্যালোচনা

২.১ ভূমিকাঃ

শিক্ষা বিজ্ঞানে শিক্ষাদর্শন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ক্ষেত্র। যখন থেকে শিক্ষাবিজ্ঞান স্বাধীনভাবে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়েছে তখন থেকেই শিক্ষা দর্শন গবেষণার অন্যতম ক্ষেত্র। প্রকৃতপক্ষে 'শিক্ষা' এবং 'দর্শন' যেন একটি মুদ্রার দুটি বিপরীত দিক। একই ঘটনাকে শিক্ষা এবং দর্শন দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে থাকে। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে দর্শন বিষয়ে গভীর আলোচনা তথা অনুসন্ধান চালু রয়েছে। সুতরাং এটাই প্রত্যাশিত যে শিক্ষা দর্শন বিষয়ে ভারতবর্ষে যথেষ্ট সংখ্যক গবেষণা হয়েছে। কিন্তু প্রত্যাশার তুলনায় শিক্ষাদর্শন বিষয়ে যথেষ্ট সংখ্যায় উন্নতমানের গবেষণা হয়নি।

শিক্ষা এবং দর্শন এই বিষয় দুটি এত গভীর এবং অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত যে কেবলমাত্র শিক্ষা শব্দটি ব্যবহার করলেও তার পশ্চাৎপটে দর্শন বিষয়টি উঠে আসে। প্রকৃতপক্ষে সত্যকে জানতে হলে দর্শন বিষয়ে গবেষণা করা জরুরী। Voltaire- এর মতে "The discovery of what is true and the practice of that which is good are the two most important objects of philosophy"।

প্রায়োগিক গবেষণার ক্ষেত্র সমূহ যেমন সত্যকে খুঁজে বার করে তেমনি দর্শন তথা শিক্ষাদর্শনের গবেষণাও মানব কল্যাণ এবং উন্নয়নের পথকে প্রশস্ত করে। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণার মৌলিক ভিত্তি ছিল দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক প্রকৃতির। অ্যারিস্টটলের শিষ্য অ্যারিস্টোজিনাস (Aristoxenus) দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক প্রকৃতির মৌলিক গবেষণার বিষয়ে বলেছেন,

"An Indian seeker met Socrates in Athens and asked the industrious savant, 'What is the scope of your philosophy?' Soctrates replied, 'An enquiry into the phenomenon that is

man.' The Indian loughed and then explained to the perplexed philosopher, 'How can you make any inquiry into the phenomenon that is man without first knowing God'?"

ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকেই শিক্ষাপদ্ধতির কেন্দ্রে ছিল দর্শনের মৌলিক জ্ঞান। তবে সময়োচিত প্রশিক্ষণ গুলির গুরুত্ব কখনোই হ্রাস করা হয়নি। ব্রিটিশ ভারতে ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে প্রথম শিক্ষাদর্শন বিষয়ে দুটি Ph.D. গবেষণা হয়েছে। ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৮৩ সালের মধ্যে শিক্ষাদর্শনের মোট একাত্তরটি Ph.D.-র জন্য গবেষণা হয়েছে। তবে এই সমস্ত গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল বিভিন্ন শিক্ষা দার্শনিকদের শিক্ষাচিন্তা। Sixth Survey of Research in Education [(N.C.E.R.T.) (২০০০)] পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষা দার্শনিকদের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়া সম্বন্ধে কয়েকটি Ph.D.-র জন্য গবেষণা চোখে পড়েছে। মাকসুদা খাতুন (১৯৯৪) বেগম রোকেয়া সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন। তিনি বেগম রোকেয়ার শিক্ষা ভাবনা এবং তার প্রয়োগ সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন। যদিও ওই সময়কালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রী অরবিন্দ, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহাত্মা গান্ধী, সাবিত্রী বাঈ ফুলে, জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি প্রমুখদের বিষয়ে বহু গবেষণায় হয়েছে। ২০০১ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়াকে নিয়ে অল্প কয়েকটি কাজ হয়েছে। যেমন- গোপা মজুমদার (দাস) (২০১১) নারী প্রগতির ধারায় বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত সম্বন্ধে পিএইচ.ডি. উপাধির জন্য গবেষণা করেন। সমকালীন প্রেক্ষাপটে বেগম রোকেয়ার জীবনী, সাহিত্যচর্চা এবং তাঁর কর্মধারা বিষয়ে দীর্ঘ গবেষণা করেছেন। রেশমা খাতুন (২০১৮) বর্তমান প্রেক্ষিতে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের শিক্ষাভাবনা এবং তার প্রয়োগ বিষয়ে গবেষণা করেছেন।

সান্তনা রায় (১৯৮৭) ভগিনী নিবেদিতার সামাজিক এবং রাজনৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে পিএইচ.ডি. উপাধির জন্য গবেষণা অভিসন্দর্ভ জমা দিয়েছেন। তাঁর মতে আয়ারল্যান্ডের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দ্বারা নিবেদিতা ইংল্যান্ডে থাকাকালীন প্রভাবিত হয়েছিলেন ফলে ভারতভূমিতে নিবেদিতা এসে যখন লক্ষ্য করলেন যে এখানেও স্বাধীনতাকামী ভারতীয়রা ব্রিটিশদের অপশাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবে মেতে উঠেছে, তখন নিবেদিতা সেই বিপ্লবে যোগ দেন।

সুশীল পাল (২০০৯) নিবেদিতার দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতের জাতীয়তাবাদ এবং শিক্ষা নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁর গবেষণার টাইটেল ছিল – "Nationalist Discourse and Education in India: Views of Sister Nivedita"। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে সিস্টার নিবেদিতা ভারতবর্ষের পুনর্জাগরণে যে ভূমিকা পালন করেছিলেন সে সম্বন্ধে এবং ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও নিবেদিতার শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

সম্পর্কিত গবেষণা পর্যালোচনা সমূহের (Review of related literature) গুরুত্ব সম্বন্ধে Krathwohl (1988) বলেছেন, "Review of Literature in any study is not a cup of tea. It requires scholarly maturity. Good review of literature is a sign of professional maturity. It shows one's grasp of the field, one's methodology sophistication in critiquing other's research and the breath and depth of one's reading."

২.১.১ সম্পর্কিত গবেষণা সমূহের পর্যালোচনার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যঃ

১. যে কোন গবেষণার উদ্দেশ্য গঠনে এবং উদ্দেশ্যের পারদর্শিতা অর্জনে সম্পর্কিত গবেষণা সমূহের পর্যালোচনা একটি অন্যতম ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। যখন কোন গবেষক নিজের গবেষণা ক্ষেত্রে যথেষ্ট সংখ্যক গবেষণা পত্র এবং গবেষণা সন্দর্ভকে পর্যালোচনা করেন এবং তার ওপর ভিত্তি করে তার গবেষণার বনিয়াদ তৈরি করেন, তখন সেই গবেষণা যথেষ্ট উন্নত গুণমানের হয়ে ওঠে।

২. সম্পর্কিত গবেষণা সমূহের পর্যালোচনা ফলে গবেষক গবেষণার মূল বনিয়াদটি খুঁজে বের করেন যার উপর ভিত্তি করে তিনি নিরন্তর বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে পারেন।

৩. সম্পর্কিত গবেষণা সমূহের পর্যালোচনাকালে গবেষক যখন সম্পর্কিত গবেষণা গুলির সমালোচনা করেন তখন তিনি বুঝতে পারেন পূর্ববর্তী গবেষকের প্রাপ্ত তথ্যের সঙ্গে বর্তমান গবেষকের প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে কতখানি মিল বা অমিল রয়েছে। একই সঙ্গে গবেষক বুঝতে পারেন প্রতিষ্ঠিত সত্যের সঙ্গে তার গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের কতখানি সম্পর্ক রয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই গবেষক যখন গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করেন, সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুত করেন এবং পরবর্তীকালের গবেষকদের দিশা দেখান তখন সেটি অনেক বেশি বাস্তবসম্মত এবং গ্রহণযোগ্য হয়। সুতরাং সম্পর্কিত সাহিত্য সমূহের পর্যালোচনা সংশ্লিষ্ট গবেষক / গবেষিকাকে গবেষণায় সঠিক পথ দেখায়।

৪. সম্পর্কিত গবেষণা সমূহের পর্যালোচনা করলে গবেষক / গবেষিকা একই কাজের দ্বিত্বকরণ রূপ দোষ থেকে মুক্ত থাকার সুযোগ পান এবং অন্যান্য গবেষক এর কাজের মধ্যে খামতিটুকু খুঁজে বের করার সুযোগ পান। ফলে তাঁর গবেষণা হয়ে ওঠে অনেক বেশি বিজ্ঞানসম্মত।

২.১.২ সম্পর্কিত গবেষণা সমূহের পর্যালোচনার উদ্দেশ্য :

i) সম্পর্কিত গবেষণা সমূহের পর্যালোচনা থেকে গবেষক তাঁর গবেষণা ক্ষেত্রে সীমাগুলি চিহ্নিত এবং সংজ্ঞায়িত করতে পারেন।

ii) সংশ্লিষ্ট সাহিত্য সমূহের পর্যালোচনা দ্বারা গবেষক অপ্রয়োজনীয় সমস্যা গুলিকে চিহ্নিত করতে পারেন এবং ত্যাগ করতে পারেন। তিনি তার গবেষণার পূর্ববর্তী গবেষণার ইতিবাচক ফলগুলিকে নির্বাচন করতে পারেন যেগুলি জ্ঞানের দিক থেকে তাকে সমৃদ্ধ করবে এবং তার গবেষণাকে আরো কার্যকরী করে তুলবে।

iii) সংশ্লিষ্ট সাহিত্যসমূহের পর্যালোচনার মাধ্যমে গবেষক অনিচ্ছাকৃত দ্বিত্বকরণ গুলিকে পরিহার করতে পারেন। যে সকল গবেষণালব্ধ ফলাফল সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সর্বজন গ্রাহ্য বলে স্বীকৃত হয়েছে তিনি সেগুলিকে গবেষণার প্রয়োজনে মাত্র ব্যবহার করতে পারেন।

iv) সংশ্লিষ্ট গবেষণা সমূহের পর্যালোচনা দ্বারা গবেষক গবেষণা পদ্ধতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে সমর্থ হন।

v) সংশ্লিষ্ট গবেষণা সমূহের পর্যালোচনার দ্বারা গবেষক পূর্ববর্তী গবেষকেরা কোন নির্দিষ্ট গবেষণার ক্ষেত্রে কী কী বিষয়ে গবেষণা হওয়া জরুরি বলে মনে করেছেন সে সম্বন্ধে নির্দিষ্ট ধারণা লাভ করেন।

২.২ নিবেদিতা সম্বন্ধে সংঘটিত কিছু গবেষণার পর্যালোচনা :

Banerjee, R. and Biswas, P. (2016) তাদের প্রবন্ধ "The Role of Sister Nivedita in Empowering Women of Modern India" তে আধুনিক ভারতে মেয়েদের ক্ষমতায়নে ভগিনী নিবেদিতার ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। সমগ্র আলোচনাটিকে তাঁরা চারটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন – ১. কর্মযোগী হিসাবে ভগিনী নিবেদিতার ভূমিকা, ২. সমাজসেবী হিসেবে নিবেদিতার ভূমিকা, ৩. নারীর ক্ষমতায়নে ভগিনী নিবেদিতার উদ্যত লেখনীর ভূমিকা এবং ৪. আধুনিক ভারতের মেয়েদের শিক্ষায় নিবেদিতার ভূমিকা। প্রতিটি পর্যায়ে লেখিকারা নিবেদিতার লেখা বই এবং চিঠিপত্রের উপর ভিত্তি করে গবেষণা পত্রটিকে প্রস্তুত করেছেন। সেই যুগে অর্থাৎ ব্রিটিশ ভারতে মেয়েদের শিক্ষা এবং ক্ষমতায়নে নিবেদিতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এখানে আলোচিত হয়েছে।

আচার্য পরমেশ (2017) লেখক তাঁর গবেষণা প্রবন্ধ "নিবেদিতা : অনন্যা অগ্নিকন্যা ও নারীমুক্তির প্রতীক" এ নিবেদিতার নারীমুক্তি ভাবনাকে ব্যাখ্যা করেছেন। স্বামীজী নিবেদিতাকে আহ্বান জানিয়েছিলেন– "হে মহাপ্রাণ, ওঠো জাগো, জগৎ যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছে। তোমার কি নিদ্রা সাজে?" অর্থাৎ স্বামীজী চেয়েছিলেন নিবেদিতা যেন নিজেকে জগতের কল্যাণে নিয়োজিত করেন। নিবেদিতার সেবাদর্শে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন, "নিজেকে এমন করে সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করে দেবার আশ্চর্য ক্ষমতা আমি আর কোন মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই।" আক্ষরিক অর্থে এই কথাগুলি সত্য।

নারী মুক্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে এই বিষয়ে ভগিনী নিবেদিতার নিজস্ব ভাবনা ছিল প্রকট। রেকস্হ্যাম স্কুলে শিক্ষকতা করার সময় মাত্র একুশ বছর বয়সে মার্গারেট নারীর অধিকার সম্বন্ধে ছয়টি প্রবন্ধ লেখেন। ওই প্রবন্ধগুলি একাধিকবার মুদ্রিত হয়ে সমকালীন সমাজে নিজেদের প্রাসঙ্গিকতাকে প্রমাণ করেছে। তৎকালীন ব্রিটেনের নারী মুক্তি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এই প্রবন্ধগুলিকে বিচার করলে পূর্ণাঙ্গ সমাজ গঠনে নিবেদিতার সৃজনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। ছাত্রী জীবনে মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল্ [পরবর্তীকালে ভগিনী নিবেদিতা] ছিলেন সুবক্তা ও সুলেখিকা। শিক্ষিকা হিসাবে তাঁর অনন্যতা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। ১৮৯৫ সালে স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ লাভের পর নিবেদিতার মধ্যে নারী মুক্তি চেতনার স্ফুরণ ঘটে। স্বামীজী বলেছিলেন "পূর্ণ

নারীত্বের আদর্শ পূর্ণ স্বাধীনতা"। স্বামীজীর এই বাণীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভগিনী নিবেদিতা ঝাঁপিয়ে পড়েন নারীমুক্তি আন্দোলনে। নিবেদিতার মনেই মেয়েদের শিক্ষা তাদেরকে বিবেচক নারীতে পরিণত করবে এবং তারা সমাজের নিম্ন শ্রেণি থেকে উচ্চ শ্রেণীতে সাধারণ মানুষকে উন্নীত করতে পারবে। তাঁর মতে প্রকৃত শিক্ষা প্রাপ্ত নারী যথার্থ কর্তব্য পালনের মাধ্যমে নিজের উন্নতি এবং সমাজের উন্নতি ঘটাতে পারবে। নিবেদিতা বুঝেছিলেন নারী মুক্তির অর্থ কেবলমাত্র কতকগুলি নিষ্ঠুর প্রথা থেকে মুক্ত হওয়া নয়। উপযুক্ত শিক্ষালাভ করে মেয়েরা নিজেদের স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন হবে। নারীমুক্তি ব্যতীত নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়।

মুখোপাধ্যায়, অদিতি (২০১৭) তাঁর প্রবন্ধ "পরিবেশ ভাবনায় এবং নারী শিক্ষার জাগরণে ভগিনী নিবেদিতা"- তে নিবেদিতার নারী শিক্ষা এবং নারীর জাগরণ সম্বন্ধে ভাবনাকে প্রকাশ করেছেন। লেখিকার মতে, "সনাতন ভারতবর্ষে শিক্ষা, সমাজ, আদর্শ, সংস্কৃতিকে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে এবং ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে উন্মেষ ও উত্তরণের লক্ষ্যে সাফল্য মণ্ডিত হতে হলে ভারত নিবেদিত প্রাণা ভগিনী নিবেদিতার চিন্তাধারা, কর্ম ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে তাঁকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। বিদুষী, বাস্তববাদী, ক্ষুরধার বুদ্ধি ও মেধা সম্পন্ন এই মহীয়সী নারী ভারতবর্ষে উত্তরণের সোপানগুলি চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন, তা হল আমাদের জাতীয়তাবোধ, জাতীয় চেতনার পুনর্জাগরণ এবং সর্বোপরি নারী জাতির পুনরুত্থান। তাঁর মতে, নারী এবং পুরুষ উভয়ের প্রচেষ্টা ছাড়া সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব নয়। আর এজন্য প্রয়োজন ভারতবর্ষে নারীজাতির অভ্যুত্থান। নিবেদিতার মতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন নারী শিক্ষা, তাহলেই আসবে নারী মুক্তি এবং নারী স্বাধীনতা।

লেখিকা আরো জানিয়েছেন যে, নারী শিক্ষা প্রসঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আন্তর্জাতিক। নিবেদিতার মতে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা হবে জাতীয়তা ভিত্তিক এবং পরবর্তী স্তরে তা হবে আন্তর্জাতিক স্তরের। নিবেদিতার শিক্ষায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এক অদ্ভুত মেলবন্ধন লক্ষ্য করা যায়। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, প্রকৃত শিক্ষা সমস্ত সংকীর্ণতা দূরীভূত করে প্রকৃত মানবতার পথে তাকে উন্নীত করবে। সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে, শক্তিশালী শোষকের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে সাহস যোগাবে। নিবেদিতা লিখেছেন, "...the question that had to be solved for Indian women, therefore, is a form of education that might attain this and of developing the faculties of soul and mind in harmony with one another. One such a

form shall be successfully thought out and its adequacy demonstrated, we shall without further, have an era amongst us of women's education.”

Swami Balabhadrananda (2018)। লেখক “Sister Nivedita’s Concept of National Education in India” প্রবন্ধে ভগিনী নিবেদিতার জাতীয় শিক্ষা ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে নিবেদিতার বক্তব্য খুবই স্পষ্ট। লেখক এই প্রসঙ্গে নিবেদিতার উদ্ধৃতিকে তুলে ধরেছেন। “Education! Ah, that is the problem of India. How to give true education, national education: how to make you full men, true sons of Bharatvarsha and not poor copies of Europe? Your education should be an education of the heart and the spirit and of the spirit as much as of the brain; it should be a living connection between yourselves and your past as well as modern world.” লেখক দেখিয়েছেন যে, নিবেদিতার মতে জাতীয় শিক্ষা বলতে প্রাচীন ভারতে সমস্ত শিক্ষা যা যুগে যুগে বিকশিত হয়েছে এবং যা পাশ্চাত্যের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে মিশ্রিত করে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা হবে। এর দ্বারা ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীরা হয়ে উঠবে প্রকৃত ভারতবর্ষীয়। ফলে এই শিক্ষা তাদের হৃদয় এবং বৌদ্ধিক সামর্থ্যকে বিকশিত করবে এবং অন্তর আত্মাকে জাগ্রত করবে। ভারতবর্ষের প্রতি নিবেদিতা ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান। স্বামীজীর আহ্বানে ভারতে আসার পূর্বে তের বছর তিনি ইংল্যান্ডের ছয়টি স্কুলে শিক্ষিকা তথা শিক্ষাবিদ হিসেবে কর্মরতা ছিলেন। এর মধ্যে শেষের স্কুলটি তিনি নিজের হাতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নিবেদিতা পাশ্চাত্যের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে যেমন জেনেছিলেন তেমনি বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে এসে ভারতীয় আত্মাকে স্পর্শ করতে পেরেছিলেন এবং ভারতবর্ষে যুগ যুগ ধরে চলে আসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে অন্তর থেকে গ্রহণ করেছিলেন। তাই নিবেদিতার মধ্যে আমরা দেখি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে যা কিছু সুন্দর, নির্মল এবং পবিত্র তার বুদ্ধিদীপ্ত প্রকাশ। সঠিক অর্থেই নিবেদিতা হয়ে উঠেছিলেন এক আন্তর্জাতিক ব্যক্তিময়ী নারী, আর এর জন্য প্রয়োজন ছিল তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের বজ্রকঠিন ব্যক্তিত্বের স্পর্শ। নিবেদিতা লক্ষ্য করেছিলেন স্বামীজীর জীবনচর্চা এবং তাঁর প্রতিটি বাণীর মধ্যে ছিল জাতীয়তাবাদের ভাবনা। স্বামীজী হয়ে উঠেছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ জাতীয়তাবাদী। স্বামীজী এবং নিবেদিতা দুজনেই অনুভব করেছিলেন জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাকে।

স্বামীজী এবং নিবেদিতা উভয়ের মত ছিল জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিক শিক্ষার সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্তি লাভ করবে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা অনুভব করবে স্বদেশ প্রেম এবং স্বদেশের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতাকে। নিবেদিতা বিশ্বাস করতেন যে সমগ্র ভারতভূমিতে যত রকমের সমস্যা রয়েছে তার মধ্যে তাদের প্রধান সমস্যা হল স্বদেশবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত করা এমনকি অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা থেকে এই সমস্যা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন, "...the practical process and the economic disaster are only side-issues; ...the one essential that is realization of her (India's) Nationality by the Nation." কারণ মানুষ যখন প্রকৃত অর্থে জাতীয়তাবাদী হয়ে উঠবে তখন তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাতীয় প্রয়োজনীয়তার দিকে নজর দেবে এবং ভবিষ্যতে নিজেরাই জাতীয় স্তরের সমস্ত সমস্যার সমাধান করবে। তাই নিবেদিতার কথায় – "The whole task now is to give the word Nationality to India– in all its breadth and meaning. The rest will do itself. India must be obsessed by this great conception. Hindu and Mohammedan must become one in it, with a passionate admiration of each other. It means new views of history, of custom, and it means the assimilation of the whole Ramakrishna-Vivekananda in Religion– the synthesis of all religious ideas." নিবেদিতার মতে নারী শিক্ষা বলতে মেয়েদের ক্ষমতায়ন এবং মুক্তির পথকে বোঝায়। তাঁর মতে উপনিষদের ভাবধারার সঙ্গে আধুনিক যুগের ভাবধারার সংমিশ্রণে জাতীয় শিক্ষা তৈরি সম্ভব। জাতীয় শিক্ষায় হিন্দু এবং মুসলমানের সমান গুরুত্ব থাকবে। তাঁর কথায়, "You must love the different communities in India. Love them where you differ most. For a nationality all things are necessary. Singly each community is a crippled and maimed limb... the Indian people has a great future in all world by its very complexity."

Mukherjee, Saradindu (2018)। প্রাবন্ধিক তাঁর লেখা প্রবন্ধ "A Message for the Youth of India : Relevance of Sister Nivedita's Teachings in the 21st Century"- এ নিবেদিতার শিক্ষাদান পদ্ধতির

আজও প্রাসঙ্গিকতা কতখানি সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। শিক্ষার উপাদান এবং শিক্ষার অর্থ সম্বন্ধে নিবেদিতার ব্যাখ্যা হল–

“Evidently Education–that process which is not merely the activity of the reading and writing mill, but all the preparedness that life brings us for all the functions that life demands of us - Education is vitally determined by circumstances of place.” নিবেদিতার মতে যে কোন জ্ঞানের মৌলিক ভিত্তিটি হল মানুষ যেন তাদের নিকট ভৌগোলিক পরিবেশকে ভালোভাবে জানতে পারে। কারণ যে কোন সমাজব্যবস্থায় সামাজিক গঠন শারীরিক শ্রমের উপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে শ্রমিক অবশ্যই কোন নির্দিষ্ট স্থানে বাস করে আর এভাবেই আমরা আমাদের চিন্তন এবং আদর্শের গোপন তথ্যগুলিকে জানতে সমর্থ হই। নিবেদিতার মতে আমাদের জাতীয়তাবাদের মূল সুরটি বাধা রয়েছে গীতা নামক পবিত্র গ্রন্থে। নিবেদিতা লক্ষ্য করেছেন ভারতীয়দের নামের মধ্যেই তাদের প্রাচীন সম্পদের সন্ধান লুকিয়ে রয়েছে। ভারতীয়দের চিন্তনের মধ্যে দার্শনিক চিন্তা এবং বিজ্ঞান এসেছে একটি মুদ্রার এপিঠ ওপিঠের ন্যায়। লেখক জানিয়েছেন যে, নিবেদিতা প্রতিদিনের জীবনের ছোট ছোট ঘটনা থেকে ছাত্রীদের পাঠদান করতেন। বসা, শৃঙ্খলা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ওপর নিবেদিতার নজর ছিল সর্বদাই সতর্ক। বই মুখস্থ করা বিদ্যা পছন্দ করতেন না। প্রতিটি শিক্ষার্থীর ভিতরে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত সম্ভাবনাকে তিনি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। নিবেদিতা ভারতীয়দের দ্বারা ভারতের নিজস্ব ইতিহাস রচনার উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। প্রত্যেকে যেন নিজেকে জানতে পারে অন্যথায় অন্যকে জানা তার পক্ষে কিভাবে সম্ভব? নিবেদিতার শিক্ষাদানের পদ্ধতি তাঁর নিজস্ব মননশীলতার ফসল। পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য ভাবধারার সমস্ত সৌন্দর্য এবং সম্পদকে তিনি একত্রিত করেছেন তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি রচনা করবার কালে।

Basak, S. (1992) “Sister Nivedita and Women's Education in Bengal in the First Decade of the 20th Century”- বিষয়ে গবেষণা করেন। এই গবেষণা পত্রে গবেষক নিবেদিতার ব্যক্তিত্ব এবং এর শিক্ষাগত প্রভাবের বিভিন্ন দিক অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মধ্যে সবচেয়ে বহুমুখী ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। নিবেদিতা ছিলেন একজন আইরিশ

ভদ্রমহিলা। 1898 সালের জানুয়ারিতে তিনি ভারতে এসেছিলেন। প্রাথমিকভাবে মেয়েদের শিক্ষামূলক কাজে সহায়তা করার জন্য তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সবচেয়ে নিবেদিত পশ্চিমা শিষ্যা হয়ে ওঠেন। এই গবেষণাপত্রের মূল লক্ষ্য ছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলায় নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে ভগিনী নিবেদিতার ভূমিকা খুঁজে বের করা এবং মূল্যায়ন করা।

নিবেদিতার শিক্ষামূলক প্রকল্প প্রথম থেকেই অর্থের অভাবের মধ্যে ভুগছিল। কাশ্মীরের মহারাজা এবং নিবেদিতার নিজের সঞ্চয় থেকে স্বামীজীকে দেওয়া সামান্য অর্থ দিয়ে স্কুলটি শুরু হয়েছিল। কিন্তু এর কোনো স্থায়ী তহবিল বা আয়ের কোনো স্থায়ী উৎস ছিল না। বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা এক টাকা মাসিক ফিও শিশুরা কেউ দেয়নি। এই আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য নিবেদিতা স্বামীজীর পরামর্শে তাঁর স্কুলের তহবিল সংগ্রহের জন্য আমেরিকায় বক্তৃতা ভ্রমণে রওনা হন।

উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিবেদিতা তাঁর মেয়েদের বিভিন্ন হস্তশিল্প -- আঁকা, চিত্রাঙ্কন এবং সূঁচের কাজে তাদের দক্ষতা বিকাশের জন্য উৎসাহিত করতেন। তিনি অত্যন্ত মূল্যবান কাগজে এবং কাদামাটিতে তাঁর মেয়েদের দ্বারা তৈরি স্বতঃস্ফূর্ত নকশাগুলি গর্বের সাথে বহিরাগতদের কাছে প্রদর্শন করেছিলেন। ড্রিলস এবং গেমসও চালু করা হয়েছিল। ১৯১০ সালে, কম্পাউন্ডে একটি বর্গাকার লন যোগ করা হয়েছিল, যাতে তাঁর 'ছোট হিন্দু মেয়েরা তাদের শাড়ি পরে বিকেল 4 টায় ব্যাডমিন্টন খেলতে পারে'। মাঝে মাঝে, নিবেদিতা ছাত্রীদের জন্য ছোট পিকনিক এবং আউটিংয়ের ব্যবস্থা করতেন। প্রবীণদেরকে মিউজিয়াম ও চিড়িয়াখানা দেখাতে নিয়ে যেতেন তিনি। এগুলি ছিল সংক্ষিপ্ত শিক্ষামূলক ভ্রমণ যা জ্ঞানের সঙ্গে ঘটত আনন্দের সংমিশ্রন।

এইভাবে 'নিবেদিতার স্কুল', আর্থিক দৈন্যতা সত্ত্বেও উন্নতি করতে থাকে (দার্জিলিংয়ে নিবেদিতার অকালমৃত্যু পর্যন্ত, অক্টোবর, 1911)। 1918 সালে স্কুলটি রামকৃষ্ণ মিশনের সাথে অধিভুক্ত হয় এবং এর নাম দেওয়া হয়- 'রামকৃষ্ণ মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল'। বর্তমানে, এটি 'রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল' নামে পরিচিত কারণ এটি শ্রী সারদা মঠের সন্ন্যাসিনীদের দ্বারা পরিচালিত হয়।

আমাদের আরও মনে রাখা উচিত যে ভগিনী নিবেদিতা নিজের অজান্তে, একজন শিক্ষাবিদ এবং একজন সমাজ সংস্কারকের দ্বৈত ভূমিকায় মিলিত হয়েছিলেন। গবেষক যখন কলকাতার বাগবাজার এলাকায় তাঁর স্কুলে যোগদানকারী ছোট মেয়ে এবং প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের গঠন বিশ্লেষণ করেন - দুটি জিনিস স্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসে। প্রথমত, তাঁর 'কিন্ডারগার্টেন' স্কুলের শিশুরা ব্যাপকভাবে বিভিন্ন বর্ণ এবং সামাজিক পটভূমি থেকে এসেছিল, যদিও তারা সাধারণভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। নিবেদিতা এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন, যেটি তাঁর স্কুলের অন্তর্গত। তিনি তাঁর স্কুলে যোগদানকারী প্রতিটি শিশুর জাতিগত সম্পর্ক এবং সামাজিক পটভূমি উল্লেখ করেছেন; তাদের উপস্থিতি, অগ্রগতি, যোগ্যতা এবং সাধারণ আচরণ তাঁর নিজের রেজিস্টারে সাবধানতার সাথে লিপিবদ্ধ করেছেন।

সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় নিবেদিতাঃ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের বাংলার হিন্দু সমাজের আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মর্মস্পর্শী বিষয় ছিল বিধবা। স্কুলের প্রাপ্তবয়স্ক বিভাগে যোগদান করতে আসা অল্পবয়সী মেয়েদের একটি বড় সংখ্যক ছিল বাল্য বিধবা। নিবেদিতার সহানুভূতি এবং দয়ার কোন সীমা ছিল না, যখন তিনি এই মেয়েদের সাথে আচরণ করতেন। প্রফুল্লমুখী এবং গিরিবালা ঘোষের মতো বাল্য বিধবারা নিবেদিতার কাছ থেকে স্নেহপূর্ণ মনোযোগ পেয়েছিলেন, যখন তিনি তাদের বাড়িতে গিয়ে অভিভাবকদের কাছে অনুরোধ করেছিলেন যাতে তাঁরা তাঁদের মেয়েদের স্বাভাবিক স্কুল সময়ের বাইরেও স্কুলে থাকতে দেয়। শিক্ষাবিদ ও শিক্ষিকা নিবেদিতা এখানে ঊনবিংশ শতাব্দীর মহান সমাজ সংস্কারক ও মানবতাবাদী পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মিশে গেছেন।

ভগিনী নিবেদিতার গার্লস স্কুল একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজন পূরণ করেছে। কারন বাংলার দরিদ্র, গোঁড়া, অশিক্ষিত নারীদের একটি অংশকে জাতীয় মূল স্রোতে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ যখন মার্গারেট নোবেলকে তাঁর দেশের মহিলাদের জন্য কাজ করার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তখন তাঁর মনে যে স্বপ্ন ছিল তাকে বাস্তব রূপ দিয়েছেন নিবেদিতা। কৃতিত্ব যে তিনি তাঁর বুদ্ধিমত্তা, শিক্ষাগত গভীরতা এবং পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের সাথে, বাঙালি নারীদের এই অংশের সাথে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে একীভূত করতে পেরেছিলেন। তিনি

তাঁদেরই একজন হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের ভালোবাসা, সম্মান এবং আস্থা অর্জন করেছিলেন এবং আমাদের দেশে নারী উন্নয়নের জন্য অসামান্য উৎসর্গের উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন।

Biswas, S. (2014) "From Noble to Nivedita: Sister Nivedita and Her Passages Through India, 1895-1911"- বিষয়ে গবেষণা করেন। এই গবেষণাপত্রটি বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের স্কটিশ জন্মগ্রহণকারী আইরিশ শিষ্যা মার্গারেট নোবেলের (1867-1911) 1896-পরবর্তী জীবন এবং ভগিনী নিবেদিতা হিসাবে জনজীবনে তাঁর পরবর্তী স্বীকৃতির উপর আলোচনা করেছে।

নোবেল, বিবেকানন্দকে তাঁর গুরু হিসাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং তাঁর আধ্যাত্মিক এবং শারীরিক শক্তি বিনিয়োগের জন্য একটি ক্ষেত্র হিসাবে ভারতকে বেছে নিয়েছিলেন এবং নেওয়ার পরে 1898 সালের 20শে জানুয়ারী তিনি ভারতে এসেছিলেন স্বামীজির আহ্বানে। তার প্রাথমিক বছরগুলি তীর্থস্থান পরিদর্শন, বক্তৃতায় অংশ নেওয়া এবং বাংলা ও ভারতের বুদ্ধিজীবীদের সাথে নতুন পরিচিতি তৈরিতে ব্যয় হয়েছিল। তাঁর প্রাথমিক চিঠিপত্রের বেশিরভাগই এই প্রথম ইমপ্রেশনের উল্লেখ করে যা তাকে একটি অপরিচিত ভৌগলিক এবং সাংস্কৃতিক ল্যান্ডস্কেপ নিয়ে আলোচনা করতে সক্ষম করেছিল। যাইহোক, এটি তাঁর নিজের দেশের সাথে মাঝে মাঝে সামান্য মিল ছিল যা একটি 'বাড়ির মতো অনুভূতি' তৈরি করেছিল। এই ধরনের মিলগুলি প্রায়শই খুব মৌলিক হতে পারে, তবুও ভারত থেকে তাঁর প্রাথমিক চিঠিতে এই সাদৃশ্যপূর্ণ উল্লেখগুলি ছিল যা বিবেকানন্দের বৃত্তের মধ্যে তাঁর আমেরিকান এবং ব্রিটিশ বন্ধুদের সাথে বিশেষভাবে সারা বুল, মিসেস হ্যামন্ড, জোসেফাইন ম্যাক্লিওড এবং ক্রিস্টিন গ্রিনস্টিডেলকে অনুরাগীভাবে মনে রাখা হয়েছিল।

1898-1900 সালে তাঁকে কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট বক্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা গিয়েছিল। শহরের বিশিষ্ট পাবলিক প্ল্যাটফর্মগুলিতে তাঁর প্রবেশাধিকার তাঁকে ব্রাহ্ম সমাজের (আদি এবং নববিধান উভয় দলই) বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্যের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এনে দেয় - বিপিন চন্দ্র পাল, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বসু পরিবারগুলির যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল। হিন্দু ধর্মের 'বিশ্ব' নেতা হিসাবে বিবেকানন্দের উঠে আসার বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের স্বীকৃতি ছিল অস্পষ্ট। তাঁর পরবর্তী জীবনে, কেশব চন্দ্র

সেন রামকৃষ্ণের কাছাকাছি চলে গিয়েছিলেন এবং তাঁর সঙ্গ চেয়েছিলেন, কিন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজের মনোভাব বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি ছিল শুষ্ক এবং কঠিন।

ভারতমাতার চেতনার মূর্ত প্রতীক হিসেবে নিবেদিতার আবেদন শুধু কলকাতার যুবকদেরই অনুপ্রাণিত করেনি তার বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। যেমন আর. সি. মজুমদার চরমপন্থী রাজনীতির দিকে আকৃষ্ট হন, সি. সুব্রহ্মনিয়া ভারতী, একজন অগ্রগামী আধুনিক তামিল কবি এবং সাংবাদিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। নিবেদিতার ভারতীর জীবনীকার, প্রেমা নন্দকুমার এই বৈঠকটিকে স্বদেশী আন্দোলন এবং নারী শিক্ষার প্রচেষ্টার দ্বারা অনুপ্রাণিত চরমপন্থী মতাদর্শের সাথে ভারতীয় উপলব্ধি এবং সম্পৃক্ততার একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের জন্য দায়ী করেছেন। 1907 সাল নাগাদ, ভারতী পত্রিকা মাদ্রাজে তিলক, লাজপত রায়, অরবিন্দ এবং বিপিন চন্দ্র পালের দ্বারা উত্থাপিত চরমপন্থী রাজনীতির বার্তা সংগঠিত করতে ও প্রচার করতে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ে।

O'Doherty, M. (2018) "Sister Nivedita—A Psychological Reassessment"- বিষয়ে গবেষণা করেছেন। এই গবেষণা পত্রে গবেষক নিবেদিতার চিঠি গুলির দ্বারা তাঁর ব্যক্তিত্ব তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে তিনি ছিলেন একজন জটিল এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তি। তিনি একজন সন্ত নারী হিসেবে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। তিনি 1895 সালে বৈদান্তিক স্বামী বিবেকানন্দকে অনুসরণ করেছিলেন, তাঁকে গুরু হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং ভারতীয় মহিলাদের শিক্ষার জন্য স্বামীজীর দ্বারা নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন। তিনি ড্যাংগ্যাননে জন্মগ্রহণ করলেও আইরিশ ইতিহাসের খুব কম তাঁর লেখায় রয়েছে কারণ তার প্রধান কাজ ছিল ভারতে।

নিবেদিতা তাঁর সমস্ত শক্তি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জন্য ব্যয় করেছিলেন। তিনি একজন সক্রিয় বিপ্লবী ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের সর্বোত্তম প্রকাশ সম্ভবত লক্ষ্য করি তার সংগৃহীত চিঠিগুলিতে। তিনি নিজেকে বিভিন্ন মানুষের কাছে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছিলেন। চিঠিপত্রের বাইরে তিনি রাজনীতি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেছিলেন। অন্যদের কাছে তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে খুব কমই বলেছেন। তিনি এমন একজন বুদ্ধি দীপ্ত এবং চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব ছিলেন যার আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ষোল বছর বয়সে শেষ হয়েছিল। নিবেদিতা হাজার হাজার চিঠি লিখেছিলেন এবং

মাঝে মাঝে তাঁর নিজের মেজাজের পরিবর্তন এবং পুরুষদের সাথে তাঁর বন্ধুত্বে অসুবিধা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন চিঠিপত্রে। বিবেকানন্দ তাঁর অন্যতম শিষ্যা নিবেদিতাকে দিয়েছেন আত্মিক শক্তি, ভারত মাতার প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য ও ভালোবাসা এবং সনাতন হিন্দু শাস্ত্র সমূহ এবং বেদান্ত সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসা। কখনও স্বামীজী ভগিনী নিবেদিতাকে যেমন কাছে টেনে নিয়েছেন তেমনি কখনও তাঁকে দূরে ঠেলে দিয়েছেন, জাতে নিবেদিতা নিজের ভেতরের অনন্ত শক্তিকে অনুভব করতে পারেন এবং নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেন।

নিবেদিতা, যদিও অত্যন্ত ধার্মিক তবুও প্রায়শই সন্দেহ করতেন যে তিনি পবিত্রতার পথে আছেন কিনা ? বিবেকানন্দ তাঁকে যে জীবনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন তার প্রতি তিনি সত্য এবং একনিষ্ঠ কিনা? এটি কেবল অস্থির রহস্যবাদীর 'অন্ধকার রাত' ছিল না; এটি একটি উপলব্ধি ছিল যে তিনি আধ্যাত্মিক যাত্রা বা সাধনার চেয়ে সাংবাদিকতা এবং সক্রিয়তায় নিজেকে অধিক নিবেদিত করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত ধর্মতত্ত্ব বেশিরভাগই ছিল আধ্যাত্মবাদ এবং খ্রিস্ট বিজ্ঞান - বেদান্ত নয়। বিবেকানন্দ তাঁর খ্রিস্ট বিজ্ঞানের বিশ্বাসকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করেননি, কারণ তিনি শিখিয়েছিলেন যে, সমস্ত আধ্যাত্মিক রাস্তাই মানুষকে একই জ্ঞানের দিকে পরিচালিত করে। তিনি রহস্যময় অভিজ্ঞতার জন্য কোনও দাবি করেননি, এমনকি এই সত্যের জন্য শোক প্রকাশ করেছিলেন যে অন্যরা 'ঘোমটার আড়ালে' থেকে বিবেকানন্দের বার্তা পেয়েছিলেন যখন তিনি পাননি। এটি অবশ্যই তাঁর জন্য একটি ধাক্কার মতো এসেছিল যে বিবেকানন্দ তাঁর বন্ধু বিপ্লবী অরবিন্দকে তাঁর কারাগারে হাজির করেছিলেন, যদিও পরে, র‍্যার্টক্লিফের কাছে একটি চিঠিতে (21 জুলাই 1909), তিনি অরবিন্দের বিশ্বাসকে উপহাস করেছিলেন যে ঈশ্বরের কাছ থেকে তার মিশন রক্ষা করা হোক।

ভারতে থাকাকালীন নিবেদিতা তিনবার ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি আবার ইংল্যান্ডে র‍্যাটক্লিফের সাথে দেখা করেন এবং তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত তাঁর সাথে চিঠিতে যোগাযোগ রাখেন। চিঠিগুলি তিনি একজন সাংবাদিক হিসাবে লিখেছিলেন- যেখানে প্রকাশিত তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং উদার হাস্যরস প্রয়োগ এর ক্ষমতা। এই চিঠিগুলিতে অন্যান্য সংবাদদাতাদের থেকে তাঁর স্বর ছিল আলাদা। সাধারন ভাবে সাংবাদিকরা

হয় রাজনৈতিকভাবে চতুর এবং তাদের হাস্যরস প্রায়ই অতি নিম্ন গুনমানের হয়। র‍্যাটক্লিফই একমাত্র যার সাথে তিনি বাংলায় বিপ্লবী কার্যকলাপ সম্পর্কে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি শেয়ার করেন, এবং তিনি খুব কমই অন্যদের কাছে তাঁর ভয়ের কথা উল্লেখ করেন যে পুলিশ তাঁকে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য সন্দেহ করছে এবং তাঁকে কোনো বিপদে ফেলতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, তিনি জোসেফাইন ম্যাকলিওডকে ধমক দিয়েছিলেন যে তাঁর রাজনৈতিকভাবে সক্রিয়তাকে যেন সর্বদা অস্বীকার করা হয়। একই সময়ে, তিনি প্যারিসে অবস্থিত একজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদীর প্রতি তার অবজ্ঞা প্রকাশ করে র‍্যাটক্লিফকে অকপটে লিখেছিলেন: 'কৃষ্ণবর্মা শ্যামজিকে অবশেষে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে শুনে আমার যে কি পরিমান আনন্দ অনুভব করা উচিত তা আপনাকে বলা অসম্ভব।'

তাঁর নিজের কাজ ছিল বেশিরভাগই লেখা এবং পড়ানো। তাঁর নিজের বই ছাড়াও, তিনি বিবেকানন্দের কাজগুলি সম্পাদনা করেছিলেন এবং জীববিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর সাথে কাজ করেছিলেন যেখানে তাঁর বইগুলিতে উদ্ভিদের মধ্যে চেতনা প্রমাণ করতে লেখায় সাহায্য করে । তিনি র‍্যাটক্লিফের জন্য সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন, শুধুমাত্র তাঁকে কোন প্রস্তাব করেননি বরং তাঁকে আমেরিকার দিকে নির্দেশ করেছিলেন ম্যাগাজিন এবং তাঁর কর্মজীবনে সাহায্য করার জন্য।

Biswas, I. (2020) এর গবেষণার শিরোনাম- “Sister Nivedita and the Upliftment of Indian Women.” এই গবেষণায় গবেষক অনুসন্ধান করেছেন যে সিস্টার নিবেদিতা ছিলেন ভারতের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে তিনি নিখুঁত জীবনধারা খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি ইউরোপ থেকে ভারতে এসেছিলেন শুধুমাত্র সুবিধাবঞ্চিত ভারতীয়দের সাহায্য করার জন্য। স্বামীজী তার নাম দেন 'নিবেদিতা'। তিনি নারী শিক্ষার জন্য অনেক কাজ করেছেন। তাঁর বিশেষ ধরনের শিক্ষণ পদ্ধতি এবং উদারতা তাঁর স্কুলকে খুব জনপ্রিয় করে তুলেছিল। নিবেদিতা শুধু একজন শিক্ষিকাই ছিলেন না, একজন সমাজ সংস্কারকও ছিলেন। ভারতীয় সমাজে তাঁর অবদান অসাধারণ। উদারভাবে তিনি ভারতের অগ্রগতির জন্য তাঁর সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেন। এই গবেষণাপত্রটি মূলত নারী শিক্ষায় নিবেদিতার অবদান এবং একজন সমাজ সংস্কারকের ভূমিকার ওপর আলোকপাত করেছে । গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ১. নারী শিক্ষা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি

আলোচনা করা। ২. নারী শিক্ষায় ভগিনী নিবেদিতার আবেগপ্রবণ কাজের ভূমিকা আলোচনা করা। ৩. ভারতীয় সমাজের প্রতি ভগিনী নিবেদিতার ভক্তি ব্যাখ্যা করা।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় মহিলাদের করুণ অবস্থা নিয়ে ভীষণ ভাবে চিন্তিত ছিলেন। তিনি নিবেদিতাকে তাদের উন্নতির দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেছিলেন। নিবেদিতা স্বামীজীর একজন মহান অনুসারী ছিলেন এবং তিনি কখনই তাঁর প্রস্তাব অমান্য করেননি। কলকাতায় পৌঁছে স্বামীজীর আশা পূরণের চেষ্টা করেন। নারী শিক্ষার জন্য তিনি বাগবাজারে একটি স্কুল চালু করেন। তিনি জানতেন যে এই উদ্যোগটি কিছু নির্দিষ্ট সময়ের, কিন্তু বিশ্বাস করতেন যে এটি ভবিষ্যতে প্রসারিত হবে। নিবেদিতা লক্ষ্য করেছিলেন যে নিরক্ষরতা এবং কুসংস্কার ভারতীয় সমাজের দুটি প্রধান অসুবিধা। এই ধরনের মনোভাবই ভারতের পশ্চাৎপদতার প্রধান কারণ। নারীরাও সমাজের একটি অংশ, তাই সম্পূর্ণ উন্নতির জন্য তাদের উন্নতি অপরিহার্য।

নিবেদিতা ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে একটি অনন্য গুণ লক্ষ্য করেছিলেন। তারা নিরলসভাবে এবং নিঃস্বার্থভাবে তাদের পরিবারের সেবা করে। সকাল থেকে শুরু হওয়া কাজ চলে রাত পর্যন্ত। তারা পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তাদের নিজস্ব ইচ্ছা এবং সুখ বিসর্জন দেয়। নারীত্বের এই ঐতিহ্য নিবেদিতাকে বিস্মিত করে। তিনি ভারতীয় মহিলাদের প্রকৃতিতে ভক্তি লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি তাদের জীবনকে উন্নত করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে চান। তিনি কখনই ভারতীয় মহিলাদের কাছে পশ্চিমী জীবনযাপনের প্রস্তাব দিতে চাননি। তিনি তাদের ধর্মীয় চেতনা ও সহনশীলতার প্রশংসা করেন। প্রাচ্যের বই পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন নিবেদিতা। তাঁর মতে, সাহিত্যের এই অংশগুলি নারীর মনকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করতে পারে। তিনি ভারতীয় নারীদের পবিত্রতা ও নির্দোষ গুনকে বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, পরিবারের বড়দের সম্মান করার আদর্শ একটি মহান গুণ। তিনি এগুলি শুধু হিন্দু মহিলাদের জন্যই নয়, মুসলিম মহিলাদের জন্যও বলেছিলেন। নিবেদিতা সব নারীকে বোন বলে ডাকতেন। তিনি দেখেন যে ভারত বৈচিত্র্যময় ধর্মের দেশ । নিবেদিতার মতে, ব্যাপক উন্নয়ন ভবিষ্যৎ শিক্ষার উপর নির্ভর করে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ভারত রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য শিল্প ও বাণিজ্যের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তবে উন্নতি শুধুমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তিদের দ্বারাই সম্ভব হবে।

কারিগরি শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, তবে জাতির অগ্রগতির জন্য উন্নত গবেষণারও প্রয়োজন রয়েছে । তিনি উচ্চ গবেষণা ছাড়া কারিগরি শিক্ষাকে বৃক্ষবিহীন শাখা, শিকড়বিহীন পুষ্পের মতো বলে উল্লেখ করেছেন। একটি উন্নত জাতির জন্য সর্বদা সম্পূর্ণ অগ্রগতি প্রয়োজন। তিনি মানবিক ঐক্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি শক্ত ও সাহসী হয়ে দাঁড়াবে। শিক্ষা সেই স্ব-প্রদর্শিত অবস্থায় পৌঁছানোর প্রবেশদ্বার।

ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন একজন মহানুভব, মমতাময়ী, গতিশীল মহিলা। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের একজন মহান ভক্ত ছিলেন। বিবেকানন্দের জীবনদর্শন তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি ভারতে এসে স্বামীজীর দেখানো পথে হাঁটতে শুরু করেন।। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে শিক্ষার মাধ্যমে ভারতীয় মহিলাদের দুর্ভোগ বন্ধ হয়ে যাবে । নারী শিক্ষায় ভগিনী নিবেদিতার অবদান গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

Rai, S. (2018) এর গবেষণার শিরোনাম-'Indian Education System: A Comprehensive Analysis by Sister Nivedita'. এই গবেষণা নিবন্ধে গবেষক ভগিনী নিবেদিতার মতে প্রকৃত ভারতীয় শিক্ষার দিকগুলি নিয়ে গবেষণা করেছেন। এখানে 'প্রকৃত শিক্ষা'এর অর্থ হল মানবতার প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সঠিক শিক্ষার পথ তৈরির অপরিহার্য উপাদানগুলির উপর জোর দেওয়া। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর গভীর বিশ্লেষণ এবং গভীর গবেষণার পর, শেখার সহায়ক সরঞ্জাম, শেখার উদ্দেশ্য এবং শেখার ফলাফল, এই তিনটি মৌলিক উপাদান ভারতের জাতীয় শিক্ষার উপর তাঁর রচনায় বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। শিক্ষার ধারণার পিছনে অবশ্যই একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি থাকতে হবে যাকে তিনি 'শিক্ষার আত্মা' বলে অভিহিত করেন যা হৃদয়কে প্রশিক্ষিত করে এবং মনকেও প্রশিক্ষিত করে। তিনি মনে করতেন শিক্ষাকে জাতি গঠনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা প্রয়োজন। তাঁর মতে শিক্ষার অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে তরুণ প্রজন্মের মনে জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য চিন্তার তরঙ্গ তৈরি করতে হবে। এই ধরনের শিক্ষা লাভ করা একজন মানুষই তাঁর মাতৃভূমির সেবা করবে ।

ভগিনী নিবেদিতা বলেছিলেন যে কোনও নির্দিষ্ট বিষয় শেখার চেয়ে একাগ্রতার প্রশিক্ষণ শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাঁর মতে একটি নিখুঁত শিক্ষায় তিনটি ভিন্ন উপাদান বিবেচনা করা এবং অনুশীলন করা উচিত।

প্রথম উপাদানটি সহায়ক সরঞ্জাম। তবে অনেকেই শিক্ষাগত প্রক্রিয়ার এই ধাপ সম্পর্কে অবগত নন। সৌভাগ্যবশত, ভারতীয় সভ্যতা এই সত্যটি সম্পর্কে সচেতন ছিল যে এটি হল 'মন' যা শিক্ষার প্রাথমিকভাবে মোকাবেলা করা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার উদ্দেশ্য, এটি সাধারণভাবে সমগ্র শিক্ষার কথা বলে যেখানে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য আত্ম উপলব্ধি। এইভাবে অর্জিত সমসাময়িক জ্ঞান বিশ্বব্যাপী শিক্ষিত মনের সাথে যোগাযোগের ভিত্তি তৈরি করে। একবার উপরের দুটি উপাদান সম্পূর্ণরূপে অর্জিত হলে তা শিক্ষার ফলাফলের দিকে নিয়ে যাবে অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষার জন্য মনকে প্রস্তুত করবে। তৃতীয় অপরিহার্য উপাদান হল নিজেকে একজন গুরুর কাছে সমর্পণ করা। এটি একজন শিক্ষার্থীকে সামগ্রিকভাবে মানবতার সম্পদে অবদান রাখতে প্রস্তুত করে তোলে। এই তৃতীয় প্রধান ফ্যাক্টরটি সাধক এবং বিশ্বের অনেক বিখ্যাত পণ্ডিতদের তৈরি করেছে। শিক্ষার এই ধারণা যা শেষ পর্যন্ত অদ্বৈতবাদে রূপান্তরিত হয়, যা ভগিনী নিবেদিতার একটি অসাধারণ ধারণা! এটি ঋগ্বেদেও উল্লেখ আছে "একং সদ্ বিপ্রা তৎ বহুধা বদন্তি।"

জাতি হল মানুষ-দেশ ও ধর্মের সমন্বয়। যে ব্যক্তি তার জন্মভূমিকে (দেশ) সেবা করতে আগ্রহী এবং সেই মাটিতে জন্মগ্রহণকারী এবং বসবাসকারী মানুষদের অবশ্যই এর ধর্ম বা সভ্যতার সাথে একটি জীবন্ত সংযোগ গড়ে তুলতে হবে। ধর্ম হল প্রধান শক্তি যা প্রচলিত প্রথা এবং বোঝাপড়ার ঐতিহ্যগত চিন্তা ও বিশ্বাসকে একত্রিত করে, যা একটি জৈব এবং ধর্মীয়ভাবে ঐক্যবদ্ধ সমাজ তৈরি করে। এটি একটি জাতির ধর্ম যা সেই জাতির মানুষের চরিত্র এবং ভাগ্যকে গঠন করবে। তাই নিবেদিতার শিক্ষার ধারণা একটি জাতির সন্তানদের হৃদয়ে জাতীয় আদর্শের জীবন্ত উপস্থিতি তৈরি করতে সফল হবে।

সিস্টার নিবেদিতা যে বিষয়ে জোর দিয়েছিলেন তার মধ্যে একটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে, বিদেশী সংস্কৃতির স্থানটি প্রকৃত শিক্ষাব্যবস্থার শুরুতে কখনই নয়। প্রকৃত অগ্রগতি ঘটাতে হবে জানা থেকে অজানা, অন্তরঙ্গ থেকে দূর, নিকট থেকে দূর পর্যন্ত। ভারতীয় পিতামাতারা প্রায়ই তাদের সন্তানকে বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জনের জন্য বিদেশে যেতে দেন! কিন্তু ছেলেটি ভারত ছাড়ার আগে তাকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে: ১• বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলি অর্জন করা। 2• বিদেশে অধ্যয়ন করা বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক সমস্ত স্বদেশী

পদ্ধতি শেখা। ৩• আদিম শিল্পকে তার নিজের আধুনিক শিক্ষার সাপেক্ষে বিচার করা। ৪• আন্তঃ ব্যবধান বিশ্লেষণ করণ। ৫• অধ্যয়ন এবং পরীক্ষাকরণ।

ভগিনী নিবেদিতা পশ্চিমারা যা দিতে চেয়েছিলেন তার সেরাটাই পেয়েছিলেন এবং ভারতীয় শিক্ষাকে যে নতুন পথের দিকে অগ্রসর হতে হবে সে সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা ভীষণ স্পষ্ট। তিনি বলেন, পশ্চিমারা শ্রেষ্ঠ কারণ তারা যে কোনো দিকে মহান ঐক্যবদ্ধ শক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করে- এমনকি স্ব-শিক্ষার ক্ষেত্রেও। এই ভারতকে পশ্চিমাদের থেকে শিক্ষা নিতে হবে। জার্মানি বা আমেরিকার তুলনায়, ভারত তার জনসংখ্যার প্রতি হাজারে বেশি সংখ্যক প্রতিভা তৈরি করে: কিন্তু জার্মানি এবং আমেরিকা জাতীয়তাবাদী সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জগুলি সমাধানের জন্য জাতীয় মনকে অভিমুখী করতে খুব পরিচিত! তাই ভারতীয় সমস্যার প্রতি ভারতীয় মনকে অভিমুখী করা ভারতের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। এর জন্য ব্যক্তি কল্যাণের পরিবর্তে সমাজের কল্যাণের প্রতিস্থাপন করতে হবে। তাই আমাদের ভারতের সন্তানদের পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাগুলি কী তা দেখা এবং ভারতের জাতীয় শিক্ষায় উপযুক্ত পদ্ধতিতে এর বৈশিষ্ট্যগুলিকে একীভূত করা।

ভগিনী নিবেদিতা বিরল শিক্ষাবিদদের মধ্যে একজন যিনি অনুশীলন এবং উপলব্ধি উভয়ের মাধ্যমে ভারতকে অমূল্য সেবা দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে যা কিছু সেরা তার সমন্বয় একটি মহান শিক্ষামূলক আন্দোলনের নিউক্লিয়াস গঠন করবে। প্রাচীনকে আধুনিক করা এবং আধুনিককে জাতীয়করণ করা ভারতীয় শিক্ষার লক্ষ্য। সারাদেশে (ইতিমধ্যে কলকাতা, হায়দ্রাবাদ, মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা এবং গুজরাটে) নিবেদিতার কর্মপদ্ধতি সম্প্রসারণ করাই চ্যালেঞ্জ। তাই ভগিনী নিবেদিতার পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ভারতীয় তরুণদের একক প্রজন্মকে প্রশিক্ষণ দিয়ে, ভারত অবশ্যই বিশ্বের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক নেতা হিসাবে তার প্রকৃত অবস্থানে উঠবে।

Inaga, S. (2004) এর গবেষণার শিরোনাম- Sister Nivedita and Her "Kali The Mother, The Web of Indian Life", and Art Criticism: New Insights into Okakura Kakuzō's Indian Writings and the Function of Art in the Shaping of Nationality. এই নিবন্ধে গবেষক দেখিয়েছেন যে কীভাবে নিবেদিতা ইউরোপ ও ভারতের দোভাষী হয়ে ওঠেন এবং কীভাবে তিনি ভারতীয় ছাত্রদের একটি নতুন

জাতির অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠেন। ভগিনী নিবেদিতার অকাল মৃত্যুর পরপরই আনন্দ কে. কুমারস্বামী তার পান্ডুলিপিগুলি সম্পাদনা করেন এবং 'Myths of The Hindus and Buddhists' শিরোনামে তা প্রকাশ করেন। কুমারস্বামী বইটির মুখবন্ধ শুরু করেছিলেন এই বলে যে "পশ্চিমা বা ভারতীয় পাঠকদের কাছে সিস্টার নিবেদিতার কোনো পরিচয়ের প্রয়োজন নেই"। এইভাবে সিস্টার নিবেদিতা সেই সময়ের পাঠকদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়ে ওঠেন। তিনি যে সমস্ত বই লিখেছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, দ্য ওয়েব অফ ইন্ডিয়ান লাইফ, কালি দা মাদার ইত্যাদি। ভারতীয় ছাত্রীদের কাছে তিনি ছিলেন একটি নতুন জাতি গঠনের অনুপ্রেরণা।

ভগিনী নিবেদিতা ভারতে ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা বা "জাতীয় ন্যায়পরায়ণতা" প্রার্থনা করছেন। তিনি সংকটের মুহুর্তে বারবার উচ্চ আদর্শের পতাকা তুলে ধরার কথা বলেছেন। ভগিনী নিবেদিতার ভবিষ্যৎ বানীটি আংশিকভাবে সংরক্ষিত কিন্তু জোরালো বাগ্মিতার দ্বারা বাস্তবায়িত হয়েছিল, যার মাধ্যমে ভগিনী নিবেদিতা এই শৈল্পিক সাফল্যগুলিকে পাশ্চাত্য মূল্যবোধের রায় এবং প্রাচ্যের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে মুখোমুখি হওয়ার প্রেক্ষাপটে একটি নতুন "ভারতীয়" শিল্প তৈরির বিজয় হিসাবে উদযাপন করেছিলেন।

Sahoo, S. (2018) "Women Empowerment in Bengal and Sister Nivedita: A Sequential Accolade." বিষয়ে গবেষণা করেন। এই গবেষণা পত্রে পশ্চিমবঙ্গের নারীদের অবস্থার পরিবর্তনে নিবেদিতার অবদানের উপর মনোনিবেশ করা হয়েছে। এই গবেষণা পত্রটি ভারত জুড়ে তাঁর শতবর্ষী জন্মবার্ষিকী উদযাপনের প্রাক্কালে, পশ্চিমবঙ্গের পরাধীন নারী ও মেয়ে শিশুদের উন্নতির জন্য একটি অধ্যয়ন। নারীদের শিক্ষাকে সতেজ করার লক্ষ্যে নিবেদিতাকে বিবেকানন্দ কলকাতায় আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কারণ তৎকালীন সমাজে নারীদের যথাযথ শিক্ষা ছাড়াই নিকৃষ্ট অবস্থায় জীবনযাপন করতে হয়েছিল। বর্তমান গবেষণায় প্রধানত নিবেদিতা কীভাবে বাংলায় নারীদেরকে শিক্ষিত করে এবং তাদের স্বনির্ভর হতে শেখানোর মাধ্যমে ক্ষমতায়নের জন্য কিভাবে পরিশ্রম করেছিলেন তার আলোকপাত করা হয়েছে।

বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন যে জ্ঞানীয় ক্ষমতায়ন ছাড়া নারীদের মুক্তির অন্বেষণ শুরু হবে না। আর শিক্ষা হল জ্ঞানীয় ক্ষমতায়নের মূল ভিত্তি। তাই তিনি নিবেদিতার মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়নের পথকে প্রশস্ত করতে চেয়েছিলেন, যিনি 1895 সালে লন্ডনে বিবেকানন্দের সাথে সাক্ষাতের আগে ইতিমধ্যেই সক্রিয়ভাবে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সুইস শিক্ষা সংস্কারক পেস্তালোজি (1746-1827) এবং জার্মান শিক্ষাবিদ ফ্রয়েবেল (1782-1852) এর ধারণা নিয়ে সক্রিয়ভাবে পড়ানোর কাজ শুরু করেছিলেন।। শিশুদের ব্যতিক্রমী চাহিদা এবং অশেষ সম্ভাবনা রয়েছে এই স্বীকৃতির ভিত্তিতে আধুনিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করেছেন। ফ্রয়েবেল এর 'কিন্ডারগার্টেন' নামক শিক্ষার পদ্ধতিটি নিবেদিতাকে ভীষণ ভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং তাই তিনি মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য 13ই নভেম্বর, 1898 সালে কলকাতার বাগবাজার এলাকায় মেয়েদের জন্য একটি স্কুল উদ্বোধন করেন এবং একই পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। মেয়েদের শিক্ষিত করার জন্য তার প্রতিশ্রুতি এতটাই ছিল যে তিনি মেয়েদের স্কুলে যোগদানের জন্য তাদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতে বাড়িতে বাড়িতে যেতেও দ্বিধা করেননি। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর ছাত্রীদেকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় শিক্ষিত করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। তাই, তিনি তাঁর স্কুলে প্রার্থনা হিসাবে 'বন্দে মাতরম' চালু করেছিলেন। একটা সময়ে তাঁর স্কুল গভীর আর্থিক সংকটে ভুগছিল। তাই, নিবেদিতা তার স্কুলে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য 1900 সালে ইংল্যান্ড এবং আমেরিকায় তাঁর বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে ‘রামকৃষ্ণ গিল্ড অফ হেল্প ইন আমেরিকা’ গঠন করেন। তিনি মিস্টার এবং মিসেস লেগেটের কাছে তাঁর ‘রামকৃষ্ণ স্কুল ফর গার্লস প্রকল্প’ লিখেছিলেন, প্রকাশ করেছিলেন এবং পাঠিয়েছিলেন--নিবেদিতাকে তাঁরা স্কুল চালাতে প্রচুর অর্থ সাহায্য করেছিলেন। 1902 সালে বোম্বেতে হিন্দু লেডিস সোশ্যাল ক্লাবে, নিবেদিতাকে "ভারতীয় নারীত্বের গুণাবলী" নিয়ে ভাবতে বলা হয়েছিল। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "আমি মনে করি এই বিষয়ে আপনার সাথে কথা বলা আমার পক্ষ থেকে নিছক কল্পনা হবে কারণ ভারতীয় নারীত্ব আমার চেয়ে আপনারা প্রত্যেকেই ভালভাবে বোঝেন এবং অনুশীলন করেন। এটি নিবেদিতার খুব বিনয়ী মনোভাব; ভারতীয় নারীত্ব সম্পর্কে তার বরং একটি ইতিবাচক ধারণা ছিল যা তিনি গড়ে তুলেছিলেন কারণ তিনি 'আমাদের ন্যায় জীবনযাপন করেছিলেন এবং আমাদের নিজেদের মধ্যে একজন হয়ে আমাদের জানতে পেরেছিলেন'|

একজন নারী হিসেবে নিবেদিতা পুরুষশাসিত সমাজে নারীর দুঃখজনক অবস্থা উপলব্ধি করেছেন এবং অনুভব করেছেন। তিনি পুরুষদের দ্বারা নারীদের পরাধীনতা পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে বাংলায় নারীদেরকে পুরুষের তুলনায় নিকৃষ্ট সব দায়িত্ব বহন করতে হয়। পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করার কথা থাকলেও নারীরা ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী থাকে ঘরোয়া দায়িত্ব পালনের জন্য। তিনি এই ভয়ানক সত্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন যে পুরুষতান্ত্রিক আচরণবিধি পুরুষকে "বিষয়" এবং মহিলাকে "বস্তু" এর অবস্থানে রেখেছে। একজন মহিলার অস্তিত্ব শুধুমাত্র পুরুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত। নিবেদিতার প্রধান লক্ষ্যও নিঃসন্দেহে নারীদের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল যারা দাসত্বকে তাদের ভাগ্য হিসাবে গ্রহণ করে চলেছে । প্যাসিভিটি মহিলাদের একটি অপরিহার্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং এই নিষ্ক্রিয়তা জন্মগতভাবে নির্ধারিত হয় না, বরং সামাজিকভাবে হয়ে থাকে। এইভাবে নিষ্ক্রিয়তা যা 'মেয়েলি' মহিলার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হল একটি বৈশিষ্ট্য যা তার মধ্যে প্রাথমিক বছর থেকেই বিকাশ লাভ করে। কিন্তু জৈবিক ব্যাপারে এটা বলা ভুল; প্রকৃতপক্ষে এটি তার সমাজ দ্বারা তার উপর আরোপিত একটি নিয়তি। তিনি এমন একজন শিক্ষক ছিলেন যিনি নারীদের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা ও অবস্থান গঠনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিলেন। একই সময়ে, নিবেদিতা যেটা বেউভোয়ারের চেয়ে বেশি অনুভব করেছিলেন তা হল একজন মহিলার ‘প্যাসিভিটি’ তাঁর অশিক্ষার কারণেও ঘটে। শিক্ষিত না হলে নারীরা কখনই তাদের অধীনস্ত অবস্থা থেকে নিজেদের মুক্ত ও ক্ষমতায়নের জ্ঞান পাবে না। তাই, নিবেদিতা মনে করেন, শিক্ষা একজন নারীর জ্ঞানীয় ক্ষমতায়নের জন্য অপরিহার্য, যা শেষ পর্যন্ত পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তাকে তার অবস্থার সামগ্রিক উন্নতির দিকে নিয়ে যায়।

ভগিনী নিবেদিতা নিজেই ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান; সাধারণভাবে নারীদের জন্য এবং বিশেষ করে বাংলার নারীদের জন্য তাঁর নিঃস্বার্থ অবদান কখনোই খাটো করা যাবে না। বাংলার নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য শিক্ষিত ও নির্দেশনার মাধ্যমে তিনি বাংলার নারীদের জন্য একটি সিঁড়ি স্থাপন করেছিলেন যার মাধ্যমে তারা তাদের সর্বোত্তম ক্ষমতায়নের ধাপে আরোহণ করতে পারে।

Mallick, S. (2013) "Swami Vivekananda and Sister Nivedita at Crossroads" বিষয়ে গবেষণা করেছেন। এই গবেষণা অধ্যয়নে গবেষক ভগিনী নিবেদিতা এবং স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়টি তুলে ধরেছেন এবং তাঁদের বিজয় এবং ট্র্যাজেডিগুলি সত্যিকারের মানুষ গড়ে তোলার জন্য কতখানি বাস্তব তা তুলে ধরেছেন। নিবেদিতা ছিলেন একজন প্রগতিশীল এবং আদর্শবাদী। তাঁর ভারতবর্ষের হিন্দুদের জন্য একটি স্থায়ী ভালোবাসা ছিল, এবং এটি ছিল মূলত বিবেকানন্দের আদর্শের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার কারণে। নিবেদিতা সবচেয়ে সুখী এবং পরিপূর্ণ হতেন যদি তিনি স্বামীজী কে আজীবন সঙ্গী হিসেবে পেতেন। কিন্তু যখন তিনি তাঁর গুরুর ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তিনি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অন্যদিকে "স্বামীজী ছিলেন একজন ত্যাগী পুরুষ। ভগিনী নিবেদিতা বলেন, "তিনি বিবাহ এবং ব্যক্তিগত প্রেমকে অবমাননা করেন এবং স্বীকার করেন যে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক মা ও সন্তানের মধ্যে সম্পর্কের মতোই অর্থপূর্ণ। তিনি বিয়ে করতেন শুধুমাত্র তাঁর মায়ের সুখের জন্য, তবে তাঁর বিবাহযোগ্য বয়স পেরিয়ে যায় এবং তিনি চেয়েছিলেন সেই স্বাধীনতা যা সমস্ত আইন ভঙ্গ করে অর্জিত হয়েছিল। তিনি শেক্সপিয়রের রোমিও এবং জুলিয়েট পড়ে বিশেষভাবে উপভোগ করেছিলেন। কখনও কখনও তিনি একজন বলিদানকারী বীর, এক প্রকার ক্রুশবিদ্ধ দেবতা বা বেদনাদায়ক প্রমিথিউসের আত্ম-প্রতিমূর্তি তুলে ধরতেন, যা ঈশ্বরী মায়ের দ্বারা মানবজাতির কল্যাণের জন্য আত্মত্যাগের উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল।

বিবেকানন্দও নিশ্চয়ই মনোমুগ্ধকর এই উদ্যমী যুবতীর ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। "প্রকৃতপক্ষে", যেমন লিজেল রেমন্ড উল্লেখ করেছেন, "মার্গারেট প্রায় একজন সুদর্শনা, বাকপটু, এবং সুন্দর সাজে সজ্জিত যুবতী সন্ন্যাসিনী ছিলেন। বহু অনুষ্ঠানে, কথোপকথনের সময়, বিবেকানন্দ অসংখ্য দাবী এবং ইঙ্গিত করেছেন, নোবলকে একজন বীরত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসাবে ভাবতে উৎসাহিত করেছেন"। স্বামীজীই প্রথম মার্গারেটকে ভারতের জনগণের উন্নতির জন্য তার জীবন উৎসর্গ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং তাকে প্রয়োজনীয় সমস্ত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই আমন্ত্রণে তিনি এতটাই অভিভূত হয়েছিলেন যে তাঁর সন্তুষ্টির সাথে তিনি নিঃসংকোচে এবং নিঃশর্তভাবে তাঁকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন।

নিবেদিতা (মার্গরেটের নতুন নাম) আসলে কখনোই একজন ত্যাগীর কর্মজীবনে বিশ্বাস করেননি। তিনি ভাল পোশাক এবং কলকাতার অভিজাতদের সঙ্গ পছন্দ করতেন এবং নারীত্ব এবং স্ত্রীর ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় মতামত ছিল। এমনকি 'লিঙ্গের মিলন' সম্পর্কে তিনি বেশ স্পষ্টবাদী ছিলেন। সম্ভবত তিনি ভারতে বিবেকানন্দের সাথে কাজ করার জন্য স্থায়ীভাবে বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং তাঁকে বোঝানো হয়েছিল যে তাঁর দায়িত্ব সামাজিক কাজ এবং নারী শিক্ষার মধ্যে থাকবে। তিনি তাঁর উত্তর কলকাতার স্কুলে মুষ্টিমেয় কিছু দরিদ্র শিশুদের ইংরেজি শেখানোর পক্ষপাতী ছিলেন না, এবং সেই কাজ দ্বারা তিনি নিরুৎসাহিত হয়েছিলেন। তাঁর কার্যকলাপগুলি বহু প্রকারের ছিল যা তাঁর জীবনকে একটি নতুন মাত্রা দিয়েছিল এবং জীবনের এক একটি বিশেষ দিক উন্মোচন করেছিল। ভগিনী নিবেদিতার জীবনের এক একটি দিক শিক্ষার এক একটি কোর্স, শক্তির পাঠ এবং ভক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এইভাবে ভারতে আগমন ছিল সত্যিকার অর্থে তাঁর জীবনের একটি উপলব্ধি। অদ্বৈত বেদান্তের প্রভাবে উঠে আসা ধর্মীয় দর্শন দ্বারা একটি সত্য কে নিবেদিতা অনুভব করেছিলেন যা শ্রী রামকৃষ্ণ দ্বারা শুদ্ধ, একীভূত এবং প্রশংসিত। স্বামী বিবেকানন্দ এই বেদান্তকে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। নিবেদিতা এবং তাঁর গুরুর বর্ণনার মাধ্যমে আমরা স্বামীজীর মধ্যে দেখেছিলাম যোগীর একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের রহস্য, সেই রহস্যময় আধ্যাত্মিক ধন যা ভারত হাজার হাজার বছর ধরে যত্ন সহকারে নির্ধারণ করেছে।

Mukherjee, P. A (2017) এর গবেষণার শিরোনাম- “Sister Nivedita’s Vision on Education in India.” এই গবেষণায় গবেষক অনুসন্ধান করেছেন যে, ভগিনী নিবেদিতার কাছে ভারতবর্ষ ছিল একটি আদর্শ, একটি কিংবদন্তি, একটি প্রতীক, একটি আন্দোলন, একটি চিন্তা। অত্যন্ত যত্ন সহকারে তিনি ভারতীয় জীবনধারা, চিন্তাভাবনা, শিল্পকলা এবং স্থাপত্য অধ্যয়ন করেছিলেন যাতে তিনি তাঁর গুরু তাঁকে দিয়ে যে দায়িত্ব পালন করাতে চেয়েছিলেন তা পালন করার জন্য তিনি যেন পুরোপুরি প্রস্তুত হতে পারেন। দৃষ্টিভঙ্গি গত দিক থেকে তিনি পুরোপুরি 'ভারতীয়' হয়ে উঠেছিলেন এবং একজন প্রগতিশীল ভারতীয়ের চেয়ে ভারতকে তিনি বেশি ভালোবেসেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে নিবেদিতা ভারতীয় জনজীবনের অনেক বিবরণ পড়েন এবং উপলব্ধি করার

চেষ্টা করেন। বর্তমান এই গবেষণাতে ভারতে নিবেদিতার দৃষ্টিভঙ্গি এবং শিক্ষার আদর্শ নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

তিনি তার চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন যে, ভারতে নতুন জীবন এবং শক্তি সঞ্চার করার জন্য একটি পথ অনুসরণ করা উচিত যাতে ভারতীয়রা একটি গতিশীল জাতি হয়ে উঠতে পারে। এবং এটিই ছিল প্রতিটি ভারতীয়র লালিত স্বপ্ন।

ভগিনী নিবেদিতার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সর্বাঙ্গীণ এবং ভারতের জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে তার ধারণা নিছক কোন রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, শিল্প উন্নয়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, শিক্ষা এবং লোকসংস্কৃতিও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি এটিকে কেবল জাতীয় আন্দোলন নয়, জাতীয়তাবাদ বলে অভিহিত করেছেন এবং তিনি এই জাতীয়তাবাদকে জাতীয় নবজাগরণ হিসাবে দাবি করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের ভারতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তির উপর একটি পুনরুত্থিত ভারত গড়ার ভাবনা তাঁর মধ্যে ছিল। এক দশক ধরে ছড়িয়ে থাকা তাঁর কার্যকলাপের সময়কালে এটিকে একটি কার্যকরী আকার দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে ‘জনগণের মা’ (লোকমাতা) বলে ডাকতেন, ডক্টর জগদীশ চন্দ্র বসু তাঁকে 'লেডি অফ দ্য ল্যাম্প'-এর সাথে তুলনা করেছিলেন এবং শ্রী অরবিন্দ ভেবেছিলেন তিনি 'অগ্নি' (শিখাময়ী)। তিনি গোখলে ও তিলকের দার্শনিক এবং পথপ্রদর্শক এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নন্দলাল বসুর ‘মহাশ্বেতা’ ছিলেন । ডন সোসাইটির যুবকরাও তাঁর নামে শপথ করতেন। নিবেদিতা স্বামীজীর প্রত্যাশা পূরণে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

নিবেদিতা প্রান্তিক জনসাধারণ এবং উপেক্ষিত নারীদের শিক্ষিত করার কাজে নিছক দায়িত্ববোধই নয়; তিনি বরং তাঁর আভ্যন্তরীণ আত্মার নির্দেশ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। নিবেদিতা বুঝতে পেরেছিলেন যে শিক্ষাই ভারতের প্রধান সমস্যা। কীভাবে সম্পূর্ণ মানুষ হতে হবে, ভারতের সত্যিকারের সন্তান হতে হবে—এটির সম্পর্কে অজ্ঞতায় ছিল ভারতবাসীর মূল সমস্যা। শিক্ষা অবশ্যই অপরিহার্য আত্মার মতো হতে হবে এবং এটি অবশ্যই অতীত এবং আধুনিক বিশ্বের মধ্যে একটি সংযোগ স্থাপন করবে। শিক্ষার পরিকল্পনাটি এমনভাবে প্রস্তুত করা উচিত যা কেবল হৃদয়হীন যান্ত্রিক প্রাণী নয়, প্রকৃত ভারতীয় এবং মানুষ তৈরি করবে ।

নিবেদিতা এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে, সনাতন ধর্ম কখনই বিজ্ঞান বা মুক্ত চিন্তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়নি। কেউ ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে পারে আবার কেউ নাও করতে পারে, কিন্তু যতদিন একজন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুন সম্পন্ন মানুষ থাকবেন, ততদিন একজনকে জাতির আদর্শ হিসেবে জনসাধারণের কাছে পূজিত ও সম্মানিত করা যাবে। বুদ্ধ কোন ব্যক্তিগত ঈশ্বরে বিশ্বাস করেননি তবুও তাঁকে অবতার হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কপিল ব্যক্তিগত ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না; তাঁর সাংখ্য পদ্ধতিতে তিনি বলেছিলেন, 'একজন ব্যক্তিগত ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ নেই যিনি মহাবিশ্বের স্রষ্টা। নিবেদিতা বুঝতে পেরেছিলেন যে মুক্তচিন্তা প্রাচীনকালে হিন্দুদের প্রহরী ছিল। প্রাচীনকালে ভারতীয়দের মধ্যে কোন ধর্মান্ধতা ছিল না, কোন সাম্প্রদায়িকতা ছিল না; তাঁরা বেদ বলতে একগুচ্ছ বইকে বোঝাননি বরং বেদের প্রতিটি অক্ষরকে সত্য বলে মেনে নিয়ে ছিলেন। বেদ বলতে তাঁরা বুঝিয়েছেন প্রজ্ঞা ও সত্যকে।

Pramanik, S. (2018) এর গবেষণার শিরোনাম ছিল-- "Nivedita: The Lady with the Lamp--an Incarnation of Empowered Woman."- এই বিষয়ে গবেষণা করেছেন। এই গবেষণাপত্রে ভগিনী নিবেদিতার জীবন, ভূমিকা ও কর্মকাণ্ড তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি মেয়েদের শিক্ষিত করার ইচ্ছা নিয়ে একটি বালিকা বিদ্যালয় সংগঠিত করেন এবং ভারতীয় মেয়েদের শিক্ষার জন্য ঐতিহ্যগত ভারতীয় মূল্যবোধগুলিকে একত্রিত করেন, যা "পারিবারিক আদর্শ" দ্বারা প্রতিফলিত হয়েছে । নিবেদিতা মনে করতেন যে ইতিহাস অধ্যয়নের মাধ্যমে বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ, ভূগোল এবং বিজ্ঞান অধ্যয়নের মাধ্যমে "নাগরিক আদর্শ" এর মূল ভিত্তিকে গঠন করে। 1897 থেকে 1911 সালের মধ্যে ভারতে প্রায় 14 বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে নিবেদিতা জাতীয় কর্মের প্রধান ক্ষেত্রগুলিতে স্থায়ী অবদান রেখেছিলেন যা প্রাথমিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সংজ্ঞায়িত করেছিল। তিনি একজন নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মী হিসেবে কলকাতায় প্লেগ মহামারীর আক্রমনের সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি কেন্দ্রে "বজ্র" সহ জাতীয় পতাকার একটি প্রোটোটাইপ ডিজাইন করেছিলেন এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মেই সেই প্রতীকটির কেন্দ্রীয়তা এবং শক্তির একটি বিশদ বিবরন লিখেছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার মতো বিদেশী আর কেউ থাকতে পারে না, যিনি নিঃশর্তভাবে ভারতকে

ভালোবেসেছেন এবং ভারতীয় সমাজের জন্য আদর্শ হয়ে উঠেছিলেন। স্বামীজীর একনিষ্ঠ শিষ্যা হিসেবে তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ। একজন মেটাফিজিশিয়ান হিসাবে, তিনি মহাবিশ্বের রহস্যের একজন আগ্রহী পাঠিকা ছিলেন। লেখিকা হিসেবে তিনি ছিলেন অতুলনীয়া । একজন বিপ্লবী হিসেবে তিনি ছিলেন নির্ভীক। বিজ্ঞানের গভীর উপলব্ধির সাথে, একজন বিজ্ঞানমনস্ক দার্শনিক হিসাবে, তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ । একজন সমাজকর্মী হিসেবে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। সূচিকর্ম থেকে শুরু করে আধুনিক বিজ্ঞান পর্যন্ত যা কিছু সর্বোত্তম সব বিষয়ে ছিল তাঁর গভীর আগ্রহ।

নিবেদিতা স্বামীজীর কাছ থেকে আধ্যাত্মিকতা এবং সেবা করার দীক্ষা পেয়েছিলেন। তাকে নিবেদিতা নাম দেওয়া হয়েছিল "ঈশ্বরের প্রতি উৎসর্গীকৃত" হিসেবে। তিনি প্রথম পশ্চিমী মহিলা ছিলেন যাকে একজন ভারতীয় সন্ন্যাসীনি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ সেই সময় দেশের উত্তর এবং পশ্চিম অংশে ধর্ম, ইতিহাস, ভূগোল এবং জাতিতত্ত্বের উপর বক্তৃতা করেছিলেন। নিবেদিতা তাঁর আত্মার বাড়ি এবং নিয়তি খুঁজে পেয়েছিলেন এই ভারতবর্ষে। নিবেদিতা উল্লেখ করেছেন যে স্বামীজীর প্রতিটি বক্তৃতায় তিনি মুগ্ধ ছিলেন। 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম'-এ তিনি তাঁর গুরু সম্পর্কে লিখেছেন:- তাঁর এই আলোচনায়, রাজপুতের বীরত্ব, শিখদের বিশ্বাস , মহরতদের সাহস, সাধুদের ভক্তি, এবং মহৎ নারীদের পবিত্রতা ও অবিচলতা, সবই পুনরায় জেগে উঠেছিল ।

মেয়েদের বিশেষ করে হিন্দু বিধবা যাঁদের জীবন অসম্মানজনক হয়ে উঠেছিল তাঁদের শিক্ষিত করার ইচ্ছা নিয়ে নিবেদিতা একটি বালিকা বিদ্যালয় খোলেন। 1898 সালের 13 নভেম্বর কলকাতার বাগবাজার এলাকার 16 বোসপাড়া লেনে কালী পুজোর দিন তিনি স্কুল চালু করেন। স্বামী বিবেকানন্দ, এবং শ্রী রামকৃষ্ণের অন্যান্য শিষ্যদের উপস্থিতিতে সারদা দেবী স্কুলটি উদ্বোধন করেছিলেন। সারদা দেবীর সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাত তাঁর জন্য একটি দুর্দান্ত বিস্ময় ছিল। মা সারদা নিবেদিতাকে আমার মেয়ে বলে স্নেহের সাথে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন প্রথম দর্শনে। নিবেদিতা ছিলেন সারদা মায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। পবিত্র মা সারদা দেবী স্কুল খুলতে এসে আশীর্বাদ করলেন, “আমি প্রার্থনা করি যে, ঐশ্বরিক মায়ের আশীর্বাদ স্কুল এবং মেয়েদের উপর বর্ষিত হোক;

এবং স্কুল থেকে প্রশিক্ষিত মেয়েরা আদর্শ মেয়ে হয়ে উঠতে পারে"। সারদা দেবীর প্রতি নিবেদিতার শ্রদ্ধা প্রতিফলিত হয়েছিল এই বাক্যে। "তিনি সত্যিই সবচেয়ে সহজ, সবচেয়ে নিরীহ ছদ্মবেশে, একজন শক্তিশালী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নারী।" নিবেদিতার নিবেদন একটি কারণের জন্য এতটাই ছিল যে তিনি মেয়েদের স্কুলে যোগদানের জন্য বাড়িতে বাড়িতে যেতেন। ভগিনী নিবেদিতা সর্বদা তাঁর ছাত্রীদের জাতীয়তাবাদী চেতনায় শিক্ষিত করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি তার স্কুলে প্রার্থনা হিসেবে 'বন্দে মাতরম' গান গাওয়ার প্রচলন করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ভারতীয় মেয়েদের শিক্ষার জন্য ঐতিহ্যগত ভারতীয় মূল্যবোধের সমন্বয় করা উচিত - যা "পারিবারিক আদর্শ" দ্বারা প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি ইতিহাস, ভূগোল এবং বিজ্ঞানের অধ্যয়নের মাধ্যমে বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ এর কথা বলেছেন এবং তিনি এই বিষয়গুলিকে আধুনিক শিক্ষার মূল ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন।

তিনি বিবেকানন্দের 'মানুষ-গড়ার'- ধারণাকে 'জাতি-গঠন'-এর মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি ভারতে "জাতীয়তার"- ধারণাটি চালু করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে শুরু করেছিলেন এবং এটিকে মানুষের হৃদয়ে ও মনের মধ্যে স্থাপন করেছিলেন। তাঁর জাতীয়তার সংজ্ঞার অর্থ হল মানুষ এই ভূমিকে তাদের আধ্যাত্মিক আবাস হিসাবে অনুভব করবে, চিহ্নিত করবে এবং এটিকে নাগরিকের আত্ম-ধারণার একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে তুলে ধরবে। তাঁর কাছে এটি ছিল জাতীয়তার সর্বোচ্চ রূপ, যা নাগরিক সমাজের গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে, জাতির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে না।

কঠোর পরিশ্রম তাঁর স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে শুরু করে। ভগিনী নিবেদিতা 28 অক্টোবর 1867 সালে আয়ারল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন এবং 13 অক্টোবর 1911 সালে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিংয়ে 43 বছর বয়সে মারা যান। মাটির কন্যাকে সম্মান জানাতে, যেখানে তাঁকে দাহ করা হয়েছিল সেই পবিত্র স্থানে পরে একটি সমাধি উত্থাপিত হয়েছে।

Rani, S.L.T. (2020) এর গবেষণার শিরোনাম- "Sister Nivedita: The Embracer of India: ভগিনী নিবেদিতা, একজন আইরিশ ভদ্রমহিলা শুধুমাত্র ভারতীয় সংস্কৃতিকে সম্মান করেননি, তিনি এটিকে একটি নতুন পথের দিশা দেখিয়েছেন। তিনি ভারতে তাঁর সেবার বাহন হিসেবে শিক্ষাকে বেছে নিয়েছিলেন। তৎকালীন অনেক ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর বিপরীতে গিয়েছিলেন নিবেদিতা যাঁরা পশ্চিমা শিক্ষাকে প্রচলিত সামাজিক কুফল দূর করার একমাত্র উপায় বলে মনে করতেন। তাঁর শিক্ষার ধারণাটির মাধ্যমে দেশীয় ঐতিহ্য রচিত হয়েছিল এবং তিনি কখনোই পুরোনো সবকিছুকে উপড়ে ফেলা এবং নতুনকে নতুন করে নতুনভাবে প্রতিস্থাপন করার পক্ষপাতী ছিলেন না। মেয়েরা তার কাজের কেন্দ্রবিন্দুতে অনেক বেশি জায়গা জুড়ে ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে ভারতীয় মহিলারা, প্রচলিত ধারণার বিপরীতে, অজ্ঞ নয়। তারা একটি অনন্য উপায়ে ক্ষমতায়িত হয়েছিল এবং তাদের চরিত্র, বিশ্বাস, করুণা এবং অন্যদের প্রতি সেবার অপরিসীম শক্তি ছিল। তিনি তাঁদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার চেষ্টা করেছেন। এমনকি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তিনি 1906 সালে কলকাতার প্লেগ এবং বাংলার দুর্ভিক্ষের সময় দরিদ্র ও নিঃস্বদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

তিনি ভারতীয় মহিলাদের সম্পর্কে সবসময় একটি ভালো দৃষ্টিভঙ্গি রাখতেন এবং তাঁর মূল ভিত্তি ছিলেন পবিত্র মা সারদা দেবী। তাঁকে অনুসরণ করে তিনি আত্মত্যাগ এবং নিঃস্বার্থতা শিখেছিলেন। মা ছিলেন তাঁর হৃদয়ের সবচেয়ে কাছের এবং তিনি ছিলেন মায়ের প্রিয় 'খুকি'। তাঁর উপস্থিতিতে তিনি মায়ের স্নেহের মধ্যে একটি শিশুর মতো আচরণ করেছিলেন, তিনি তাঁর জন্য তৈরি করা ছোট উপহারগুলি স্বাদরে গ্রহন করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, "আমার কাছে সর্বদাই মনে হয়েছে যে তিনি ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ হিসেবে শ্রী রামকৃষ্ণের শেষ কথা"।

নিবেদিতা সর্বদা ভারতের মহিলাদের "আমাদের মহিলা" বলে সম্বোধন করেছেন। তিনি সবসময় ভারতীয় স্ত্রীর বিশ্বস্ততা এবং ভারতীয় মায়ের সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ এবং প্রেমময় প্রকৃতির প্রশংসা করেছেন। তিনি এই ধারণার বিরুদ্ধে ছিলেন যে ভারতীয় নারীরা অজ্ঞ এবং নির্যাতিত। মাদ্রাজ মহিলা সমাবেশের জন্য লেখা একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন যে 'স্বামী বিবেকানন্দের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ভারতের ভবিষ্যত ভারতীয় পুরুষদের চেয়ে ভারতীয় মহিলাদের উপর বেশি নির্ভর করে'। তিনি চেয়েছিলেন যে তাঁরা শিক্ষিত হোন তবে এটি একটি জাতীয়

এবং সৃজনশীল শিক্ষা হওয়া উচিত। সে সময় যেসব নারী বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতেন তাঁরা কেবল পশ্চিমা চিন্তাধারা ও সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তিনি এমন শিক্ষা চেয়েছিলেন যেখানে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও জাতির অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে পারবে। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে ভারতীয় নারীদের তপস্বীনীতে থাকা উচিত এবং জাতি গঠনে তাঁদের পরিবারের উদ্বেগকে প্রসারিত করে জাতি গঠনে অংশগ্রহণ করা উচিত। পরিবারের যত্ন নেওয়ার উদ্দেশ্য হবে জাতির শক্তিতে অবদান রাখা।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্যয় থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে যে নারীরা একটি জাতির অগ্রগতির মূলে রয়েছে, তিনি তাদের শিক্ষার প্রতি তাঁর প্রচেষ্টাকে উৎসর্গ করেছিলেন। তবে নেটিজেনদের সাথে আচরণ করার সময় তিনি একটি শ্রেষ্ঠত্বের পদ্ধতি অবলম্বন করেন। ভারতে তাঁর প্রথম বক্তৃতার সময় তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে তিনি ভারতের সেবা করার জন্য সেখানে ছিলেন। পশ্চিমে প্রচুর সাহিত্যিক, বুদ্ধিমত্তা এবং উচ্চতা থাকা সত্ত্বেও এটি ভারতের অন্তর্নিহিত মহত্ত্ব এবং প্রজ্ঞা যা তাঁকে এই ভূমিতে নিয়ে এসেছে এবং তিনি বিবেচনা করেছিলেন যে তার নিজের শিক্ষা সবে শুরু হয়েছিল। শিক্ষকতা নিবেদিতার হৃদয়ের খুব কাছাকাছি ছিল এবং তিনি যাত্রা শুরু করার আগে এই বিষয়ে নতুন ভিত্তি তৈরি করেছিলেন। বিবেকানন্দের (যিনি 1895-96 সালে লন্ডনে অধিবেশন করেছিলেন) নিবেদিতাকে যেটি আকৃষ্ট করেছিল তা কেবল বেদান্তের উপর তাঁর বক্তৃতাই নয়, ভারতে মেয়েদের শিক্ষার বিষয়েও তাঁর চিন্তাভাবনা ছিল। নিবেদিতা যিনি তার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তেরো বছর ভারতে কাটিয়েছেন, 1898 সালে একটি স্কুল খোলেন, দ্বারে দ্বারে গিয়ে পিতামাতার কাছে তাদের মেয়েদেরকে তাঁর স্কুলে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেছিলেন। নিবেদিতা তাঁর প্রচেষ্টায় অবিচল ছিলেন এবং স্কুলে উচ্চ উপস্থিতি দেখতে শুরু করেন। স্বল্প সম্পদের সাথে কাজ করলেও, তিনি তাঁদের মনে জ্ঞানের ভান্ডার স্থাপন করেছিলেন যা চিন্তা ও সামাজিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে অন্বেষণের নতুন ক্ষেত্র উন্মুক্ত করেছিল, তাঁদের অস্তিত্ব এবং প্রভাবের বৃত্তকে প্রশস্ত করেছিল। স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামে মহিলাদের পরবর্তী অংশগ্রহণের ভিত্তি তৈরী করেছিলেন নিবেদিতা।

মানবতাবাদী হিসেবে নিবেদিতার কাজও ছিল অসাধারণ। 1899 সালে কলকাতায় প্লেগ প্রাদুর্ভাবের সময় এবং 1906 সালের ইস্ট বেঙ্গল দুর্ভিক্ষের সময় তিনি তার নিজের জীবনকে একটি বড় বিপদের মধ্যে ফেলেছিলেন। পূর্ব বাংলার দুর্ভিক্ষের সময় বহু কষ্ট স্বীকার করে পল্লীতে তাঁর দায়িত্ব পালনের পর তিনি একটি সংক্রমণে

আক্রান্ত হন। ম্যালেরিয়ার মারাত্মক রূপ পুনরুদ্ধার করতে তাঁর অনেক সময় লেগে যায় এবং ম্যালেরিয়া তাঁর স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। অবশেষে এটিই তাঁকে অকাল মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যিনি তাঁকে কাছ থেকে দেখেছিলেন এবং "তার অসাধারণ শক্তি অনুভব করেছিলেন",তাঁকে "লোকা মাতা" (জনগণের মা) বলে উল্লেখ করেছিলেন।

Banerjee, S. N. (2021) এর গবেষণার শিরোনাম- "Nivedita: Religion and Society – An Impeccable Act of Civic Service by The Sister During Calcutta Plague Pandemic". এই গবেষণায় গবেষক মৌলিক শিক্ষার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন এর বিষয়টি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছেন এবং এ বিষয়ে তৎকালীন ভারতের সামাজিক ও সাহিত্যের অগ্রগতিতে ভগিনী নিবেদিতার অবদানকে তুলে ধরেছেন। তবে তাঁর প্রধান কাজ ছিল তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের মতামত এবং ধর্মীয় চিন্তাধারাকে প্রচার করা এবং সেই কারনেই তিনি ভারতকে তাঁর স্থায়ী কাজের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। ভারতীয় সমাজে প্রচলিত রক্ষণশীলতা, অজ্ঞতা এবং নিরক্ষরতার কারণে স্বামীজীর বার্তাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করা তাঁর জন্য মোটেও মসৃণ যাত্রা ছিল না।সেই কাজ করতে গিয়ে তিনি বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। মার্গারেট 28শে জানুয়ারী 1898 তারিখে ভারতে এসেছিলেন, যখন প্লেগের প্রাদুর্ভাব ইতিমধ্যেই বোম্বে শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল। মহামারীর ব্যবস্থাপনায় নিবেদিতা আমাদের সমাজ তাঁর নির্ভীক এবং নিরলস সেবার জন্য সমাজ সংস্কারে তাঁর অবদান ভীষণ ভাবে স্মরণীয়।

মিস মার্গারেট নোবল্ 28শে জানুয়ারী 1898-এ ভারতের মাটি স্পর্শ করেছিলেন এবং স্বামী বিবেকানন্দ ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে স্বাগত জানান । মার্গারেটের আগমনের অনেক আগে থেকেই বোম্বে প্লেগ (1896) এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। স্বামীজীর আহ্বান এতটাই প্রবল ছিল যে, নিজের জীবনের নিরাপত্তার দিকে কোনো খেয়াল না করেই তিনি তাঁর পরিবার ও জন্মভূমি ছেড়ে গুরুর সঙ্গে কাজ করার জন্য মনস্থির করেছিলেন। 17 ফেব্রুয়ারী, 1898 তারিখে মার্গারেট ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল পরিদর্শন করেন এবং স্কুলের ইনচার্জের সাথে পরিচয় করেন। ভারতে তাঁর নিযুক্তির প্রাথমিক উদ্দেশ্যই ছিল নারী শিক্ষার প্রসার। মার্গারেট 11 ই মার্চ 1898 তারিখে কলকাতার স্টার থিয়েটারে রামকৃষ্ণ মিশন দ্বারা সংগঠিত এবং স্বামী বিবেকানন্দের সভাপতিত্বে একটি সেমিনারে

প্রথম জনসাধারণের কাছে আত্ম প্রকাশ করেন। শ্রোতাদের সাথে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়ে, স্বামীজী তাঁর "ভারতের জন্য একটি উপহার" বর্ণনা করেছিলেন। ইংল্যান্ডে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের প্রসারের উপর তাঁর বক্তৃতা সেই সভায় উপস্থিত বিদ্বান শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিল। 1898 সালের 25শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে বিবেকানন্দের দ্বারা দীক্ষা নেওয়ার ঠিক পরে তিনি অনেকগুলি ক্রিয়াকলাপে নিমগ্ন হন যেমন স্যার জে সি বোসের ল্যাব পরিদর্শন করা, কালী মন্দিরে বক্তৃতা দেওয়া, তাঁর গুরুর সাথে উত্তর ভারত ভ্রমণ করা, ধর্মীয় বক্তৃতা দেওয়া, গার্লস স্কুল উদ্বোধন করা ইত্যাদি।

1899 সালের প্রথম দিকে, প্লেগ আরও প্রতিহিংসা নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসে। প্রতিদিন শত শত লোকের মৃত্যু হয়। স্বামীজী ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত বিভাগে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা প্রদানের জন্য চূড়ান্ত অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে নিবেদিতা এবং তাঁর দুই সন্ন্যাসীনি শিষ্যাকে নিযুক্ত করেছিলেন। নিবেদিতা মিস ম্যাকলিওডকে 12 ই মার্চ 1899 তারিখের একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "তারপর আমরা প্লেগ সম্পর্কে কথা বললাম যা এই পাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে এবং সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছে" । নিবেদিতা প্লেগ আক্রান্ত এলাকায় গিয়ে একটি সমীক্ষা করেন এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের তালিকা তৈরি করেন। তিনি রোগীদের চিকিৎসার জন্য একটি অস্থায়ী ডিসপেনসারি খোলেন । পুরো কাজটি এত দক্ষতার সাথে করা হয়েছিল যে যখন সরকারী স্বাস্থ্য আধিকারিক এলাকাটি পরিদর্শন করতে আসেন, তখন তিনি দেখতে পান যে প্রয়োজনীয় সবকিছু অনেক আগেই সম্পন্ন হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবকরা দলে দলে জনগণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছেন, বাড়িতে জীবাণুনাশক বিতরণ করেছেন। নিবেদিতা স্বেচ্ছাসেবকদের আত্মত্যাগের অনুশীলনের মাধ্যমে নাগরিক জীবনের জন্য একটি নতুন ধারণা দিয়েছিলেন ।

ব্রিটিশ সরকার নিবেদিতার গভীর সম্পৃক্ততা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বাগবাজার এলাকার চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা চিকিৎসক আর জি কর বলেন, "এই দুর্যোগের সময় বাগবাজারের প্রতিটি বস্তিতে ভগিনী নিবেদিতার মমতাময়ী রূপ দেখা গেছে। তিনি তাঁর নিজের অবস্থার কথা চিন্তা না করে অন্যদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। এক সময় যখন তাঁর নিজের খাবারে শুধু দুধ এবং ফল ছিল, তখন রোগীর চিকিৎসার খরচ

মেটাতে তিনি দুধ ছেড়ে দিয়েছিলেন। ডাঃ কর আরও জানিয়েছেন যে তিনি নিবেদিতাকে বাগ বাজারের একটি বস্তিতে একজন শিশু রোগীকে সেবা করতে দেখেছেন। বিকেলে আবার রোগী দেখতে এসে তিনি দেখেছেন নিবেদিতা তখনও ওই এলাকার স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া-যুক্ত কুঁড়েঘরে শিশুটিকে কোলে নিয়ে বসে আছেন।

নিবেদিতা তাঁর প্রভুর শিক্ষাকে হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ধর্ম, ত্যাগ এবং সেবার ধারণাগুলিকে ধারণ করে এবং তা প্রয়োগ করেছিলেন যখন ভয়ঙ্কর বুবোনিক প্লেগ কলকাতায় মারাত্মক আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। তার দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর প্রভুর গতিশীল ধর্মা-ধর্মের ধারণার একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে যেটি সক্রিয় ত্যাগ এবং অন্যের ভালোর জন্য নিঃস্বার্থ সেবা। "এটাই সেই লক্ষ্য যার দিকে আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। দারিদ্র্য, শুদ্ধতা এবং আত্মত্যাগের প্রতি ভালবাসার সাথে আপনাকে অবশ্যই পরিপূর্ণ নাগরিকের ব্যবহারিক চেতনা ও সংস্কৃতিকে নিজের মধ্যে একত্রিত করতে হবে। এগুলি হল সেই অবস্থা যার অধীনে আপনার বিশ্বাস প্রস্ফুটিত হবে," স্বামীজী নিবেদিতাকে বলেছিলেন।

প্লেগের সময় নিবেদিতার সেবা গতিশীল ধর্মের রূপান্তর, মানবতার মধ্যে ঈশ্বরের সেবা এবং মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবত্বের প্রয়োগ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, নিবেদিতার এই কাজটি ছিল স্বামীজীর গতিশীল ধর্ম, এবং মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবত্বের প্রয়োগের অর্থে ব্যবহারিক বেদান্ত। তাঁর সাফল্যের পিছনে রহস্য ছিল যে তিনি তাঁর দেহ, মন এবং আত্মাকে ব্যাপকভাবে সেবার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। কলকাতার গরম জলবায়ুতে প্লেগের বিরুদ্ধে তাঁর দুই মাসের লড়াই তাঁর স্বাস্থ্যকে এবং জীবনকে বিপন্ন করেছিল, কিন্তু প্লেগ মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি নিরলস ছিলেন। তাঁর সেবা প্রচারের জাঁকজমকপূর্ণ প্রদর্শনের দ্বারা পরিশ্রুত ছিল না কিন্তু শুদ্ধ পরিমাণে যা একজনের আত্মাকে সর্বশক্তিমান, অদ্বৈতের দিকে চালিত করতে পারে। তাঁর স্ব-নিযুক্ত সেবার কীর্তি অনুকরণ করা মানবজাতির সেবা এবং ঈশ্বরের সেবার সমার্থক।

২.৩ রোকেয়া সম্বন্ধে সংঘটিত কিছু গবেষণার পর্যালোচনা :

Begum, A. (2021) "Begum Rokeya Sakhawat Hossain's Sultana's Dream: An Echo of Enlightened Women's Leadership in the Feminist Utopia." – এই বিষয়ে গবেষণা করেছেন। এই গবেষণা পত্রে গবেষক দেখিয়েছেন যে, সুলতানার স্বপ্ন (১৯০৫ সালে লেখা, ১৯০৮ সালে প্রকাশিত) রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) দ্বারা লেখা একটি নারীবাদী ইউটোপিয়া। তিনি একজন মুসলিম নারীবাদী লেখিকা এবং সমাজ সংস্কারক যিনি ব্রিটিশ ভারতে বসবাস করতেন, যা এখন বাংলাদেশ। বেগম রোকেয়া তাঁর জীবনের শুরুতেই খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, শিক্ষাই একমাত্র নারী সমাজে অগ্রগতির এবং মুক্তির চাবিকাঠি। তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ছিল বাঙালী মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটানো কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষা যদি নারীদের মধ্যে সঠিকভাবে ধারণ করা হয় তাহলে তা তাদের আলোকিত করবে এবং কঠোর পিতৃতন্ত্র ও প্রচলিত রীতিনীতির বাধা থেকে তাদের মুক্ত করবে। অতএব, তাঁর লেখার অংশ (সুলতানার স্বপ্ন) শুধু নারী শিক্ষা নয়, নারীর ক্ষমতায়নের অবকাঠামো গড়ে তুলতে তার সৃজনশীল চাতুর্যের স্বাক্ষর ধরে রেখেছেন। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল শিক্ষা কীভাবে উদ্ভাবনী চিন্তাশক্তির সঙ্গে নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে তা খুঁজে বের করা।

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনে প্রবন্ধ, উপন্যাস, ইউটোপিয়া, কবিতা, হাস্যরস এবং নারী অধিকার এবং অন্যান্য সামাজিক বিষয় নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক প্রবন্ধ বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই লিখেছেন। তার রেফারেন্সিয়াল ইংরেজি অংশগুলি হল: সুলতানার স্বপ্ন, পদ্মরাগ, গড গিভস, ম্যান রবস, আধুনিক ভারতীয় মেয়েদের জন্য শিক্ষামূলক আদর্শ এবং তাঁর প্রায় বারোটি ইংরেজি লেখনি। বেগম রোকেয়া ছিলেন নারী শিক্ষার প্রকৃত পথপ্রদর্শক। নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তিনি মুসলিম মহিলাদের জন্য একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই গবেষণার অপর একটি উদ্দেশ্য ছিল বেগম রোকেয়ার নিখুঁত নারী নেতৃত্বের সৃজনশীলতাকে প্রমাণ করা যা শিক্ষার দ্বারা আলোকিত হয়েছিল।

মূলত, বেগম রোকেয়া দুটি কল্পকাহিনী লিখেছেন: একটি সুলতানার স্বপ্ন (1905) এবং অন্যটি পদ্মরাগ (1924)। যদিও প্রথমটি একটি নিছক স্বপ্নদর্শন, একটি কাল্পনিক দেশে স্থাপিত কিন্তু পদ্মরাগ সেরকম নয়, বরং এটি রকির নিজস্ব সময় এবং স্থানের অন্তর্গত এবং এটি যে সমস্যাগুলি প্রকাশ করে তা স্পষ্টতই সমসাময়িক। বেগম রোকেয়ার "সুলতানার স্বপ্ন" একটি কল্পনাপ্রসূত এবং উচ্চাভিলাষী আখ্যান যা 1905 সালে ইন্ডিয়ান লেডিস ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছিল । এটি ছিল ভারতের প্রথম ম্যাগাজিন, যা মহিলাদের জন্য একজন মহিলা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত হয়েছিল। এটি নারীবাদী কল্পবিজ্ঞানের প্রথম উদাহরণগুলির মধ্যে একটি।

এই ছোট গল্পটি লেডি ল্যান্ড নামে একটি জায়গায় সেট করা হয়েছে যেখানে পুরুষরা পর্দার পিছনে থাকে এবং মহিলারা পুরুষদের চেয়ে অনেক ভাল দেশ চালায়। এই নারীবাদী ইউটোপিয়াতে, নারীরা বিশ্বকে শাসন করে যেহেতু সমাজ তাদের সৌর ওভেন, উড়ন্ত গাড়ি এবং ক্লাউড কনডেন্সারের উদ্ভাবনের মাধ্যমে শান্তিতে বসবাস করে এবং সমৃদ্ধ হয়, যা "লেডি ল্যান্ড" এর জনসংখ্যাকে প্রচুর পরিচ্ছন্ন জল সরবরাহ করে এবং পুরুষদের, যাদের " সবকিছুর জন্য উপযুক্ত" বলে মনে করা হয়, তাদের ঘরের মধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

বেগম রোকেয়া নারীদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতের সাথে পরিচিত হওয়ার গুরুত্বের উপর বিশেষ জোর দেন। এই নামহীন দেশে, পুরুষ ব্যক্তিরা নিরর্থক এবং অবিরাম যুদ্ধে লিপ্ত হয়, যার ফলে তাদের দেশের মূল্যবান সম্পদ নিঃশেষ হয়। বিপরীতে, মহিলা পরিসংখ্যানগুলি তাদের মননের উন্নতির জন্য আরও উৎপাদনশীল লক্ষ্যে বিকশিত হয়। বেগম রোকেয়া অসামান্যভাবে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃশ্যকল্প এঁকেছিলেন, যেগুলি মহিলাদের জন্য একটি একচেটিয়া বিশ্ব হবে যেখানে অভিনব স্কিমগুলি তৈরি করা হবে এবং পরবর্তীতে বাস্তবায়িত হবে।

যদিও রোকেয়া তাঁর সমস্ত জ্ঞান, সম্পদ এবং শক্তি নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য নিযুক্ত করেছিলেন, তবে পারিবারিক বিরোধ এবং তাঁর পিতামাতা, স্বামী এবং সন্তানদের মৃত্যুর মতো কিছু ঘটনা এবং ক্লেশের কারণে 1909 থেকে 1914 সাল পর্যন্ত তাঁর সাহিত্যিক কর্মজীবনে শূন্যতা দেখা দিয়েছিল। মূলত তিনি তাঁর দুই শিশুকন্যাকে হারিয়েছেন; একটি 5 মাস বয়সে এবং অন্যটি চার মাস বয়সে (কাইয়ুম, 2013)। রোকেয়া হয়তো এই কষ্টের কারণেই ১৯০৯ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে সাহিত্য রচনা করতে পারেননি।

আরও দেখা যায় যে নারী শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি তাদের ক্ষমতায়নে রোকেয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। মূলত, প্রায় 150 বছর আগে রোকেয়া বাঙালি নারীদের ক্ষমতা অর্জনের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা এখনও পর্যন্ত নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার অন্যতম মৌলিক মাপকাঠি হিসেবে রয়ে গেছে। সামগ্রিকভাবে, নারীমুক্তি এবং ক্ষমতায়নের জন্য সর্বোত্তম বিষয়টি কল্পনা করার জন্য তাঁর সাহস এবং চতুরতা ছিল । তিনি আশ্চর্যজনকভাবে মহিলাদের মধ্যে লুকানো সম্ভাবনা খুঁজে বের করতে পারেন যার জন্য আজকের আলোকিত মহিলা প্রতিনিধির অবদান বিশ্বব্যাপী শীর্ষে পৌঁছেছে। এইভাবে, বেগম রোকেয়ার ইউটোপিয়া এই সমসাময়িক আধুনিক বিশ্বের নিখুঁত সাদৃশ্য হয়ে উঠেছে যেখানে আমাদের আলোকিত নারীরা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করে থাকে।

Sultana, S. (2021) "Contribution of Savitribai Phule And Begum Rokeya Sakhawat Hossain In Women-Education Reform" বিষয়ে গবেষণা করেছেন। এই গবেষণাতে দুই দেশের নারী শিক্ষার দুই পথিকৃৎ যারা একজন নারীর অস্তিত্ব ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন তাঁদের অবদান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই গবেষণার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন সাবিত্রীবাই ফুলে এবং বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। নারী শিক্ষা সংস্কারে তাঁদের অবদান তুলনামূলকভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং সমসাময়িক নারী শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা এবং এই দুই নারীর শিক্ষা ভাবনার তাৎপর্যকে এই গবেষণাতে তুলে ধরা হয়েছে।

নারী শিক্ষার প্রসারে সাবিত্রীবাই ফুলে জ্যোতিরাওয়ের বন্ধু উসমান শেখের বোন ফাতিমা শেখের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছিলেন। সাবিত্রী এবং ফাতিমা একটি শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ শেষ করে উসমান শেখের বাড়িতে একটি স্কুল শুরু করেন। ছাত্রীদের স্কুলে যেতে অনুপ্রাণিত করার জন্য, সাবিত্রীবাই দরিদ্র ছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি শুরু করেছিলেন। শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অভিভাবকদের শিক্ষিত করার জন্য নিয়মিত অভিভাবক-শিক্ষক সভার আয়োজন করতেন। ফলস্বরূপ পুনের সরকারি স্কুলের তুলনায় তাঁদের স্কুলে মেয়েদের ভর্তির হার ছিল অনেক বেশি। 1848 থেকে 1852 সাল নাগাদ স্বামী-স্ত্রী জুটি মহারাষ্ট্র জুড়ে মেয়েদের জন্য 18টি

স্কুল খুলতে সক্ষম হয়েছিলেন । 1876 সালের দুর্ভিক্ষের সময় তাঁর দরিদ্র ছাত্র ছাত্রীদের জন্য 52টি বিনামূল্যের খাবারের হোস্টেল তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 1852 সালে ব্রিটিশ সরকার ফুলে পরিবারকে সম্মানিত করেন এবং সাবিত্রীবাইকে 'সেরা শিক্ষিকা' র সম্মান দান করেন।

"শিক্ষা মানেই কোনো বিশেষ ধারণা বা সাংস্কৃতিক রীতিনীতি অনুসরণ করা নয়। ঈশ্বর আমাদের অনেক সম্ভাবনা দিয়েছেন এবং কঠোর পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের মাধ্যমে সেই প্রাকৃতিক অনুষদকে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা একমাত্র উপায়। আমাদের অনুষদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা আমাদের কর্তব্য। আল্লাহ আমাদের হাত, পা, চোখ, কান, মন এবং চিন্তা করার ক্ষমতা দিয়েছেন। আমরা যখন নিজের হাতে ভালো কাজ করি, চোখে দেখি, কান দিয়ে শুনি এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে চিন্তা করতে পারি, তাকে বলে শিক্ষা" ("স্ত্রীজাতির অবনতি"/ নারীর অবস্থার অবনতি, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন)।

বিয়ের পর রোকেয়ার শিক্ষায় উৎসাহ আরও বেড়ে যায়। তাঁর স্বামী খান বাহাদুর সাখাওয়াত হোসেন ভাগলপুরের (বিহার) ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। পশ্চিম (ইংল্যান্ড) থেকে শিক্ষিত বাহাদুর সাখাওয়াত ছিলেন একজন উদার ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার মানুষ যিনি নারী শিক্ষাকে পুরোপুরি সমর্থন করতেন। তিনিই রোকেয়াকে পড়াশোনায় সাহায্য করেছিলেন। পরে তাঁর সহায়তায় তিনি সেই সময়ের ভারতীয় সাময়িকীতে তাঁর লেখা প্রকাশ করতে শুরু করেন। তাঁর স্বামী বিবাহের খুব অল্পকাল পরেই অপ্রত্যাশিতভাবে মারা যান। 1909 সালে তরুণী রোকেয়াকে একা রেখে যান। সমস্ত দুর্দশা সত্ত্বেও তিনি কান্না এবং শোকের কাছে নতি স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না, বরং তাঁর প্রবল-ইচ্ছা দিয়ে তিনি তাঁর জীবনের আরও বড় উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ মাস পরে, তিনি তাঁর স্বামীর স্মৃতিতে ভাগলপুরে একটি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর স্বামীর রেখে যাওয়া 10,000 টাকার উত্তরাধিকার যথাযথভাবে ব্যবহার করে "সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুল" নামকরণ করেন। প্রাথমিকভাবে তিনি মাত্র পাঁচজন শিক্ষার্থী নিয়ে বিদ্যালয়টি চালু করেন। 1910 সালে, তিনি তাঁর সৎ কন্যার স্বামী এবং সৎ কন্যার সাথে কিছু সম্পত্তি-বিবাদের কারণে স্কুলটি বন্ধ করতে বাধ্য হন। তিনি কলকাতায় আসেন এবং 1911 সালে মাত্র আটজন ছাত্র নিয়ে স্কুলটি পুনরায় চালু করেন। পরে 1915 সালে এই

সংখ্যা বেড়ে চুরাশিতে উন্নীত হয়। ভারতের গভর্নর জেনারেল এবং ভাইসরয়ের স্ত্রী লেডি চেমসফোর্ড 1917 সালে স্কুলটি পরিদর্শন করেন। 1931 সালে, এই স্কুলটিকে একটি ইংরেজি মাধ্যম গার্লস হাই স্কুলে উন্নীত করা হয়। সেই যুগে এটি কল্পনাতীত ছিল কারণ সেই যুগে মাতৃভাষাতেও মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে সমাজ উদাসীন ছিল। রোকেয়া অনেক সময় বিভিন্ন কারণে এই স্কুলটিকে বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তর করতে বাধ্য হন ।

এমনকি গোঁড়া অভিভাবকদের বোঝানোর জন্য রোকেয়া ঘরে ঘরে প্রচার চালান। তিনি প্রাথমিকভাবে বাবা-মায়ের দাবি পূরণের জন্য ঘোড়ায় টানা গাড়ির ব্যবস্থা করেছিলেন, যাতে মেয়েরা নিরাপদে স্কুলে যেতে পারে-তার জন্য। তিনি ব্যক্তিগতভাবে পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন। শুধু মেয়েদের শিক্ষায় আপস না করার জন্য এবং বাবা মা এর দাবি পূরণের জন্য তিনি ওই ব্যবস্থা করেছিলেন। পরে তিনি ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে বাস সার্ভিসের ব্যবস্থাও করেন। 1968 সালে, অবশেষে, স্কুলটি কলকাতার লর্ড সিনহা রোডে স্থায়ী (বর্তমান) ঠিকানা পায়। তিনি "ভোকেশনাল ট্রেনিং" এর একজন কট্টর সমর্থক ছিলেন কারণ তিনি নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন। তাঁর ভাষায়, “মেয়েদের শিক্ষিত করুন এবং তাদের কর্মক্ষেত্রে ছেড়ে দিন, তারা তাদের নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করবে” (‘বেগম রোকেয়া রোচনাবলী’, পৃ. ২৮)। তাঁর "বৃত্তিমূলক শিক্ষা"র মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক প্রচারিত "মৌলিক শিক্ষা" ধারণার সাথে অনেকটা মিল ছিল। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ছাড়াও, তাঁর স্কুলের পাঠ্যক্রমে, "মূল্যবোধের শিক্ষার" গুরুত্বকে আদর্শ মা হওয়ার জন্য প্রচার করা হয়েছিল কারণ মায়েরা হলেন সন্তানের প্রথম শিক্ষক । তাঁর "ওপেন-এয়ার-স্কুলিং" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বারা প্রচারিত শিক্ষায় প্রকৃতিবাদের দৃষ্টিভঙ্গি" এর মতো। তিনি ভালো শিক্ষকের প্রয়োজন অনুভব করেন এবং নিজেই মহিলা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন।

তিনি "আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতেন-ই-ইসলাম (ইসলামী মহিলা সমিতি) নামে একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান শুরু করেছিলেন যার উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্র মুসলিম মহিলাদের আর্থিক ও শিক্ষাগত সহায়তা প্রদান করা এবং মুসলিম মহিলাদের অধিকারের বিষয়ে জনমত গড়ে তোলা এবং মুসলিম পুরোহিতরা (মৌলভি) কিভাবে ধর্মীয় শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা দিয়ে মুসলিম নারীদের কণ্ঠস্বরকে দমন করেন সে সম্পর্কে সচেতন করা।

Islam1, M.S. & Islam, R. (2012) এর গবেষণার শিরোনাম- "Emancipation of Women through Education and Economic Freedom: A Feminist Study of Begum Rokeya's Utopias"- এই গবেষণা পত্রটি বেগম রোকেয়ার ইউটোপিয়া সুলতানার স্বপ্ন এবং পদ্মরাগের আলোকে দক্ষিণ এশিয়ার বিশেষ করে বাংলাদেশে নারীর জগতকে অনুসন্ধান করেছে। পিতৃতন্ত্রের শৃঙ্খল থেকে নারীদের মুক্তি এবং শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মাধ্যমে মেয়েদের ক্ষমতায়নের জন্য যে পথ তিনি দেখিয়েছেন তা খুঁজে বের করাই ছিল এই গবেষণার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের মতো দক্ষিণ এশিয়ার দেশে নারীদের অবস্থা ক্রমাগত শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। বেগম রোকেয়া একজন শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী,সংস্কারক এবং নারীদের মুক্তিদাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। প্রায় একশ বছর আগে নারীর করুণ দুর্দশা, যা পুরুষদের দ্বারা সৃষ্ট এবং ন্যায্য বলে মনে করা হয়, বেগম রোকেয়া তা প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। একজন আইকনিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে নারীবাদী রোকেয়া নির্মম পুরুষ শাসিত সমাজের কবল থেকে তাদের মুক্তির জন্য নারীদের শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপর জোর দিয়েছিলেন। গবেষণায় বলা হয়েছে যে শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নারীর ক্ষমতায়নের ভিত্তি তৈরি করে। এই গবেষণাপত্রটি শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও মুক্তির প্রকৃতি ও পরিধি নিয়েও অনুসন্ধান করেছে, যেমনটি রোকেয়া তার ইউটোপিয়াস: 'সুলতানার স্বপ্ন' এবং 'পদ্মরাগ'-এ আত্মনির্ভরশীলতার আকারে প্রকাশ করেছেন।

আমরা যখন বেগম রোকেয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে লিঙ্গ-অধিকারের নারীবাদকে অন্বেষণ করি, তখন আমরা দেখতে পাই যে তিনি অন্যান্য নারীবাদীদের চেয়ে ভিন্নভাবে নারীর মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করেন। রোকেয়া নারীর অভ্যন্তরীণ জগৎ উন্মোচন করার আগ্রহ দেখিয়েছেন যাতে তারা বুঝতে পারে যে গোঁড়া পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তাদের নিজেদের সুবিধার্থে অমানুষ হিসাবে ব্যবহার করে। একজন নারীসুলভ ট্রান্সেন্ডেন্টালিস্ট হিসেবে, রোকেয়া এই বিশ্বাসকে অস্বীকার করেছেন এবং তাঁর "আত্মা"কে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থায় উন্নীত করার জন্য তার নশ্বর আকাঙ্ক্ষাকে অতিক্রম করেছেন যেখানে তাঁর কাজ এবং নারীমুক্তির দর্শন বাংলাদেশী নারীদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য বিশ্বকে গঠন করতে সহায়তা করেছে। তাঁর সুলতানার স্বপ্নে রোকেয়া, ভিক্টোরিয়ান নারীবাদী ভার্জিনিয়া উলফের মতো অতিক্রান্ত ধারণার পরিচয় দিয়েছেন। রোকেয়ার নারীবাদী অবস্থান প্রমাণ

করে যে, সঠিক শিক্ষা অর্জনের পর্যাপ্ত সুযোগের মাধ্যমে নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হতে হবে যা তাদের আত্মবিশ্বাস কে নিশ্চিত করতে পারে। এই ক্ষেত্রে তারা পুরুষদের দ্বারা পরিকল্পিত এবং প্রয়োগ করা সমস্ত ধরণের দমনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে সক্ষম হবে। ভার্জিনিয়া উলফ একইভাবে এই মত পোষণ করেন যে "একজন মহিলার যদি কথাসাহিত্য লিখতে হয় তবে তার নিজস্ব অর্থ এবং একটি ঘর থাকতে হবে। রোকেয়া এবং উলফ উভয়েই বিশ্বাস করেন যে নারীদের মুক্তি তখনই সম্ভব যখন তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে, স্বাচ্ছন্দ্যে শ্বাস নিতে এবং পুরুষের উপর নির্ভরতা ছাড়াই তাদের জীবন পরিচালনা করার জন্য অর্থ উপার্জন করতে পারে। রোকেয়া যুক্তি দেন যে, মানুষের সম্ভাবনার পরিপূর্ণতাকে সুখের নিরিখে নয়, স্বাধীনতার নিরিখে বিচার করতে হবে। নিস্ক্রিয় ও নিস্তব্ধতায় নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার চেয়ে স্বাধীনতা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মুক্ত হওয়ার জন্য একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই তার জীবনের পশুত্ব অতিক্রম করতে হবে এবং জীবনের একটি যুক্তিবাদী মানসিকতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে লেগে থাকতে হবে। বাংলাদেশী নারীরা বেগম রোকেয়ার আদর্শকে অনুসরণ করেছেন কারণ তিনি সত্যিকার অর্থে নারীমুক্তির পক্ষে কথা বলেছেন।

পুরুষ-শাসিত সমাজ থেকে নারী মুক্তির শিক্ষা একটি অপরিবর্তনীয় এবং অনির্ধারিত প্রক্রিয়া । শিক্ষা নারীদের কঠোর দক্ষতার সাথে জীবনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। একই সময়ে, এটি কঠোর পিতৃতান্ত্রিক এবং যৌনতাবাদী নিয়মের বাধা লঙ্ঘন করে স্বাধীনতার সাথে বিকশিত হতে এবং বিচরণ করতে সক্ষম করে নিজেকে মুক্ত করে তোলে । রোকেয়া ছিলেন একজন সত্যিকারের শিক্ষার মাধ্যমে নারীমুক্তির বিপ্লবের সাধক ও মডেল। রোকেয়া বিশ্বাস করেন, প্রকৃত শিক্ষা মানে কোনো বিশেষ জাতি বা জাতির অন্ধ অনুকরণ নয়। বরং এটা প্রাকৃতিক জ্ঞান বা শক্তির মাধ্যমে মানুষের ইন্দ্রিয়ের অনুষদের বিকাশ যা ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন । সংকীর্ণতায় স্তব্ধ সমাজকে পরিবর্তনের প্রেরণা নিয়ে এটি সর্বদা মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

শিক্ষা যথেষ্ট পরিমাণে গুণগত পরিবর্তন আনে এবং একজন ব্যক্তির মৌলিক প্রবৃত্তির বিকাশ ঘটায়। শিক্ষা মানুষের ক্ষমতায়নের চাবিকাঠি ধারণ করে এবং জীবনের আনন্দকে প্রশস্ত করে যা বেগম রোকেয়ার কাজগুলিতে

জোর দেওয়া হয়েছে। রোকেয়া সারাজীবন তাঁর ভাইয়ের কাছে কৃতজ্ঞ ছিলেন যিনি তাঁকে শিক্ষায় অনুপ্রাণিত ও সাহায্য করেছিলেন কারণ তিনি একটি রক্ষণশীল পরিবারের কন্যা ছিলেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ, তিনি তাঁর ভাইকে পদ্মরাগ উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি একাকীত্ব, বৈষম্য এবং সর্বোপরি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অন্যতম অস্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন। খুব অল্প বয়সেই রোকেয়া, অযৌক্তিক প্রতিপালনের বিরুদ্ধে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেন।

সুলতানার স্বপ্ন এবং পদ্মরাগ রোকেয়ার সৃজনশীলতা ও তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক সঙ্গীতের কেন্দ্রবিন্দু প্রকাশ করে। তিনি তাঁর কাজের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত সহানুভূতি, মানবতা, হাস্যরস, সৃজনশীলতা এবং বাস্তববাদকে চিত্রিত করেছেন। এটা সকলের দ্বারা স্বীকৃত যে "দক্ষিণ এশিয়ায় নারীমুক্তি ও শিক্ষার ইতিহাসে...রোকেয়ার মতো একজন ব্যক্তিত্ব সত্যিকারের একটি হীরা" (বাগচী, পৃ. 11)। রোকেয়া প্রতিটি নারীর আত্ম-উন্নয়ন এবং লক্ষ লক্ষ যুবতী মেয়ের মুক্তি এবং শিক্ষার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র সম্পর্কে গভীরভাবে সচেতন ছিলেন। বাংলাদেশে মেয়েদের শিক্ষার সমস্যা আজও যন্ত্রণাদায়কভাবে তীব্র। বাংলাদেশে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে আমরা রোকেয়ার সময়ে যে ছবি দেখেছিলাম সেই ছবিই প্রচলিত আছে। কন্যা শিশুরা এখনও পিতামাতা, ভাই, স্বামী এবং আবার তাদের নিজের ছেলে সন্তান এবং নাতি-নাতনিদের করুণার উপর নির্ভরশীল। এটি নিষ্ঠুর পুরুষতন্ত্রের একটি চক্র যা এখনও বাংলাদেশী পুরুষদের মনে কাজ করছে। নারী হয় পুরুষের দাস বা ইন্দ্রিয়জগতের বস্তু; তাদের বিভিন্ন উপায়ে অধঃপতন হয়. পুরুষরা কুসংস্কার, গোঁড়া ধর্মীয় রীতিনীতির সাহায্যে কিছু কৌশলগত নিয়ম তৈরি করে, যা নারীদের অশিক্ষিত এবং অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল থাকার জন্য তাদের থেকে নিকৃষ্ট থাকতে বোঝায়। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে তারা শিক্ষার অভাবের কারণে পুরুষদের ধূর্ত আচরণ বুঝতে পারে না।

বেগম রোকেয়া দক্ষিণ এশিয়া বিশেষ করে বাংলাদেশের হতভাগ্য, অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত নারীদের ত্রাণকর্তা রূপে হয়ে ওঠেন এক মহান কণ্ঠস্বর। তিনি আজও প্রাসঙ্গিক যখন আমরা সমাজে নারীদের শোচনীয় অবস্থা দেখি। আমরা যখন দেখি যে মেয়েটি তার জীবনের প্রথম পর্যায়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ, তখন আমাদের

রোকেয়ার কথা মনে পড়ে; আমরা তাঁর ইউটোপিয়া অধ্যয়ন করার চেষ্টা করি। যখন দেখা যায়, অ্যাসিড নিক্ষেপের মাধ্যমেও একটি মেয়েকে বিভিন্নভাবে হেয় করা হয়, একজন নারী তার স্বামীর নিষ্ঠুরতার শিকার হয়, একজন নারী অভিশপ্ত, নির্জন জীবনযাপন করে, তখন আমরা 'সুলতানার স্বপ্ন' ও 'পদ্মরাগের' মধ্য দিয়ে রোকেয়ার কান্না খুঁজি। যদি একটি মেয়ে নীরবে কষ্ট পায় কারণ তার পরিবার, প্রকৃতপক্ষে একটি পিতৃতান্ত্রিক পরিবার তাকে স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে বাধা দেয়, তবে রোকেয়া আমাদের সামনে জ্বলন্ত ধূমকেতু হিসাবে উপস্থিত হন। তাঁর ইউটোপিয়া, সত্যিকারের চেতনায়, এই নারীদেরকে তাদের সীমাবদ্ধ পৃথিবী থেকে জাগানোর পথ তৈরি করেছে। যদি কোন মহিলা একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেয় তবে স্বামী এবং তাঁর পরিবার মহিলার প্রতি ক্ষোভ ও অসম্মান প্রদর্শন করে। এসব কারণে নারীরা শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব ক্ষেত্রে বেগম রোকেয়া অনুপ্রেরণাদায়ী ব্যক্তিত্ব হিসেবে এগিয়ে আসেন। রোকেয়ার সবচেয়ে আলোচিত কাজ সুলতানার স্বপ্ন এবং পদ্মরাগ পুরুষের শৃঙ্খল থেকে এই নারীদের মুক্তির প্রবেশদ্বার হিসেবে আবির্ভূত হয়।

আসলে রোকেয়া যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা হল নারীর মৌলিক মানবাধিকারের স্বপ্ন। তিনি পুরুষশাসিত সমাজ থেকে নারীদের প্রতি কোনো সহানুভূতি চাননি। পুরুষের সেকেলে পিতৃতান্ত্রিক বিবাদ থেকে নারীর মুক্তির জন্য রোকেয়ার স্বপ্ন প্রতিটি নারীর স্বপ্ন। এই স্বপ্ন সত্যি হবে যদি নারীর প্রতি পুরুষের ঐতিহ্যগত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা হয় এবং নারীকে "আলাদা" হিসেবে নয় বরং পুরুষের বন্ধু এবং সমাজে অবদানকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

Quayum, M.A. (2016) "Gender and Education: The Vision and Activism of Rokeya Sakhawat Hossain."- বিষয়ে গবেষণা করেছেন। এই গবেষণার মাধ্যমে গবেষক অনুসন্ধান করেছেন যে, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (1880-1932) ছিলেন ঔপনিবেশিক বাংলার একজন অগ্রগামী নারীবাদী লেখিকা, শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষাকর্মী । তিনি শুধুমাত্র ভারতীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পিতৃতন্ত্রে গভীরভাবে আবদ্ধ মূল্যবোধ থেকে নারীদের মুক্তির চেষ্টা করেননি, মুসলিম মেয়েদের জন্য স্কুলও স্থাপন করেছিলেন যার মাধ্যমে মেয়েদের ক্ষমতায়নের জন্য তার ধারণা সক্রিয়ভাবে অনুসরণ এর ব্যবস্থা করেন। এই নিবন্ধটি রোকেয়ার

নারীবাদী মতাদর্শ এবং ভারতীয় নারীদের, বিশেষ করে বাঙালি মুসলিম নারীদের উন্নতির জন্য গৃহীত তার শিক্ষামূলক কর্মসূচীকে অনুসন্ধান করেছে। গবেষক এ প্রসঙ্গে যুক্তি দিতে চেয়েছেন যে যদিও একটি গোঁড়া পরিবারে রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং কোনও প্রথাগত শিক্ষা ছাড়াই কঠোর পরিশ্রমে বেড়ে উঠেছিলেন, তবুও রোকেয়ার সেই বিরল দূরদর্শিতা এবং সাহস ছিল তাঁর সময়ের সামাজিক অবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করার মতো। তাঁর লেখায় বহু পুরানো লিঙ্গ প্রথাকে উপহাস করা হয়েছে, এমনকি তার ইউটোপিয়ান আখ্যান সুলতানার স্বপ্নে ([1905], 1908) একটি লেডিল্যান্ড তৈরি করে লিঙ্গ সম্পর্ককে উল্টে দেয়, যেখানে পুরুষরা ঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং নারীরা রাষ্ট্র পরিচালনা করে । তিনি নারীদের অজ্ঞতা দূরীকরণ এবং তাদের আত্মবোধ জাগ্রত করার পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে, কলকাতায় একটি স্কুল স্থাপন করেন এবং মুসলিম মহিলাদের জন্য অ্যাসোসিয়েশন, আঞ্জুমানী-খওয়াতেন- তৈরি করেন এবং বস্তির মহিলাদের শিক্ষিতা করার জন্য প্রোগ্রাম পরিচালনা করার ব্যবস্থা করেন।

রোকেয়া ছিলেন একজন অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং নিবেদিতপ্রাণ লেখিকা যিনি প্রায় তিন দশক ধরে নারীর সমস্যা নিয়ে লিখেছেন, এবং বিভিন্ন ধারায়ও - কবিতা, বিতর্কমূলক প্রবন্ধ, কল্পকাহিনী এবং রূপক আখ্যান থেকে শুরু করে সামাজিক ব্যঙ্গ, বার্লেস্ক, চিঠিপত্র এবং সাংবাদিকতামূলক কথাবার্তা বলেছেন। সব মিলিয়ে তিনি রেখে গেছেন পাঁচটি বই এবং অসংখ্য অসংগৃহীত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও চিঠিপত্র। তাঁর বইয়ের মধ্যে রয়েছে 'মতীচূর' (A String of Sweet Pearls), Vols I (1904) এবং II (1922); 'সুলতানার স্বপ্ন' ([1905], 1908); 'পদ্মরাগ' (রুবি, 1924) এবং 'অবোধবাসিনী' (দ্য জেনানা উইমেন, 1931)। এগুলিতে লেখার গভীরতা এবং প্রশস্ততার কারণে সমালোচকরা প্রায়শই তাঁকে যুগের সেরা মহিলা লেখক হিসাবে বিবেচনা করেন। তাঁকে কেবল তাঁর সহ-মুসলিম লেখকদেরই নয় বরং তাঁর হিন্দু সমকক্ষদেরও এগিয়ে রাখে। তার সমসাময়িক, লেখক এবং সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার, উদাহরণস্বরূপ, তাকে তাঁর বয়সের 'আত্মা এবং চেতনা' বলে অভিহিত করেছেন (সৈয়দ, 2011, পৃ. 17)। শিবনারায়ণ রায়ের অভিমত ছিল যে তাঁর সময়ের অন্য কোন লেখক, হিন্দু বা মুসলিম, রোকেয়া যে ধরনের দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে লিখেছেন তা সত্যি প্রশংসনীয়। আবদুল হাই, নামে একজন সাহিত্যিক ইতিহাসবিদ বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমলে যে সকল মুসলিম নারী বাঙালি লেখিকা হিসেবে খ্যাতি

পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বেগম রোকেয়াই ছিলেন প্রথম ও শ্রেষ্ঠ'। অতি সম্প্রতি, রওশন জাহান (1988, পৃষ্ঠা. 1-3) তাঁকে বাঙালি মুসলিম সমাজের প্রথম এবং প্রধান নারীবাদী বলে আখ্যায়িত করেছেন যিনি তাঁর কলম ব্যবহার করেছিলেন শুধুমাত্র সমাজ সংস্কারের জন্য।

রোকেয়া শুধু একজন স্বপ্নদ্রষ্টাই ছিলেন না, একজন বাস্তববাদী কর্মীও ছিলেন। তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পুনর্বিবেচনা করেছিলেন এবং এটিকে বাস্তবে রূপান্তর করেছিলেন। প্রথম এবং সর্বাগ্রে তিনি শিক্ষার মূল্য ও তাৎপর্যে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, 'অজ্ঞানের পর্দা' দূর না করে ভারতীয় মহিলারা তাদের বর্তমান দুর্দশা এবং দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে না বা মানুষ হিসাবে তাদের প্রকৃত মূল্য খুঁজে পেতে পারে না। এটা মাথায় রেখেই তিনি মুসলিম মেয়েদের জন্য একটি স্কুল খুলেছিলেন যার নাম ছিল ‘সাখাওয়াত হোসেন মেমোরিয়াল স্কুল’।

তিনি তাঁর নিজের স্কুল খুলে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগের অভাব পূরণ করতে চেয়েছিলেন। সাধারণভাবে নারী শিক্ষা এবং বিশেষ করে মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার প্রতিকূল পরিবেশে এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া তার জন্য অবশ্যই অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। এটা আরও বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল কারণ রোকেয়া নিজে একজন মহিলা এবং একজন বিধবা ছিলেন। ধর্মীয় গোঁড়ারা শীঘ্রই তাঁর বিরুদ্ধে কলঙ্ক ছড়াতে শুরু করেছিল। কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন যে 'একজন যুবতী বিধবা একটি স্কুল স্থাপন করেছিলেন শুধুমাত্র তার সৌন্দর্য সমাজকে দেখানোর জন্য' (সুফি, 2001, পৃ. 84)। অন্যরা 'অভিযোগ করেছেন যে তাঁর সঙ্গীরা পতিতা এবং সমাজের নোংরা ছিল' (বাগচি, 2005, পৃ. x)। এমনকি কেউ কেউ তাঁকে সরাসরি 'একজন বেশ্যা এবং তহবিল আত্মসাৎকারী' বলেও উল্লেখ করেছেন (গুপ্ত, 2013, পৃ. 28)। কিন্তু এসব কিছুই রোকেয়ার সংকল্পকে নাড়া দিতে পারেনি বরং তিনি সম্পূর্ণ দৃঢ়তা এবং পূর্ণ প্রত্যয়ের সাথে তাঁর মিশন নিয়ে এগিয়ে যান । সমাজের গোঁড়া শ্রেণীর দ্বারা এই ধরনের নিত্য নিপীড়নের পাশাপাশি, স্কুলটি সফলভাবে পরিচালনা করার জন্য রোকেয়াকে কিছু ব্যবহারিক সমস্যাও মোকাবেলা করতে হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, তিনি নিজে কখনো স্কুলে যাননি, তাই শ্রেণীকক্ষের পরিবেশে কীভাবে পড়াতে হয় বা কীভাবে স্কুল প্রশাসন চালাতে হয় সে সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান ছিল না। রোকেয়া

বলেছিলেন যে, 'আমি যখন পাঁচজন ছাত্র নিয়ে স্কুল শুরু করি, তখন এটা আমার কাছে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক মনে হয়েছিল যে একজন শিক্ষিকা কীভাবে একই সময়ে পাঁচজন ছাত্রীকে পড়াতে পারেন' (মাহমুদ, 2009, পৃ. 32)। এই ঘাটতি কাটিয়ে ওঠার জন্য এবং স্কুল প্রশাসনের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য, তিনি কলকাতার বেশ কয়েকটি ব্রাহ্ম ও হিন্দু স্কুল পরিদর্শন করেছিলেন, যেখানে তিনি পি কে রায়, রাজকুমারী দাস, সরলা রায় এবং আবালা বোসের মতো সেই সময়ের নেতৃস্থানীয় বাঙালি শিক্ষাবিদ দের সাথে দেখা করেছিলেন এবং শুধু শিখেছিলেন তাই নয়, তাদের সাথে আজীবন বন্ধুত্বও গড়ে তোলেন।

রোকেয়া বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ডিগ্রি অর্জন এবং চাকরি খোঁজা হওয়া উচিত নয়; শিক্ষা হওয়া উচিত স্বাস্থ্যকর এবং সামগ্রিক, যাতে এটি ব্যক্তির সমস্ত দিকের অর্থাৎ শারীরিক, নৈতিক ও মানসিক বিকাশে সাহায্য করে। 'নারীর পতন'-এ, তিনি বলেছেন যে, শিক্ষা 'অ্যাকাডেমিক ডিগ্রি' অর্জনের জন্য নয়, বা 'একটি সম্প্রদায় বা জাতিকে অন্ধভাবে অনুকরণ করা' নয়, বরং তা হবে 'ব্যক্তির সহজাত ফ্যাকাল্টি' গড়ে তোলার জন্য।

এডুকেশনাল আইডিয়ালস ফর ইন্ডিয়ান গার্লস'-এ তিনি প্রস্তাব করেন যে যেহেতু শিক্ষা মানে 'জীবনের জন্য প্রস্তুতি' এবং 'সম্পূর্ণ জীবনযাপনের জন্য', তাই শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তিক, শারীরিক ও নৈতিকভাবে প্রশিক্ষিত হওয়া উচিৎ। তিনি পরামর্শ দেন যে, 'নৈতিক শিক্ষা [উচিত] অবহেলা করা উচিত নয়',। তা ছাড়াও শিক্ষাকে আধুনিক ও প্রাচীন, বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক সব দিকেই কাজে লাগাতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা জীবনের বিভিন্ন প্রতিযোগী শক্তি সম্পর্কে ভারসাম্যপূর্ণ সচেতনতা গড়ে তোলে এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান অর্জনের সময় ভারতীয় হিসাবে তাদের পরিচয় হারাতে না পারে।

'দ্য ডন'-এ রোকেয়া নারীদের পরামর্শ দিয়েছিলেন, -'আপনার অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা রক্ষার জন্য নিজেরা সমিতি গঠন করুন। তিনি সর্বদা নারীর সম্মিলিত পরিচয়ের উপর জোর দিয়েছিলেন কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে শুধুমাত্র একটি ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে নারীরা কুসংস্কার, নিপীড়ন এবং নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে এবং নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের পক্ষে জনমতকে উৎসাহিত করতে পারে। এই বিষয়টি

মাথায় রেখে, তিনি সমাজের সুবিধাবঞ্চিতদের সাহায্য করার অভিপ্রায়ে 1916 সালে মুসলিম মহিলাদের জন্য আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিন-ই-ইসলাম নামে একটি সমিতি গঠন করেন। সমিতির লক্ষ্য ছিল দরিদ্র বিধবাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান, দরিদ্র পরিবারকে তাদের মেয়েদের বিয়ে দিতে সহায়তা করা এবং সর্বোপরি বস্তির মহিলাদের মধ্যে সাক্ষরতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশি লেখিকা সুফিয়া কামাল স্মরণ করেছেন, কীভাবে তিনি আঞ্জুমানের কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন, রোকেয়া কীভাবে তাদের কলকাতার বস্তিতে মহিলাদের সাহায্য করার জন্য পাঠাতেন এবং কীভাবে কখনও কখনও শত্রু পুরুষদের তাদের এলাকায় প্রবেশে বাধা দিতেন। কখনও কখনও উর্দুভাষী মুসলমানরা মনে করত যে হিন্দুরা তাদের সাথে কাজ করতে এসেছে । হিন্দু ও মুসলিম উভয় নারীর সমন্বয়ে গঠিত এই স্বেচ্ছাসেবকরা দ্বারে দ্বারে গিয়ে মহিলাদের পড়া, লেখা, সেলাই, সূচিকর্ম বা শিশু যত্ন বা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত বিষয়গুলি শেখাতেন। সমিতির তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের অবস্থার উন্নতি সাধন করা, যাতে তারা তাদের লিঙ্গগত অভিজ্ঞতাগুলি ভাগ করে নিতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত নিপীড়ন ও অবিচারের বিরুদ্ধে একটি সম্মিলিত কণ্ঠস্বর খুঁজে পেতে পারে।

একজন 'নারীবাদী অগ্রমাতা হিসাবে রোকেয়া ভারতীয় মহিলাদের অবস্থাকে উপশম করার জন্য তাঁর হৃদয় ও আত্মা কাজ করেছিল। তিনি তাঁর সহকর্মী 'বোনদের' তাদের 'কারাবাস' এবং দুর্দশার ঊর্ধ্বে উঠে তাদের অধিকার ও স্বাধীনতার জন্য দাঁড়াতে অনুপ্রাণিত ও অনুপ্রাণিত করার জন্য একজন লেখিকা হিসাবে তাঁর কাজ শুরু করেছিলেন। তিনি কখনও কখনও কঠোর এবং কাস্টিক ব্যঙ্গাত্মক দ্বারা তাদের প্ররোচিত এবং উস্কানি দিয়ে এটি করেছিলেন, কখনও কখনও বুদ্ধিমান এবং মৃদু উৎসাহ দিয়ে মানুষ হিসাবে তাদের সত্যিকারের সম্ভাব্যতা দেখিয়েছিলেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে, তিনি শিক্ষার উপর জোর দিয়েছিলেন কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষাই নারীদের জন্য তাদের বর্তমান দুর্ভাগ্য কাটিয়ে ওঠার এবং তাদের বিষয়বস্তু এবং স্বতঃস্ফূর্ততা খুঁজে পাওয়ার একমাত্র উপায়। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা কেবল তাঁর লেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; তিনি কল্পনার জগৎ থেকে প্রায়োগিকতা এবং অনুশীলনের দিকে পা রাখেন, বিশেষ করে মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার জন্য একটি স্কুল খোলার মাধ্যমে যারা সেই সময়ে সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া অংশ ছিল। যাতে তাদের মধ্যে শ্রোতাত্ব এবং

সম্মিলিত পরিচয়ের অনুভূতি তৈরি করা যায়, সেইসাথে বস্তি এলাকায় বসবাসকারীদের বিভিন্ন আর্থিক ও সাক্ষরতা কর্মসূচির মাধ্যমে সেবার কাজ শুরু করেন।

Mahmud, R. (2016) এর গবেষণার শিরোনাম- "Rokeya Sakhawat Hossain: Tireless Fighter of Female Education and their Independence – A Textual Analysis." এই গবেষণায় গবেষক অনুসন্ধান করেছেন যে, বাংলার প্রথম মুসলিম নারীবাদী চিন্তাবিদ, লেখিকা এবং শিক্ষাবিদ রোকেয়া নারী স্বাধীনতা এবং নারী শিক্ষার সমর্থনে তাঁর প্রচেষ্টার জন্য একজন কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব। একটি আধুনিক, উদার ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি কল্পনা করেছিলেন যে শিক্ষার মাধ্যমে নারীরা বিশেষ করে মুসলিম নারীরা মানুষ হিসেবে তাঁদের পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে পারবে এবং পুরুষের উপর নির্ভর না করে তাদের নিজস্ব স্বার্থ অনুসরণ করবে। তাঁর জীবদ্দশায় বা তার আগে, কিছু ব্যক্তি মুসলিম নারীদের শিক্ষিত করার উদ্যোগ নিলেও বাঙালি মুসলিম সমাজে রোকেয়াই প্রথম যিনি শিক্ষার প্রসারকে নারীর মুক্তি ও অগ্রগতির সাথে যুক্ত করেন। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল নারীমুক্তি। বাঙালি মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষার প্রসারই ছিল তাঁর একমাত্র নিষ্ঠা। তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষা যদি সঠিকভাবে দেওয়া হয়, তাহলে তা নারীদের আলোকিত করবে এবং কঠোর পিতৃতান্ত্রিক ও যৌনতাবাদী নিয়মের বাধা থেকে তাদের নিজেদেরকে মুক্ত করবে। কিন্তু রোকেয়া যদিও নারী শিক্ষার পক্ষে ছিলেন, আশ্চর্যজনকভাবে, তাঁর কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। তাঁর ভাই ও বোন গোপনে তাঁকে বাংলা ও ইংরেজি পড়তে ও লিখতে শিখিয়েছিলেন। এই গবেষণাপত্রে রোকেয়া কীভাবে তাঁর জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পুরুষশাসিত সমাজে নারীরা যে সমস্যার সম্মুখীন হয় তা নির্ণয় করেছিলেন এবং কীভাবে তিনি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিষয়ে নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য সমাধানের প্রস্তাব দিয়েছেন তা তুলে ধরা হয়েছে।

রোকেয়া ছিলেন প্রগতিশীল চিন্তাধারার একজন স্বশিক্ষিতা নারী। তাঁর অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ চোখ দিয়ে তিনি শুধু নারীদের দুঃখ-দুর্দশাই দেখেননি, তারা কীভাবে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছে তাও দেখেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাদের দুর্দশা থেকে মুক্তি দিতে নারী জাগরণ অপরিহার্য। এর মাধ্যমে তিনি নারী শিক্ষার ব্রত নিয়েছিলেন এবং সমাজে নারীর অমানবিক অবস্থানের বিরুদ্ধে লিখতে কলম ধরেছিলেন। এই দুটি দিক ছিল একে অপরের

পরিপূরক। কারণ, নারী শিক্ষার পূর্ব শর্ত হলো নারীর আত্মসচেতনতা এবং আত্মসচেতনতা নারীকে শিক্ষার জন্য প্ররোচিত করে। বর্তমান বিশ্বে রোকেয়ার সময়ে নারীরা কতটা পিছিয়ে ছিল তা কল্পনা করা যায় না। সেই সময়ে, একদিকে সমাজে রক্ষণশীল প্রভাব ছিল, এবং অন্য দিকে নারীদের আত্মসচেতনতার অভাব ছিল, তাদের প্রকৃত মানুষ হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলার সুযোগগুলিতে ঠেলে দেওয়ার মানসিকতা ছিল না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীরা নিজেরাই নারী শিক্ষার বিরুদ্ধে ছিলেন। তাই ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সামাজিক বাধা বিপত্তিকে জয় না করে তাদের জাগরণ সম্ভব ছিল না। রোকেয়া বুঝতে পেরেছিলেন যে, শিক্ষা হল সেই শক্তি যা নারীদের পথ দেখাতে পারে, আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করতে পারে, মিথ্যা কুসংস্কারমূলক বিশ্বাসের ভিত্তিহীন ভয়কে জয় করতে পারে এবং সমাজে তাদের সঠিক মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। সেই স্বপ্নের কথা মাথায় রেখে তিনি স্কুল (সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল) এবং মহিলাদের জন্য সংগঠন (আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিন-ই-ইসলাম) প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় বেশ কিছু বই রচনা করেছেন। তিনি তাঁর লেখায় পরিবার ও সমাজে নারীর শোচনীয় অবস্থা চিত্রিত করেছেন। এবং পাশাপাশি তিনি দেখিয়েছিলেন যে সেই সময়ে নারীদের দমন কতটা তীব্র ছিল। "বেঙ্গল উইমেনস এডুকেশনাল কনফারেন্স"-এ তাঁর বক্তৃতা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করার মতো।

আগেই বলা হয়েছে, রোকেয়ার সময়ে নারীদের চলাফেরা চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং বাইরের জগত থেকে তারা ছিল বিচ্ছিন্ন। তাদের শিক্ষা ধর্মীয় শিক্ষার নামে পবিত্র কুরআন অধ্যয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং তা মক্তব বা মাদ্রাসায় পড়ানো হত না, প্রশিক্ষকদের হাউস টিউটর হিসেবে নিযুক্ত করা হোতো যাঁরা কাছাকাছি মসজিদের মৌলবী ছিলেন । নারীকে বন্দী অবস্থায় শিক্ষা গ্রহণ করতে হতো এবং বাইরের জগত সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা ছিল না। কারণ তখনকার সমগ্র মুসলিম সমাজ পুরুষের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি, নারীর জন্য তো বটেই। আর নারীকে চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী করে রাখা ছিল সেকালের রীতি। যারা এই প্রথাগুলি স্থাপন করেছিল তাদের বিশ্বাস ছিল যে তারা যা করেছে তা মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার একমাত্র উপায়। এসব প্রথার আধিক্যের ফলে নারীর জীবন হুমকির মুখে পড়েছিল।

রোকেয়া নারীর পরাধীনতার দুটি মূল বিষয় চিহ্নিত করেছেন- শারীরিক দুর্বলতা এবং অর্থনৈতিক নির্ভরতা। "অনেক মানুষ মনে করেন যেহেতু নারীরা পুরুষের আয়ের ওপর নির্ভরশীল, তাই তাদের কর্তৃত্ব মেনে নিতে হবে। সম্ভবত নারী, প্রথমে শারীরিক পরিশ্রমে অক্ষম হয়ে, অন্যের আহরণ করা সম্পদে নিজের ভরণ-পোষণ করতে বাধ্য ছিল। শারীরিক ক্ষমতায় পুরুষরা প্রথমে নারীদের পরাজিত করে পরে তাদের অধীনস্থ করে, এর পর অর্থনৈতিক অঞ্চল থেকে বিতাড়িত এবং শক্তিহীন হয়ে পড়ে। স্বাধীনতার প্রথম শর্ত হলো অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। রোকেয়া উপলব্ধি করতেন, যে সমাজে নারী শুধু অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের জন্য পুরুষের ওপর নির্ভরশীল, সে সমাজে নারীর মুক্তির স্বপ্ন সম্পূর্ণ কল্পনা। তাঁর বিভিন্ন লেখায় তিনি অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বার্তা প্রচার করেছেন। যে সমাজে নারীরা আর্থিকভাবে সম্পূর্ণভাবে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল, সে সমাজে নারীর মুক্তির কথা বলা অর্থহীন। তাঁর বিভিন্ন লেখায় তিনি অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বার্তা প্রচার করেছেন- "স্ত্রী জাতির অবনতি", "ডেলিসিয়া হত্যা" এবং "পদ্মরাগ"। "পদ্মরাগ" উপন্যাসের মূল বিষয় অর্থনৈতিক স্বাধীনতা।

নারীর মুক্তিকে কেন্দ্রে রেখে রোকেয়া তাঁর লেখায় নারীর অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা প্রতিষ্ঠার জন্য পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করেছেন। সেই মুক্তির লক্ষ্য ছিল পুরুষের সমান অধিকার। তিনটি উদ্দেশ্য ছিল- ১। নির্জনতা প্রথা বিলুপ্ত করা, ২। অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করা, এবং ৩। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন। আর এসব উদ্দেশ্য অর্জনের মাধ্যম ছিল শিক্ষা; তাদের স্ব-প্রতিষ্ঠার জন্য, মহিলাদের স্ব-প্রেরণামূলক শিক্ষা প্রয়োজন। রোকেয়া বলেন, শিক্ষার অভাবে আমরা স্বাধীনতা অর্জনের অযোগ্য হয়ে পড়েছি। অযোগ্য হওয়ার কারণে আমরা আমাদের স্বাধীনতা হারিয়েছি। দুর্বোধ্য লোকেরা তাদের স্বার্থের জন্য আমাদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করেছে।

রোকেয়া চেয়েছিলেন নারীর মুক্তি, তাদের উন্নতি; এবং প্রশ্ন করেছেন, আমরা যদি জড় থাকি তবে সমাজ কীভাবে এগিয়ে যাবে? নারী ও পুরুষের স্বার্থ ভিন্ন নয়, অভিন্ন। তাদের জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, আমাদেরও তাই। আমাদের মধ্যে এমন গুণ থাকা উচিত যাতে আমরা জীবনের বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রেই পুরুষদের পাশাপাশি চলতে পারি। রোকেয়ার কাছে নারী-পুরুষ একই শরীরের দুটি অঙ্গ। একটি গাড়ি যেমন দুই চাকা বা দুই হাত দিয়ে পূর্ণ হয়, তেমনি একটি সমাজ নারী-পুরুষ উভয়ের দ্বারা সম্পূর্ণ হয়।

সুতরাং, সমাজের মূল বিকাশ মানে নারী-পুরুষ উভয়ের বিকাশ। একটিকে অবহেলা করলে অন্যটির উন্নতি করতে পারে না। একটি গাড়ি এক চাকায় চলতে পারে না। তাই নারীদের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করলে সমাজ ঝুঁকে পড়বে। সমাজকে মসৃণভাবে চলতে সাহায্য করার জন্য, রোকেয়া চান নারী ও পুরুষ উভয়েই পাশাপাশি দাঁড়ান- "আমাদের বাধ্যবাধকতা হল সমাজের উপর একটি ভয়ানক বোঝা হওয়াকে পরিত্যাগ করা এবং পুরুষদের সঙ্গী, সহকর্মী হওয়া এবং আমরা যেভাবে পারি তাদের সমর্থন করা। তবে যুগে যুগে যারা সমাজের সংস্কার ও কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাদের কঠোর সমালোচনা, অপবাদ ও নিন্দার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। রোকেয়াও এর ব্যতিক্রম নন। সামাজিক গোঁড়া এবং ধর্মীয় গোঁড়ারা নির্জন নারীদের সম্পর্কে তাঁর আপোষহীন তিরস্কার এবং মতামতে ক্ষুব্ধ হয়েছিল। তাদের কেউ কেউ তাদের লেখার মাধ্যমে রোকেয়াকে নিরাশ করার চেষ্টা করেছে। নওসের আলী খান ইউসুফজি (1864-1924), একজন বিখ্যাত মুসলিম লেখক, নবনুর পত্রিকায় একটি সংখ্যা প্রকাশ করেন এবং রোকেয়ার সমালোচনা করেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে মৃত্যু পর্যন্ত রোকেয়া বিনা বিরতিতে সমাজের জন্য কাজ করে গেছেন। এ সময় তিনি অনুভব করেন যে, অর্ধেক জনসংখ্যাকে অশিক্ষিত ও নির্জন রেখে দেশ বা জাতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই তিনি নারী মুক্তির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষা হল সেই মাধ্যম যা নারীদের অজ্ঞতা দূর করতে পারে এবং তাদের পরাধীনতা সম্পর্কে সচেতন করতে পারে। তার চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল নারীমুক্তি এবং শিক্ষাই ছিল সেই স্বাধীনতা অর্জনের প্রবেশদ্বার।

Roy, A.K. (2019) "Educational Thoughts of Begum Rokeya And Her Contribution in the Upliftment of Women Education in Bengal."- বিষয়ে গবেষণা করেছেন। এই গবেষণায় গবেষক অনুসন্ধান করেছেন যে 19 শতক ছিল ব্রিটিশ শাসনাধীন অবিভক্ত বাংলায় নবজাগরণের সময়। এটি রাজা রামমোহন রায়ের সাথে শুরু হয়েছিল এবং বিদ্যাসাগর, কেশব চন্দ্র সেন এবং অন্যান্যদের মত বাস্তববাদীদের দ্বারা অব্যাহত ছিল। সংস্কারের চেতনা শুধু হিন্দু বাঙালি সমাজকেই প্রভাবিত করেনি বরং মুসলিম বাঙালি সমাজকেও প্রভাবিত করেছে। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কারের প্রেরণা 19 শতকের শেষের দিকে ঘটেছিল

এবং 20 শতকের প্রথম দিকে তা অব্যাহত ছিল। বেগম রোকেয়া ছিলেন অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম জাগরণের জননী। তিনি সেই নারীদের দলভুক্ত ছিলেন যাদেরকে বাঙালি ভদ্রমহিলা বলা হত- ভার্জিনা উলফের তৈরি "নতুন নারী" এর মতই একটি ধারণা। তিনি মুসলিম নারীদের মুক্তির জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন যারা পর্দা এবং অন্যান্যদের মতো কঠোর ধর্মীয় রীতি অনুসরণ করতেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে মুসলিম মহিলাদের শিক্ষার সুযোগ দেওয়া উচিত। ভারতের নারী শিক্ষার ইতিহাসে তিনি একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব যিনি যথেষ্ট নির্ভীক ছিলেন এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রধানদের (মৌলবী) কঠোর সমালোচনার পরোয়া করেননি। বর্তমান প্রবন্ধে বেগম রোকেয়ার শিক্ষা-চিন্তা এবং ব্রিটিশ শাসকদের আধিপত্যে অবিভক্ত বাংলায় নারী শিক্ষার উন্নয়নে তাঁর অবদানকে সমালোচনামূলকভাবে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই গবেষণা পত্রের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হলঃ

(i) বেগম রোকেয়ার শিক্ষাগত চিন্তাকে সমালোচনামূলকভাবে তুলে ধরা এবং

(ii) উপনিবেশিত ভারতে নারী শিক্ষার উন্নয়নে রোকেয়ার ভূমিকা আলোচনা করা।

রোকেয়ার শিক্ষার দর্শন তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। তিনি তার দৃষ্টিভঙ্গিতে একজন আদর্শবাদী ছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়ের নারীরা প্রাচীন ধর্মীয় রীতিনীতি এবং পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের কারণে কীভাবে ভোগেন। তাদের দুঃখ দূর করার জন্য তিনি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। তিনি একটি নতুন যুগের একটি নতুন ভোরের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ইসলামের অপব্যাখ্যা হিসাবে তিনি মুসলিম নারীর অকথ্য দুর্দশার কারণটি সঠিকভাবে সনাক্ত করেছিলেন। তিনি নারী শিক্ষার ব্রত নিয়েছিলেন। কিন্তু ইসলামের ধর্মীয় নির্দেশের নামে যখন মুসলিম নারীদের বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল তখন এটা সহজ কাজ ছিল না। সে সময় সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মুষ্টিমেয় কিছু মুসলিম নারী শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন। মৌলবীরা তাদের বন্দী অবস্থায় পবিত্র কোরআন শিক্ষা দিতেন। প্রথমে তিনি নারী শিক্ষা ও তাদের মুক্তির সমর্থনে বিভিন্ন প্রবন্ধ, বই ইত্যাদি লিখতে শুরু করেন। স্বামীর সাহায্য

ও উৎসাহে তিনি ভাগলপুরে একটি বালিকা বিদ্যালয় চালু করেন। সে উদ্দেশ্যে তাঁর স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন তাকে 10,000 টাকার উত্তরাধিকার প্রদান করেন। তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ মাস পরে, তিনি তাঁর প্রিয় স্বামীর স্মরণে সেখানে একটি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং এটির নাম দেন "সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুল"। এটি ভাগলপুর-এ শুরু হয়েছিল। 1910 সালে, তার সৎ মেয়ের স্বামীর সাথে পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে বিরোধের কারণে তাঁকে স্কুল বন্ধ করতে বাধ্য করা হয়। একই বছরে তিনি কোলকাতায় (তখন কলকাতা) আসেন। তিনি তার জীবনের মূলমন্ত্র ত্যাগ করেননি যা ছিল মুসলিম নারীদের মুক্তি। তিনি **১৯১১** সালের **১৬** মার্চ এখানে **১৩** নম্বর সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুলটি পুনরায় চালু করেন। প্রথমে সেখানে মাত্র আটজন ছাত্রী ছিল। ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে 1915 সালে চুরাশিতে পরিণত হয়। লেডি চেমসফোর্ড, গভর্নর জেনারেলের স্ত্রী এবং ভারতের ভাইসরয় 1917 সালে স্কুলটি পরিদর্শন করেন। পরে এটি একটি মধ্য বালিকা বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। 1931 সালে, এটি আবার একটি উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। বিদ্যালয়টি বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তরিত হয়। ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য কিছু কারণে। 1931 সালে, এটি ছিল 13, ইউরোপিয়ান অ্যাসাইলাম লেন, 1932 সালে 162, লোয়ার সার্কুলার রোড এবং 1938 সালে 17, লর্ড সিনহা রোড এবং আলিপুর হেস্টিং হাউস। 1968 সালে যখন এটি অবশেষে 17, লর্ড সিনহা রোডে স্থানান্তরিত হয় তখন স্কুলটির একটি স্থায়ী ঠিকানা হয়।

বেগম রোকেয়া অবিভক্ত বাংলায় নারী শিক্ষার একজন হিতৈষী ছিলেন। মুসলিম সমাজের প্রতিরূপ হওয়া সত্ত্বেও, তিনি মুসলিম নারীদের মর্যাদা সম্পর্কে যুগে যুগে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন যারা এমনকি মানুষের অধিকার থেকেও বঞ্চিত ছিল। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে সমাজের তথাকথিত গোঁড়া পুরুষরা তাদের নিজেদের সুবিধার জন্য সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করে এবং এইভাবে মানুষ হিসাবে নারীর বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। তিনি সত্যিই উপলব্ধি করেছিলেন যে শিক্ষার মধ্যে এমন শক্তি রয়েছে যা নারীদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পথ দেখাতে পারে, মিথ্যা কুসংস্কারমূলক বিশ্বাসের ভিত্তিহীন ভয়কে জয় করে এবং সমাজে নিজেকে সঠিক মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গি মাথায় রেখে তিনি বাংলার ছাত্রীদের জন্য একটি স্কুল স্থাপন করেছিলেন। । মুসলিম

মেয়েদের শিক্ষার জন্য তিনি বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় বেশ কিছু বই লিখেছেন। তিনি তাঁর ছাত্রীদের মানসিক অনুষদের উন্নতির জন্য পাঠ্যক্রম নির্বাচন করেছিলেন। বৃত্তিমূলক দক্ষতার উপর তার জোর মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক গৃহীত "মৌলিক শিক্ষা" ধারণার অনুরূপ। "ওপেন এয়ার স্কুলিং" এর প্রতি তাঁর সমর্থনও তাঁর প্রগতিশীল আধুনিক শিক্ষাগত চিন্তার আরেকটি দিক।

ভারতের নারী শিক্ষার ইতিহাসে, রোকেয়া একজন কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব যিনি নারীর স্বাধীনতা ও শিক্ষার জন্য সমর্থন করেছিলেন এবং লড়াই করেছিলেন। তিনি একজন দূরদ্রষ্টা ছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি, উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের সমান হবে চিন্তাভাবনা ও বুদ্ধিমত্তায় যদি তাদের সুযোগ দেওয়া হয়। তাদের সুযোগ প্রদান এবং স্বাধীনতার জন্য তাদের অন্তরাত্মাকে জাগ্রত করার জন্য, বিশেষ করে মুসলিম নারীদের শিক্ষার সুযোগের জন্য তাঁর সংগ্রাম বাংলার নারী শিক্ষার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য তাঁর শিক্ষাগত আদর্শ ছিল বাস্তববাদ ও প্রগতিশীলতার মিশ্রণ।

Shamsunnahar Mahmud (1937) “রোকেয়া জীবনী” (Rokeya Jibani) নামক গবেষণা সন্দর্ভে মাহমুদ রোকেয়ার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়কালের প্রতিটি ঘটনার অনুপুঙ্খ পর্যালোচনা করেছেন। রোকেয়ার জীবনী নিয়ে পরবর্তীকালে যেসকল গবেষক কাজ করেছেন তাঁরা রোকেয়ার জীবনী থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য গ্রহণ করেছেন। রোকেয়ার মানবতাবাদী চিন্তাভাবনা এবং কর্ম, মুসলমান সমাজের মেয়েদের জন্য তাঁর সুগভীর অনুভূতি, কাজের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং সর্বোপরি সমস্ত কাজের মধ্যে প্রেমদান রোকেয়াকে সমগ্র বিশ্বে একজন মানবতাবাদী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

Moshfeda Mahmud (1965) তাঁর গবেষণায় রোকেয়া চিঠিপত্রে রোকেয়ার সম্বন্ধে ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। “পত্রে রোকেয়া পরিচিতি” (“Patrey Rokeya Parichiti”) গ্রন্থে পত্রসাহিত্য গুলিকে কালানুক্রমে সাজিয়েছেন, সেগুলির বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছেন এবং একই সময়ে অন্যান্য যারা রোকেয়াকে চিঠি লিখেছেন সেই চিঠিগুলিকেও কালানুক্রমে সাজিয়েছেন এবং ব্যাখ্যা করেছেন। রোকেয়ার কোন কোন চিঠি যেমন ব্যক্তিগত ছিল

তেমনি কতকগুলি ছিল অফিসিয়াল। রোকেয়ার চিঠিপত্রে রোকেয়ার গঠনমূলক চিন্তাভাবনার প্রমাণ পাওয়া যায়। একই সঙ্গে তখনকার সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে মুসলমান সমাজের উন্নয়নে বিশেষত মুসলমান নারী সমাজের উন্নয়নে রোকেয়ার দূরদৃষ্টিকে স্পষ্টভাবে এই গ্রন্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তখনকার মুসলমান সমাজ মেয়েদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল। তাঁরা তাদের মেয়েদের পর্দানসিন করে রাখতে এবং শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত রেখে কেবলমাত্র স্বামীর চাহিদা তৃপ্তি, গৃহকর্ম এবং সন্তান জন্মদান ও লালন পালন করাই মেয়েদের লালন-পালন জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে মনে করতেন। রোকেয়ার বিভিন্ন চিঠিপত্রে সেই সময়কার পুরুষতান্ত্রিক মুসলমান সমাজের অত্যন্ত হতাশা ব্যঞ্জক নেতিবাচক চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। সেই যুগের মুসলমান সমাজে তাদের মেয়েদের সম্বন্ধে মূল্যবোধও রোকেয়ার চিঠিপত্রে ধরা পড়েছে। বিভিন্ন চিঠির প্রেক্ষিতে রোকেয়ার লড়াইয়ের ভয়ংকর চিত্র আমাদের চোখের সামনে উঠে আসে।

Motahar Hossain Sufi (1986) তাঁর “বেগম রোকেয়া : জীবনী ও সাহিত্য” (“Begum Rokeya Jiban O Sahitya”) নামক গবেষণাতে বেগম রোকেয়ার সমগ্র জীবন এবং তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত কর্মকাণ্ডকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। রোকেয়ার উপরে সেই কালে যে সমস্ত গবেষণা হয়েছিল সেগুলির তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ করেছেন। এই গবেষণা কর্মটি অধ্যয়ন করলে বেগম রোকেয়ার মানসিক, সামাজিক, বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক এবং নৈতিক দিকগুলিকে বিশ্লেষকের দৃষ্টিতে দেখা যায়।

Hasina Joardar and Safiuddin Joardar (1980)- তাঁদের গবেষণার শিরোনাম ছিল “Begum Rokeya : The Emancipator”। এই গবেষণাতে সংশ্লিষ্ট গবেষকরা রোকেয়ার সমাজ ভাবনা এবং সেই সময়ের প্রেক্ষিতে ওই ভাবনার গুরুত্ব কতখানি তা বিশ্লেষণ করেছেন। গবেষকরা দেখিয়েছেন সেই সময়ের মুসলমান নারী সমাজের উন্নয়নে রোকেয়ার চিন্তাভাবনা এবং কাজকর্ম কেমন ছিল।

Habiuzzaman (2016) তাঁর “Education of Muslim Women in Colonial Bengal” শীর্ষক গবেষণায় ব্রিটিশ শাসনে বঙ্গদেশে মুসলমান সমাজে মেয়েদের অবস্থা কেমন ছিল সেই বিষয়ে অনুপুঙ্খ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ব্রিটিশ শাসনকালে মুসলমান সমাজ ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল। তারা মেয়েদের পর্দানসিন করে রাখতেন। মেয়েদের শিক্ষার প্রায় কোন ব্যবস্থাই ছিল না। কিছু কিছু অভিজাত পরিবার তাদের মেয়েদেরকে গৃহ শিক্ষকের কাছে

শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতেন মাত্র। ওই সময়কালে যখন রোকেয়াও জন্মেছিলেন এবং কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তখন মুসলমান সমাজে মেয়েদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না, তাই কোন কোন মুসলমান পরিবার তাদের মেয়েদের ছেলেদের সাথে প্রাথমিক স্তরে মক্তবে পাঠাতেন আরবি ভাষা শেখার জন্য এবং কোরান পড়বার সামর্থ্য অর্জনের জন্য। ওই সকল মক্তবে মেয়েদের আধুনিক শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা ছিল না, যাতে করে তাদের মুক্তিলাভ সম্ভব হয়। কোন কোন মহীয়সী মুসলমান নারী ওই সময়কালে মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা, ক্ষমতায়ন, এবং মুক্তির পথ দেখানোর উদ্দেশ্যে স্কুল তৈরির কাজ শুরু করেছিলেন। এদের মধ্যে রোকেয়া ছিলেন সেই যুগের অন্যতম নারী।

Tanaya Afrosa (2016) তাঁর গবেষণা প্রবন্ধ "রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) : বাংলার মুসলমান সমাজে নারী শিক্ষার প্রসারে এক জেহাদি কন্যা"- এ বেগম রোকেয়ার নারী শিক্ষা ভাবনা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এই আলোচনা প্রসঙ্গে গবেষিকা বেগম রোকেয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনীও তুলে ধরেছেন। তিনি বাংলা একাডেমী ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'রোকেয়া রচনাবলী'তে (১৯৮৪) সম্পাদক আব্দুল কাদির এর সম্পাদকের নিবেদন থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন– "...মিসেস আর. এস. হোসেনের ভগ্নহৃদয় মুসলমানের জন্য এক দৈব আশ্বাস। নিবাত নিষ্কম্প মুসলমান অন্তঃপুরে যদি এহেন বুদ্ধির দীপ্তি, মার্জিত রুচি, আত্মনির্ভরতা ও লিপি কুশলতার জন্ম হয়, তবে আজও ভয় কেন বাংলার মুসলমানদের ঘোঁচেনা? তবে আজও কেন নিজেকে পরিবেষ্টনের সন্তান ও জগতের অধিবাসী বলে পরিচিত করবার সাহস তার হয় না?" লেখিকা রোকেয়ার উক্তি উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন ছোটবেলায় রোকেয়া পাড়ার মহিলাদের সামনেও বের হবার সুযোগ পেতেন না। ১৯১১ সালের ১৬ই মার্চ রোকেয়া মেয়েদের শিক্ষার জন্য কলকাতায় একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯১৫ সালে স্কুলটি উচ্চ প্রাথমিক পর্যায়ে, ১৯১৭ সালে নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে এবং ১৯৩০ সালে মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হয়। লেখিকা তাঁর প্রবন্ধে রোকেয়ার শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য, পদ্ধতি এবং নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

২.৪ গবেষণা সমূহ পর্যালোচনার ছক (Review of Related Literature Matrix)

Title of the Article/Research Paper	Author/s and Year of Publication	Journal/Book /Link	Objective (s)	Findings
Sister Nivedita and Women's Education in Bengal in the First Decade of the 20th Century	**Basak, S. (1992)**	Indian History Congress	বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলায় নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে ভগিনী নিবেদিতার ভূমিকা খুঁজে বের করা এবং মূল্যায়ন করা।	1. নিবেদিতা তাঁর মেয়েদের বিভিন্ন হস্তশিল্প-আঁকা, চিত্রাঙ্কন এবং সূঁচের কাজে দক্ষতা বিকাশের জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। 2. ভগিনী নিবেদিতা নিজের অজানতেই, একজন শিক্ষাবিদ এবং একজন সমাজ সংস্কারকের দ্বৈত ভূমিকায় নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। 3. ভগিনী নিবেদিতার গার্লস স্কুল একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজন পূরণ করেছে।
From Noble to Nivedita: Sister	**Biswas, S.**	Indian History Congress	স্বামী বিবেকানন্দের আইরিশ শিষ্যা	1. 1898-1900 সালে তাঁকে কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের

Nivedita and Her Passages Through India, 1895-1911	**(2014),**		মার্গারেট নোবেলের (1867-1911) 1896-পরবর্তী জীবন এবং ভগিনী নিবেদিতা হিসাবে জনজীবনে তাঁর পরবর্তী স্বীকৃতির উপর আলোচনা করা।	মধ্যে একজন বিশিষ্ট বক্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা গিয়েছিল। 2 তাঁর প্রাথমিক চিঠিপত্রের বেশিরভাগই এই প্রথম ইমপ্রেশনের উল্লেখ করে যা তাঁকে একটি অপরিচিত ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক ল্যান্ডস্কেপ নিয়ে আলোচনা করতে সক্ষম করেছিল।
Sister Nivedita—A Psychological Reassessment	**O'Dohert y, M. (2018)**	History Ireland , Vol. 26, No. 1	১। নিবেদিতার চিঠি গুলির দ্বারা তাঁর ব্যাক্তিত্বকে তুলে ধরা। ২। নিবেদিতা কীভাবে নিজেকে বিভিন্ন মানুষের কাছে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছিলেন তা ব্যাখ্যা করা।	নিবেদিতার ব্যক্তিগত ধর্মতত্ত্ব বেশিরভাগই ছিল আধ্যাত্মবাদ এবং খ্রিস্ট বিজ্ঞান, বেদান্ত নয়। বিবেকানন্দ তার খ্রিস্ট বিজ্ঞানের বিশ্বাসকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করেননি, কারণ তিনি শিখিয়েছিলেন যে সমস্ত আধ্যাত্মিক রাস্তাই মানুষকে একই জ্ঞানের দিকে পরিচালিত করে।
Sister Nivedita and the	**Biswas, I. (2020)**	International Journal of Research on	১. নারী শিক্ষা সম্পর্কে স্বামী	নিবেদিতা দেখেন যে ভারত বৈচিত্র্যময় ধর্মের দেশ। নিবেদিতার মতে, ব্যাপক

Upliftment of Indian Women		Social and Natural Sciences Vol. V	বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা। ২. নারী শিক্ষায় ভগিনী নিবেদিতার আবেগপ্রবণ কাজের ভূমিকা আলোচনা কর। ৩. ভারতীয় সমাজের প্রতি ভগিনী নিবেদিতার ভক্তি ব্যাখ্যা করা।	উন্নয়ন ভবিষ্যৎ শিক্ষার উপর নির্ভর করে। তিনি দেশের উন্নয়নে শিল্প ও বাণিজ্যের ভূমিকার গুরুত্বকে স্বীকার করেন, তবে উন্নতি শুধুমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তিদের দ্বারাই সম্ভব হবে।
Indian Education System: A Comprehensive Analysis by Sister Nivedita	**Rai, S. (2018)**	International Journal of Social Sciences	এই গবেষণাপত্রে বিদেশী সংস্কৃতি এবং ভগিনী নিবেদিতার দ্বারা অনুধাবন করা ভারতীয় শিক্ষার উপর এর প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।	নিবেদিতার মতে একটি নিখুঁত শিক্ষায় তিনটি ভিন্ন উপাদান অনুশীলন করা উচিত i) শেখার যন্ত্র ii) শিক্ষার উদ্দেশ্য iii) নিজেকে একজন গুরুর কাছে সমর্পণ করা। ভগিনী নিবেদিতার পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ভারতীয় তরুণদের একক প্রজন্মকে প্রশিক্ষণ দিয়ে, ভারত অবশ্যই বিশ্বের

				আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক নেতা হিসাবে তার প্রকৃত অবস্থানে উঠবে।
Sister Nivedita and Her "Kali The Mother, The Web of Indian Life	**Inaga, S. (2004)**	Japan Review	কীভাবে নিবেদিতা ইউরোপে ও ভারতের দোভাষী হয়ে ওঠেন এবং কীভাবে তিনি ভারতীয় ছাত্রদের একটি নতুন জাতির অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠেন তা ফোকাস করা।	এই অধ্যয়নের প্রধান ফলাফলগুলি হল ভগিনী নিবেদিতার দৃষ্টিকোণ থেকে, ১)ভারতীয় জনজীবনের সমসাময়িক প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা। ২)"ধর্ম" হিসাবে "জাতীয় ন্যায়পরায়ণতা। ৩) ঘরোয়া বিপ্লব বা "ভিতর থেকে বিজয়", ৪) "প্রাচ্য আধ্যাত্মিকতা" ৫)ভারতীয় আদর্শবাদ এবং স্বদেশ আন্দোলন। ৬) ভারতীয় শিল্পের "জাতীয় নবজাগরণ",
Women Empowerment in Bengal and Sister Nivedita:	**Sahoo, S. (2018)**	International Journal for Innovative Research in Multidiscipli	এই গবেষণাপত্রটি পশ্চিমবঙ্গের নারীদের অবস্থার বিবর্তনে নিবেদিতার	নিবেদিতা বাংলায় নারীদেরকে শিক্ষিত করে এবং তাদের স্বনির্ভর হতে শেখানোর মাধ্যমে ক্ষমতায়নের জন্য কিভাবে

A Sesquicentennial Accolade		nary Field	অবদানের উপর মনোনিবেশ করেছে।	পরিশ্রম করেছিলেন তা কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। বাংলার নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য শিক্ষিত ও নির্দেশনার মাধ্যমে তিনি বাংলার নারীদের জন্য একটি সিঁড়ি স্থাপন করেছিলেন যার মাধ্যমে তারা তাদের সর্বোত্তম ক্ষমতায়নের ধাপে আরোহণ করতে পারে।
Swami Vivekananda and Sister Nivedita at Crossroads.	**Mallick, S. (2013)**	IJECT Vol. 4,	এই গবেষণা অধ্যয়নে গবেষক ভগিনী নিবেদিতা এবং স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে সম্পর্কের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন।	এই গবেষণা পত্রটি এই দুটি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের একটি অধ্যয়নের সাথে আলোচনা করেছে এবং তাদের বিজয় এবং ট্র্যাজেডিগুলি সত্যিকারের মানুষ গড়ে তোলার জন্য কতখানি বাস্তব তা তুলে ধরেছেন।
Sister Nivedita's Vision on Education in India.	**Mukherjee, P. A (2017)**	International Journal of History, Archaeology, Indology & Numismatics	ভারতে নিবেদিতার দৃষ্টিভঙ্গি এবং শিক্ষার আদর্শ তুলে ধরা	ভগিনী নিবেদিতার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সর্বাঙ্গীন এবং ভারতের জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর ধারণা, যা তাঁর কাছে নিছক রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, শিল্প উন্নয়ন,

				সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, শিক্ষা এবং লোকসংস্কৃতি অন্তর্ভুক্ত ছিল।
Nivedita: The Lady with the Lamp-an Incarnation of Empowered Woman.	**Pramanik, S. (2018)**	International Research Journal of Humanities, Language and Literature	ভগিনী নিবেদিতার জীবন, ভূমিকা ও কর্মকাণ্ড তুলে ধরা।	1897 থেকে 1911 সালের মধ্যে ভারতে প্রায় 14 বছরের সংক্ষিপ্ত অবস্থানে, নিবেদিতা জাতীয় কর্মের প্রধান ক্ষেত্রগুলিতে স্থায়ী অবদান রেখেছিলেন যা প্রাথমিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সংজ্ঞায়িত করেছিল।
Sister Nivedita: The Embracer of India	**Rani, S.L.T. (2020)**	RJPSS Sept. 2020 Vol. XLV	সিস্টার নিবেদিতার কাজ বিশ্লেষণ করা।	নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তিনি 1906 সালে কলকাতার প্লেগ এবং বাংলার দুর্ভিক্ষের সময় দরিদ্র ও নিঃস্বদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্যয় থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে যে নারীরা একটি জাতির অগ্রগতির মূলে রয়েছে, তিনি তাদের শিক্ষার প্রতি তার প্রচেষ্টাকে উৎসর্গ করেছিলেন।
Nivedita:	**Banerjee**	ResearchGate	নিবেদিতার	বর্তমান নিবন্ধটি প্লেগ

Religion and Society – An Impeccable Act of Civic Service by The Sister During Calcutta Plague Pandemic	**, S. N. (2021)**		দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলিক শিক্ষার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ জে সি বোসের বিশ্বস্ত সহচর, তৎকালীন ভারতের সামাজিক ও সাহিত্যিক অগ্রগতিতে ভগিনী নিবেদিতার অবদান তুলে ধরা।	মহামারীর সময় "লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প"-এর নিবেদিত প্রচেষ্টার প্রতি উষ্ণ শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং কোভিড-১৯-এর কারণে বর্তমান সঙ্কট পরিচালনা করার জন্য তিনি যে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন তা থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।
"The Role of Sister Nivedita in Empowering Women of Modern India"	**Banerjee, Ranita and Biswas, Prathrta (2016)**	Women's Education in India- Past Predicaments and Future Possibilities	আধুনিক ভারতে মেয়েদের ক্ষমতায়নে ভগিনী নিবেদিতার ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করা।	এই গবেষণা পত্রে যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা হল ১কর্মযোগী হিসাবে ভগিনী . নিবেদিতার ভূমিকা, ২ . সমাজসেবী হিসেবে নিবেদিতার ভূমিকা, ৩ . নারীর ক্ষমতায়নে ভগিনী নিবেদিতার উদ্যত লেখনীর ৪ ভূমিকা এবং. আধুনিক ভারতের মেয়েদের শিক্ষায় নিবেদিতার ভূমিকা।

"নিবেদিতা : অনন্যা অগ্নিকন্যা ও নারীমুক্তির প্রতীক"	**Acarya Paremesh (2017)**	উদ্ভাসিত মহিমাঃ শ্বেতপদ্ম নিবেদিতা	নিবেদিতার নারীমুক্তি ভাবনাকে ব্যাখ্যা করা।	এই প্রবন্ধে গবেষক দেখিয়েছেন যেনারী মুক্তির , অর্থ কেবলমাত্র কতকগুলি নিষ্ঠুর প্রথা থেকে মুক্ত ,হওয়া নয়উপযুক্ত শিক্ষালাভ এর মাধ্যমে মেয়েদের নিজেদের স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন করা। নারীমুক্তি ব্যতীত নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়।
"পরিবেশ ভাবনায় এবং নারী শিক্ষার জাগরণে ভগিনী নিবেদিতা"	মুখোপাধ্যায় অদিতি (২০১৭)	উদ্ভাসিত মহিমাঃ শ্বেতপদ্ম নিবেদিতা	ভারত নিবেদিতা প্রাণা ভগিনী নিবেদিতার চিন্তাধারা, কর্ম ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে তাঁকে হৃদয়ঙ্গম করা।	এই প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে যে, কীভাবে একজন বিদুষী, বাস্তববাদী, ক্ষুরধার বুদ্ধি ও মেধা সম্পন্ন এই মহীয়সী নারী ভারতবর্ষে উত্তরণের সোপানগুলি চিহ্নিত করেছিলেন এবং সেগুলি কীভাবে হল আমাদের জাতীয়তাবোধ, জাতীয় চেতনার পুনর্জাগরণ এবং সর্বোপরি নারী জাতির পুনরুত্থানে সহায়তা করেছিল।
"Sister Nivedita's Concept of National Education in India"	**Swami Balabhadrananda**	Sister Nivedita and Her	ভগিনী নিবেদিতার জাতীয় শিক্ষা ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা।	এই প্রবন্ধে লেখক দেখিয়েছেন যে, নিবেদিতার মতে জাতীয় শিক্ষা বলতে

	(2018)।	Contributions to India		প্রাচীন ভারতে সমস্ত শিক্ষা যা যুগে যুগে বিকশিত হয়েছে এবং যা পাশ্চাত্যের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে মিশ্রিত করে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে যা হৃদয় এবং বৌদ্ধিক সামর্থ্যকে বিকশিত করে এবং অন্তর আত্মাকে জাগ্রত করে।
"A Message for the Youth of India : Relevance of Sister Nivedita's Teachings in the 21st Century"	**Mukherjee, Saradindu (2018)**	Sister Nivedita and Her Contributions to India	নিবেদিতার শিক্ষাদান পদ্ধতির আজও প্রাসঙ্গিকতা কতখানি সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা।	প্রতিটি শিক্ষার্থীর ভিতরে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত সম্ভাবনাকে তিনি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। নিবেদিতা ভারতীয়দের দ্বারা ভারতের নিজস্ব ইতিহাস রচনার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রত্যেকে যেন নিজেকে জানতে পারে অন্যথায় অন্যকে জানা তার পক্ষে সম্ভব নয়। নিবেদিতার শিক্ষাদানের পদ্ধতি তাঁর নিজস্ব মননশীলতার ফসল।
Gender and Education: The Vision and	**Quayum, M.A.**	SAGE (Journal of Social Values)	রোকেয়ার নারীবাদী মতাদর্শ এবং ভারতীয় নারীদের,	হিন্দু ও মুসলিম উভয় নারীর সমন্বয়ে গঠিত এই স্বেচ্ছাসেবকরা দ্বারে দ্বারে

Activism of Rokeya Sakhawat Hossain	**(2016)**		বিশেষ করে বাঙালি মুসলিম নারীদের উন্নতির জন্য গৃহীত তার শিক্ষামূলক কর্মসূচী অনুসন্ধান করা।	গিয়ে মহিলাদের পড়া, লেখা, সেলাই, সূচিকর্ম বা শিশু যত্ন বা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত বিষয়গুলি শেখাতেন।
Rokeya Sakhawat Hossain: Tireless Fighter of Female Education and their Independence – A Textual Analysis	**Mahmud, R. (2016)**	International Journal on Studies in English Language and Literature (IJSELL)	বাংলার প্রথম মুসলিম নারীবাদী চিন্তাবিদ, লেখিকা এবং শিক্ষাবিদ বেগম রোকেয়ার নারী স্বাধীনতা এবং নারী শিক্ষার সমর্থনে তার প্রচেষ্টা তুলে ধরা।	একটি আধুনিক, উদার ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি কল্পনা করেছিলেন যে, শিক্ষার মাধ্যমে নারীরা, বিশেষ করে মুসলিম নারীরা মানুষ হিসেবে তাদের পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে পারবে এবং পুরুষের উপর নির্ভর না করে তাদের নিজস্ব স্বার্থ অনুসরণ করবে।
Educational Thoughts of Begum Rokeya And Her Contribution in the Upliftment of Women Education in Bengal	**Roy, A.K. (2019)**	International Journal of Research in Social Sciences	(i) বেগম রোকেয়ার শিক্ষাগত চিন্তাকে সমালোচনামূলকভাবে পরীক্ষা করা। (ii) উপনিবেশিত ভারতে নারী শিক্ষার উন্নয়নে রোকেয়ার	বেগম রোকেয়ার শিক্ষা-চিন্তা এবং ব্রিটিশ শাসকদের আধিপত্যে অবিভক্ত বাংলায় নারী শিক্ষার উন্নয়নে তাঁর অবদানকে সমালোচনামূলকভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

			ভূমিকা তুলে ধরা।	
Begum Rokeya Sakhawat Hossain's Sultana's Dream: An Echo of Enlightened Women's Leadership in the Feminist Utopia	**Begum, A. (2021)**	International Journal for Asian Contemporary Research, Volume 1	১. এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল শিক্ষা কীভাবে উদ্ভাবনী চিন্তাশক্তির সঙ্গে নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে তা খুঁজে বের করা। 2. বেগম রোকেয়ার নিখুঁত নারী নেতৃত্বের সৃজনশীলতাকে প্রমাণ করা যারা শিক্ষার দ্বারা আলোকিত হয়েছিল।	নারী শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি তাদের ক্ষমতায়নে রোকেয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। বেগম রোকেয়ার ইউটোপিয়া এই সমসাময়িক আধুনিক বিশ্বের নিখুঁত সাদৃশ্য হয়ে উঠেছে যেখানে আমাদের আলোকিত নারীরা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করে।
Emancipation of Women through Education and Economic	**Islam1, M.S & Islam, R (2011)**	SUST Journal of Social Sciences, Vol. 18	বেগম রোকেয়ার ইউটোপিয়া সুলতানার স্বপ্ন এবং পদ্মরাগের আলোকে	শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নারীর ক্ষমতায়নের ভিত্তি তৈরি করে। এই গবেষণাপত্রটি শিক্ষা

Freedom: A Feminist Study of Begum Rokeya's Utopias			দক্ষিণ এশিয়ার বিশেষ করে বাংলাদেশে নারীর জগতকে অন্বেষণ করা।	এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও মুক্তির প্রকৃতি ও পরিধি নিয়েও অনুসন্ধান করেছে।
Contribution of Savitribai Phule And Begum Rokeya Sakhawat Hossain In Women-Education Reform	**Sultana, S. (2021)**	EduQuad (International & Peer Reviewed Journal of Education)	সাবিত্রীবাঈ ফুলে এবং বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এই গবেষণার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন। ১) নারী শিক্ষা সংস্কারে তাদের অবদান তুলনামূলকভাবে আলোচনা করা । ২) সমসাময়িক নারী শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা এবং এই দুই নারীর তাৎপর্য তুলে ধরা ।	সাবিত্রী এবং ফাতিমা একটি শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ শেষ করে উসমান শেখের বাড়িতে একটি স্কুল শুরু করেন। ছাত্রদের স্কুলে যেতে অনুপ্রাণিত করার জন্য, সাবিত্রীবাই দরিদ্র ছাত্রদের জন্য উপবৃত্তি শুরু করেছিলেন। বেগম রোকেয়া "আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতেন-ই-ইসলাম (ইসলামী মহিলা সমিতি) নামে একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান শুরু করেছিলেন যার উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্র মুসলিম মহিলাদের আর্থিক ও শিক্ষাগত সহায়তা প্রদান করা এবং মুসলিম মহিলাদের অধিকারের

				বিষয়ে জনমত গড়ে তোলা ।
"রোকেয়া জীবনী"	**Shamsunnahar Mahmud (1937)**	Rokeya Jiboni	রোকেয়ার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়কালের প্রতিটি ঘটনার অনুপুঙ্খ পর্যালোচনা করা।	রোকেয়ার মানবতাবাদী চিন্তাভাবনা এবং কর্ম, মুসলমান সমাজের মেয়েদের জন্য তাঁর সুগভীর অনুভূতি, কাজের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং সর্বোপরি সমস্ত কাজের মধ্যে প্রেমদান।
"পত্রে রোকেয়া পরিচিতি"	**Moshfeda Mahmud (1965)**	Patre Rokeya Porichiti	রোকেয়ার পত্রসাহিত্য গুলিকে কালানুক্রমে সাজানো এবং সেগুলির বিস্তৃত বিশ্লেষণ।	রোকেয়ার বিভিন্ন চিঠিপত্রে সেই সময়কার পুরুষতান্ত্রিক মুসলমান সমাজের অত্যন্ত হতাশা ব্যঞ্জক নেতিবাচক চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। সেই যুগের মুসলমান সমাজে তাদের মেয়েদের সম্বন্ধে মূল্যবোধও রোকেয়ার চিঠিপত্রে ধরা পড়েছে। বিভিন্ন চিঠির প্রেক্ষিতে রোকেয়ার লড়াইয়ের ভয়ংকর চিত্র আমাদের চোখের সামনে উঠে আসে।
"বেগম রোকেয়া :	**Motahar Hossain**	Begum Rokeya :	১বেগম রোকেয়ার (সমগ্র জীবন এবং তাঁর	বেগম রোকেয়ার মানসিক, সামাজিক,

জীবনী ও সাহিত্য”	**Sufi (1986)**	Jiban O Shahitya	বুদ্ধিদীপ্ত কর্মকাণ্ডকে সুন্দরভাবে তুলে ধরা। ২। রোকেয়ার উপরে সেই কালে যে সমস্ত গবেষণা হয়েছিল সেগুলির তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ করা।	বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক এবং নৈতিক দিকগুলিকে বিশ্লেষকের দৃষ্টিতে দেখা যায়।
“Begum Rokeya : The Emancipator”	**Hasina Joardar and Safiuddin Joardar (1980)**	Begum Rokeya: The Emancipator	রোকেয়ার সমাজ ভাবনা এবং সেই সময়ে প্রেক্ষিতে ওই ভাবনার গুরুত্ব কতখানি তা বিশ্লেষণ করা।	গবেষকরা দেখিয়েছেন সেই সময়ের মুসলমান নারী সমাজের উন্নয়নে রোকেয়ার চিন্তাভাবনা এবং কাজকর্ম কেমন ছিল।
“Education of Muslim Women in Colonial Bengal”	**Habiuzzaman (2016)**	NU Journal of Humanities, Social Sciences & Business Studies.	ব্রিটিশ শাসনে বঙ্গদেশে মুসলমান সমাজে মেয়েদের অবস্থা কেমন ছিল সেই বিষয়ে অনুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করা।	ব্রিটিশ শাসনকালে মুসলমান সমাজ ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল। তারা মেয়েদের পর্দানসিন করে রাখতেন। মেয়েদের শিক্ষার প্রায় কোন ব্যবস্থাই ছিল না। কিছু কিছু অভিজাত পরিবার তাদের মেয়েদেরকে গৃহ শিক্ষকের কাছে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতেন মাত্র।
“রোকেয়া সাখাওয়াত	**Tanaya**	Women’s	বেগম রোকেয়ার নারী	লেখিকা তার প্রবন্ধে

হোসেন :(১৯৩২-১৮৮০) বাংলার মুসলমান সমাজে নারী শিক্ষার প্রসারে এক জেহাদি কন্যা”	**Afrosa (2016)**	Education in India Past Predicaments and Future Possibilities	শিক্ষা ভাবনা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা।	রোকেয়ার শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য, পদ্ধতি এবং নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

তথ্যসূত্রঃ

- Khatun, M. (1994). Begum Rokeya: An Enquiry it to her Educational Idea and Practice. Thesis submitted to the University of Calcutta for the PH.D. Degree in Education in Calcutta, Calcutta.
- মজুমদার (দাস), গোপা (২০১১)। নারী প্রগতির ধারায় বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি. (বাংলা) প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, শিলিগুড়ি।
- Khatun, R. (2018). Educational Ideas and Practices of Rokeya Sakhawat Hossain with Reference to Mordern Perspective. Thesis submitted to Visva- Bharati (A Central University) for the Award of the degree of Doctor of Philosophy in Education, Department of Education, Visva - Bharati.
- Roy, S. (1987). Social and Political Ideas of Sister Nivedita. Ph. D. (Ants) Dissertation submitted to the University of Calcutta, Calcutta.
- Paul, S. (2009). Nationalist Discourse and Education in India : Views of Sister Nivedita. Thesis submitted to Assam University, Silchar in partial fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy in Education, Department of Education, School of Humanities, Assam University, Silchar.
- Knathwohl, D.R. (1988). How to prepare a Research Proposal : Guidelines for Funding and Dissertations in the Social and Behavioral Sciences. *Syracuse NY : Syracuse University Press.*

- আচার্য, পরমেশ (২০১৭)। নিবেদিতা : অনন্যা অগ্নিকন্যা ও নারী মুক্তির প্রতীক। বিষ্ণুপদ নন্দ, *উদ্ভাসিত মহিমা : শ্বেতপদ্ম নিবেদিতা* সম্পাদিত গ্রন্থ/ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ.- ১৫৩-১৫৯।
- মুখোপাধ্যায়, অদিতি (২০১৭)। পরিবেশ ভাবনায় এবং নারী শিক্ষার জাগরণে ভগিনী নিবেদিতা, সম্পাদিত গ্রন্থ বিষ্ণুপদ নন্দ, *উদ্ভাসিত মহিমা : শ্বেতপদ্ম নিবেদিতা*/ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ.- ২১৬-২২০।
- Swami Balabhadrananda (2018). *Sister Nivedita's Concept of National Education in India.* In Swami Kamalasthananda (Ed.), *Sister Nivedita and Her Contributions to India.* Ramakrishna Mission Vivekananda Centenary College, Rahara. Pp- 17-22.
- Mukherjee, Saradindu (2018). A Message for the Youth of India: Relevance of Sister Nivedita's Teachings. In Swami Kamalasthananda (Ed.), *Sister Nivedita and her Contributions to India.* Ramakrishna Mission Vivekananda Centenary College, Rahara. Pp- 29-40.
- Basak, S. (1992). Sister Nivedita and Women's Education in Bengal in the First Decade of the 20th Century. *Indian History Congress.* Vol. 53 (1992), pp. 414-422.
- Biswas, S. (2014). From Noble to Nivedita: Sister Nivedita and her Passages Through India, 1895-1911. *Indian History Congress.* Vol. 75, Platinum Jubilee (2014), pp. 790-797.
- O' Doherty, M. (2018). Sister Nivedita—A Psychological Reassessment. *History Ireland* , 26(1) (January–February 2018), pp. 26-29.
- Biswas, I. (2020). Sister Nivedita and the Upliftment of Indian Women. *International Journal of Research on Social and Natural Sciences.* V (2).
- Inaga, S. (2004). Sister Nivedita and Her "Kali The Mother, The Web of Indian Life", and Art Criticism: New Insights into Okakura Kakuzō's Indian Writings and the

Function of Art in the Shaping of Nationality. *International Research Centre for Japanese Studies, National Institute for the Humanities.* 16, pp. 129-159.

- Rai, S. (2018). Indian Education System: A Comprehensive Analysis By Sister Nivedita. *PEOPLE: International Journal of Social Sciences,* 4(2), 17-26.
- Sahoo, D. S. (2018). Women Empowerment in Bengal and Sister Nivedita: A Sequential Accolade. *International Journal for Innovative Research in Multidisciplinary Field,* 4(6).
- Mallick, S. (2013). Swami Vivekananda and Sister Nivedita at Crossroads. *International Journal of Electronics and Communication Technology,* 4(1).
- Mukherjee, D. A. (2017). Sister Nivedita's Vision on Education in India. *International Journal of History, Archaeology, Indology and Numismatics,* 4(1).
- Pramanik, S. (2018). Nivedita: The Lady with the Lamp - an Incarnation of Empowered Woman. *International Research Journal of Humanities, Language, and Literature,* 5(8).
- Rani, T. (2020). Sister Nivedita: The Embracer of India. *RJPSS,* 14(2).
- Benerjee, S. N. (2021). Nivedita: Religion and Society- an Impeccable act of Civic Service by the Sister During Calcutta Plague Pandemic. *ResearchGate.*
- Begum, A. (2021). Begum Rokeya Sakhawat Hossain's Sultana's Dream: An Echo of Enlightened Women's Leardership in the Feminist Utopia. *International Journal for Asian Contemporary Research, I*(III), 130-133.

- Sultana, S. (2021). Contribution of Savitribai Phule and Begum Rokeya Sakhawat Hossain in Women Education Reform. *EduQuad,* 1(2).

- Mohammad Shafiqul Islam and Ruma Islam. (2012). Emancipation of Women through Education and Economic Freedom: A Feminist Study of Begum Rokeya's Utopia. *SUST Journal of Social Science,* 18(4), 11-19.

- Mahmud, R. (2016). Rokeya Sakhawat Hossain: Tireless Fighter of Female Education and Their Independance. *International Journal on Studies in English Languageand Literature,* 4(9), 40-48.

- Roy, A. K. (2019). Educational Thoughts of Begum Rokeya and Her Contribution in the Upliftment of Women Education in Bengal. *International Journal of Research in Social Sciences,* 9(3).

- Mahmud, S. (1937). *Rokeya Jibani.* Bulbul Publishing House, Calcutta
- Mahmud, M. (1965). *Patre Rokeya Parichiti.* Bangla Academi Dhaka
- Sufi, M. H. (1986). *Begum Rokeya: Jiban O Sahitya* [Life and works of Begum Rokeya], University Press Limited, Dhaka.
- Joardar, H. & Joardar, S. (1980). *Begum Rokeya: The Emancipator.* Nari Kalyan Sangstha, Dhaka
- Hadiuzzaman, S. (2016). *Education of Muslim Women in Colonial Bengal,* N.U Journal of Humanity, Social Science & Business Studies, 2 (2).
- আফরোজ, তনয়া (২০১৬)। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) বাংলার মুসলমান সমাজে নারী শিক্ষার প্রসারে এক জেহাদী কন্যা। ইউ.জি.সি. -এর অর্থানুকূল্যে জাতীয় আলোচনা সভা '*Women's*

Education in India: Past Predicaments and Future Possibilities'. পরিচালনায় সংস্কৃত বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ এবং সমাজ তত্ত্ব বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন এবং মহারানী কাশীশ্বরী কলেজ, ২৩-২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৫, ৩৯০-৩৯৭।

- Uddin, M. J. (2020). Education as a Tool of Women in Begum Rokeya's Sultana's Dream. *ResearchGate.*

তৃতীয় অধ্যায়

গবেষণার পদ্ধতি

৩:১.	ভূমিকা
৩.২	ঐতিহাসিক গবেষণার পদ্ধতি
৩.২.১	ঐতিহাসিক গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য
৩.২.২	পর্যবেক্ষণ
৩.২.৩	সাক্ষাৎকার পদ্ধতি
৩.২.৪	বর্তমান গবেষণার নক্সা
৩.২.৫	গবেষণায় ব্যবহৃত সহায়ক সরঞ্জাম সমূহ
৩.৩	তথ্যের বিশ্লেষণ
	তথ্যসূত্র

তৃতীয় অধ্যায়

গবেষণার পদ্ধতি

৩:১ ভূমিকাঃ

বর্তমান গবেষণাটি একটি গুনগতমান ভিত্তিক শিক্ষাচর্চা। গবেষিকা এখানে গবেষণার নক্সা প্রস্তুত করণে বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন সুচিন্তিত ভাবে। গবেষিকা তাঁর সুপারভাইজার এর সঙ্গে আলোচনা করে বর্তমান গবেষণায় তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন। এটি একটি ঐতিহাসিক গবেষণা যেখানে ইন্টারভিউ পদ্ধতিকে ব্যবহার করা হয়েছে।

গুনগতমানভিত্তিক গবেষণা সম্বন্ধে Hiatt (1986) বলেছেন, "Qualitative Research lays emphasis on discovering and understanding the experiences, Perspectives, and thoughts of Participants– that is, qualitative research explores meaning, purpose or reality."

এই পদ্ধতিতে ফিল্ড নোট গ্রহণ, সাক্ষাৎকার পদ্ধতি, পারস্পরিক ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, ফটোগ্রাফ, রেকর্ডিং ইত্যাদিকে ব্যবহার করা হয়। এই পর্যায়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে যে সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হয় সেগুলির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয় এবং সেখান থেকে গবেষক/গবেষিকা একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকেন।

Denzin and Lincoln (2005, p.3) -এর মতে, "Qualitative researcher study things in their natural settings, attempting to make sense of, or interpret Phenomena in terms of the meanings people bring to them."

গুনগতমানভিত্তিক গবেষণায় গবেষক কেস স্টাডি পদ্ধতি, এথনোগ্রাফিক পদ্ধতি, সাক্ষাৎকার পদ্ধতি, ফোকাস গ্রুপ পদ্ধতি ইত্যাদি এক বা একাধিক পদ্ধতি ব্যবহার করে সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ করেন।

Denzin (2006) বলেছেন, - In this approach researchers can not set aside their experiences, perception, biases and thus can not pretend to be objective by the researchers.

এই ধরনের গবেষণার অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল যে, গুণগতমান ভিত্তিক গবেষণা তুলনামূলক ভাবে নতুন এবং বর্তমানের গবেষকরা এই পদ্ধতির উপর অধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন। মোটামুটিভাবে ১৯৮০ সাল থেকে সমগ্র বিশ্বেই এই পদ্ধতির বহুল ব্যবহার শুরু হয়েছে (Denzin, 2006)।

Merriam (2009, p.13) -এর মতে, Qualitative Researchers are interested in understanding the meaning people have constructed, that is how the people make sense of their world and the experiences they have in the world.

এই পদ্ধতিতে গবেষণায় অংশগ্রহণকারীর পর্যবেক্ষণ করা হয়, তার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়, যা অবশ্য বর্ণনামূলক।Sociologists using this method typically reject positivism and adopt a form of interpretive sociology (Perkinson and Drislane, 2011).

গুনগতমানভিত্তিক এবং ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে বর্তমান গবেষণাটিকে সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

৩.২ ঐতিহাসিক গবেষণার পদ্ধতি :

শিক্ষাবিজ্ঞানের গবেষণায় ঐতিহাসিক গবেষণার ব্যবহার অনেক প্রাচীন। ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে গবেষণার ক্ষেত্রে নৃতাত্ত্বিকরাও যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছেন। Bernar Cohn এর মতে, “Historical Anthropology than will be the delination of cultures, the location of these in historical time through the study of events which effect and transform structures and the explanation of the consequences of these transformation. These will not yield a scientific theory of social change such as nineteenth century scholars shought but rather history of change.”

Young এর মতে, Historical method is the induction of principles through research into the past and social forces which have shaped the present.” প্রকৃতপক্ষে অতীতের নথিভুক্ত বিষয়গুলিকে

সমালোচনার মাধ্যমে পরীক্ষা করা সম্ভব হয় ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে। তাই বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদ, শিক্ষাবিদ, নৃতাত্ত্বিক এবং দার্শনিকরা এই পদ্ধতিতে গবেষণা করেন।

Waan Dalean ঐতিহাসিক গবেষণায় পাঁচটি পর্যায়ের কথা বলেছেন–

১. সমস্যাটিকে চিহ্নিতকরণ করতে হবে, সমস্যাটির সংজ্ঞা দান করতে হবে এবং সমস্যাটিকে বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করতে হবে।

২. তথ্য সংগ্রহের উৎসটিকে চিহ্নিতকরণ করতে হবে যার উপর ভিত্তি করে গবেষণায় সংশ্লিষ্ট তথ্যগুলিকে সংগ্রহ করা হবে। সমস্যা-ভিত্তিক তথ্য এবং উপাত্তের সংগ্রহকরণ এই পর্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

৩. যে সকল উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হবে তার সমালোচনাপূর্ণ মূল্যায়ন করতে হবে।

৪. গবেষণাটির সম্ভাব্য অনুমানগুলি তৈরি করতে হবে যার উপর ভিত্তি করে সংগৃহীত তথ্য ও চিত্রের ব্যাখ্যা দান সম্ভব হবে।

৫. বিভিন্ন সংগৃহীত ঐতিহাসিক উপাদানের বিশ্লেষণ করতে হবে, উপাদানগুলিকে পর্যায়ক্রমে এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সজ্জিতকরণ করতে হবে এবং সর্বোপরি একটি উপসংহারে উপনীত হতে হবে।

৩.২.১ ঐতিহাসিক গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য :

Mauli ঐতিহাসিক গবেষণার উৎস এবং ঘটনাগুলিকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন–

১. ঐতিহাসিক তথ্য সমূহ

২. ঐতিহাসিক গবেষণায় ব্যবহৃত অবশিষ্ট উপাদান সমূহ।

উৎসগুলিকে Waan Dalean ঐতিহাসিক উপাত্তগুলির উপর ভিত্তি করে ভাগ করেছেন–

i) প্রাথমিক উৎস

ঐতিহাসিক গবেষণায় ব্যবহৃত প্রাথমিক উৎস গুলি হল–

১. প্রত্নতত্ত্ব (Archieology)

২. আত্মজীবনী (Autobiography)

৩. সরকারি কাগজপত্র (Archives)

৪. সরণিকা (Diary)

৫. জীবাশ্ম (Fossil)

৬. অতীত ভাষণ বিবৃতি (Past Speech Statement)

৭. পর্যটকের গল্প (Stories written by tourist)

৮. ব্যক্তিগত চিঠিপত্র (Letters written by the concern person)

৯. ব্যক্তিগত বই (Books written by the person)

ii) গৌণ উৎস

. ঐতিহাসিক গবেষণায় নিম্নলিখিত গৌণ উৎসগুলিকে তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করা হয়।

১. বিশ্ববিদ্যালয় বুলেটিন

২. সমসাময়িক পত্রপত্রিকা সমূহ

৩. যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে গবেষণা করা হচ্ছে তাঁকে / সেই প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে কোন কার্যবিবরণী বা মূল ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসা অপরাপর ব্যক্তির দ্বারা লিখিত পুস্তক ইত্যাদি।

৪. মানচিত্র

Waan Dalean -এর কথায় প্রাথমিক উৎসগুলি হল - ঐতিহাসিক গবেষণার মৌলিক উপাদান ("The basic material of historical research")

ঐতিহাসিক গবেষণায় যে সকল নথিপত্র/ঐতিহাসিক দলিল ব্যবহৃত হয় সেগুলি হল –

i) সরকারি নথিপত্র / দলিল সমূহ

ii) ব্যক্তিগত নথিপত্র / দলিল সমূহ

iii) বিভিন্ন প্রকারের ছবি, ঐতিহাসিক ম্যাপ সমূহ, ঐতিহাসিক স্থান / ঐতিহাসিক দলিলের ফটো, ঐতিহাসিক স্কেচ সমূহ, ঐতিহাসিক মুদ্রা, ঐতিহাসিক মূর্তি, বিভিন্ন শিলালিপি / তাম্রলিপি ইত্যাদি।

iv) প্রকাশিত গবেষণায় ব্যবহারযোগ্য উপাদান সমূহ।

v) যান্ত্রিক উপাদান সমূহ। যেমন- টেপ রেকর্ডার, ভিডিও, অডিও ক্যাসেট ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক কিছু কিছু ভগ্নাবশেষও এই ধরনের গবেষণার পক্ষে সহায়ক যেমন- ঐতিহাসিক ঘরবাড়ি, ঐতিহাসিক আসবাবপত্র, বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্রপাতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, মৃতদেহের অংশবিশেষ ইত্যাদি। ঐতিহাসিক গবেষণায় হাতে লেখা উপাদানগুলিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমান গবেষণায় গবেষিকা নারী শিক্ষা এবং সমাজ ভাবনায় ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছেন। এই গবেষণাটিকে নারী শিক্ষার আঙ্গিকে দেখা যায়। ভারতে নারী শিক্ষা বিষয়ে ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে খুব বেশি গবেষণা লক্ষ্য করা যায় না। Fourth Survey of Research in Education (1983 – 1988) এর প্রথম খণ্ডে নারী শিক্ষার উপরে ওই সময়কাল পর্যন্ত যে সকল গবেষণাকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল – Mathur (1978), Misra (1961), Rai (1955), Vakil (1965), Desai (1972), Naik (1949), Dave (1971), Lakhar (1976), Das (1979), Rajlakshmi (1984) প্রমুখরা। এই সকল গবেষকরা উন্নত গুণমানের গবেষণা করেছেন।

নারী শিক্ষা বিষয়ে গবেষণায় ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং কি ধরনের প্রয়োজনীয়তা ছিল সে সম্বন্ধে গবেষকরা বিভিন্ন মতামতকে উপস্থাপন করেছেন। কোন কোন গবেষণায় সমাজ সংস্কারদের নারী শিক্ষা ক্ষেত্রে ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। নারী সম্বন্ধীয় এই সমস্ত গবেষণায় গবেষকরা

বিভিন্ন ধরনের উপন্যাস, ছোটগল্প, আত্মজীবনী, জীবনীমূলক গ্রন্থ, মহিলাদের চর্চা হয় এমন পত্রপত্রিকা, মহিলা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস ইত্যাদিকে গবেষণার উৎস হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

বর্তমান গবেষণায় গবেষিকা নিবেদিতার পত্রাবলী, নিবেদিতা রচনা সমূহ, নিবেদিতা সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থ সমূহ, সমকালে সংবাদপত্রে ব্যবহৃত তথ্যসমূহ, নিবেদিতাকে লেখা বিভিন্ন চিঠি, পত্রাবলী (স্বামী বিবেকানন্দ দ্বারা লিখিত চিঠিপত্রের অখণ্ড সংস্করণ), নিবেদিতার উপর সংগঠিত বিভিন্ন গবেষণার অভিসন্দর্ভ এবং গবেষণা পত্র, নিবেদিতা সম্পর্কিত প্রবন্ধ সমূহকে নিবেদিতার গবেষণায় প্রাথমিক এবং গৌণ উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

গবেষণায় বেগম রোকেয়া সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষিকা নিম্নলিখিত প্রাথমিক এবং গৌণ উৎসগুলিকে ব্যবহার করেছেন – রোকেয়া রচনাবলী, রোকেয়া সম্পর্কিত বিভিন্ন লেখকের লেখা বই, রোকেয়া সম্পর্কিত প্রবন্ধ সমূহ, বিভিন্ন পত্রপত্রিকা যেগুলিতে রোকেয়া সম্পর্কিত গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয়েছে, রোকেয়া সম্পর্কিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ।

৩.২.২ পর্যবেক্ষণ :

কোনো প্রাথমিক উৎস থেকে ঐতিহাসিক গবেষণায় পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষক তার বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলিকে ব্যবহার করেন। বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণের দ্বারা তথ্যকে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিকে ব্যবহার করা হয়। পর্যবেক্ষণ যেমন গুনগতমানভিত্তিক হয় (যেখানে কোনো একটি উপাদান এর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিকে বোঝায়) অথবা সাংখ্যমানভিত্তিক (যেখানে পর্যবেক্ষণযোগ্য ঘটনার/উপাদানের সংখ্যা বা পরিমাপ করা হয়)।

৩.২.৩ সাক্ষাৎকার পদ্ধতি :

শিক্ষাবিজ্ঞানের গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পদ্ধতি গুলির মধ্যে সাক্ষাৎকার একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি। Bennery and Hughus সাক্ষাৎকারকে একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরূপ স্বীকৃতি দিয়েছেন। কোন একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যখন একটি বিষয়ে - আলাপ আলোচনা করেণ তখন তাকে সাক্ষাৎকার বলে। Young এর মতে, “Interview is a systematic method by which a person enters more or less imaginatively into the life of a comparative stranger.” নির্দিষ্ট কিছু তথ্য

উত্তরদাতার কাছ থেকে বের করে আনার লক্ষ্যে সাক্ষাৎ গ্রহণকারী এবং উত্তর দাতার মধ্যে যে কথোপকথন তাকে সাক্ষাৎকার বলে (Moser and Kalton)।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ পদ্ধতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সুবিধা হল–

১. নমনীয়তা এই পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

২. প্রশ্নদাতা চাইলে অনেক জটিল এবং কঠিন প্রশ্নের উত্তর উত্তরদাতার কাছে জানতে চাইতে পারেন।

৩. উত্তরদাতার আচরণও এই পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ করা যায়।

৪. সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী চাইলে নিজের মত করে এই পদ্ধতির পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

৫. এই পদ্ধতির নির্ভরযোগ্যতা বেশি এবং এর যথেষ্ট প্রয়োগ যোগ্যতা রয়েছে।

৬. সর্বোপরি এই পদ্ধতিতে প্রশ্নকর্তা এবং উত্তরদাতার মধ্যে গভীর মিথস্ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে এক বা একাধিক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন এবং এক বা একাধিক ব্যক্তি তার উত্তর দেন, স্বাভাবিকভাবে সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে একজন উত্তরদাতাকে একজন প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন করেন। একাধিক উত্তরদাতা থাকলে পর্যায়ক্রমে একেকজনকে প্রশ্ন করা হয়। এই পদ্ধতিতে সাক্ষাৎ দানকারীর কাছ থেকে সাক্ষাৎ গ্রহণকারীর কাছে তথ্যসমূহ আসে। সাক্ষাৎকারের এটি হল প্রাথমিক উদ্দেশ্য। তবে তথ্যের সঞ্চালন একই সঙ্গে উভয় দিকে ঘটতে পারে। অনেকক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারে উত্তরদাতা প্রশ্নকর্তাকে প্রশ্ন করেন।

৩.২.৪ বর্তমান গবেষণার নক্সা :

গবেষিকা বর্তমান গবেষণায় গুণগতমান ভিত্তিক গবেষণা পদ্ধতিকে ব্যবহার করেছেন। এই পদ্ধতিতে তিনি নিম্নলিখিত উৎগুলি থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

(ক) প্রাথমিক উৎসসমূহ – বেগম রোকেয়ার রচনাবলী, বেগম রোকেয়ার চিঠিপত্র, বেগম রোকেয়ার ছবি, Complete works of Nivedita, Letters of Nivedita, pictures and documents on Nivedita ইত্যাদি।

(খ) গৌন উৎসসমূহ – বেগম রোকেয়া এবং ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে রচিত বিভিন্ন পুস্তক সমূহ, গবেষণাপত্র এবং গবেষণা অভিসন্দর্ভ, সমকালের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এবং সংবাদপত্রের কাটিং ইত্যাদি।

৩.২.৫ গবেষণায় ব্যবহৃত সহায়ক সরঞ্জাম সমূহ :

সাক্ষাৎকার গ্রহণ - বর্তমান গবেষিকা চার জন প্রথিতযশা অধ্যাপক যারা নিয়মিতভাবে ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়াকে নিয়ে চর্চা করেন তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন। এই সাক্ষাৎকারটিতে পূর্বপরিকল্পিত প্রশ্নমালা গবেষিকা ব্যবহার করেছেন।

৩.৩ তথ্যের বিশ্লেষণ :

গবেষিকা গবেষণায় ব্যবহৃত প্রাথমিক উৎস এবং গৌণ উৎস থেকে নিবেদিতা এবং রোকেয়া সম্বন্ধে যে সকল তথ্য পেয়েছেন সেগুলির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন, প্রাপ্ত তথ্যগুলির সত্যতা যাচাই করেছেন এবং এই উৎসগুলি সম্বন্ধে বিভিন্ন সমালোচকের বিশ্লেষণ গুলিকে মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছেন এবং সেই অনুযায়ী গবেষণাটিকে দাঁড় করিয়েছেন।

তথ্যসূত্রঃ

- Hiatt, J. K. (1986). *Spirituality, Medicine, and Healing.* Southern Medical Journal, 79, 736-743).
- Denzin, N.K., and Lincoln, Y. S. (2005). *Introduction In N.K. Denzin and Y. S. Lincoln* (Eds.), The SAGE handbook of Qualitative Research (3rd ed., pp. 1-29). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Denzin, N.K. (2006). *The elephant in the Living room: or extending conversation about the politics of evidence.* Qualitative Research, 9, 139–160.
- Merriam, S. (2009). *Qualitative Research : A guide to Design and Implementation.* San Francisco, CA: Jossey - Bass.
- Parkinson, G., and Drislane, R. (2011). *Qualitative Research. In Online Dictionary of the Social Sciences.* Retrieved from http://bitbucket.icaap.og/dict.pl

চতুর্থ অধ্যায়

ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনী

৪.১	ভূমিকা
৪.২	মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল থেকে সিস্টার নিবেদিতায় রূপান্তর
৪.৩	বেগম রোকেয়ার সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী
	তথ্যসূত্র

চতুর্থ অধ্যায়

ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনী

৪.১ ভূমিকাঃ

বঙ্গদেশে তথা গোটা ভারতবর্ষে কোন কালেই বিশেষ ভাবে জোর দেওয়া হয়নি মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে তাদের মানসিক বিকাশ ঘটানোর উপর, মেয়েরা লেখাপড়া জানবে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তারা পালন করবে একথাও ভাবা হত না। উনিশ শতকে মেয়েদের পড়াশোনার সুযোগ খুব একটা বেশি ছিল না| আমাদের দেশে শিক্ষার ব্যাপারে ব্রাহ্মসমাজের মেয়েরা এগিয়ে গেলেও কিছু সংখ্যক প্রতিষ্ঠিত পরিবারে মেয়েদের বাড়ির ভিতরেই পড়াশোনার ব্যাপারটা সীমাবদ্ধ থাকত। গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের পড়াশোনা করা নিন্দনীয় ছিল। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। পবিত্রতা স্বরুপিণী শ্রীমা সারদা দেবী পড়তে জানতেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাইঝি লক্ষীদিদিও বই পড়তেন। তাতে ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয় শ্রীমায়ের হাত থেকে বই কেড়ে নিয়ে বলেছিলেন, “শেষে কি নাটক নভেল পড়বে?” (বন্দনা ভট্টাচার্য, ২০১৭। পৃ. ৫) এই ছিল তখনকার অবস্থা|

১৮৩০- এর দিকে হিন্দু কলেজে লেখাপড়া শিখেছিলেন যে তরুণরা অথবা ঐ কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়েছিলেন, পরবর্তীতে তাঁরা অনেকেই বঙ্গদেশের তথাকথিত নবজাগরণে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁরা প্রবল ঘৃণা এবং প্রতিবাদী মনোভাব দেখিয়েছিলেন ধর্মীয় আচার, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং চিরাচরিত মূল্যবোধের প্রতি। ১৮৩৮ সালের সমাচার দর্পণে একটি লেখায় নব্য শিক্ষিতদের সম্পর্কে বলা হয়েছে -

“পুরুষদের এইরূপ অবস্থার পরিবর্তন হইলে কি মূর্খ স্ত্রীদের সঙ্গে তাহাদের সম্প্রীতি হইবেক। দিবসীয় মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমের পর পুরুষের যে সান্ত্বনা ও সাহায্যের আবশ্যকতা তাহা কি ঐ অজ্ঞান স্ত্রীর নিকটে পাইতে পারিবেন। ঐ স্ত্রীর নিকটে তিনি কি আপনার অন্তঃকরণীয় বার্তা প্রকাশ করিতে পারিবেন?” (গোলাম মুরশিদ, ২০১২। পৃ. ৬))

যাঁরা স্ত্রী শিক্ষার বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁদের লক্ষ্য করে জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকা লিখেছিল : ছেলেদের শিক্ষা দিওনা তাহলে মেয়েদের শিক্ষা দেবার ও দরকার হবে না। সমকালের তুলনায় যাঁদের চিন্তা ছিল অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, কর্মবিমুখ সমাজে বিরল ব্যতিক্রম হিসেবে যাঁরা সামাজের অগ্রগতির দায়িত্ব নিয়েছিলেন, কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন, বাক্যে এবং কর্মে যাঁরা অভেদ, এমন দুইজন মহিয়সী ব্যক্তিত্ব হলেন- ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়া।

ঊনিশ শতকের শেষ এবং বিংশ শতকের গোড়ার দিকে বাঙালি মুসলমান সমাজে বিশেষ করে নারী সমাজের অবনত অবস্থা, অধিকারহীনতাকে দেখানো হয়েছে পুরুষের নিদারুণ স্বার্থপরতার প্রেক্ষাপটে। বেগম রোকেয়া সমাজজীবনে পুরুষের এই দৃষ্টির পরিবর্তন চেয়ে বলেছেন – "যে শকটের এক চক্র বড় (পতি) এবং এক চক্র ছোট (পত্নী) হয়, সে শকট অধিক দূরে অগ্রসর হইতে পারে না, - সে কেবল একই স্থানে (গৃহকোণেই) ঘুরিতে থাকিবে। তাই ভারতবাসী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না"। (ড. মিজান রহমান, ২০১২। পৃ. ৮)

এত শতাব্দী পেরিয়ে যাওয়ার পর আজও আমরা একটু সমাজের দিকে ভালো করে লক্ষ্য করলেই দেখতে পাই নারীদের দুরাবস্থা কতখানি। তাই আজ এখন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে আবারও এই মহীয়সী ব্যক্তিত্বকে অনুধাবন করতে হবে।

৪.২ মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল থেকে সিস্টার নিবেদিতায় রূপান্তর :

সমগ্র সৃষ্টির মূলে যে অখণ্ড চৈতন্যসত্তা রয়েছে, বিভিন্ন লীলা বৈচিত্র্যের মধ্যে তারই প্রকাশ নিখিল বিশ্বকে মহিমা দান করেছে। মানুষ জীবনে তারই অনুপম অভিব্যক্তি, যে জীবনকে আশ্রয় করে সেই চৈতন্যসত্ত্বার দিব্য প্রকাশ ঘটে, তার প্রতি আচরণে, তার প্রতি কার্যে যে মধুর জ্যোতিঃ প্রস্ফুটিত হয়, তা সমস্ত জনমানবকে কেবল মাত্র আকৃষ্টই করে না, নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে সেই চৈতন্যের আবির্ভাবকে লক্ষ্য করে কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- 'মানুষের সত্যরূপ, চিৎরুপ যে কি, তাহা যে তাঁহাকে জানিয়াছে সে দেখিয়াছে। মানুষের

আন্তরিক সত্তা সর্বপ্রকার স্থূল আচরণকে একেবারে মিথ্যা করিয়া দিয়া কীরূপ অপ্রতিহত তেজে প্রকাশ পাইতে পারে তাহা দেখিতে পাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা। ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে সেই অপরাহত মহত্ত্বকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি"। (প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, ১৯৮৫। পৃ. ১)।

ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে যে দৈবী শক্তির এক বিশেষ প্রকাশ ঘটেছিল, ভারতের জাতীয় জীবনের নবজাগরণের প্রতি পদক্ষেপে তাহার পরিচয় পাই। শিক্ষায়, সেবায়, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, রাজনীতিতে তাঁর অবদান ভারত - ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।

মোটামুটি তিনটি পর্বে ভগিনী নিবেদিতার জীবনকালকে ভাগ করা যেতে পারে। এই তিনটি পর্ব কী সুন্দর ভাবে একটি পর্ব আর একটি পর্বের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত,–

প্রথম পর্ব– তাঁহার জন্মকাল থেকে শুরু করে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা হওয়া পর্যন্ত। এই সময় বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর চরিত্রের অনন্যসাধারণ গুনগুলির বিকাশ ঘটে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ভাবে তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছিল সংশয় ও অনিশ্চয়তা।

দ্বিতীয় পর্ব– এই পর্বে তাঁর জীবনকাল শুরু হয় বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ এর পর। নিবেদিতার জীবনে দ্বিতীয় পর্বের সূচনা কালকে ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি পর্ব বললে কিছু ভুল হয় না। স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা তিনি কতখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাঁর চিন্তাজগতে যে পরিবর্তন ঘটেছিল তা নিবেদিতার স্বলিখিত বই গুলি থেকে প্রমাণ দেয়।

তৃতীয় পর্ব–এই পর্বে ঘটে তাঁর বৃহৎ এক কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ। নীরব নিরলস কর্মের মধ্য দিয়ে তাঁর এগিয়ে যাওয়া প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে - আত্মবিসর্জনই ছিল তাঁর জীবনের মূল ব্রত। নিবেদিতা জানতেন, "ব্রতের উদযাপনে, প্রাণপাত করাই জীবনের আদর্শ, সিদ্ধির জন্য ব্যাকুল হওয়া নহে।"(তদেব, পৃ. ৩) অধ্যাত্মসাধনার কেন্দ্র ভারতভূমি ছিল তাঁর কর্মস্থল। তিনি এমন এক মহামানবী ছিলেন যে, অনেক সময় তাঁকে দেখে রক্তমাংসে গঠিত দেহের অস্তিত্ব কিনা তা নিয়ে মনে সংশয় জাগত। কারণ কখনও তিনি লোক শিক্ষয়িত্রী, কখনও

স্নেহবিগলিত জননী, কখনও কর্তব্যনিষ্ঠ মায়া-মমতায় জড়িত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কর্মী, কখনও বিনীতা ছাত্রী, অথবা সেবিকা, আবার কখনও ভগবদ্ভাবে বিভোরা– বিভিন্ন ভাবের সমাবেশ পরিলক্ষিত হত একই চরিত্রে।

নিবেদিতার পূর্ব নাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল, পিতামহীর নাম অনুসারে শিশুর নামকরণ হয়েছিল মার্গারেট এলিজাবেথ। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ শে অক্টোবর উত্তর আয়ারল্যান্ডের ডানগ্যানন নামে এক ছোট শহরে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা স্যামুয়েল রিচমন্ড নোব্‌ল পেশায় ছিলেন একজন ধর্মযাজক। তাঁর মাতার নাম মেরী ইসাবেল। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র দশ বছর বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। তাঁর পিতার মৃত্যুর পরে তাঁর মা দুটি কন্যা ও এক পুত্রকে নিয়ে পিতা হ্যামিলটনের কাছে চলে আসেন। হ্যামিলটন আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। মার্গারেটের চরিত্রের মধ্যে মাতামহের চারিত্রিক গুণাবলী পরিলক্ষিত হয়। উনি ছিলেন সদা সত্যের পূজারী। ধর্মের প্রতি অনুরাগ, দেশাত্মবোধ এবং রাজনীতির প্রতি মার্গারেটের আকর্ষণ দেখা যায় কারণ মার্গারেটের পিতা ও পিতৃপুরুষ এবং মাতামহের আদর্শের প্রভাব পড়েছিল মার্গারেটের উপর।

মার্গারেটের পাঠ্যজীবন কাটে লন্ডনের চার্চের অধীনে এক বোর্ডিং স্কুলে, কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে। মার্গারেট ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধাবী সম্পন্ন। তিনি পাঠ্য বিষয় ছাড়াও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করতেন-- সাহিত্য, সঙ্গীত, কলাবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, সবকিছুতেই ছিল তাঁর সমান আগ্রহ। স্কুল জীবন ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে শেষ করে মাত্র সতেরো বছর বয়স থেকেই শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হন এবং ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে উইম্বল্ডনে একটি স্কুল স্থাপন করেন এবং নিজস্ব পদ্ধতিতে সেখানে শিক্ষা দিতে শুরু করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে ভালো শিক্ষায়িত্রী হিসেবে। তিনি নানা পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই লন্ডনের বুদ্ধিজীবী মহলের একজন ভালো লেখিকা হিসেবে তাঁর পরিচয় গড়ে ওঠে। Wimbaldon Literary Society প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। চিত্রবিদ্যায় শিক্ষা লাভ করেন শিল্পী এবেনজার কুক এর কাছ থেকে। আর ধর্মের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আকর্ষণ। ছোটবেলা থেকেই চার্চের অধীনে তিনি নিয়মিত সেবা ও কাজ করতেন। বাস্তব জীবনে যথেষ্ট সফল হলেও চার্চের অধীনে প্রথাগত ধর্মজীবন তাঁকে শান্তির সন্ধান দিতে পারেনি। হ্যালিফ্যাক্স বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই তাঁর মনে ধর্ম সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন জাগে। ওই বিদ্যালয়টি ছিল কংগ্রিগেশনালিস্ট চার্চের অধীনে। ঐ জাতীয় বিদ্যালয় গুলিতে নীতি শিক্ষার উপর বিশেষ করে গুরুত্ব দেওয়া হত। সেই প্রচলিত নীতি শিক্ষা একদিকে

যেমন দীনতা, সংযম, স্বার্থত্যাগ, পবিত্রতা প্রভৃতি গুণগুলির বিকাশে সহায়তা করত অপর দিকে, তার কঠোরতা, অত্যধিক বিধিনিষেধ ও অন্য ধর্মের প্রতি অনুদার মনোভাব চরিত্রে উদারতার সৃষ্টিতে বাধা হয়ে দাঁড়াত। অল্প বয়স থেকেই মার্গারেটের মন ছিল সবরকমের সংকীর্ণতা বিরোধী। তাই বিদ্যালয়ে এই পরিবেশ তাঁকে পীড়িত করত। তাঁর মনে হতে লাগল ধর্মজীবনে এত অসহিষ্ণুতা, অনুদারতা কেন? "হৃদয় এখানে অহরহ নিপীড়িত, ক্লিস্ট, ধর্মানুভূতির সহগামী উদার আন্দোলনের এখানে অভাব। ধর্মজীবনে চলিবার একটা পথ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, আর চার্চ যেন, উদ্যত শাসনদণ্ড হস্তে ভ্রুকুটি করিয়া চাহিয়া আছে, এতটুকু এদিক ওদিক হইলেই সর্বনাশ। যাহারা ইহার অনুগামী তাহাদের মধ্যে দাক্ষিণ্যের অভাব সর্বদাই, তাহারা অপর ধর্মাবলম্বীদের প্রতি অসহিষ্ণু। নীতির আবেগহীনতা চরিত্রের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে উৎপাটিত করিয়াছে। মার্গারেটের মনে নিরন্তর প্রশ্ন জাগিতে লাগিল যাজকীয় সংকীর্ণতার উর্ধে কোন উদার এবং মানবীয় ধর্ম কি নাই"? (তদেব, পৃ. ১৫) যে যত যুক্তিবাদী, তার সংশয়ও তত প্রবল। মাত্র আট বছর বয়সেই মার্গারেটের চিন্তাশক্তি আশ্চর্য পরিণতি লাভ করেছিল। যুক্তি দ্বারা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে খ্রীষ্টান মতবাদের সত্যতা সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ জাগল, বহু বিশ্বাস ও আচার মনে হল মিথ্যা, অসঙ্গত। ফলে ক্রমশই, আনুষ্ঠানিক ভাবে খ্রীস্টান ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর কমতে লাগল। ক্রমে মার্গারেট গীর্জা যাওয়া ছেড়ে দিলেন। তাঁর মনে হল প্রাণহীন, শুষ্ক আচার-অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সত্যের সন্ধান করা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু তাও মাঝে মাঝেই এই মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য গির্জায় ছুটে যেতেন - মনে করতেন এবার একটু এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবেন। কিন্তু সমস্ত মনে হওয়াই ছিল বৃথা আড়ম্বর মাত্র।

দীর্ঘ সাত বৎসর কেটে গেল। মার্গারেট এর হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হয়ে উঠল এই সন্দেহসংঘর্ষে। এরই মধ্যে তিনি অনেক বই, অনেক জ্ঞানী ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং দার্শনিক মতবাদগুলি নিয়ে অনেক চিন্তা ও গবেষণা করেছেন, কিন্তু সবকিছুই বৃথা। হঠাৎ তাঁর মনে হল বিজ্ঞান অনুশীলনের দ্বারা হয়ত প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। তাই তিনি চালালেন বিজ্ঞান সাধনা। তিনি ক্রমাগত চলেছেন এক কূল থেকে অপর কূলে। এই সংশয়শুদ্ধ, বিস্তীর্ণ সাগর থেকে কে তাঁকে উদ্ধার করবে? এমন সময় তাঁর হাতে এসে পড়ল বুদ্ধের জীবনী "Light of Asia"। আগ্রহের সঙ্গে তিনি তা পড়ে ফেললেন এবং মনে করলেন এবার হয়তো সত্যের উদ্ঘাটন

সম্ভব হবে। কিন্তু আশা পূর্ণ হল না। সংশয় থেকে তিনি মুক্তি লাভ করতে পারলেন না ঠিকই তবে তাঁর ধারণা দৃঢ় হল এই যে, মুক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে বুদ্ধের বাণী খ্রীস্টান ধর্মযাজকদের মুক্তিব্যাখ্যা অপেক্ষা অধিকতর সঙ্গত।

আচার পঙ্কিল ধর্ম সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা তাঁর মনকে ব্যাথিত করে তুললেও অধ্যাত্মবাদ তাঁর জীবনে ক্রমশ সুদৃঢ় হতে থাকল। চার্চ প্রচলিত ধর্মাচরণের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আগের সেই সহজ-সরল আবেগপূর্ণ ধর্মীয় মনোভাবটি ছিল না ; তার পরিবর্তে জাগ্রত হয়েছিল সত্যকে জানবার এক কঠোর সংকল্প, জীবনের সব রহস্য ভেদ করার এক প্রবল আকাঙ্খা – ধর্ম কি সত্য হইতে পৃথক? মার্গারেটের যুক্তিবাদী মন বলে, 'না, ধর্ম ও সত্য এক'। তবে কোথায় সেই ধর্ম? যে ধর্মে সকলের স্থান, যাহা উদার এবং অকপটে সকলকে আলিঙ্গন করিতে পারে? যে ধর্মে কেবল নির্দিষ্ট পন্থাবলম্বী কয়েকজনের পক্ষে নহে, পরন্তু জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের পক্ষে লভ্য। (তদেব, পৃ. ১৭) আধ্যাত্মিক জীবনের এই সংগ্রামে মার্গারেট অবসন্ন হয়ে পড়লেন। অন্তরে এক প্রবল শূন্যতা অনুভব করতে লাগলেন। সকল যুক্তি ও তর্কের অতীত দুর্জ্ঞেয় সত্যটি তাঁর নিকট উদঘাটিত হবে না? জগতে এমন কেউ কি নাই যিনি ধর্মকে প্রত্যক্ষ রূপ দিতে পারেন?

জীবনের এই সমস্তরকম অশান্তি চিরকালের জন্য দূর হয়ে গেল ভারতীয় সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে। লন্ডনের এক অভিজাত পরিবারের বাড়িতে ১৮৯৫ সালের নভেম্বর মাসে এক সন্ধ্যায় স্বামীজী ভারতীয় বেদান্ত দর্শন ব্যাখ্যা করেছিলেন। এখানেই মার্গারেট স্বামীজীকে প্রথম দর্শন করেছিলেন এবং স্বামীজীর দ্বারা ধর্ম ব্যাখ্যা ও স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের প্রতি তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। এরপর লন্ডনের নানা জায়গায় বক্তৃতা ও প্রশ্ন উত্তর ক্লাস করেছেন স্বামীজী। স্বামীজীর প্রতিটি ব্যাখ্যা শোনার জন্য মার্গারেট সর্বত্র উপস্থিত থাকতেন এবং ক্রমাগত প্রশ্ন করে সব সংশয় তিনি দূর করতে চাইতেন। ক্রমাগত সেই প্রশ্ন-উত্তর গুলি নিয়ে নিজে মনে মনে চিন্তা করতেন। তাঁর বিশ্বাস হল অবশেষে, যে ধর্মজীবনের সন্ধানে এতদিন তিনি দিশাহারা হচ্ছিলেন তার সন্ধান তিনি খুঁজে পেলেন এক ভারতীয় সন্ন্যাসীর থেকে, অবশেষে মার্গারেট স্বামীজীকে তাঁর গুরু বলে বরণ করে নিলেন।

স্বামীজীর পূর্ব নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর গুরু ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ছোটবেলায় তাঁর নাম ছিল গদাধর চট্টোপাধ্যায়। ছোটবেলায় তিনি রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবত গীতা ইত্যাদির কথা শুনে শিখতেন। পরোপকারিণী

দানশীল তেজস্বিনী রানি রাসমনি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরে যোগ দেন তিনি পূজার কাজের জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগ-তপস্যা-ভক্তি ঈশ্বর প্রেমের যেন এক জীবন্ত মূর্তি। এই মহাপুরুষ একদিকে যেমন শাক্ত, বৈষ্ণব ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের ভাবে সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন তেমনি আবার মুসলমান ও খ্রীস্ট ধর্মের ভাবেও সাধনা করে পৌঁছেছিলেন অভীষ্ট লক্ষ্যে। তাই তিনি সহজেই নিজের উপলব্ধি থেকে বলতে পারতেন "যত মত তত পথ" অর্থাৎ এক একটা ধর্ম এক একটি পথ, সব ধর্মেরই এক লক্ষ্য - ঈশ্বর লাভ। সকল জীবেই ঈশ্বর আছেন তবে মানুষের মধ্যে তাঁর বেশি প্রকাশ। নরেন্দ্রনাথ তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সর্বদা সমাধি অবস্থায় থাকার আশীর্বাদ প্রার্থনা করলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে তিরস্কার করে বলেছিলেন শুধুমাত্র নিজের মুক্তি যথেষ্ট নয়, জগতের দুঃখ মোচনের জন্য বিশাল বট গাছের মত আশ্রয়স্থল হয়ে উঠতে হবে। দেহত্যাগের কয়েকদিন আগে শ্রীরামকৃষ্ণ লিখে রেখেছিলেন,"নরেন শিক্ষে দেবে"।(বন্দনা ভট্টাচার্য,২০১৭।পৃ. ১০)

মার্গারেটের সত্যনিষ্ঠা, দৃঢ়তা, স্পষ্টবাদিতা ও সবার ওপরে তাঁর মানব দরদী মনের পরিচয় পেলেন স্বামীজী। পরাধীন ভারতবর্ষের সমস্ত রকম দুঃখ-দুর্দশা, যন্ত্রণা অনুভব করতেন স্বামীজী এবং তিনি মনে করতেন এই সমস্ত রকম দুঃখ-দুর্দশা ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া তখনই সম্ভব যখন নারীদের অবস্থার উন্নতি ঘটানো সম্ভব হবে। আর নারীদের অবস্থার উন্নতি সম্ভব তখনই, যখন নারীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার বিস্তার ঘটানো সম্ভব হবে। তখন নারীরা নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে সচেষ্ট হবে, নারীরা আত্মনির্ভরশীল এবং আত্মবিশ্বাসী হবে। আর মার্গারেটকে দেখে স্বামীজীর মনে হয়েছিল মার্গারেট হলেন সেই নারী যিনি ভারতবর্ষে নারীশিক্ষার জন্য উপযুক্ত হবেন। তাই তিনি ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের বিশেষত নারীদের শিক্ষার কাজে মার্গারেটকে আহ্বান করলেন; "তোমাকে অকপটভাবে বলিতেছি, এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, ভারতের কার্যে তোমার অশেষ সাফল্যলাভ হইবে। ভারতের জন্য, বিশেষতঃ ভারতের নারী সমাজের জন্য, পুরুষ অপেক্ষা নারীর – একজন প্রকৃত সিংহিনীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী নারীর জন্মদান করিতে পারিতেছে না, অন্য জাতি হইতে তাহাকে ধার করিতে হইবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম প্রীতি, দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তই তোমাকে সর্বথা সেই উপযুক্ত নারীরূপে গঠন করিয়াছে?" (প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, ১৮৯৫। পৃ. ৫০-৫১)

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মোম্বাসা জাহাজে ইংল্যান্ড থেকে রওনা হয়ে ২৮ শে জানুয়ারী কলকাতা পৌঁছান মার্গারেট। খিদিরপুর ডকে তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য স্বয়ং স্বামীজী নিজেই উপস্থিত ছিলেন। এখানে স্বামীজীর ভারত গঠনের কাজে যোগদান করতে মার্গারেট তাঁর স্বদেশ, আত্মীয়-বন্ধু, প্রতিষ্ঠিত জীবন সবই ছেড়ে চলে আসেন কলকাতায়। কিন্তু প্রথমে তো মার্গারেটকে ভারতবর্ষকে চিনতে হবে তাই স্বামীজী অসীম ধৈর্য ও মমতা নিয়ে দিনের পর দিন মার্গারেট এর সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেন ভারতের ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, জনজীবন, সমাজতত্ব, প্রাচীন এবং আধুনিক মহাপুরুষদের জীবনী। দুঃখ-দারিদ্র্যপূর্ণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরাধীন যে ভারতবর্ষ চোখের সামনে রয়েছে তার আড়ালে রয়েছে আধ্যাত্মিকতার ঐশ্বর্যে পূর্ণ ত্যাগ- সেবা ও তপস্যাময় এক মহান ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের এই অতুলনীয় রূপ মার্গারেটের সামনে তুলে ধরলেন স্বামীজী। ক্রমশই মার্গারেট ভারতবর্ষকে ভালোবাসতে শুরু করলেন এবং ভারতীয় জীবন গ্রহণের প্রবল আকাঙ্খা তাঁর মধ্যে জেগে উঠল, ক্রমশই তিনি এবং ভারতবর্ষ মিশে একাকার হয়ে উঠল।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ ই মার্চ সারাবুল ও ম্যাক্‌ক্লাউডের সঙ্গে শ্রীমা সারদা দেবীর সাথে পরিচিত হতে যান মার্গারেট। 'আমার মেয়েরা' এই বলে তাদের সারদা মা সম্বোধন করেন এবং তাদের সঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ করেন। নিবেদিতা মুগ্ধ হয়ে দিনটিকে ডায়েরিতে 'a day of days' বলে উল্লেখ করেন। ভালোবাসা, পবিত্রতা, মাধুর্য, সরলতা এবং জ্ঞানের প্রতিমূর্তি সারদা মা বিধাতার যেন এক আশ্চর্যতম সৃষ্টি; ধীরে ধীরে মার্গারেট হয়ে উঠলেন সারদা মা'র আদরের খুকি।

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ২৫ শে মার্চ স্বামীজী মার্গারেটকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়ে নাম রাখলেন 'নিবেদিতা'। নির্দেশ দিলেন তাঁকে, আজীবন কঠোর সংযম অবলম্বন করতে আর বুদ্ধের মতো মানবসেবায় আত্মোৎসর্গ করতে। মার্গারেটের জীবনে ভগবৎ পাদপদ্মে ঐকান্তিক আত্মাহুতিরুপ যে নিবেদন পরবর্তী কালে তা-ই তাঁকে নিবেদিতা নামের সার্থকতা এনে দেয়। এর সূত্রপাত তাঁর জন্মের পূর্বেই মাতৃগর্ভে ঘটেছিল। প্রথম সন্তানধারণের ভয় ও ব্যাকুলতা মেরী হ্যামিলটনকে অভিভূত করেছিল। তাই ধর্মভীরু মেরী ভবিষ্যতের চিন্তা না করে হয়তো মনের আবেগেই আগত সন্তানের মঙ্গল কামনার জন্য দেবতার চরণে একান্ত মনে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন- নিরাপদে যদি সে

জন্মগ্রহণ করে, তবে দেবতার কাজেই তাঁকে উৎসর্গ করবেন। বস্তুতঃ সেদিন সরল মনে দেবতার কাছে যে প্রার্থনা জানিয়ে ছিলেন সেটা মার্গারেটের স্মৃতিপটে অঙ্কিত ছিল কিনা তা সন্দেহের তবে যেদিন স্বামীজী মার্গারেটের নামকরণ করলেন 'নিবেদিতা' সেদিন মার্গারেটের মা মেরী ভেবেছিলেন আজ কন্যার জীবনের সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। তাই তিনি সেদিন পূর্বের কথা স্মরণ করে মার্গারেটের বান্ধবী ম্যাক্‌ক্লাউডের কাছে বর্ণনা করেণ। তাঁর গর্ভকালের কথা। পরবর্তী জীবনে নিবেদিতার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের সেবা করা। ভারতবর্ষের কল্যাণেই জগতের কল্যাণ - স্বামীজীর এই কথায় তিনি বিশ্বাস করতেন। জগতকে সারাজীবন কল্যাণের পথ দেখাবে - ভারতবর্ষের এই আধ্যাত্মিকতার আদর্শ। তাই তাঁর ভারতসেবা আসলে ছিল সমগ্র মানবজাতির সেবা।

মেয়েদের শিক্ষার জন্য যে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে স্বামীজী উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তা পরিচালনা করার জন্য ভারতেরই কোন নারী যদি এই কাজের ভারের দায়িত্ব নেয় তবে তার জন্য তিনি চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন নানাভাবে। এমন কি 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সরলা ঘোষালকে উচ্চ প্রশংসা করে পত্র লিখেছিলেন - 'প্রভু করুন, যেন আপনার মত অনেক রমণী এদেশে জন্মগ্রহণ করেন ও স্বদেশের উন্নতিকল্পে জীবন উৎসর্গ করেন'। (তদেব, পৃ. ৪৪ – ৪৫)

কত আশা নিয়ে স্বামীজী বর্তমান ভারতবর্ষের অবনতির কথা এবং অবনতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যে নারী জাগরণের প্রয়োজন তা বিস্তৃতরূপে আলোচনা করেছিলেন চিঠিতে সরলা ঘোষালের কাছে । কেবল শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রচার এবং ঐ উদ্দেশ্যে ভারতের প্রধান শহরগুলিতে কেন্দ্র স্থাপন কেবলমাত্র পুরুষদের জন্য নয়, নারীগণের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন। কিন্তু সেটা করা সেই সময় ছিল অত্যন্ত কঠিন। সরলা ঘোষালের কাছ থেকে পাওয়া উত্তর স্বামীজীর আশা পূর্ণ করল না, স্বামীজীর মনে হল মৈত্রেয়ী, খনা লীলাবতী, সাবিত্রী ও উভয়ভারতীর জন্মভূমিতে কি আর কোনও নারীর এ সাহস হবে না? অবশেষে, লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত, লাঞ্ছিত নরনারীর দুঃখ বেদনায় অধীর স্বামী বিবেকানন্দের কাতর আবেদন কোন ভারতীয় নারীকে নয় বিদেশিনী মার্গারেটকে সর্বস্ব ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

স্বামীজীর ইচ্ছায় বাগবাজারের বোসপাড়া ১৬ নং লেনে নিবেদিতা ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ নভেম্বর মাসে মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করে ভারতের জাতীয় আদর্শে নারী শিক্ষার কাজ শুরু করলেন।

১৯০২ সালে ৪ই জুলাই স্বামীজী দেহ রক্ষা করেন। নিবেদিতার সামনে রয়েছে স্বামীজীর অসমাপ্ত অনেক কাজ। তাই স্বামীজীর দেহরক্ষার পরে তাঁর শোক যাপন করার মতোও সময় নেই। ভারতবর্ষে বাস করে নিবেদিতা অনুভব করেছিলেন ব্রিটিশের শাসনের নামে শোষণকে। তাই তিনি ভারতবাসীর এই নৈতিক অধঃপতন, দুর্বলতা ভারতবর্ষের উন্নতির পথের কাঁটা তার পরাধীনতা, ইত্যাদি থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য প্রবল আকাঙ্খায় তিনি রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে ফেললেন। স্বামীজীর আদেশ ছিল যেন রাজনীতির সাথে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কোন সম্পর্ক না থাকে তাই তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ছিন্ন করলেন কিন্তু অন্তরের যোগাযোগ কোন কালেই ছিন্ন হয়নি। তাই সংঘের সন্ন্যাসী, মঠের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, শ্রীসারদা মা প্রমুখদের সঙ্গে তাঁর আজীবন শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক ছিল। তাই তিনি নিজেকে পরিচয়ও দিতেন 'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নিবেদিতা' বলে।

গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে নিবেদিতা বিবেকানন্দের আদর্শ সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নানা জায়গায় বক্তৃতা দেওয়া শুরু করলেন। তাঁর ভাষণে ত্যাগ ও তপস্যার প্রতিমূর্তি নিবেদিতার আন্তরিক আবেদন সাধারণ মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। অনেকের মধ্যেই স্বদেশভাবনা জেগে উঠত। তিনি তাদের আহ্বান করলেন, সমস্ত সামাজিক ও ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে স্বদেশ জননীর সেবার জন্য এগিয়ে আসতে। ছাত্রদের তিনি সৎ, পরিশ্রমী ও নির্ভীক হতে উপদেশ দিতেন এবং বলতেন, তোমরা বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের দেশের ছেলে তাই তোমাদের শরীর ও মনের দিক থেকে বীর হতে হবে এবং ভারত জননীকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতে হবে এবং পূজা করতে হবে।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে কার্জনের বঙ্গভঙ্গ আইনকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন শুরু হল। দেশের মানুষ প্রকাশ্যে ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা শুরু করল এই প্রথমবার। এই আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের নিবেদিতা নানা ভাবে সাহায্য করে চললেন, ভারতবর্ষকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করার জন্য।

ভারতবর্ষকে সবদিক দিয়ে জাগ্রত করে তুলতে হবে – যে ভারতবর্ষ তাঁর গুরুর চির-আরাধ্যা দেবী। বিপ্লবী আন্দোলনের প্রধান নেতা শ্রী অরবিন্দ ও অন্যান্য বিপ্লবী নেতা ও যুবকদের সঙ্গে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, দেশ সেবায় নিয়োজিত স্বার্থশূন্য প্রাণ গুলিকে তিনি রাজরোষ থেকে রক্ষা করার জন্য সর্বদা তৈরি থাকতেন। এবং নিজের বন্ধুদের থেকে গুপ্ত খবর জোগাড় করতেন এবং বিপ্লবীদের আগে থেকেই সাবধান করতেন এবং তাঁদের নানা পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতেন। চেষ্টা চালাতেন যাতে ভারতবর্ষের উপর ব্রিটিশ সরকারের জনবিরোধী কাজকর্মের কথা ইংল্যান্ডে ছড়িয়ে পড়ে ও তার বিরুদ্ধে জনমত তৈরি হয়। তিনি নিজেকে আড়ালে রেখে বিবেকানন্দের ইচ্ছা অনুসারে জন্মসূত্রে যাঁরা ভারতীয় তাদেরকেই রাজনৈতিক এই আন্দোলনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। ভারতবর্ষকে নিবেদিতা স্বদেশ বলেই গ্রহণ করেছিলেন তাই ভারতবাসীর দুঃখ-বিপদে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে যে কোন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। যেমন ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্লেগ রোগ কলকাতায় মহামারীর রূপ ধারণ করলে নিবেদিতা প্লেগ রোগীদের সেবা করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। নিবেদিতার সঙ্গে ছিলেন মিশনের সন্ন্যাসীরা। রোগ প্রতিরোধের জন্য মানুষের বসবাসের পল্লীগুলির আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য নিজে হাতে ঝাড়ু-বালতি নিয়ে সাফাইয়ের কাজ করতেন। প্লেগ রোগ মানেই যে মৃত্যু এবং এর ফলে যে তাঁরও প্লেগ রোগ হতে পারে এসব কথা তাঁর মনে আসত না। নিবেদিতাকে দেখে সেবা কাজে যোগ দিয়েছিলেন স্থানীয় অনেক যুবক।

যদিও সেই সময় ছোঁয়াছুঁয়ির রীতি প্রচলিত ছিল তাও যে কোন অসুবিধে এবং দুঃখের সময় নিবেদিতা প্রতিবেশীদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন। ব্রাহ্মণ পরিবারের নিষ্ঠাবতী এক বিধবা শ্রীরামকৃষ্ণকে ‘গোপাল’ বলে ডাকতেন। সেই গোপালের মা যখন খুব অসুস্থ তখন নিবেদিতা তাঁকে নিজের বাড়িতে রেখে সেবা শুশ্রূষা করে ছিলেন। ‘সারা জীবন তিনি মহা - আচারী ছিলেন, সেই গোপালের মাও তাঁর সেবা নিতে কুণ্ঠা করেননি’। (ভগিনী নিবেদিতার সার্ধশত জন্মজয়ন্তী স্মারক সংখ্যা, ২০১৯। পৃ. ২৩) অর্থাৎ ভালোবাসার পবিত্রতায় সমাজে যে আচার বিচারের গন্ডি তা তখন ভেঙ্গে গিয়েছিল। নিবেদিতার সেবা ও ভালোবাসার কোন তুলনা ছিল না।

পূর্ববঙ্গে এক সময় দূর্ভিক্ষ ও বন্যা দেখা দিলে নিবেদিতা সঙ্গীসাথী নিয়ে সেখানে সেবাকার্যে লেগে পড়েন। দুঃখ দুর্দশাগ্রস্থ মানুষরাও নিবেদিতার করুণা, মায়া-মমতা দেখে তাঁকে আপনজন বলে মনে করতেন। স্বামীজীর সময়ে

ভারতীয় বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুকে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকরা তাঁদের সম মর্যাদা দিতে মোটেই রাজী ছিলেন না এবং বিদেশী সরকারও কোন সাহায্য করতে চাইতেন না কিন্তু নিবেদিতা মাতৃস্নেহ নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন এই মহান বৈজ্ঞানিককে সাহায্য করার জন্য এবং নানান সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য সরকারী মহলে নিজের প্রভাব খাটাতেন। স্বামীজীর আদর্শ অনুযায়ী, ভারতবর্ষে বিজ্ঞান সাধনার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মনে করতেন, বেদান্ত ও বিজ্ঞানচর্চা এই দুয়ের সমন্বয়েই আদর্শ ভারতবর্ষ গড়ে উঠবে।

শুধু বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রেই নয়, শিল্প আন্দোলন গড়ে তোলার পিছনেও তাঁর ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে যে জাতীয় ধারায় শিল্প আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু যার শ্রেষ্ঠ পরিণতি – নিবেদিতার অবদান তার পেছনে অপরিসীম। জাতীয় ধারার ইতিহাস রচনার জন্যও তিনি রমেশচন্দ্র দত্ত এবং যদুনাথ সরকারের মতো ঐতিহাসিকদের সর্বদা প্রেরণা দিয়েছেন।

ভারতবর্ষে এসে যখন তিনি স্বামীজীর ভাবধারায় জাতীয়তাবোধের জাগরণে আত্মনিয়োগ করলেন তখনই তিনি বুঝেছিলেন এ ব্যাপারে এক মাত্র অস্ত্র হবে লেখনী। তাই তিনি মডার্ন রিভিউ, স্টেটসম্যান, অমৃতবাজার পত্রিকা, প্রবুদ্ধ ভারত, বালভারতী ইত্যাদি এদেশীয় এবং অনেক বিদেশী পত্রপত্রিকায় নিয়মিত ভাবে ধর্ম, সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, শিল্পতত্ত্ব, রাজনীতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল - 'Kali the Mother', 'Web of Indian Life', 'Cradle Tales of Hinduism', 'The Master as I saw him'.

এতসব ব্যস্ততার মধ্যেও নিবেদিতা তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলটির প্রতি কখনও মনোযোগ হারান নি। সেই সময় অভিভাবকরা পড়াশুনার পক্ষপাতি ছিলেন না কিন্তু নিবেদিতা ছাত্রী জোগাড় করেছিলেন বাগবাজারের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে। তিনি মেয়েদের গণিত, ভূগোল, প্রকৃতি বিজ্ঞান এবং কিছু কিছু ইংরাজি ভাষাও পড়াতেন এবং লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেলাই, ছবি আঁকা, হাতের কাজ শেখাতেন, ব্যায়াম ও শরীরচর্চা করতে বলতেন, সর্বোপরী তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। নিবেদিতা মনে করতেন এই স্কুলের ছাত্রীদের মধ্য থেকেই ভবিষ্যতে গার্গী, মৈত্রেয়ীরা আবার ভারতবর্ষে আবির্ভূত হবে।

স্কুলে ছাত্রীদের তিনি দক্ষিণেশ্বর, চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম বেড়াতে নিয়ে যেতেন এবং ছাত্রীদের খাওয়ার ইচ্ছে হলে ছোট ছোট শালপাতার ঠোঙায় ফল, মিষ্টি সাজিয়ে খেতে দিতেন এবং ছাত্রীদের খাওয়া হয়ে গেলে তিনি নিজেই ঝুড়িতে ঠোঙ্গাগুলি নিয়ে ফেলে দিতেন। তিনি ছাত্রীদের খাওয়াতে ভালোবাসতেন। আর এভাবেই তিনি সেবা করতেন তাঁর আদরের ছাত্রীদের। তাঁর জীবনে আর্থিক অনটন লেগেই থাকত। তিনি খুবই সাধারণ ভাবে জীবন কাটাতেন। স্কুলের খরচ চালানোর জন্য অর্থের প্রয়োজন তাই তিনি দেশে বিদেশে বক্তৃতা করে অর্থ সংগ্রহ করতেন। এত পরিশ্রম শরীর আর সহ্য করতে পারল না। খুব অল্প, মাত্র ৪৪ বছর বয়সে **১৯১১** সালে **১৩** ই অক্টোবর দার্জিলিংয়ে তিনি দেহত্যাগ করেন। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভারতবর্ষের সেবায় নিবেদন করে, ভারতবর্ষকে আপন করে, ভারতবর্ষকে ভালবেসে তাঁর গুরুর দেওয়া নিবেদিতা নাম তিনি সার্থক করে গেলেন।

৪.৩ বেগম রোকেয়ার সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী :

ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারী জাগরণের অগ্রদূত, সমাজসংস্কারক, শিক্ষাসংস্কারক, চিন্তা ও চেতনায় প্রগতিশীল মনোভাবের, দৃঢ়চেতা, স্বীয় কর্তব্যে অটল যে মহিয়সীর ব্যক্তিত্ব আমাদের চোখে পড়ে তিনি হলেন বেগম রোকেয়া। ইংরেজী **১৮৮০** খ্রীষ্টাব্দে ৯ই ডিসেম্বর এক মুসলিম রক্ষণশীল পরিবারে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

রোকেয়ার পিতার নাম জহিরুদ্দিন মোহম্মদ আবু আলী সাবের। মাতার নাম রাহাতুন্নেসা সাবের চৌধুরানী। রোকেয়ার তিন বোন ছিলেন আর দুই ভাই। বোনদের নাম হল – করিমুন্নেসা, রোকেয়া ও হমায়ারা। ভাইদের নাম হল – ইব্রাহিম সাবের ও খলিল সাবের। রোকেয়ার বাবা প্রচুর ধন সম্পদের মালিক হলেও উনি খুব ধর্মান্ধ ছিলেন। অত্যন্ত গোঁড়ামি, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করলেও, সব ভাই-বোন ক্রমাগত চেষ্টা করে গিয়েছেন এই কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। তাই রোকেয়ার বড় ভাই ইব্রাহিম ও খলিল সাবের পরিবারের ঐতিহ্য ভেঙে প্রথম ইংরেজী শিখলেন এবং দুভাই-ই কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে লেখাপড়া করেন এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার ফল স্বরূপ অশিক্ষা ও কু-শিক্ষায় মোড়া এই সমাজকে মুক্ত করতে তাদের মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তারা উপলব্ধি করতে শুরু করেন দেশকে জাগ্রত করতে হলে প্রথমে

দরকার নারীদের জাগিয়ে তোলা। তাই তারা এই কাজ শুরু করলেন নিজেদের বোনদের শিক্ষিত করার মাধ্যমে - বাংলার নারীজাতিকে কুশিক্ষা, কুসংস্কারের অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে তৎপর হয়ে ওঠেন।

মেয়েদের লেখাপড়ায় যে বিধিনিষেধ সেসময় সমাজে প্রচলিত ছিল সেই বিধিনিষেধকে জহিরুদ্দিন খুব বেশি প্রাধান্য দেননি। তাই তাঁর আত্মীয় স্বজন অনেকের কাছ থেকে তাঁকে কু-কথা শুনতে হয়েছিল। রোকেয়ার মা ছিলেন ঢাকার বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারের মেয়ে, তাই সমাজে কঠিন পর্দা প্রথা থাকলেও তিনি সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে ছিলেন সংস্কার মুক্ত। প্রধানত তাঁর উৎসাহেই তাঁর মেয়েদের মধ্যেও লেখাপড়ার প্রতি প্রবল আগ্রহ সঞ্চারিত হয়েছিল।

লেখাপড়ার প্রতি রোকেয়ার আগ্রহ ছিল সহজাত। পরিবারের গতানুগতিক রীতি অনুযায়ী ছোটবেলায় শিক্ষালাভ করেছিলেন আরবী ও ফারসি ভাষায়। কিন্তু তিনি ওইটুকুতে সীমাবদ্ধ থাকেন নি। ইংরেজী ও বাংলা শেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়েন এবং মায়ের কাছে আর্জি জানান। তাঁর দুই ভাই গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর পড়াশুনার প্রতি তীব্র আগ্রহকে। তাই তাঁর মায়ের কাছে অনুমতি নিয়ে রোকেয়াকে লেখাপড়া শেখানোর জন্য বাড়িতেই একজন ইংরেজ মহিলা শিক্ষিকাকে নিয়োগ করেন। কিন্তু তখনকার কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজ মেনে নিতে পারলো না যে একজন বিদেশিনী বাড়ির অন্তঃপুরে যাতায়াত করছে, এতে পর্দাপ্রথা নষ্ট হচ্ছে–এই নিয়ে সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠলেন প্রতিবেশীরা ও আত্মীয়স্বজনরা। তাই বেশিদিন ইংরেজি শেখার সুযোগ পেলেন না রোকেয়া ওই বিদেশিনী শিক্ষিকার কাছ থেকে। কিন্তু এই দেখে থেমে থাকলেন না রোকেয়ার বড় দাদা রুকু এবং বড়দিদি করিমুন্নেসা।

বড় দাদা ইব্রাহিম (রুকু) নিজেই তিনি বোনকে বাড়িতে গোপনে শেখাতে লাগলেন ইংরেজী এবং সেই সঙ্গে বড়দিদি করিমুন্নেসা তাঁকে বাংলা শেখাবার দায়িত্ব নিলেন। এই ভাবেই রোকেয়ার যখন আট নয় বছর বয়স তখন বাড়িতেই ইংরেজি ও বাংলা শিক্ষালাভ করা শুরু হল। এই পড়াশোনা করার সময়টি রোকেয়ার জীবনের এক বৃহৎ অধ্যায়, পড়াশোনা শেখার জন্য তাঁকে পাড়া প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনদের কাজ থেকে কতইনা গঞ্জণা সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু ধৈর্যশীল রোকেয়া নিজের লক্ষ্য থেকে কখনও পিছুপা হননি। বরং বলা চলে, এই সব

বাস্তবের তিক্ত অভিজ্ঞতা রোকেয়াকে করে তুলেছিল আরো বেশি দৃঢ় ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ – জেদী। সমস্ত গঞ্জণা-বাধাবিপত্তি মুখ বুজে সহ্য করে একাগ্রচিত্তে তিনি তাঁর বিদ্যাচর্চার কাজ চালিয়ে যান, কারণ রোকেয়ার কাছে তখন ওই আট-নয় বছর বয়সেই রক্ষণশীল সমাজের চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাই তিনি বোরখার অন্তরালে রুদ্ধ জীবনে মুক্তির সন্ধান খুঁজে পেয়েছিলেন শিক্ষার আলোর মধ্য দিয়ে। তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল সমাজের সমস্ত অন্ধকার কোণগুলির প্রতি বিশেষ করে ওই বয়স থেকেই রোকেয়া উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলেন মেয়েদের জীবনের কঠোর সীমাবদ্ধতার কুফলগুলি সম্পর্কে। তাই তিনি তাঁর বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে মেয়েদের জেগে ওঠার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন, জাগ্রত হওয়ার কথা বলেছেন বারে বারে।

ওই সময় মেয়েদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে গুরুত্ব দেওয়া হত না এবং তাঁদের স্বাধীন ভাবে মতামত প্রকাশ করারও কোন সুযোগ ছিল না। রোকেয়ার দিদি করিমুন্নেসার লেখাপড়ার প্রতি ছিল প্রবল আগ্রহ। কিন্তু করিমুন্নেসার বিয়ে হয়ে যায় মাত্র তেরো বছর বয়সে। সেই সময় এই রকম বয়সেই বিয়ে দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। রোকেয়ার দিদি রোকেয়াকে খুবই স্নেহ করতেন এবং রোকেয়াকে তিনি আত্মীয় স্বজনের চোখের আড়ালে যত্ন নিয়ে বাংলা শেখাতেন। তাই রোকেয়া বড়দিদির স্নেহ ও বিদ্যানুরাগের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আজীবন স্মরণ করেছেন। কৃতজ্ঞতার প্রমাণ স্বরুপ পরবর্তীকালে তিনি তাঁর ইংরাজি পুস্তক 'Sultana's dream' ও বাংলা গ্রন্থ ‘মতিচূর’ ২য় খণ্ড বড় দিদিকে উৎসর্গ করেছেন।

বিবাহিত জীবন -

১৮৯৬ সালে ১৬ বছর বয়সে রোকেয়ার বিয়ে হয় ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সাথে। বিয়ের পর তিনি বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নামে পরিচিতা হন। তাঁর স্বামী ছিলেন একজন মুক্তমনা মানুষ। রোকেয়াকে তিনি লেখালেখি করতে উৎসাহ দেন এবং তিনি নারীদের শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। তাই তিনি একটি স্কুল তৈরির জন্য অর্থ আলাদা করে রেখে যান। রোকেয়া সাহিত্যচর্চা শুরু করেন ১৯০২ সালে ‘পিপাশা’ নামে একটি বাংলা গল্পের মধ্য দিয়ে।

১৯০৯ সালে সাখাওয়াত হোসেনের মৃত্যুর পাঁচ মাস পর মেয়েদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন ভাগলপুরে এবং নাম দেন রোকেয়া সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল। ১৯১০ সালে সাখাওয়াতের প্রথম স্ত্রীর কন্যা ও জামাতার সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলার ফলে স্কুল বন্ধ করে তিনি কলকাতায় চলে যান । এখানে ১৯১১ সালের ১৫ই মার্চ তিনি সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল পুনরায় চালু করেন মাত্র ৮ জন ছাত্রীকে নিয়ে এবং কয়েকটি বেঞ্চ নিয়ে। চার বছরের মধ্যে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৮৪-তে। ১৯৩০ সালের মাঝামাঝি এটি হাই স্কুলে পরিণত হয়।

সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড -

স্কুল পরিচালনা ও সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সাংগঠনিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে রোকেয়া নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। ১৯১৬ সালে তিনি মুসলিম বাঙালি নারীদের সংগঠন 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন সভায় তিনি তাঁর বক্তব্য তুলে ধরতেন। ১৯২৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'বাংলার নারী শিক্ষা' বিষয়ক সম্মেলনে রোকেয়া সভাপতিত্ব করেন।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে রোকেয়ার লেখা গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হতে শুরু করে। রোকেয়া তাঁর লেখার মাধ্যমে অসহায় নারীর বেদনাকে পরম মায়া মমতা এবং যুক্তির দ্বারা তুলে ধরতে লাগলেন। একে একে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর ৫টি বই প্রকাশিত হয়। বইগুলি হল 'মতিচূর' (প্রথম খণ্ড, ১৯০৪)। 'মতিচূর' (১৯০৪) প্রবন্ধগ্রন্থে রোকেয়া নারী পুরুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখেছেন। এছাড়াও রোকেয়া নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে পুরুষদের সমকক্ষ দাবী করেছেন। নারীদের পিছিয়ে পড়ার কারণ হিসাবে শিক্ষার অভাবকেই তিনি মূলত দায়ী করেছেন। তাঁর 'সুলতানার স্বপ্ন' (১৯০৫), প্রবন্ধে বেগম রোকেয়া একটি প্রবন্ধে ইউটোপিয়ান সমাজ ব্যবস্থার কথা ভেবেছেন যেখানে নারীদের ভূমিকা সর্বাগ্রে। (রোকেয়া রচনাবলী, ২০০৬। পৃ. ১০২) 'পদ্মরাগ' (১৯২৪) তাঁর রচিত উপন্যাস। 'অবরোধ বাসিনী' (১৯৩১) কতকগুলি ছোট কাহিনীর সমাহার। এই বইতে বেগম রোকেয়া পর্দাপ্রথা এবং তাঁর কুফলগুলি সরস করে ছোট গল্পের আকারে প্রকাশ করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীকে বলা হয় বাংলা তথা ভারতের নব চেতনার উজ্জীবনের যুগ। এই সময় পরাধীন দেশে সমাজ-সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। নবজাগ্রত ভারতে

সামাজিক মুক্ত চিন্তার বিকাশ, কুসংস্কার, শিক্ষা ও সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে যাঁরা পথ প্রদর্শকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বেগম রোকেয়া। অশিক্ষা, কু-শিক্ষা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজের মূলস্রোত থেকে পিছিয়ে পড়া বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত করেছিলেন রোকেয়া। সেই সময় মেয়েদের ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে কিছুই ছিল না। তাদের জীবন আবদ্ধ থাকত নানা ধর্মীয় অনুশাসন ও কুসংস্কারের গণ্ডিতে। এমনই এক কঠিন পরিবেশ-পরিস্থিতিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন বেগম রোকেয়া। মুসলমান সমাজে নারীশিক্ষা ও নারীজাগরণের অগ্রদূত ছিলেন বেগম রোকেয়া। আজ মুসলমান সমাজের মেয়েরা ঘরের বাইরে এসে লেখাপড়া শিখছেন। এসব সম্ভব হয়েছে বেগম রোকেয়ার নারীশিক্ষা আন্দোলনের কারণে। রোকেয়ার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও আদর্শ ছিল মেয়েদের বিশেষ করে মুসলিম সমাজের মেয়েদের অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে বের করে নিয়ে জ্ঞানের আলোয় প্রবেশ করানো। তিনি সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে। ধর্মের নামে নারীর প্রতি যে অন্যায় অবিচার চলে তা রোধ করতে চেয়েছেন। এমনকি মেয়েদের শিক্ষা আর পছন্দ অনুযায়ী পেশা নির্বাচন করার কথা বলেছেন, কারণ তিনি তাঁর লেখায় বিভিন্ন ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে সমাজে নারী-পুরুষ একসঙ্গে কাজ না করলে সমাজকে কখনোই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। তাই তিনি মেয়েদেরকে পুরুষদের মত সমান ভাবে কর্ম করার কথা যেমন বলেছেন তেমনি বলেছেন, মেয়েদেরও “প্রকৃত সুশিক্ষা চাই যাহাতে মস্তিষ্ক ও মন উন্নত হয়”। (বেগম রোকেয়া রচনাবলী, ১৯৮৪। পৃ. ২১)

তথ্যসূত্রঃ

- বন্দনা ভট্টাচার্য (২০১৭)। *নিবেদিতা : আলোর দূতী*। শ্রীশারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কোলকাতা। পৃ. ৫
- গোলাম মুরশিদ (২০১২)। *নারী প্রগতির একশো বছর : রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া*। অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা। পৃ. ৬
- ড. মিজান রহমান (সংকলন ও সম্পাদনা) (২০১২)। অর্ধাঙ্গী, *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ বেগম রোকেয়া*। কথা প্রকাশ, শাহবাগ, ঢাকা। পৃ. ৮
- প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা (১৯৮৫)। *ভগিনী নিবেদিতা*। সিস্টার নিবেদিতা গার্লস্ স্কুল, বাগবাজার, কোলকাতা। পৃ. ১
- প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা (১৯৮৫)। *তদেব,* পৃ. ৩
- প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা (১৯৮৫)। *তদেব,* পৃ. ১৫
- প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা (১৯৮৫)। *তদেব,* পৃ. ১৭
- বন্দনা ভট্টাচার্য (২০১৭)। *নিবেদিতা : আলোর দূতী*। শ্রীশারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কোলকাতা। পৃ. ১০
- প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা (১৯৮৫)। *ভগিনী নিবেদিতা*। সিস্টার নিবেদিতা গার্লস্ স্কুল, বাগবাজার, কোলকাতা। পৃ. ৫০-৫১
- প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা (১৯৮৫)। তদেব, পৃ. ৪৪-৪৫
- শ্রী সুশান্ত দত্ত (সম্পা.)(২০১৯)। *ভগিনী নিবেদিতার সার্ধশত জন্মজয়ন্তী স্মারক সংখ্যা*। কোলকাতা।পৃ. ২৩
- আবদুল কাদির (সম্পা.) (২০০৬)। *রোকেয়া রচনাবলী*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃ. ১০২
- বেগম রোকেয়া রচনাবলী (১৯৮৪)। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃ. ২১

পঞ্চম অধ্যায়

ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার শিক্ষা ভাবনা

৫.১	ভূমিকা
৫.২	শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার মতামত
৫.৩	শিক্ষার পাঠ্যক্রম সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার মতামত
৫.৪	শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার মতামত
৫.৫	শৃঙ্খলা সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার মতামত
	তথ্যসূত্র

পঞ্চম অধ্যায়

ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার শিক্ষা ভাবনাঃ

৫.১ ভূমিকা :

অবরোধের দারুন যন্ত্রনা রোকেয়া ব্যক্তিগত জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন। একশো বছর পরে একুশ শতাব্দীতে আমরা এসে পৌঁছেছি তবুও দেখছি এখনো হয়তো বাহ্যিক ভাবে যে অবরোধ প্রথা সে সময় প্রচলিত ছিল এখন তা মানসিক গহ্বরে প্রবেশ করেছে। অর্থাৎ মেয়েরা এখনো সঠিকভাবে নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারছেন না, এ যেন আর এক ভয়াবহ অবরোধ প্রথা নারীদের গ্রাস করছে আর এর থেকে বেরোনোর একমাত্র উপায় হল শিক্ষা। সিস্টার নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়া দুজনেই সেই সময় বলেছেন মেয়েদের শিক্ষিতা করতে পারলে মেয়েরা নিজেরা নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে পারবে এবং সমাজও সুন্দর থেকে আরও সুন্দর হয়ে উঠবে।

তাই এখন বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আমাদের শপথ নিতে হবে যে ভগিনী নিবেদিতা এবং রোকেয়া যেভাবে শেখানোর কথা বলেছিলেন তা অনুশীলন করে শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও মজবুত করতে হবে তাহলেই মেয়েদের মনের মধ্যে এখনও যে অবরোধ প্রথা স্থায়ী রয়েছে সেটার থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে।

৫.২ শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার মতামত :

“অশিক্ষিত স্ত্রী লোকের শতদোষ সমাজ অম্লান বদনে ক্ষমা করিয়া থাকে, কিন্তু সামান্য শিক্ষা প্রাপ্ত মহিলা দোষ না করিলেও সমাজ কোন কল্পিত দোষ শত গুন বাড়িয়ে সে বেচারীকে ঐ ‘শিক্ষার’ ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় এবং শত কণ্ঠে সমস্বরে বলে থাকে ‘স্ত্রী শিক্ষাকে নমস্কার’।” (রোকেয়া রচনাবলী, ২০০৬। পৃ. ১৮) বর্তমানে অধিকাংশ লোকে শিক্ষাকে কেবল চাকুরি লাভের পথ মনে করে। মহিলাগণের চাকুরি গ্রহণ অপ্রয়োজনীয় সুতরাং এই সকল লোকের চক্ষে স্ত্রী শিক্ষা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

'শিক্ষার' অর্থ কোন সম্প্রদায় বা জাতি বিশেষে 'অন্ধ অনুকরণ' নয়। ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা দিয়েছেন, সেই ক্ষমতাকে অনুশীলনের দ্বারা বৃদ্ধি করাই শিক্ষা। এই গুণের সদ্‌ব্যবহার করাই কর্তব্য এবং অপব্যবহার করাই দোষ। ঈশ্বর নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে হাত, পা, চোখ, কান, মন, বুদ্ধি এবং চিন্তাশক্তি দিয়েছেন। যদি আমরা অনুশীলনের দ্বারা হাত-পা সবল করি, হাত দ্বারা সৎ কার্য করি, চোখ দ্বারা মনযোগ সহকারে দেখি (বা Observe করি), কান দ্বারা মনোযোগ পূর্বক শুনি এবং চিন্তাশক্তি দ্বারা আরও সূক্ষ্ম ভাবে চিন্তা করতে শিখি তাহলে তাকেই বলে প্রকৃত শিক্ষা। আমরা কেবল 'পাশ করা বিদ্যা'-কে প্রকৃত শিক্ষা বলিনা। (তদেব, পৃ. ১৯)

অপরদিকে নিবেদিতা ভারতীয় নারীর ভবিষ্যৎ উল্লেখ করে বলেছেন শিক্ষার প্রয়োজন আছে। কিন্তু শিক্ষা কি ধরনের হবে তা প্রশ্ন। ইংরেজী শিখতে ও পড়তে পারাই শিক্ষা নয়। মানুষ হওয়ার শিক্ষা লাভ করা চাই। উন্নতির সম্ভাবণার মূলে যে অন্তরায় গুলি বর্তমান, তা দূর করতে পারলে ভারতীয় নারী যথার্থ শিক্ষার আধার হবে।

'স্ত্রী জাতির অবনতি' প্রবন্ধে রোকেয়া নারী জাতির দোষগুলির সমালোচনা করেন। বেগম রোকেয়ার মতে– "স্ত্রী জাতির কয়েকটি দূরারোগ্য ব্যাধি হল– অযোগ্যতা, অসন্তোষ, পরনিন্দা, হিংসা এবং মূর্খতা..."।

"The five worst maladies that afflict the female mind are : indocility, discontent, slander, jealousy and silliness... such is the stupidity of her character, that it is incumbent on her, in every particular, to distrust herself and to obey her husband." (Japan, the Land of the Rising Sun) (তদেব, পৃ. ১২)।

নিবেদিতার মতে একটি জাতীয় শিক্ষার প্রথম এবং সর্বাগ্রে আসে জাতীয় আদর্শের শিক্ষা। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হল সহানুভূতি ও শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশ। আমরা নতুন যা কিছুই করি বা ভাবি তা আমাদের অতীতের যে গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে তার উপর নির্ভর করেই করা উচিত। শিক্ষকদের উচিত ছাত্র-ছাত্রীদের জানা থেকে অজানার দিকে, সরল জ্ঞান থেকে জটিল জ্ঞানের দিকে পাঠকের মনকে নিবিষ্ট

করবে। ভারতে একটি সত্যিকারের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসীর প্রতি ত্যাগের জন্য মনকে প্রস্তুত করবে।

ভগিনী নিবেদিতা তাঁর প্রথাগত শিক্ষা সম্পূর্ণ করার পরই মাত্র সতের বছর বয়সে শুরু করেন শিক্ষকতার কাজ। তিনি প্রথমে উত্তর ইংল্যান্ডের – লেক ডিসট্রিক্ট-এ একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। তারপর তিনি রাগবিতে চলে যান এবং একটি অনাথ আশ্রমে শিক্ষাদান করেন। একজন শিক্ষিকা ছাড়াও তাঁর অন্য আর একটি পরিচয় আছে তা হল তিনি একজন লেখিকা। তিনি যে সময় শিক্ষকতার কাজ শুরু করেন তখন ব্রিটেনে শিক্ষাকে কেন্দ্র করে এক বিশেষ আন্দোলন গড়ে উঠে যা পাশ্চাত্যের সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়ে– এটিই নতুন শিক্ষা আন্দোলন নামে পরিচিত (New Education Mement)। সুইস শিক্ষাবিদ জোহান পেস্তালৎসি এবং তাঁর জার্মান ছাত্র ফ্রেডরিক ফ্রয়েবেল গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে দরিদ্র জনগনের মধ্যে শিক্ষার প্রসার খুব প্রয়োজন। পেস্তালৎসি নিজে সারা জীবন দরিদ্র ও সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য শিক্ষকের ভূমিকায় কাজ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিশুকে শেখানোর সবচেয়ে ভালো উপায় হল যে, নিজের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে শিশুর মান অনুসারে সরলীকরণ করে নেওয়া, মূর্ত থেকে বিমূর্ত ধারণার দিকে শিশুকে পরিচালনা করা এবং পরিচিত থেকে অপরিচিত ধারণার দিকে যাওয়ার জন্য শিশুর মনকে তৈরী করা।

স্বামীজীর মত ভগিনী নিবেদিতাও মনে করতেন যে, শিক্ষা হল কোন শিশুর অনুভূতি আর পছন্দকে প্রশিক্ষণ দেওয়া। নিবেদিতার লক্ষ্য ছিল শুধু শিক্ষাদান করা বা তথ্য সম্ভার শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া নয়, বরং শিক্ষার লক্ষ্য হবে মানব সম্পদের বিকাশ সাধন।

নিবেদিতা গনিত শিখনের বিষয়ে নিজের ধারণা বলতে গিয়ে তাঁর নিজের লেখায় বলেছেন যে পাটিগনিত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন শিক্ষনীয় বিষয়। কারণ যদিও প্রথাগত পাটিগনিতের জ্ঞান ছাড়াও প্রাচীন কালের অনেক জ্ঞানী মানুষের পরিচয় মিলেছে তবুও একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে কোন সভ্য সমাজে রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর মধ্যে সংখ্যা তত্ত্বের জ্ঞান না থাকলে যে কোন কাজ সম্পাদন করতে অসুবিধার সম্মুমীন হতে হবে। নিবেদিতা গনিত শিখনের ক্ষেত্রে বলেছেন যে শিশুকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে তিন আর দুই এ যোগ করলে কত হয়, তা কোন

শিশুর জন্য কাম্য শিখন নয়, কারণ তার শিখন আরও গোড়া থেকে শুরু হওয়া দরকার। তিনি বলতেন শিক্ষক কি বোঝানোর চেষ্টা করছেন তা সুনিশ্চিত করা দরকার এবং তিনি এর একটি পরিষ্কার ধারণা শিশুকে দেওয়া দরকার বলে বলেছেন। তিনি একটি মূর্ত ধারণার উপর ভিত্তি করে গণিতে শিক্ষণের কথা বলেছেন। যেমন, তিনটি কমলালেবু, তিনটি বাদাম, তিনজন ভাই, তিনজন বোন এইসব ধারণাকে সামনে আনতে হবে। কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণকে আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিই, তবে সংখ্যা তত্ত্বের শিক্ষা যদি নার্সারি গেম এর মাধ্যমে যেমন, তিনটি ছড়ির মধ্যে একটি লুকিয়ে দিয়ে যদি শিশুকে ভাববার সুযোগ করে দেওয়া হয় তবে সেটা অনেক বেশি স্থায়ী ও কার্যকর শিখন হবে।

একশ বছরের বেশি পূর্বে অবিভক্ত ভারতবর্ষে, বর্তমানে যা বাংলাদেশে, বেগম রোকেয়া একজন রক্ষণশীল মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং নিজের অদম্য ইচ্ছা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সমগ্র মানব জাতির কাছে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা, নারী শিক্ষা, শিশুর উপযুক্ত যত্ন প্রভৃতি বিষয়ে নূতন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন। বেগম রোকেয়া শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন কারণ তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, শিক্ষাই একমাত্র বিষয় যা সমাজে সামঞ্জস্যপূর্ন পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। প্রাচীন যুগ থেকে এই শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে কিন্তু সবসময় কোন না কোন শ্রেনির মানুষ শিক্ষার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন কিছু বিশেষ কারণের জন্য। শিক্ষাই হল মানব সভ্যতার উন্নতির একমাত্র অনুঘটক। কোন দেশের অর্থনীতির বিকাশের জন্য শিক্ষা হল প্রাথমিক শর্ত।

শিক্ষা হল একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে নাগরিকরা জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও সমাজে বেঁচে থাকার উপযুক্ত আচরণ অর্জন করে। নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতির বাইরে গিয়েও একজন জ্ঞান লাভ করতে পারে, অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে, তবে এই শিক্ষা মানব সম্পদের উন্নতির জন্য কোন কাজে আসে না। শিক্ষা মানুষের মধ্যে সত্য ও মিথ্যা, ঠিক ও ভুলের পার্থক্য নির্ণয় করার একটি স্বাভাবিক সচেতনতা গড়ে তোলে। শিক্ষার জন্য মানুষ তার নিজস্ব ক্ষমতা ও দক্ষতাকে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলে। শিক্ষা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরালে শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সামাজিক বোধ সবকিছুর বিকাশ হয়। আমাদের লক্ষ্য ছিল, শিক্ষা এমন একটি ভবিষ্যৎ তৈরি করবে যে সেখানে প্রতিটি নর- নারী সর্ব্বোচ্চ সুবিধা ভোগ করবে এবং তাদের কাছে বিভিন্ন ভাবে কর্ম সংস্থানের সুযোগ থাকবে। আদর্শগত শিক্ষা হওয়া উচিত গনতান্ত্রিক অর্থাৎ সর্বজনীন। সব মানুষের জন্য সমান মানের

শিক্ষার সুযোগ যা আমাদের দেশে কেবল রাজনৈতিক কারণে এখনও অর্জন করা সম্ভব হয়নি। প্রযুক্তিগত শিক্ষা বা কারিগরি শিক্ষার পরিকাঠামো এতটাই স্বল্প পরিসরে যে মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানেরা সুযোগ পায় না, আর গরীব পরিবারের ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রে তা অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়।

অ্যারিস্টটল বিশ্বাস করতেন, সব মানুষেই শিখতে ইচ্ছুক। তিনি এও বলেছেন যে মানব জাতি বেঁচে থাকে তার কলা কৌশল আর যুক্তিবাদী মনের দ্বারা। তাঁর মতে একজন শিল্পী সত্ত্বার মানুষ একজন অভিজ্ঞ মানুষের থেকে বেশি জ্ঞানী, কারণ একজন অভিজ্ঞ মানুষ কেবল কোন মূর্ত বা বিমূর্ত বিষয়ের সম্পর্কে সেই টুকুই জানেন যেটুকু তিনি দেখেছেন। অন্যদিকে একজন সৃজনশীল মানুষ তার কারণ সমূহ বিস্তারিত ভাবে জানেন।

বেগম রোকেয়া তাঁর ‘Sultana's Dream’ (সুলতানার স্বপ্ন) নামক ছোট বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্পে যে চিত্রটি অঙ্কন করেছেন তা হল লেডি ল্যান্ড নামক আদর্শ ভূমির রানী-নারী সমাজের বুদ্ধিমত্তাকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত করার জন্য বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলে যাতে তারা তাদের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিতে পারে, দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে সাহায্য করতে পারে এবং এমনকি সংকটকালীন পরিস্থিতিতে দেশকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতেও পারে। রোকেয়া বলেছেন যে শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল জাতিকে অন্ধভাবে অনুকরণ করা নয়, বরং ব্যক্তির অভ্যন্তরীন শক্তিকে, যা ভগবানের দান, তার বিকাশ সাধন করা। রোকেয়ার মতে সবচেয়ে বেশি বিজ্ঞান সম্মত আবিষ্কার হল জ্ঞানের প্রাসঙ্গিকতা। জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়ার পদ্ধতিগত পরিকাঠামোই হল শিক্ষা।

৫.৩ শিক্ষার পাঠ্যক্রম সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার মতামত :

স্বামীজীর মতো ভগিনী নিবেদিতাও একজন গভীর ভাবনা ও আদর্শের প্রতিমূর্তি। তিনি শিশুর অন্তর্নিহিত গুপ্ত ভাবনার উৎকর্ষতায় গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর মতে প্রকৃত শক্তির উৎস হল হৃদয়, তার আগে বুদ্ধি বৃত্তিক সরঞ্জাম একটি নিছক সামান্য আয়োজন মাত্র। নিবেদিতার মতে শিক্ষা প্রথম ও সর্বাগ্রে একজন ব্যক্তির অনুভূতি এবং পছন্দের প্রশিক্ষণের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ আমরা অনুভূতি ও পছন্দকে প্রশিক্ষণ না দিলে একজন শিশুকে শিক্ষিত করা যাবে না। এক্ষেত্রে সে কিছু কার্য সম্পাদনের মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র কিছু বৌদ্ধিক কৌশল

আয়ত্ত করে থাকে মাত্র| এইসব কৌশল শিখে সে তার রুজি রোজগারের উপায় খোঁজে কিন্তু কখনই নিজেকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত বলে দাবী করতে পারে না। নিবেদিতা বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে অনুভূতির প্রশিক্ষণ ছাড়া আর কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয়। নিবেদিতা একটি ছোট্ট ভাড়ার ঘরের কুটিরে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁর সামনে সবচেয়ে বড়ো বাধা ছিল কুসংস্কার কাটিয়ে অবিভাবকরা তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে চাইতেন না। তিনি অনেক কষ্টে বিভিন্ন বয়সের কয়েকটি মেয়েকে জোগাড় করে তাদের পড়া, লেখা, পেন্টিং, অঙ্কন, স্বাস্থ্যবিধি এবং কাদামাটির মডেলিং শিখিয়েছিলেন। তিনি তাঁর শিক্ষা প্রণালী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংমিশ্রনে গড়ে তোলেন। একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে ভগিনী নিবেদিতার খ্যাতি ছিল অসামান্য এমনকি যখন তাঁর সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ হয়নি তখনও তিনি লণ্ডনে একজন বুদ্ধিমতি নাগরিক ও শিক্ষাবিদ হিসেবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। তিনি শিক্ষা দানের পদ্ধতি নিয়ে ১৮৯২ সাল থেকে গবেষণা শুরু করেন। ‘কিনসলি গেট’ বিদ্যালয়ে তিনি পরবর্তীকালে পরিচিত হন লেডি, রিপন এবং লেডি ইসাবেল মারগেস এর সঙ্গে যাঁরা লণ্ডনে একটি সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন| যা পরবর্তী সময়ে সীসেম ক্লাব নামে পরিচিতি লাভ করে।

নিঃসন্দেহে সুইস শিক্ষা সংস্কারক হেইনরিচ এবং তাঁর জার্মান ছাত্র, শিশু মনস্তত্ত্ববিদ ফ্রেডরিচ ফ্রয়েবেল ভগিনী নিবেতিদার অনেক শিক্ষা সংক্রান্ত ধারণাকে প্রভাবিত করেছেন| নিবেদিতার মতে মানুষের মন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়| শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে, সে আধ্যাত্মিক শিক্ষাই হোক কিংবা কোন বিশেষ কৌশল বা দক্ষতা শিক্ষাই হোক,– সবকিছুই নির্ভর করে মনের অবস্থার উপর| তিনি চেয়েছিলেন শিশুর মনকে বুঝে সেই অনুসারে শিক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করতে। তিনি জোর দিয়েছেন স্বদেশীয় ইতিহাস বা গৌরব গাথার শিক্ষা দান করার উপর| তাঁর তৈরি পাঠক্রমের মধ্যে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র, বিজ্ঞান, গনিত এর পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষা যেমন সেলাই, মাটির জিনিস বানানো, বুনুনির কাজ, হস্ত শিল্পের শিক্ষার উপর জোর দিতেন| বৃত্তিমূলক শিক্ষা পেলে মেয়েরা স্বনির্ভর হতে পারবে। তাঁর মতে স্বদেশীয় ঐতিহ্যকে না জেনে কেউ বর্তমানকে সঠিকভাবে জানতে বা বুঝতে পারবে না|

ঔপনিবেশিক ভারতে নারী মুক্তি আন্দোলনের একজন অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন বেগম রোকেয়া। তিনি প্রথম দিকে মুসলমান সমাজের নারী সমাজকে সঠিক পথে নিয়ে আসার সকল প্রকার প্রচেষ্টা করেন। তিনি ভারতীয় মুসলমান সমাজের মেয়েদের কাছে ধ্রুবতারার মতো পথপ্রদর্শক ও দিক নির্দেশক। তিনি তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে কঠোরভাবে পরিশ্রম করেছেন| সমস্ত মুসলমান নারী সমাজকে শিক্ষার আঙ্গিনায় আনার জন্য| সেজন্য তাঁকে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে অবিভক্ত বাংলার নারী শিক্ষার একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে।

বেগম রোকেয়া অনেকগুলি বই লেখেন যার বেশি ভাগই মুসলমান সমাজের নারীদের করুন অবস্থার চিত্রকে প্রকাশ করেছে, আবার এই পিছিয়ে পড়ার কারণ হিসাবে তিনি শিক্ষাকে দায়ী করেছেন| তিনি মনে করেন মুসলিম মেয়েরা যদি পর্যাপ্ত শিক্ষা পেত, তাহলে মুসলমান সমাজের চিত্র আলাদা কিছু হত। রোকেয়ার সমস্ত জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা তাঁর নিজস্ব জীবন থেকে পাওয়া। তাঁর চিন্তা ভাবনা ও আদর্শে তিনি একজন আদর্শবাদী। তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে বাঙালী মুসলমান মহিলা সমাজ ভুগছে বহুদিন ধরে চিরাচরিত ধর্মের গোঁড়া শাসনে এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অত্যাচারে। তাদের কষ্টের অবসানের একমাত্র উপায়, যা রোকেয়া ভেবেছিলেন, তা হল শিক্ষা। বেগম রোকেয়া স্বপ্ন দেখেছিলেন যে তাঁর সমাজে নারীরাও পুরুষের মতো সমান অধিকার ও মর্যাদা পাবে। তিনি মুসলিম সমাজে নারী জাতির শিক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন– কিন্তু এটা কোন সহজ কাজ ছিল না কারণ মুসলিম নারী সমাজ ধর্মের কারনে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ মাস পর স্বামীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে তিনি 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস' হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন মাত্র পাঁচজন শিক্ষার্থী নিয়ে। বেগম রোকেয়ার এই ভাবনা ও আদর্শ সাধারণ বাঙালী মুসলমান সমাজের বৃত্ত পেরিয়ে সর্বস্তরে সমাজ ব্যবস্থাকে স্পর্শ করেছিল। শিক্ষার পাঠক্রমের রূপরেখা যেভাবে তিনি নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন তা আসলেই কার্যকরী ও আদর্শ একটি রূপরেখা যা বর্তমান দিনেও সমান প্রাসঙ্গিক| শুধু তাই নয় এই পরিকাঠামোর সম্পূর্ণ প্রয়োগে সমাজের আমূল পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বেগম রোকেয়া তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের রূপরেখা নিজেই ঠিক করতেন। তিনি পাঠক্রমের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন| যেমন, ১. কোরাণ অর্থাৎ ধর্মের শিক্ষা, স্বজাতির অস্তিত্বকে বোঝাতে গেলে ধর্মের চর্চা খুব প্রয়োজন। ২. ইংরেজী- বিদেশের সংস্কৃতিকে চিনতে গেলে, সেই দেশের ভাষাকে রপ্ত করতে হয় আর ইংরেজী ভাষায়

যেহেতু পৃথিবীর সিংহভাগ মানুষ কথা বলেন, তাই বিশ্বজনীন সংস্কৃতির অংশ হওয়ায় ইংরেজী ভাষার শিক্ষা অনিবার্য। এছাড়া তিনি পঠক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন– ৩. উর্দু ভাষা, ৪. পার্সি ভাষা, ৫. হোম নার্সিং, ৬. ফাস্ট এইড, ৭. রান্না, ৮. সেলাই, ৯. শরীর শিক্ষা, এবং ১০. পেশাগত শিক্ষা।

বেগম রোকেয়া অন্তরের আত্মায় একজন শিক্ষাবিদ ছিলেন। তাঁর বিদ্যালয় চালানোর ক্ষেত্রে তিনি খুব সামান্য সহযোগিতা পেয়েছিলেন ইংরেজদের কাছ থেকে, তবে তিনি খুব সহজে হেরে যাওয়ার মতো মানুষ ছিলেন না। নিজের ব্যক্তিগত আয় তিনি বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য ব্যয় করতেন। তিনি শরীর শিক্ষার উপর জোর দিতে বলেছেন কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন এতে মেয়েরা শারীরিক দিক থেকে সক্ষম ও আত্মবিশ্বাসী হবেন। তিনি পেশাগত শিক্ষার কথাও বলেছেন যাতে মেয়েরা আর্থিক দিক থেকে সাবলম্বী হতে পারে। এছাড়া বেগম রোকেয়া মূল্যবোধের শিক্ষা অনুমোদন করেছিলেন যাতে মেয়েরা আদর্শ কন্যা, বধূ এবং মা হয়ে উঠতে পারে।

৫.৪ শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার মতামত :

শিক্ষণ পদ্ধতি : ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন—"আমি ভারতকে ভালোবাসি, কারণ জগতের ধর্মমত গুলির মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট ভারত তার জন্মদাত্রী।" (প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, ১৯৮৫। পৃ. ২৩১) "...হে ভগ্নিগন, আপনাদের সকলের প্রতি আমার একান্ত ভালোবাসা আছে, কারণ আপনারা এই ভারতভূমির কন্যা। আপনাদের নিকট আমার অনুরোধ, আপনারা পাশ্চাত্য সাহিত্যের পরিবর্তে এই মহিমাময় প্রাচ্য সাহিত্যের অনুশীলন করুন। আপনাদের সাহিত্য আপনাদের উন্নত করবে। আপনাদের পারিবারিক জীবনের যে সরলতা ও গাম্ভীর্য, তা যেন অটুট থাকে। প্রাচীন কালে এই পারিবারিক জীবনে যে পবিত্রতা ছিল এবং যা এখনও আপনাদের ঘরে রয়েছে, সেই পবিত্রতা অক্ষুন্ন রাখবেন। পাশ্চাত্যের আধুনিক রীতিনীতি ও আড়ম্বর এবং তার ইংরেজী শিক্ষা যেন আপনাদের বিনম্র সৌজন্য নষ্ট না করে। ...আমার এই অনুরোধ কেবল হিন্দু ভগ্নীগনের কাছে নয়, মুসলমান ভগ্নীনকেও আমার এই অনুরোধ। আপনারা সকলেই আমার ভগ্নী, কারণ যে দেশকে আমি স্বদেশরূপে গ্রহণ করেছি, এবং যেখানে আমি আমার গুরুদেব বিবেকানন্দের অভিপ্রেত কাজ করে যেতে আশা করি, আপনারা সকলেই সেই দেশের কন্যা।" (তদেব, পৃ. ২৩১) নিবেদিতা কি সুন্দর ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাই তিনি সকলের কাছে অনুরোধ করেছিলেন সকলের মধ্যে যাতে এই চারিত্রিক বৈশিষ্ঠগুলি অক্ষুন্ন থাকে, তা যেন কোন ভাবেই নষ্ট হয়ে না যায়।

ভারতীয় নারীর ভবিষ্যৎ উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, শিক্ষার প্রয়োজন আছে। কিন্তু শিক্ষা কী ধরণের হবে তাই প্রশ্ন। ইংরেজী লিখতে ও পড়তে পারাই শিক্ষা নয়। মানুষ হওয়ার শিক্ষা লাভ করা চাই। উন্নতির সম্ভাবনার মূলে যে বাধাগুলি বর্তমান, তা দূর করতে পারলে যথার্থ শিক্ষার পরিবেশ গড়ে উঠবে। যার ফলে সকলের মধ্যে গড়ে উঠবে পবিত্রতা, বিশ্বস্ততা, ঐকান্তিকতা, দৃঢ়তা, ও অসীম প্রীতি, উদারতা, ও স্বার্থশূন্যতা, যা মনকে আগ্রহের সঙ্গে সত্যকে গ্রহণ করার প্রেরণা দেয়।

নিবেদিতা বলেছিলেন—

'...মাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য অধিক জানার প্রয়োজন নাই - কেবল তাঁহাকে ভালোবাস' (তদেব, পৃ. ১৩৫) আর যাকে ভালোবাসা যায় তার অভিলষিত কার্যে জীবন সমর্পন কত আনন্দদায়ক। এই কথাটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে একজন শিক্ষকের হৃদয় পরিপূর্ণ থাকবে ভালোবাসা দ্বারা, আর ভালোবাসা থাকলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন।

'সত্যকে সজীব করিয়া তোলে চরিত্র, সর্বপ্রকার সাহায্যের সফলতা নির্ভর করে প্রেমের উপর, কোন বাক্যের পিছনে চিত্তের যতটা একাগ্রতা তাহাই বাক্যটিকে শক্তি প্রদান করে।'- এ হল মার্গারেটের চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। (তদেব, পৃ. ৩৩)

স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে নিবেদিতার চিন্তাধারা লক্ষ্য করে আমরা অবাক হই, পূর্বে স্ত্রী শিক্ষা আন্দোলনে প্রথম যুগে এক্ষেত্রে যে সকল সমস্যা ছিল, আজও তার সম্পূর্ণ সমাধান হয়েছে বলে বলা চলে না। পুরুষ ও নারী নিয়ে সমাজ গঠিত হয়। উভয়ে মিলেই গৃহ এবং সমাজের বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজন সামিল হয়। অতএব সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য বিভিন্ন প্রকার কার্য ও শিক্ষার প্রয়োজন আছে এবং প্রয়োজন কিছু পরিবর্তনের। তবে এই পরিবর্তন কীরূপ হবে তাই প্রশ্ন। আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষাব্যবস্থা করতে হবে।

নিবেদিতা বলেছেন–

'যে শিক্ষা বুদ্ধি ভিত্তিক উন্মেষ সাধন করিতে যাইয়া নম্রতা ও কর্ম নিয়ত বিনষ্ট করে, তাহা প্রকৃত শিক্ষা হইতে পারে না। ... সুতরাং ভারতীয় নারীগণের জন্য এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজন, যাহার লক্ষ্য হইবে মানসিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তি গুলির পরস্পরের সহযোগিতায় বিকাশ সাধন।' (Hints on National Education in India, pp. 54-55) (তদেব, পৃ. ৪০১ - ৪০২)

আমরা দেখতে পাই স্বামীজীর মানস কন্যা নিবেদিতা। তাঁরই মত মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশকে বলেছেন শিক্ষা। সেই সঙ্গে চাই দেশকে ভালোবাসা ও দেশপ্রেম।

নিবেদিতার স্কুলটি যখন বাগবাজারে বোসপাড়া লেনে ছিল সেখানে নীচে খানিকটা বারান্দার মতো ছিল। সেখানে খুব ছোট মেয়েরা ক্লাস করত, উপরে কয়েকটি ঘরও ক্লাস হিসেবে ব্যবহৃত হত। তার মধ্যে একটি সিস্টারের শোবার ঘর ছিল ও সেই ঘরটির একপাশে তিনি লেখাপড়া করতেন। তখন স্কুলে একজন মাত্র শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, তিনি ছোট মেয়েদের পড়াশোনা দেখাতেন এবং বড়োদেরও সাহায্য করতেন। বড় মেয়েরাও প্রয়োজন মতো ছোটদের ক্লাস নিতেন। এর মধ্য থেকে আমরা বুঝতে পারি যে উনার উদ্দেশ্যই ছিল কিছু শিক্ষয়িত্রী তৈরি করা। এবং এর থেকে আমরা এটাও বুঝতে পারি যে উনি মেয়েদের এইসব কাজ করিয়ে মেয়েদেরকে আত্মনির্ভরশীল ও সাহসী করে তুলতে চেয়েছিলেন। এছাড়াও বাগবাজার পল্লির গৃহস্থ ঘরের অনেক মহিলারা, মেয়েদের 'মা'-রা, ঠাকুমা'রা মাঝে মাঝে স্কুলে আসতেন নিবেদিতার কাছে সেলাই শিখতে এবং অনেক অভাব গ্রস্থ মহিলারা এসে তাদের বাচ্চার জামা প্যান্ট তৈরি করিয়ে নিয়ে যেতেন। সেই তৈরি করার জন্য যা কাপড়, সুতো লাগত তার খরচ বহন করতেন নিবেদিতা নিজেই। অনেকে এমনও ছিলেন যারা নিবেদিতার কাছে সাহায্য চাইতে আসতেন, তাদেরকেও নিবেদিতা যথাসাধ্য সাহায্য করতেন এবং তাদেরকে কিছু কাজ দিতেন– সেলাই প্রভৃতির কাজ, যাতে তারা শুধু শুধু সাহায্য নেওয়া থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে পারে এবং নিজেরাই সাবলম্বী হতে পারে। এর থেকে আমরা শিক্ষা পাই একজন শিক্ষক হবেন উদার প্রকৃতির এবং তিনি সর্বদা চেষ্টা করবেন যাতে একজন শিক্ষার্থী সাবলম্বী হতে পারে, তার সঠিক উপায় বলে দেওয়া। এর ফলে শিক্ষার্থীকে কারও উপর নির্ভরশীল হতে হবে না, নিজের প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করার জন্য।

প্রভাবশালিনী নিবেদিতা, পরিচিতি ও বন্ধুত্ব সুত্রে অনেক পরিবারের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন কিন্তু তাও তাঁর কর্মক্ষেত্রের দিকে সম্পূর্ণরূপে নজর রেখেছিলেন। তাকে সর্বদাই দেখা যেত দরিদ্র গৃহস্থ, পল্লীবধূ ও গৃহিনীদের দ্বারা বেষ্টিত থাকতে। অন্যান্য স্কুল গুলির মতো তাঁর স্কুলে কোন মাইনে নেওয়া তো হত না উপরন্তু প্রয়োজনে পেনসিল, বই, কাগজ দিয়ে মেয়েদের সাহায্য করা হত। অর্থাৎ আমরা দেখতে পাই নিবেদিতার সঙ্গে প্রতিবেশি বা ঘনিষ্ট বন্ধু মহলের সম্পর্ক ছিল খুবই মধুর। নিবেদিতা নিজের লক্ষ্যে ছিলেন একেবারে স্থির, তিনি সবসময় তাঁর কাজ সম্বন্ধে সচেতন থাকতেন। অর্থাৎ, শিক্ষক হবেন নিজের কাজের প্রতি সচেতন এবং দায়িত্বশীল।

নির্ঝরিনী সরকার ছিলেন নিবেদিতার এক প্রত্যক্ষ ছাত্রী। তিনি লিখেছেন - "(নিবেদিতা) যখন আমাদের পড়াতেন তখন আমরা তাঁকে শিক্ষক বা গুরুর চেয়ে বন্ধু বলে বেশি মনে করতাম, যেন তিনি আমাদের কত আপনজন। তাঁকে আমাদের একটুও ভয় হত না, তাঁর কাছে আমরা পড়বার সময় ভুল করলে তাঁর ছিল সেই ক্ষমাপূর্ণ স্নেহ হাসি। এখনও সেকথা মনে হয়"। (নির্ঝরিনী সরকার, আনন্দ বাজার পত্রিকা, শতবর্ষ সংকলন, ২০২২। পৃ. ১০৭)

এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি একজন শিক্ষক যেমন শিক্ষার্থীর গুরু হবেন ঠিক একই সঙ্গে শিক্ষার্থীর বন্ধুও হবেন, আবার শিক্ষক হবেন হাসিখুশি ও সহিষ্ণু স্বভাবের অধিকারী। নির্ঝরিনী সরকার লিখেছেন,– "হঠাৎ সিস্টার সেই ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন এবং আবার আমাদের সকলের দিকে তাকালেন যেন এক দৃষ্টিতে সমস্ত দেখে নিলেন, তার পর আমাদের কাছে এসে প্রত্যেককে সম্পূর্ণ সোজা হয়ে বসতে বললেন। আমরা লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বসলাম কিন্তু যাদের বসা তখনও তার মনোমত হয়নি, তাদের তিনি মেরুদন্ড সোজা রেখে কিভাবে বসতে হয়, নিজে ঠিক করে বসিয়ে দেখিয়েদিলেন, ও দৃঢ়ভাবে আমাদের বললেন, তোমরা সর্বদাই সোজা হয়ে বসবে, নিচু হয়ে, কুঁজো হয়ে বা বেঁকে চূরে কখনো বসবে না। এই কয়েকটি মাত্র কথা বলে তিনি আবার চলে গেলেন। এর পরেও যখনই তিনি আমরা সাবধান হওয়ার পূর্বেই আমাদের পড়ার ঘর দিয়ে কোন দরকারে অন্য ঘরে যেতেন, তখন আমাদের মধ্যে কেউ সোজা হয়ে না বসলে নিজেই ধরে সোজা করে বসিয়ে দিয়ে যেতেন, আমরাও খুব অপ্রস্তুত হয়ে যেতাম। একটি দৃষ্টি পাতেই তিনি মেয়েরা কে কি করছে সবই বুঝতে পারতেন কোন অন্যায় বা ন্যায় কিছুই গোপন থাকত না।" (তদেব, পৃ. ১০৭)

নির্ঝরিনী সরকারের এই উক্তিটির দ্বারা আমাদের কাছে পরিষ্কার যে একজন শিক্ষক হবেন প্রখর দৃষ্টি সম্পন্ন, যার চোখের আড়ালে কোন কাজ করা সম্ভব হবে না।

সুধীরা দিদি, ক্রিশ্চিয়ানা ছিলেন নিবেদিতার স্কুলের শিক্ষায়িত্রী। সুধিরা দিদি, একদিন ক্রিশ্চিয়ানাকে বলেছিলেন - "আমরা তো সন্নাসিনী, এত ছোট ছোট বিষয়ে আসক্তি থাকা কি ভালো?" কোন একদিন ক্রিশ্চিয়ানা গল্পের ছলে এই কথা নিবেদিতাকে বলেছিলেন, নিবেদিতা তৎক্ষনাৎ বলেছিলেন– "এরকম মনোভাবকে কখনও প্রশ্রয় দেবে না"। (তদেব, পৃ. ১০৭) কোন সামান্য দুর্বলতাও তিনি সহ্য করতে পারতেন না। সামান্য ত্রুটি, অলসতা, ফাঁকি

লুকাবার উপায় নেই। এমনকি সুধিরা দিদি ও ক্রিশ্চিয়ানা পর্যন্ত কেউ নিবেদিতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির থেকে রেহাই পেতেন না। সুতা, পেনসিল, কাগজ প্রভৃতি এতটুকু জিনিসও তিনি নষ্ট করা পছন্দ করতেন না।

নিবেদিতার ওই উক্তিটির দ্বারা পরিষ্কার যে, শিক্ষক হবেন সর্বদাই কঠোর পরিশ্রমী এবং শিক্ষকের মধ্যে কোন ভাব বিলাসিতার প্রকাশ পাবে না। কেবলমাত্র জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসেবে গ্রহণ না করে যারা শিক্ষা দানের মধ্য দিয়ে নিজের সত্ত্বাকে প্রকাশ করে এক অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করে, তাদের শিক্ষা প্রণালী স্বভাবতই চিরাচরিত পথ থেকে ভিন্ন। নিবেদিতা অঙ্ক, ইতিহাস ও ছবি আঁকা শেখাতেন। তিনি সাধারণ স্কুলের মতো পাঠ্য পুস্তক দ্বারা ইতিহাস পড়াতেন না, তিনি নিজেই ইতিহাসের গল্প বলে যেতেন এবং ছাত্রীরা শুনতেন। তিনি যেদিন যে বিষয়টি আরম্ভ করতেন সেই বিষয়টির মধ্যে যেন তিনি একেবারে ডুবে যেতেন। সিস্টার নিজে সমস্ত রাজপুতনা ঘুরে বেড়িয়ে ছিলেন, সে সম্বন্ধে গল্প শোনাতেন শিক্ষার্থীদের। রাজপুত জাতির শৌর্য, বীর্য, দেশের জন্য ত্যাগ, কষ্ট সহিষ্ণুতা, আবার রাজপুত নারীদের বীরত্ব গাথা, আত্ম-সম্মান এই সব তিনি অগ্নিগর্ভ ভাষায় বর্ণনা করতেন এবং সেই সময় তাঁর মুখের ভাব বিভিন্ন ভাবের ছটায় উদ্ভাসিত হত এবং শিক্ষার্থীরা তা দেখে মুগ্ধ হত। একেকদিন মহাভারতের গল্পও বলতেন এবং সেখান থেকে প্রশ্ন করতেন – "মহাভারতের নারী চরিত্রের মধ্যে কোন নারী চরিত্র সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে?" প্রশ্নের উত্তর দিতে ছাত্রীরা ইতস্তত বোধ করায় তিনি নিজেই বললেন--- "মহাভারতের শ্রেষ্ঠ নারী চরিত্র গান্ধারী।" কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে যাওয়ার সময় প্রাণের অধিক সন্তানরা যখন জননীর চরণে প্রণাম করে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন, তখন গান্ধারী জানতেন নিশ্চিত ভাবে এ যুদ্ধের ফল কি এবং ধর্ম কোন পক্ষে, তবু ও তিনি নির্দ্বিধায় বলেছিলেন, 'যত্রধর্ম স্ততোজয়'। গান্ধারী এমন এক চরিত্র ছিলেন যাঁর স্বামী দৃষ্টিহীন ছিলেন বলে তিনি নিজের চোখও বেঁধে নিয়েছিলেন। পৃথিবীর সমস্ত সুখ, আনন্দ থেকে তিনি নিজেকে বিরত রেখে ছিলেন। নিবেদিতার কথাগুলি শোনা মাত্র সব ছাত্রীরা মহান নারী চরিত্র গান্ধারীর মহিমার কাছে ম্লান হয়ে গেল। এখানে নিবেদিতা কি সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করলেন অন্যের জন্য নিজেকে কিভাবে বিলিয়ে দিতে হয়। নিবেদিতা এরূপ বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতেন। আরও একদিন নিবেদিতা ক্লাসে বলছেন----"যুদ্ধের সময় অগ্রগামী যে দল শুধু পরবর্তী দলের পথ

প্রস্তুত করবার জন্য নিজের জীবন দান করে, আমরা সেই নিরাশ দল। একথা তোমরা ভোলো না, আমাদের কাজ শুধু পথ প্রস্তুত করা।" (তদেব, পৃ. ১০৮)

নিবেদিতা সপ্তাহে একদিন প্রায় একঘন্টা সময় এই সমস্ত উপাখ্যান এবং ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনা ও চরিত্র শিক্ষার্থীদের সামনে আলোচনা করতেন যাতে শিক্ষার্থীরা সেই সব চরিত্রের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয় এবং তাদের আচরণের মধ্যে যেন তা প্রতিফলিত হয়।

নিবেদিতা কি সুন্দরভাবে পড়াতেন এবং যেকোন বিষয় বোঝাতেন। কোন শিক্ষার্থী কোন বিষয় বুঝতে না পারলে নিবেদিতা কোনরূপ বিরক্ত না হয়ে তাকে বারে বারে বোঝাতেন। নির্ঝরিনী সরকার লিখেছেন – "তিনি অঙ্ক শেখাতেন খেলার মতন করে। একজনের পর আর একজনকে মুখে মুখে প্রশ্ন করতেন, আমরাও মুখে মুখে উত্তর দিয়ে যেতাম। একদিন ক্লাসে নরেশনন্দিনী দিদি অঙ্কের ক্লাসে বারে বারে ভুল করছিলেন। সিস্টার তার দিকে বিশেষ মনযোগী হয়ে তাকে জিনিসটা বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন। যখন নরেশনন্দিনী দিদি উত্তর দিতে বারে বারে বিফল হচ্ছিল তখন অজ্ঞাতসারে আমি উত্তরটা দিয়ে দি। সিস্টার তখন একেবারে গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং আমাকে 'এই প্রশ্নটি করা হয়েছিল' কিনা জানতে চাইলেন। তারপর আবার নিয়মিত পর পর প্রশ্ন করতে লাগলেন, কিন্তু আমাকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে।" (তদেব) এর দ্বারা বোঝা যায় একজন শিক্ষকের মধ্যে থাকবে অনন্ত এক ধৈর্য এবং তিনি কখনও শিক্ষার্থীর প্রতি কোনরূপ বিরক্তিকর মনোভাব প্রকাশ করবেন না।

নিবেদিতা ছবি আঁকা ও রং তুলির কাজ শেখাতেন এত সহজভাবে যে সকল শিক্ষার্থী সহজেই তার শেখানো প্রণালী আয়ত্ব করতে পারত। কত আল্পনা, মাটির ছাঁচ, মাটির বেনেপুতুল, পুরান কাশ্মিরী সালের কাজ, কাঁথার কারুকার্য সিস্টার সংগ্রহ করতেন এবং যাদের এসব শেখার আগ্রহ দেখতেন তাদেরকে স্কুলে ডেকে এনে সাদরে শিক্ষা দিতেন। স্কুলের ছাত্রীরা যখন কোন আলপনা এঁকে সিস্টারকে উপহার দিতেন উনি খুব খুশি হতেন এবং সেগুলিকে যত্ন করে রেখে দিতেন।

নিবেদিতা তাঁর স্কুলের বাচ্চাদের বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে শিক্ষা দিতেন। বৌদ্ধ যুগের স্থাপত্য শিল্প, মূর্তি, স্তূপ, শিলালিপির উপর তার গভীর আগ্রহ ছিল।এসম্বন্ধে যাতে তাঁর স্কুলের বাচ্চাদের জ্ঞান বাড়ে তাই

বাচ্চাগুলিকে একদিন মিউজিয়ামে নিয়ে যান। বৌদ্ধ যুগের নানারকম মূর্তি ও স্থাপত্য নিদর্শন ছিল সেখানে। সেগুলি বাচ্চাদের দেখান ও সে সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলেন তাদের। তিনি একটি ঠোঙায় করে কিসমিস, আখরোট প্রভৃতি নিয়ে গিয়েছিলেন মিউজিয়ামে বেড়াতে যাওয়ার সময়। তাঁর যখন মনে হল তার বাচ্চাদের খিদে পেয়েছে তখন তিনি ওই ঠোঙা প্রফুল্ল দেবীর হাতে দিয়ে বললেন সবাইকে ভাগ করে দিতে। যথাযথ ভাবে প্রফুল্ল দেবী সবাইকে ভাগ করে দিয়ে সিস্টারকেও হাত পাততে বললেন। সিস্টার প্রত্যেকের স্বভাব খুব ভালো আত্মস্থ করতে পারতেন। সিস্টার তখন প্রফুল্ল দেবীকে বললেন–"দুষ্টু মেয়ে, দেখি তোমার কতটা আছে?" প্রফুল্ল দেবী বললেন "আমার অনেক আছে বলে আর কিছুতে ঠোঙা খুলে দেখালেন না। সিস্টার কিন্তু রাগ না করে এমন মিষ্টিভাবে হাসলেন যেন তার হাসিতে এই কথায় বলতে চাইছিলেন–'এটাই এদেশের মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক। অন্যের জন্য তারা ব্যস্ত হয়। নিজের জন্য তারা কিছুই রাখতে চায় না'। (তদেব, পৃ. ১০৮) নিবেদিতা বাচ্চাদের নিয়ে সবসময় খুব সচেতন থাকতেন এবং তিনি বাচ্চাদের খাওয়াতে খুব ভালোবাসতেন। বাচ্চাদের জল তেষ্টা পাওয়ায় সিস্টার একটু ব্যস্ত হলেন। বাচ্চাদের জল খাওয়াবেন বলে দেখলেন সামনেই একটি কল রয়েছে কিন্তু জল খাওয়ানোর জন্য কোন পাত্র নেই। বাচ্চাগুলির মধ্যে এক বাচ্চা সহসা দুটি হাত জুড়ে অঞ্জলির মতো করে জল খাওয়া শুরু করলে তা দেখে সিস্টার অবাক হন এবং সিস্টারও জল খাওয়া শিখে গেলেন। সিস্টার সবসময় চাইতেন যে পরিবেশে তিনি আছেন সেখানকার রীতিনীতি আদব কায়দা গুলি শিখে নিতে। মিউজিয়ামে সিস্টার যেদিন বাচ্চাদের নিয়ে এসেছিলেন সেদিন মিউজিয়ামের কয়েকটি ঘর চুনকাম ও মেরামত হচ্ছিল। সেই যারা মেরামত করছিলেন তাদের মধ্যে একজন ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছিলেন মিউজিয়ামের একধারে। তা দেখে সিস্টার ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললেন তোমরা কোন শব্দ করোনা এবং কথাও বলোনা উনি ঘুমাচ্ছেন। যাতে না ওই মানুষটির ঘুম ভাঙে তাই সিস্টার নিজেও সেখান থেকে খুব আস্তে আস্তে চলতে লাগলেন। এখান থেকে বোঝা যায় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ভালোবাসবেন আন্তরিকতার সঙ্গে এবং তাদের সকল দিকের প্রতি যেমন নজর রাখবেন ঠিক তেমনিভাবে বাচ্চাদের নিয়ম- নিষ্ঠা শেখাবেন এবং অন্যের পাশে কিভাবে সময়ে অসময়ে থাকতে হয় তাও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শেখাবেন। নিবেদিতা ক্লাস রুমে চিকাগো ধর্ম মহাসভায় তোলা স্বামীজীর একখানি ছবি রেখেছিলেন। তা দেখিয়ে বাচ্চাদের বলতেন – "আমার গুরুদেব বলতেন যে, এইভাবে দাঁড়ালে, মন অনেক উচ্চ

স্তরে উঠে যায়। তোমরাও সর্বদা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চেষ্টা করবে।” (তদেব, পৃ. ১০৯) সিস্টার সবসময় চাইতেন তার স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিয়ম, নিষ্ঠা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা করার মনোভাব, আত্মনির্ভরশীলতা যেন গড়ে উঠে।

সিস্টার স্বভাবে একদিকে যেমন কঠোর ছিলেন ঠিক ততটাই ছিলেন নরম মনের। সুধীরা দেবী নিবেদিতার কথা বলতে গিয়ে একদিন বলেছেন - “উপরে কঠোরতা ভেদ করলে যে কি অসীম স্নেহ পারাবার, সেই অমৃতের আস্বাদন একবার পেলে আর ভোলা যায় না।” (তদেব, পৃ. ১০৭) পরবর্তীকালে সুধীরা দেবীকে গ্রহণ করতে হয়েছিল নিবেদিতার স্কুলের সম্পূর্ণ ভার। সিস্টারের আদর্শ প্রচারের জন্যই তিনি জীবন পণ করেছিলেন।

এককথায় সিস্টার খুব সহজ কথায় এবং শিক্ষার্থীদের উপযোগী বাস্তব অভিজ্ঞতা গল্পের আকারে তুলে ধরে শিক্ষা দিতেন। শিশু শিক্ষায় তো বটেই এমনকি বড়দের শিক্ষা দানের ক্ষেত্রেও কঠিনতম বিষয়কে মূর্ত্ত এবং শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা, উপযোগী উদাহরণ সহ তুলে ধরতে পারলে শিক্ষার্থীদের যেমন আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে, তেমনি তারা সহজে বিষয়টিকে আয়ত্ত্ব করতে সমর্থ হবে। নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দকে কথা দিয়েছিলেন যে, মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা এবং মনুষ্যত্ব বোধ জাগ্রত করতে তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করবেন। নিবেদিতার শিক্ষা দানের পদ্ধতিকে বিশ্লেষণ করলে এই সত্যটিকে বোঝা যায়।

এখান থেকে সিস্টার কিভাবে স্কুলের বাচ্চাদের শেখাতেন তা যেমন বোঝা যাচ্ছে ঠিক তেমনিভাবে সিস্টার ছিলেন একজন দৃঢ়চেতা, আধুনিক মনস্কা, সমাজসেবী, স্পষ্টবাদী এবং নির্ভিক মনের মানুষ।

শিক্ষণ পদ্ধতি : বেগম রোকেয়া

রোকেয়া বলেছেন, একটি পরিবারে পুত্র ও কন্যাকে শিক্ষা অর্জনের সমান অধিকার দিতে হবে। আমরা সকলেই রোকেয়াকে একজন নারীবাদী ও সমাজকর্মী হিসেবে জেনে এসেছি, কিন্তু এর বাইরেও তার একটা জগৎ ছিল ---তিনি ছিলেন একজন গভীর চিন্তক। রোকেয়া বিবেক ও যুক্তিকে আশ্রয় করে তাঁর কর্মে অগ্রসর হয়েছিলেন। এর পেছনে ছিল তাঁর ব্যাপক অধ্যয়ন। সমকালীন পত্র পত্রিকা এবং গ্রন্থাদি তিনি যে নিয়মিত পড়তেন, তার উল্লেখ রয়েছে তাঁর বিভিন্ন রচনায়। মেরি করলি (Marie Corlli, 1850-1924) ছিলেন সেকালের বেস্ট সেলার। তাঁর আসল নাম মেরি ম্যাকায়, ইনি জানতেন সমাজের কোন বিষয়গুলি নিয়ে বেশি লেখালেখি করলে জনপ্রিয় হওয়া যায় – তাই তিনি ধর্মীয় আবেগকে এবং নারীর স্বাধীনতা, নারীর আপন পরিচয় স্থাপনকে নিজস্ব থিম হিসাবে গ্রহণ করেন। তিনি পুরুষ শাসিত সমাজের বিরুদ্ধে নারী বিদ্রোহকে ভাষা দিয়েছিলেন। The murder এর ন্যায় Delicia (1896) উপন্যাসেও নারী মুক্তি ধারণাকে তুলে ধরেছিলেন।

আর এরকম একটা কাহিনী যারা ইংরেজী জানেন না তাঁরা তো আত্মস্থ করতে পারবেন না, তাই রোকেয়া উপন্যাসের কাহিনীটিকে সংক্ষিপ্তভাবে পরিবেশন করলেন বাংলা ভাষায়।

এর থেকে আমরা বুঝতে পারি সমাজের মানুষ গুলির কোমল মন গুলিকে নাড়া দেওয়ার জন্য বর্তমানে সমাজের যে বিষয়গুলি প্রয়োজন সেগুলি নিয়ে লেখালেখি করার প্রয়োজনীয়তা। যেমন বলা যেতে পারে বর্তমানে মানুষের মধ্যে মূল্যবোধের বিকাশ ক্রমশই ক্ষীণ হচ্ছে – তাই আমরা যদি মানুষের মধ্যে মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে চাই তাহলে সেই সম্পর্কে লেখালেখি করতে হবে খুব সহজ সরল ভাষায় যেটি প্রতিটি মানুষ সুন্দরভাবে গ্রহণ করতে পারবে।

১৮৭০ এর দশকে বিজ্ঞান তো দূরের কথা, গনিতকেও নারী শিক্ষার অনুপযোগী হিসেবে ধরা হত। কিন্তু বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। কারণ হিসেবে ধরা যায় যে, তাঁর স্বামী যেহেতু বিজ্ঞান মনস্ক ছিলেন তাই রোকেয়াও স্বামীর প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। রোকেয়ার বিজ্ঞান মনস্কতা তাঁর চিন্তা চেতনাকে আরো যুক্তিবাদী ও সমুজ্জ্বল করেছিল। তিনি যে বিজ্ঞান মনস্ক ছিলেন আমরা তার পরিচয় পাই তাঁর লেখা ‘সুলতানার স্বপ্নে’।

সৌর শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তারা রান্না থেকে যুদ্ধ জয়– সবই করতে পারে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে রোকেয়া যখন এই কথা লিখেছেন তখন এটাকে অসম্ভব বা অবাস্তব মনে হলেও আজ আমরা যখন একুশ শতকে পৌঁছেছি, তখন দেখছি এই সৌর শক্তি কতটা কাজে লাগছে। এর মাধ্যমে রোকেয়া যে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন এবং বাস্তব পরিস্থিতিকে কতটা বুঝেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

রোকেয়া তাঁর পদ্মরাগ উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদে 'তারিণী ভবন' এ দেখিয়েছেন যে বিদ্যালয়ে সব ধর্মেরই শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে কি সুন্দর মিল। সকলেই যে এক ঈশ্বরের সন্তান। "এই তারিণী ভবনের ছাত্রীদের দুপাতা পড়তে শিখিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে ঢেলে বিলাসিতার পুতুল গঠন করা হয় না। বিজ্ঞান, সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্কশাস্ত্র–সবই শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু শিক্ষা প্রণালী ভিন্ন। মিথ্যা ইতিহাসকে কণ্ঠস্থ করিয়ে তাদেরকে নিজের দেশ এবং দেশবাসীকে ঘৃনা করতে শিক্ষা দেওয়া হয় না। নীতিশিক্ষা, ধর্ম্ম শিক্ষা, চরিত্র গঠন প্রভৃতি বিষয়ে অধিক মনোযোগ দান করা হয়। বালিকাদিগকে অতি উচ্চ আদর্শের সুকন্যা, সুগৃহিনী ও সুমাতা হতে এবং দেশ ও ধর্ম্মকে প্রাণের অধিক ভালবাসতে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিশেষতঃ তারা আত্মনির্ভরশীল হয় এবং ভবিষ্যৎ জীবনে যেন কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ পিতা, ভ্রাতা বা স্বামী পুত্রের গলগ্রহ না হয়–এই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়।"(রোকেয়া রচনাবলী, ২০০৬। পৃ. ২৭০)

এ ভাবে শিক্ষা কেমন হবে রোকেয়া 'তারিণী ভবন' এর মাধ্যমে তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করেন। রোকেয়া মেয়েদের যেহেতু আত্মনির্ভরশীল হতে বলেছিলেন তাই ছাত্রী কর্মীরা সূচিকর্ম করেন, চরকা কাটেন, তাঁত কাপড় বোনেন, বই বাঁধান এবং মিষ্টি তৈরি করেন, কেউ আবার শিক্ষিকা হবার জন্য শিক্ষা গ্রহণ করেন। নার্সিং ও টাইপিং শেখেন কেউ কেউ।

রোকেয়া বলেছেন, একটা পরিবারের পুত্র ও কন্যার যেরকম সমকক্ষতা থাকা প্রয়োজন শিক্ষা ক্ষেত্রেও সেটার প্রয়োজন। তাই তিনি সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের বৈষম্যকে অযৌক্তিক বলে বিবেচনা করেন। পতঙ্গ ভীতি দূর করার জন্য রোকেয়া বলেছেন, "প্রকৃত সুশিক্ষা চাই যাহাতে মস্তিস্ক ও মন উন্নত (brain ও mind cultured) হয়।" (তদেব, পৃ. ৪৫)

রোকেয়ার মতে, “সুশিক্ষার অভাবেই হৃদয় বৃত্তি সংকুচিত হয়ে যায়।”(বেগম রোকেয়া রচনাবলী, ২০০৬।পৃ. ৪৪)

প্রকৃত শিক্ষা কাকে বলে সে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, “শিক্ষার অর্থ কোন সম্প্রদায় বা জাতি বিশেষের অন্ধ অনুকরণ নয় বরং সৃষ্টিকর্তা যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা দিয়েছেন সেই ক্ষমতাকে অনুশীলনের মাধ্যমে বাড়িয়ে তোলাই শিক্ষা। মানুষের মধ্যে প্রকৃতি গত যে ক্ষমতা বা গুণ রয়েছে সেগুলোর সদ্ব্যবহার করা তার কর্তব্য এবং অপব্যবহার করা অন্যায়।” (তদেব, পৃ. ১৯)

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মত লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই কথাগুলির মধ্যে : শিক্ষা অন্ধ অনুকরণ নয় মানুষের মধ্যে রয়েছে সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা যাকে অনুশীলন বা ব্যবহারের মাধ্যমেই বাড়ানো যায়। এর মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই রোকেয়া শিক্ষা বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ন দিক তুলে ধরেছেন। শিক্ষা কখনোই কোন ব্যক্তির অন্ধ অনুকরণ হতে পারে না। শিশুরা অনেক কিছু শিখে বড়োদের কাছ থেকে অনুকরণের মাধ্যমে। সেটা বিশেষত ছোট বয়সে। তারপর মানুষ তার বিচার, যুক্তি ও ইচ্ছা দ্বারা অনুকরণ করবে। মানুষের মধ্যে ব্যক্তিবৈষম্য রয়েছে আর এই গুণের ভিন্নতা প্রকৃতিরই প্রয়োজনে। তাই ব্যক্তির বেলায় যা সত্য এক জাতির বেলায়ও তাই সত্য। এক এক জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রেক্ষিত এক এক রকম। এক জাতির জন্য যা প্রয়োজন অন্য জাতির জন্য তা প্রয়োজন নাও হতে পারে। তাই শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার সময় প্রত্যেকটি জাতির প্রেক্ষাপট বিবেচনা করা দরকার। এটা যদি না হয় তাহলে কোন জাতির অন্তর্নিহিত বিকাশ সঠিক ভাবে সম্ভব নয়। সুতরাং শিক্ষার অর্থ অন্ধ অনুকরণ নয়। রোকেয়া একথা বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষা অন্ধ অনুকরণ নয় বরং স্বতঃস্ফূর্ত আত্মঅনুশীলন, তাই প্রকৃত শিক্ষা বা শিক্ষা প্রণালীর সার্থকতা আসে - ব্যক্তির নিজস্ব ক্ষমতার বিকাশের মাধ্যমে। রোকেয়া বলেছেন সৃষ্টিকর্তা যে জ্ঞান বা ক্ষমতা দিয়েছেন তা অনুশীলনের মাধ্যমে বাড়িয়ে তোলাই শিক্ষা। এখানে অনুশীলন করার অর্থ হচ্ছে নিয়মিত চর্চা করা এবং শিশু নিয়ত আপনিই শেখে না, অভিজ্ঞজনের নির্দেশনাতেই শেখে। তাই রোকেয়া যখন অনুশীলনের কথা বলেন তখন তা ফ্রয়েবেলের কথার প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়। রোকেয়ার মতে মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগত যে ক্ষমতা বা গুণ রয়েছে সেগুলির সদ্ব্যবহার করা তার কর্তব্য এবং অপব্যবহার করা অন্যায়।

রোকেয়ার কাছে শুধু পাশ করা বিদ্যা প্রকৃত শিক্ষা নয়। তাঁর মতে, শুধু সনদ লাভ করলেই মানুষ শিক্ষিত হয় না, জ্ঞান ও গুণের সদ্ব্যবহার করতে পারা, 'মস্তিস্ক ও মন উন্নত' করতে পারাটাই হচ্ছে শিক্ষিত জনের মূল্যায়নের মাপকাঠি। এই বক্তব্যের উপর ভিত্তি করেই হয়ত বলা হয়, রোকেয়ার মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল মস্তিস্ক ও মন উন্নত করা। অতএব মস্তিস্কের উন্নয়নকে শিক্ষার লক্ষ্য বলে রোকেয়া তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন।

রোকেয়া বলেন, "সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে যে হাত, পা, চোখ, কান, মন এবং চিন্তা শক্তি দিয়েছেন, আমরা যদি সেগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করি, হাত দিয়ে সৎকাজ করি, চোখ দিয়ে কার্যকর ভাবে দেখি, কান দিয়ে মনযোগ সহকারে শুনি এবং চিন্তাশক্তি দিয়ে আরও সুক্ষ্মভাবে চিন্তা করতে শিখি তবে সেটাই প্রকৃত শিক্ষা।" (তদেব)

মুখস্থ করা যে প্রকৃত শিক্ষার পদ্ধতি হতে পারে না, সে কথা রোকেয়া বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি বলেন "তাহাদের বাকশক্তি কেবল আমাদের শিখান বুলি উচ্চারণ করিবার জন্য নহে"। (তদেব, পৃ. ১৯৯)

রোকেয়ার মতে, কেবলমাত্র অন্যের বক্তব্য শুনে বা মুখস্থ করে তা প্রকাশ করে দেওয়াই প্রকৃত শিক্ষা নয়, চোখ, কান এবং চিন্তাশক্তির যথাযথ ভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করা সম্ভব। তাঁর মতে, গোটাকতক বই পড়া বা দু'ছত্র কবিতা লিখতে পারা শিক্ষা নয়। তিনি চেয়েছিলেন সেই শিক্ষা যা শিক্ষার্থীকে নাগরিক অধিকার অর্জন করতে সক্ষম করবে। এই শিক্ষা মানসিক ও শারীরিক দুই রকমের হতে হবে। (তদেব, পৃ. ২৭২)

রোকেয়া বুঝতে পেরেছিলেন বৈজ্ঞানিক ও মানবিক উভয় ধরনের জ্ঞান না থাকলে শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশ সুষম হবে না। ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিষয়ে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থানে পরিবেশ ও মানুষের সম্বন্ধে জ্ঞান দানের উপরে রোকেয়া গুরুত্ব দিয়েছেন। যা কিছু দরকার তার সবই শিক্ষার্থীর পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

নৈতিকতার শিক্ষার ক্ষেত্রে রোকেয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে সমস্ত গুনাবলীর বিকাশ ঘটানোর কথা বলেছেন সেগুলি হল সত্যবাদীতা, আত্মনির্ভরতা, সাহসিকতা, কর্তব্যবোধ, একতা, শিষ্ঠাচার (যেমন বড়দের সম্মান দেওয়া এবং ছোটদেরকে স্নেহ প্রভৃতি)।

‘সৌরজগৎ’ গল্পটিতে বিভিন্ন চরিত্রের কথাবার্তা বা আলোচনার মাধ্যমে তিনি এ সম্পর্কে তাঁর মতামতটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আমরা ‘সৌরজগৎ’ গল্পটিতে দেখতে পাই প্রতিটি চরিত্র প্রতিটি চরিত্রের প্রতি কতটা দায়িত্বশীল এবং একে অপরের ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ। আবার ‘স্ত্রী জাতির অবনতি’ প্রবন্ধে শিক্ষার অভাবে মেয়েদের মধ্যে যে ভীরুতা রয়েছে এবং আরো যে পাঁচটি দূরারোগ্য ব্যাধি রয়েছে সেগুলির কথা তিনি বলেছেন–‘অযোগ্যতা, অসন্তোষ, পরনিন্দা, হিংসা এবং মূর্খতা’ (তদেব, পৃ. ১২)

এগুলিকে তিনি নানা রকম ভাবে তাঁর প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন এবং আত্মনির্ভরশীল হতে বলেছেন। তাঁর কথায়, “যে পরিশ্রম আমরা ‘স্বামী’র গৃহকার্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসা করিতে পারিব না?” (তদেব, পৃ. ২১) সাহসিকতার যে প্রয়োজন জীবনে এগিয়ে চলার জন্য সে কথাটিও, তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তাই তিনি আহ্বান জানিয়েছেন “অতএব জাগ, জাগ গো ভগিনী”! “প্রথমে জাগিয়া উঠা সহজ নহে, জানি; সমাজ মহা গোলযোগ বাধাইবে জানি; ভারতবাসী মুসলমান আমাদের জন্য ‘কৎল’ এর (অর্থাৎ প্রাণদন্ডের) বিধান দিবেন এবং হিন্দু চিতানল বা তুষানলের ব্যবস্থা দিবেন, জানি! (এবং ভগ্নিদিগের ও জাগিবার ইচ্ছা নাই, জানি!) কিন্তু সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত জাগিতে হইবেই। বলিয়াছি ত কোন ভাল কাজ অনায়াসে করা যায় না। কারামুক্ত হইয়াও গ্যালিলিও বলিয়াছিলেন, কিন্তু যাহাই হউক পৃথিবী ঘুরিতেছে (“but nevertheless it (Earth) does move”)! আমাদিগকেও এইরূপ বিবিধ নির্যাতন সহ্য করিয়া জাগিতে হইবে।” (তদেব, পৃ. ২০)

এভাবেই রোকেয়া তাঁর লেখার মাধ্যমে মুসলমান মহিলাদের উদ্দীপিত করতে চেয়েছিলেন এবং মেয়েদের মধ্যে সাহসিকতার মনোভাবটি প্রবেশ করাতে চেয়েছিলেন।

‘সুগৃহিনী’ প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি ব্যক্ত করেছেন যে একটি মেয়ের মধ্যে যদি প্রকৃত শিক্ষা না থাকে তাহলে সে কিভাবে - ক) গৃহ এবং গৃহসামগ্রী পরিষ্কার ও সুন্দর রূপে সাজাইয়া রাখিবে?

খ)পরিমিত ব্যয়ে সুচারূ রূপে গৃহস্থলি সম্পূর্ন করিবে?

গ) রন্ধন ও পরিবেশন করিবে?

ঘ) সূচী কর্ম করিবে?

ঙ) পরিজনদিগকে যত্ন করিবে?

চ) সন্তান পালন করা, ইত্যাদি করিবে এবং মানুষ করিবে?

এই কার্যগুলি এদেশে কিরূপে হয় আর কি রূপে হওয়া উচিত তা তিনি বুঝবেন কিভাবে– তার জন্য চাই প্রকৃত অর্থের শিক্ষা। "রমণীর জন্য আজ পর্যন্ত যে সব কর্ত্তব্য নির্ধারিত আছে তাহা সাধন করিতেও বুদ্ধির প্রয়োজন। অর্থ উপার্জ্জনের নিমিত্ত পুরুষদের যেমন মানসিক শিক্ষা (mental culture) আবশ্যক, গৃহস্থালীর জন্য গৃহিণীদেরও তদ্রূপ মানসিক শিক্ষা (mental Culture) প্রয়োজনীয়।" (তদেব, পৃ.- ৪১) এখানে এই 'সুগৃহিনী' প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি আরও একটি শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন যে, শিশুদেরকে কিভাবে বাড়ির কাজের লোকের প্রতি সদয় ব্যবহার আমরা শেখাব–"সচরাচর দেখা যায়, বড় ঘরের বালকেরা ভারী দাম্ভিক হয়, তাহারা চাকরকে নিতান্ত নগণ্য কি যেন মনে করে। বেতনভোগী হইলেই ভৃত্যবর্গ যে মানুষ এবং তা তাহাদেরও স্বীয় পদানুসারে মান অপমান জ্ঞান আছে, সুকুমার মতি শিশুদিগকে একথা বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। অনেক গৃহিণী নিজের পুত্র কন্যার দোষ বুঝেন না, তাঁহারা চাকরকেই অযথা শাসন করেন। ওরুপে শিশুকে প্রশ্রয় দেওয়া অন্যায়।" (তদেব, পৃ. ৪০) এর মাধ্যমে আমাদের বুঝাতে হবে আমাদের কর্তব্য হবে, আমাদের শেখাতে হবে যাতে আমাদের বালক বালিকারা সকলের প্রতি শ্রেষ্ঠ, শান্ত, বিনয়ী ব্যবহার প্রদর্শন করে।

তিনি আরও বলেছেন– "লুকাইয়া কিছু শুনা উচিত নহে, সাবধান!" (তদেব, পৃ. ৮৩)

রোকেয়া 'স্ত্রী জাতির অবনতি' প্রবন্ধে যে দূরারোগ্য ব্যধি গুলি যেমন পরনিন্দা এইসব না করে এবং বৃথা কান্নাকাটি বা তাসখেলায় সময় নষ্ট না করে সময়টিকে আনন্দের সঙ্গে কাটানোর জন্য তিনি পাঠক্রমে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী যেমন ছবি আঁকা, গান শেখার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। রোকেয়া তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে হাতের কাজকে একটা বিশেষ স্থান দিয়েছিলেন, এবং শিক্ষার্থীদের হাতের কাজগুলি নিয়ে পর্দার বাইরে আসার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেছেন। এভাবে তাদের হাতের কাজগুলি যদি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যায় তাহলে মেয়েরা সহজেই আত্মনির্ভরশীল এবং সাবলম্বী হতে পারবে।

তিনি বলেছেন “শিক্ষা মানসিক ও শারীরিক উভয় বিধ হওয়া চাই।” ‘শরীরে স্ফূর্তি না থাকলে মনেও স্ফুর্তি থাকে না’। তিনি আরও বলেছেন – “শুধু ঘুরা ফেরা করলেই ব্যায়াম হয় না। তুমি প্রতিদিন অন্তত আধঘন্টা দৌড়াদৌড়ি করিও।” (তদেব, পৃ. ১৮) এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি তিনি শারীরিক ভাবে পরিশ্রম করার কথা বলেছেন আর বলেছেন শারীরিক পরিশ্রম না করলে স্বাস্থ্য একেবারে মাটি হয়ে যাবে। তাই তিনি লাঠিখেলা, ঢেঁকির সাহায্যে ধানভানা, যাঁতার আটা প্রস্তুত করার কথা বলেছিলেন। বিশ শতকের প্রথম দশক থেকেই তিনি তাঁর বিদ্যালয়ে নিয়মিত ড্রিল করানোর ব্যবস্থাও করেছিলেন।

শিক্ষাদান পদ্ধতির ক্ষেত্রে বেগম রোকেয়া বাস্তববাদী ও প্রয়োগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করেছিলেন বলে মনে করা হয়। সাধারণত তিনি প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি ব্যবহারের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। ‘Sultana's Dream’- এ আমরা তার প্রমাণও পাই। তিনি ওইখানে তাঁর সঙ্গে যিনি ছিলেন তাঁকে ক্রমাগত প্রশ্ন করে গেছেন। রোকেয়া এক জায়গায় বলেছেন “আমি কাল মেঘমালা দেখিয়া ও দেখাইয়া প্রশ্ন করিব। তোমরা এখন আমাকে প্রশ্ন করিয়া বুঝিয়া লও।” (তদেব, পৃ. ৮৫) তার এই বক্তব্যে বাস্তববাদী দৃষ্টি ফুটে উঠেছিল। বাস্তববাদীরা প্রত্যক্ষ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষাদানের পক্ষপাতি। তাঁরা বেশি গুরুত্ব দেন বাস্তব বস্তু বা ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করে জ্ঞান লাভ করায়, নিষ্ক্রিয় পঠন পাঠনকে তাঁরা গুরুত্ব দেননি। রোকেয়া শিক্ষাদানের বা শিক্ষালাভ করার পদ্ধতি হিসেবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ, অনুসন্ধাণ, শ্রেনীকরণ, পরীক্ষণের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। পরীক্ষণ ছাড়া বিজ্ঞান শেখা সম্ভব নয়, তাই তিনি পরীক্ষণের মাধ্যমে বিজ্ঞান বিষয়গুলি শেখানোর কথা বলেছিলেন। এর ফলে শিক্ষার্থীরা আনন্দ সহকারে শিখতে পারে। ‘সৌরজগৎ’ এ আমরা দেখেছি তিনি ভ্রমনের মাধ্যমেও অল্প করে প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয় দেখিয়ে কিভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় তা তুলে ধরেছেন বিভিন্নভাবে। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা কেমন হবে বা শিক্ষকের আচরণ কেমন হবে এবং শিক্ষকের যোগ্যতা কেমন হবে সেটি একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়।

রোকেয়ার শিক্ষা ভাবনায় শিক্ষকের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। একজন শিক্ষকের ভূমিকা হবে আন্তরিকতা পূর্ণ। ‘সৌরজগৎ’ এ আমরা এর প্রমাণ পাই। ‘সৌরজগৎ’-এ কথক/শিক্ষক গওহর আলী তাঁহার

সপ্তম কন্যা সুরেয়া'র (বয়স ৬ বৎসর) নানা রকমের প্রশ্ন এবং শিক্ষককে বিরক্ত করবার পরও "পিতা (শিক্ষক) কিন্তু ইহাতে বিরক্ত না হইয়া বরং আমোদ বোধ করিয়া হাসিতেছেন।"(তদেব, পৃ. ৮০)

'সৌরজগৎ' এ রোকেয়ার লেখা---'হিমাদ্রিও ঠিক গওহরেরই (শিক্ষক/পিতা) মত সহিষ্ণু।' সুতরাং শিক্ষক হবেন সহিষ্ণু এবং হাসিখুশি। ধমক দিয়ে শিশুকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না, ভালবাসার দ্বারা তাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে শিক্ষককে প্রবেশ করতে হবে। তাঁর মতে শাস্তি বা ধমকের দ্বারা শিক্ষককে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। শিশুর বোঝবার সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের বুঝিয়ে বলতে পারলে তারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই শিক্ষায় আনন্দ লাভ করবে এবং আত্মশৃঙ্খলায় অভ্যস্ত হবে। ন্যায়সঙ্গত এবং মনোবিজ্ঞান সম্মত উপায়ে শিশুকে শাসন করবেন? অযথা শাষণ করবেন না।

রোকেয়ার মতে শিক্ষকের থাকবে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান (Versatile knowledge)। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জন্য তিনি প্রস্তুত থাকবেন। অযথা বিচলিত হবেন না। শিক্ষার্থীর মধ্যে যাতে কোনরূপ 'অহংবোধের' প্রকাশ না ঘটে সে বিষয়ে শিক্ষক সদা সতর্ক থাকবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে যে কোন ধরণের শিক্ষামূলক আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করবেন এবং সঠিক যুক্তি-তর্কের দ্বারা বিজয়ী হতে শেখাবেন। এছাড়াও রোকেয়া শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রকারের পুরস্কার দানের দ্বারা উৎসাহিত করার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে "বাগ্মিতা, বাক্‌চাতুর্য্য, বাক্‌চৌর্য্য, বাকযুদ্ধের" বিকাশের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। (তদেব, পৃ. ১০০)

শিক্ষার্থীর সামর্থ্য বিষয়ে বেগম রোকেয়ার বক্তব্য একবিংশ শতাব্দীতেও যে কোন শিক্ষাবিদকে গ্রহণ করতে বাধ্য করে। 'সৌরজগৎ' নামক প্রবন্ধে (মতিচূর, দ্বিতীয় খণ্ড) তিনি স্বীকার করেছেন, সূর্যের চতুর্দ্দিকে বিভিন্ন গ্রহ গুলি অবস্থান করে এবং প্রত্যেকে তাদের সময়মত সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। অর্থাৎ সমস্ত গ্রহ একই সময়কালের মধ্যে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে না। বাস্তবে শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিটি শিক্ষার্থী তার সামর্থ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী নিজের মতো করে শিক্ষা গ্রহণ করবে। 'সৌরজগৎ' এর গ্রহদের ন্যায় এটাই শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পার্থক্য বা স্বাধীনতা। আধুনিক মনোবিদরা একেই বলেছেন শিক্ষার্থীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য (Individual difference)।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই অনেক বৈষম্য থাকবে এমনকি তাদের মতামতের মধ্যেও Dissimilarity (বৈসাদৃশ্য) থাকবে। তিনি প্রকৃতি থেকে অনেক উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। (তদেব)

নারী শিক্ষা বিষয়ে তাঁর অভিমত– যেহেতু, "অবলাদেরও চক্ষুকর্ণ আছে, চিন্তাশক্তি আছে, উক্ত (স্বাধীন ভাবে মতামত প্রতিষ্ঠার এবং অপরের মতামত গ্রহণ করবার) শক্তি গুলির অণুশীলন যথা নিয়মে হওয়া উচিত। বাক্‌শক্তি কেবল আমাদের শিখান বুলি উচ্চারণ করিবার জন্য নহে।" (তদেব, পৃ. ১০১) তিনি আরো বলেছেন প্রতিটা মেয়েকে সেই শিক্ষা দিতে হবে যার দ্বারা তারা সত্য অর্থাৎ ঈশ্বরে লক্ষ্য রেখে, ঈশ্বরের উপর অটল বিশ্বাস রেখে নিজ নিজ কর্তব্য পথে চলে। সেই শিক্ষা মেয়েদের দিতে হবে যাতে সব অবস্থাতেই সত্যকে আঁকড়ে রেখে সত্যপথে চলে, কোন অবস্থাতেই মিথ্যাকে গ্রহণ না করে। কারণ সত্যভ্রষ্ট হলেই অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। (তদেব) পরবর্তীকাল মহাত্মা গান্ধীর লেখায় এবং বক্তব্যে এই একই কথা উঠে এসেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরণী সারদামায়ের কথাতেও রোকেয়ার বক্তব্যের প্রতিফলন দেখতে পাই। ভারতীর দর্শনেও বলা হয়েছে যে, "সত্যং ব্রুয়াৎ..."।

রোকেয়া আরও বলেছেন, মেয়েদের শিক্ষা এমন হবে যে তাদের মধ্যে ন্যায়পরায়নতা, কঠোরতা, কোমলতা এবং প্রেমের ন্যায় সদ্‌গুণগুলির বিকাশ ঘটবে। সত্য হবে স্বচ্ছ এবং সুনির্মল। সত্যে প্রতিষ্ঠিত নারী সমগ্র পরিবার এবং সমাজকে ঐক্যের পথে, ন্যায়ের পথে এবং প্রেমের পথে পরিচালিত করতে এবং প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হবে। (তদেব)

রোকেয়া যখন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন তখন শিক্ষাব্যবস্থা ছিল শিক্ষককেন্দ্রিক, কিন্তু রোকেয়ার এই 'সৌরজগৎ' প্রবন্ধটির দ্বারা আমরা বুঝতে পারি উনি শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদেরই প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলেছিলেন। অর্থাৎ শিক্ষাব্যবস্থা হবে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক।

শিক্ষার লক্ষ্য, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, পরিবেশ সম্পর্কে রোকেয়ার বক্তব্যগুলি পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে মানুষের মানসিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক, অর্থনৈতিক অর্থাৎ সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব– একমাত্র শিক্ষার দ্বারাই, এ সম্বন্ধে তাঁর কোন কুণ্ঠা ছিল না। তাই তিনি জোর গলায় বলেছেন— কোন প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত কিছু পাঠক্রম অনুসরণ

করে বা বই মুখস্থ করে যে ডিগ্রি লাভ করা হয় তা প্রকৃত শিক্ষার অর্থ বহন করে না। প্রকৃত শিক্ষা হবে বাস্তব কেন্দ্রিক, ইন্দ্রিয়গুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারা, সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানো এবং যা সত্য উদ্‌ঘাটন করতে প্রয়াসী হওয়া। যেহেতু ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত হয় সমাজ তাই ব্যক্তির উন্নয়নই সামাজিক উন্নয়নকে নিশ্চিত করতে পারবে এবং সমাজের সকল রকম বাধা পেরিয়ে একটি সভ্য সুন্দর সমাজ রচনা করা সম্ভব হবে।

রোকেয়ার লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধ গুলি পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে উনি ছিলেন একজন সমাজসেবী, সত্যদ্রষ্টা, মননশীল, সাহিত্যিক, প্রগতিশীল মানসিকতা সম্পন্ন শিক্ষাবিদ। বিংশ শতকের প্রথম ভাগেই তিনি শিক্ষা বিষয়ে যে বক্তব্য রেখেছেন সেই সব বক্তব্য আমরা একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও দেখতে পাচ্ছি তা কতটা মূল্যবান ও কতটা গ্রহণযোগ্য একটি সুন্দর প্রগতিশীল সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে।

৫.৫ শৃঙ্খলা সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার মতামত :

শৃঙ্খলা সম্পর্কে নিবেদিতার মতামত :

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতা আয়ারল্যান্ড দুহিতা ভগিনী নিবেদিতা প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থাকে গভীরভাবে অনুভব করেছেন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে শিক্ষা ভাবনার যা কিছু সুন্দর, নির্মল এবং পবিত্র– তার সম্মিলনে নারী শিক্ষাকে তাঁর বিদ্যালয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন। নিবেদিতার গুরু স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন বৈদান্তিক। তিনি বেদান্ত তথা ভাববাদকে যুগোপযোগী করে তৈরি করেছিলেন। তাঁরই শিষ্যা তথা উত্তরসূরি ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীর অন্তরের আহ্বানে ভারতবর্ষে আসেন মেয়েদের জন্য ভারতীয় ভাবে শিক্ষা দিতে। প্রাচীন ভারতে গুরুকুল ভিত্তিক এবং পরবর্তী যুগে বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় শৃঙ্খলার ধারণা নিবেদিতাকে প্রভাবিত করে। তাই শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রীদের মধ্যে শৃঙ্খলার বীজবপন করতে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। ছাত্রীদের শিক্ষাদান কালে শৃঙ্খলার প্রথম পাঠ হিসেবে নিবেদিতা বলতেন, “তোমরা সর্বদাই সোজা হয়ে বসবে;

নীচু হয়ে, কুঁজো হয়ে বা বেঁকে চুরে কখনো বসবে না।" (নিবেদিতা বিদ্যালয় শতবর্ষ স্মারক পত্রিকা, ১৮৯৮-১৯৯৮। পৃ. ৫০) ।

বোধ হয় নিবেদিতাই বাঙালী মেয়েদের প্রথম সোজা হয়ে মেরুদণ্ড খাড়া করে বসার পাঠ দেন। এই ঋজু বা সোজা হয়ে বসা ও দাঁড়ানোর ব্যাপ্তি বহুদূর – জীবনের সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সোজা ভাবে দাঁড়াতে না পারলে অন্যায় বাঁকাপথে প্রবেশ করবে জীবনকে নষ্ট করতে। এভাবেই তিনি প্রতিবাদ করবার শিক্ষা দিয়েছেন।

মেয়েদের শৃঙ্খলা বিষয়ে নিবেদিতা লিখেছেন "পুরাতন প্রথার মধ্যে নারীগণ কেবল শৃঙ্খলা নয়, জীবনের উদ্দেশ্য লাভ করিয়াছে।" (প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, আনন্দবাজার পত্রিকা, শতবর্ষ সংকলন, ২০২২। পৃ. ২২৩) সুতরাং প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় মেয়েদের মধ্যে যে সহজাত শৃঙ্খলার বোধ রয়েছে তাকে নিবেদিতা স্বীকার করেছেন।

নির্ঝরিণী সরকার স্বীকার করেছেন, নিবেদিতা সমস্ত ছাত্রীকে মাথা উঁচু করে বসবার এবং দাঁড়ানোর শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর কথায়... "নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় হতেই যে মেয়েদের এই [স্বাবলম্বণের শক্তি অর্জন] বলবৃদ্ধি ও আত্মচেতনা বিকাশের বীজ বপন প্রথম আরম্ভ হয়েছিল, তার আর ভুল নেই। দীর্ঘ চল্লিশ রছর আগে [এই রচনটির সময়কাল ১৯৪৮] আগে নিবেদিতা এই বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই বাগবাজার বোসপাড়ার মতো পুরাতন অখ্যাত পল্লীতে অল্পসংখ্যক মেয়ে নিয়ে অনাড়ম্বরভাবে স্কুল স্থাপনা করেছিলেন।" (নির্ঝরিণী সরকার রচনা সংগ্রহ, ১৯৯১। পৃ. ২০)

নিবেদিতার মতে শিক্ষার প্রথম এবং প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শিক্ষার্থীর অনুভুতিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া, তার পছন্দ এবং অপছন্দগুলিকে বিশেষ রূপ দেওয়া। নিবেদিতার মতে আমরা যতক্ষণ না শিশুর অনুভুতি এবং পছন্দ গুলিকে প্রশিক্ষিত করতে না পারছি ততক্ষণ শিশুর শিক্ষাদান সম্ভব। শিশুর বৌদ্ধিক ক্ষেত্রকে উদ্দীপিত করলে সে নিজের খাবার এবং কর্মসংস্থান করতে পারবে কারণ বুদ্ধি শুধুই একটি বাহ্যিক ধারণা। কিন্তু নিজের হৃদয়কে অপরের জন্য উন্মোচিত করতে পারবে না। শিশুর শৃঙ্খলার সম্বন্ধে নিবেদিতা স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। শিশুর শিক্ষা তথা শৃঙ্খলা সম্বন্ধে নিবেদিতা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পেস্তালৎসির দ্বারা অধিক প্রভাবিত

হয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন একজন শিশুর আর এক জন শিশুর প্রতি ভালোবাসা ও সহানুভূতির বিকাশকে বেশি মাত্রায় গুরুত্ব দিতে হবে। ছেলেমেয়েদের সম্পূর্ণ মুক্ত পরিবেশে উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পাঠদান করতে পারলে শিশু শৃঙ্খলা বিষয়ে সঠিক প্রশিক্ষণ লাভ করবে। স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলা একবার শিশুর মধ্যে জাগ্রত হলে তাকে আর বাইরে থেকে শৃঙ্খলার প্রশিক্ষণ দিতে হয়না।

শৃঙ্খলা সম্বন্ধে রোকেয়ার মতামত :

ছাত্রাবস্থায় শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন ভারত থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষাবিদ নিশ্চিত ভাবে স্বীকার করেছেন যে শৃঙ্খলা শিক্ষার্থীদের জীবনে অপরিহার্য। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিশিষ্ট নারীবাদী, সমাজসেবী এবং চিন্তাবিদ বেগম রোকেয়াও ছাত্রাবস্থায় শিক্ষার্থীদের জন্য শৃঙ্খলার গুরুত্বকে স্বীকার করেছেন। রোকেয়ার কথায়, "The period of studentship was a time for Vigorous discipline. Rigid rules were laid down for the conduct of the pupils including hygienic, moral and religious precepts and the regulation of good manners. Implicit obedience was expected and obtained from the student by the teacher and there were elaborate rules for the respect due to the latter." ('Educational Ideals for the Modern Indian Girl', রোকেয়া রচনাবলী, পৃ. ৪৯৩) সুতরাং রোকেয়া কড়া শৃঙ্খলার বিষয়ে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মত ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য শৃঙ্খলাকে জাগিয়ে তুলতে এবং প্রতিষ্ঠিত করতে দৃঢ় শৃঙ্খলা প্রয়োজন। ছাত্রাবস্থায় যারা নিয়মিত শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন করেন তারা বড় হয়েও শৃঙ্খলার মধ্যেই জীবন পরিচলনা করতে সমর্থ হবেন। যে সকল শিক্ষার্থী শৃঙ্খলার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতে সমর্থ হয় তাদের শারীরিক, মানসিক এব নৈতিক খেত্র গুলির বিকাশ ঘটে। প্রাচীন ভারতে শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক বিকাশের জন্য শৃঙ্খলার গুরুত্বকে রোকেয়া বিংশ শতাব্দীতেও সমান গুরুত্ব দিয়ে স্বীকার করেছেন। তাঁর কথায়, "Yet in this civilized and advanced generation we must acknowledge the Value of Indian methods." (রোকেয়া রচনাবলী, ২০০৬। তদেব) তিনি প্রাচীন ভারতে এবং বিংশ শতাব্দীতে শান্তিনিকেতনের উন্মুক্ত প্রান্তরে গাছের তলায় বসে শিক্ষালাভের গুরুত্বকে শ্রদ্ধার সাথে স্বীকার করেছেন। শারীরিক শৃখলা রক্ষার জন্য খেলা ধূলার প্রয়োজনীয়তা এবং নৈতিকতার বিকাশের জন্য মূল্যবোধের শিক্ষার উপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, খেলাধূলা এবং মূল্যবোধের নিরন্তর চর্চা প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে আধুনীক ভারতের শিক্ষার সরলরৈখিকরণকে স্বীকৃতি দেয়। তাঁর মতে, আমাদের প্রগতির ধীর গতিতে উন্নতির কারণ, "the Indian mind is slow to

accept innovation but that which is traditional and of proved utility finds ready favours.” (তদেব)

প্রাচীন ভারতে ছেলেমেয়েরা শরীর চর্চার জন্য সারাদিন বিভিন্ন ধরণের স্বাস্থ্যপ্রদ কাজ করত। নিয়মিত শরীরচর্চার ফলে তাদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলাবোধ জেগে উঠত। শিক্ষার্থীদের সুস্বাস্থ্য রক্ষায় এবং নৈতিক আচরণের প্রশিক্ষণে গুরু কঠোর নিয়মাবলী প্রয়োগ করতেন। প্রাচীন ভারতে শিক্ষা পদ্ধতির ধাঁচে বেগম রোকেয়া আদর্শ শিক্ষার একটি রূপরেখা ও নীতির প্রতিচিত্র রচনা করেন।

তথ্যসূত্রঃ

- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। ‘স্ত্রীজাতির অবনতি’, *রোকেয়া রচনাবলী।* বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃ. ১৮
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ. ১৯
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ.- ১২
- প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা (১৯৮৫)। *ভগিনী নিবেদিতা।* সিস্টার নিবেদিতা গার্লস্ স্কুল, বাগবাজার, কোলকাতা। পৃ. ২৩১
- প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা (১৯৮৫)। তদেব।
- প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা (১৯৮৫)। তদেব, পৃ. ১৩৫
- প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা (১৯৮৫)। তদেব, পৃ. ৩৩
- প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা (১৯৮৫)। তদেব, পৃ. ৪০১-৪০২
- নির্ঝরিনী সরকার (২০২২)। *ভগিনী নিবেদিতা ও তাঁহার বালিকা বিদ্যালয়।* আনন্দ বাজার পত্রিকা, শতবর্ষ সংকলন। পৃ. ১০৭
- নির্ঝরিনী সরকার (২০২২)। তদেব।
- নির্ঝরিনী সরকার (২০২২)। তদেব।
- নির্ঝরিনী সরকার (২০২২)। তদেব। পৃ. ১০৮
- নির্ঝরিনী সরকার (২০২২)। তদেব।
- নির্ঝরিনী সরকার (২০২২)। তদেব।
- নির্ঝরিনী সরকার (২০২২)। তদেব। পৃ. ১০৯
- নির্ঝরিনী সরকার (২০২২)। তদেব। পৃ. ১০৭
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। *রোকেয়া রচনাবলী।* বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃ. ২৭০

- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। *তদেব।* পৃ. ৪৫
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। *তদেব।* পৃ. ৪৪
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। *তদেব।* পৃ. ১৯
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। *তদেব।*
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। *তদেব।* পৃ. ১৯৯
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (১৯৮৪)। *তদেব।* পৃ. ২৭২
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। *তদেব।* পৃ. ১২
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। *তদেব।* পৃ. ২১
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। *তদেব।* পৃ. ২০
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। *তদেব।* পৃ. ৪১
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। *তদেব।* পৃ. ৪০
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। *তদেব।* পৃ. ৮৩
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। *তদেব।* পৃ. ১৮
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। *তদেব।* পৃ. ৮৫
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। *তদেব।* পৃ. ৮০
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। *তদেব।* পৃ. ১০০
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। *তদেব।*
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। *তদেব।* পৃ. ১০১
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। *তদেব।*
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। *তদেব।*
- নিবেদিতা বিদ্যালয় শতবর্ষ স্মারক পত্রিকা (১৯৯৮ নভেম্বর)। দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ৫০
- প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা (২০২২)। ভগিনী নিবেদিতার দৃষ্টিতে ভারতীয় নারী। আনন্দ বাজার পত্রিকা, শতবর্ষ সংকলন, প্রবন্ধ ও কবিতা। পৃ. ২২৩

- চিত্রা দেব (সম্পা।)(১৯৯১)। *নির্ঝরিণী সরকার রচনা সংগ্রহ*/ আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ২০
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। *রোকেয়া রচনাবলী*/ বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃ. ৪৯৩
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব।
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার সমাজ ভাবনা

৬.১	ভূমিকা
৬.২	ভগিনী নিবেদিতার সমাজ ভাবনা
৬.৩	বেগম রোকেয়ার সমাজ ভাবনা
৬.৪	দারিদ্র্য দূরীকরণে নিবেদিতা ও রোকেয়ার ভাবনা
৬.৪.১	দারিদ্র্য দূরীকরণে নিবেদিতার ভাবনা
৬.৪.২	দারিদ্র্য দূরীকরণে রোকেয়ার ভাবনা
৬.৫	সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার চিন্তা ভাবনার দূরদর্শিতা
	তথ্যসূত্র

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার সমাজ ভাবনা

৬.১ ভূমিকা :

আজকের সমাজ ব্যবস্থার বহুবিধ সমস্যার উৎপত্তি একদিনে হয়নি, যুগ যুগ ধরে সমাজ বিবর্তনের মাধ্যমে সত্যের উপলব্ধি থেকে ক্রমাগত বিচ্যুত হওয়ার ফল স্বরূপ হল এই সমস্যা গুলি– অসত্য, অনাচার, উঁচু-নিচু ভেদভাব, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, গোঁড়ামি, সাম্প্রদায়িকতা এবং দারিদ্র্য। সমাজে সাম্যবাদের কথা প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে সবসময় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তা মুষ্টিমেয় বেদজ্ঞ পণ্ডিতের কাছেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর এই বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা পরবর্তী সময়ে রাজতান্ত্রিক শাসনের প্রভাবে এবং স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে এটিকে বংশ পরম্পরায় পদমর্যাদা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। যার ফলস্বরূপ অযোগ্য, অজ্ঞানী মানুষও সেই পদমর্যাদা ভোগ করায় ধর্ম ও শাস্ত্রের নীতিগুলিকে নিজেদের আনুকূল্যে প্রয়োগ করতে করতে সবার অজান্তেই একটি চরম বৈষম্যময় সামাজিক পরিকাঠামো তৈরি হয় সম্পূর্ন ভ্রান্ত ধারনার উপর ভিত্তি করে। ইংরেজী শব্দ 'Socialism' কথাটির বিভিন্ন ভাবে পণ্ডিতরা ব্যাখ্যা করেছেন। 'Political Ideal' (Page -231) বইটিতে Bernard লিখেছেন --- 'Socialist ideal is a sentiment so obviously common to many who are not professed socialists and not in the programme of any socialist party'। সমাজের দুটি বিপরীতমুখী ক্রিয়া হল গঠনাত্মক এবং ধ্বংসাত্মক। একদিকে যেমন মালিক শ্রেণী শোষণ ও নিপীড়নকে অস্ত্র করে সমাজে একটি অসাম্য পরিস্থিতি উৎপন্ন করে। তেমনি অপরদিকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সবকিছুর উর্দ্ধে গিয়ে সমতা আনতে চায়। এরকমই একটি ধারণা আর. জি. গেটেল তাঁর Political Science (page - 401) - গ্রন্থে লিখেছেন "Instrument of production should be owned and operated and their products distributed by the organised community।"

পানিনির ব্যাকরণ মতে সমাজ শব্দের অর্থ করলে দাঁড়ায় 'জনসমূহ, মনুষ্যসংঘ, লোকসমূদয়'। অপরদিকে ইংরেজীতে Society শব্দটির অর্থ হল --- "Broad grouping of people having common traditions" (The Oxford English Dictionary.) প্রাচীন ভারতের ভাবনাও ছিল পুরোপুরি সাম্যবাদের পক্ষেই যা পরবর্তী সময়ে ক্রমশ লোপ পেয়ে যায়। আমাদের উপনিষদের শুরুর দিকেই মনুষ্যজাতিকে অমৃতের পুত্র হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যাতে বোঝা যায় যে সকল মানুষই সমান, কারোর উপর কারোর মালিকানা চলে না আর মানুষ হয়ে অপর মানুষের উপর অত্যাচার এ তো পশুত্বেরও অধম। মানুষের মধ্যে কেবল দয়া, পরহিত, সেবা ও মমতার সম্পর্কই বিদ্যমান থাকা উচিৎ। গীতায় বলা হয়েছে, যে কেবল নিজের স্বার্থের কথা ভাবে, নিজের উদর পূর্তিতেই ব্যস্ত সে আসলে পাপই খায়। "ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ।" (শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ৩/১৩) অপর একটি প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থ 'মনুসংহিতা' - তেও সাম্য ভাবনাকে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে দেশের অর্থনীতিকে সুস্থির রাখতে প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করা প্রয়োজন তবে অধিক মাত্রায় নয়। মনুসংহিতায় কোন রাজার নিজের রাজ্যের প্রজাদের শোষণ উৎপীড়ন করে কর সংগ্রহ করায় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। রাজ্যের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীক কর্মে রাজাকে কর দেওয়ার বিধি রয়েছে। (মনুসংহিতা, ৭ম অধ্যায়, ১৩৭ নং শ্লোক)। প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থাও গড়ে উঠেছিল সমতার উপর ভিত্তি করেই। সে সময় সমস্ত স্তরের মানুষের সমাজে সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার ছিল। স্কন্দপুরানের দ্বাদশ অধ্যায়ে দরিদ্র অসহায় মানুষের সুরক্ষার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া গবাদি পশু থেকে শুরু করে কীটপতঙ্গ পর্যন্ত সবারই সমান অধিকার ও সুরক্ষার প্রয়োজন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতমবুদ্ধ ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্য দেবও সমাজে সাম্যবাদের বাণী শুনিয়েছেন। ধর্মের পথে, সম্প্রদায় ও জাতির নামের উঁচু-নিচু এই ভাবনার ভিত্তিতে যে বিভেদের প্রাচীর ছিল তা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে দিয়ে এক নতুন সমাজের কথা বলেছেন। 'খালি পেটে ধর্ম হয়না'— শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথার মাধ্যমে প্রমাণিত যে দারিদ্র্য দূরীকরণ সবার আগে প্রয়োজন, তারপর শিক্ষার ও ধর্ম শাস্ত্রের চর্চা।

বর্তমান ভারতে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হল বর্ণবিদ্বেষ, জাতি-ধর্ম বিদ্বেষ। প্রাচীন ভারতে শূদ্রদের হাতে প্রস্তুত করা খাবার অন্যান্য জাতিগুলি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করত, এমনকি ব্রাহ্মণরাও। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যত

সময় গেছে রাজা সামন্তদের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণরা নিজেদের আধিপত্য অন্যান্য জাতিগুলির উপর কায়েম করেছেন। নিজেদের সুবিধামত 'উপনিষদ', ও পুরাণের কথাগুলিকে পরিবর্তন করে নিয়েছেন। মহাভারতে (সভাপর্ব, ৪, ২২৪-২২৫) যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন তখন খাবার প্রস্তুত করেছিল শূদ্ররা যা প্রমাণ করে যে প্রাচীন ভারতে জাতি বিভাজন ছিল কেবল কার্যের ভিত্তিতে। আর প্রত্যেক কার্যের সঙ্গে যুক্ত মানুষেরই সমান সম্মান ও মর্যাদা ছিল। বিশিষ্ঠ পণ্ডিত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ বলেছেন, "শূদ্রকে বেদ পাঠ হইতে নিবৃত্ত করার প্রয়োজন এই যে সমাজে যদি বেদ পাঠ করিলে সমস্ত অভাব মিটিয়া যাইত, মানুষের আহার্য পোশাক পরিচ্ছদ সমস্ত নির্বাহ হইত তাহা হইলে বেদ পাঠে কাহারও অনধিকার বলা হইত না, যে সকল কার্যের ভার শূদ্র জাতির উপর অর্পিত সে সকল কার্যও সমাজে অপরিহার্য, কাহাকেও না কাহাকেও করিতেই হইবে। এই জন্য কর্ম বিভাগ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই"। এছাড়া মনু সংহিতায় উল্লেখ পাওয়া যায় শূদ্র গুরুর কথা, অর্থাৎ সেই সময় কোন যোগ্য শূদ্রেরও বেদপাঠে অধিকার ছিল। অধ্যাপক এম. এন. শ্রীনিবাস লক্ষ্য করেছেন যে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় জাত পাতের উপর কোন বিশেষ বন্ধন ছিল না। যে সময় অপেক্ষাকৃত নিচু জাতির মানুষেরা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য নিরন্তর প্রয়াস করত। এই পদ্ধতিটিকে শ্রীনিবাস – 'Sanskritization' বলেছেন। তাঁর মতে "Sanskritization is the process by which a low hindu caste, or tribal or other group, changes its customs, ritual, ideology and way of life in the direction of a high, and frequently 'twice – born' caste."

স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত ভাবনার মূলে ছিল স্বাধীনতা। সমস্ত রাজনৈতিক, সামাজি্ শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন সময়ই রাজন্যবর্গের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন, সবাইকে মিলিত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। বিবেকানন্দের কথায় – "We see that the whole universe is working. For what?... For liberty; from the atom to the highest being, working for the one end, liberty for the mind, for the body, for the spirit. All are always trying to get freedom, flying away from bondage. The sun, the moon, the earth, the

plants are trying to fly away from bondage." (Complete Works of Swami Vivekananda, Karma- Yoga, vol- 1, P. 99)

সমাজ সম্পর্কে বিবেকানন্দের ধারণাটি হল যে- এটি একটি প্রাকৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রকৃতিগত ভাবেই মানুষ সমাজভুক্ত প্রাণী। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল এর ধারণাকে প্রাধান্য দিয়ে স্বামীজী বলেছেন মানুষ কেবল মাত্র একটি পরিবারভুক্ত ব্যক্তিত্ব নয়, সে একই সঙ্গে বৃহত্তর সমাজভুক্তও বটে। সমাজ সম্পর্কে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে বেদান্ত দর্শনকে ভিত্তি করেই। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সমাজের উদ্দেশ্য হল ঐক্যকে অনুভব করা। তাঁর কথায় "To move slowly towards the infinite whole."

সমাজ তথা রাষ্ট্র সম্বন্ধে বিশিষ্ট সমাজতন্ত্রী কার্ল মার্কস ও ভারতের প্রথম সমাজতন্ত্রী স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনার মধ্যে অনেক মিল পাওয়া যায়।

স্বামীজীর মতে সমাজে অনেকগুলি নির্দিষ্ট বিভাজন রয়েছে যা সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর জন্ম দিয়েছে। শ্রেণী ভিত্তিক বিভাজন, ধর্ম ভিত্তিক বিভাজন, ভাষা ভিত্তিক বিভাজন, বর্ণ ভিত্তিক বিভাজন, অর্থ-সম্পদ ভিত্তিক বিভাজন – এইগুলি মানুষে মানুষে বিভেদের সৃষ্টি করে। আর একটি বিভেদমুক্ত ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গড়ে তুলতে রাষ্ট্রের ধারণার প্রয়োজন যা সমস্ত বিভাজন, ব্যতিক্রম ও অসময়নতাকে এক সুত্রে গেঁথে রাখার জন্য শাসন প্রণালী প্রণয়ন করবে। এই প্রসঙ্গে মুখার্জী তাঁর 'The Philosophy of Man Making' গ্রন্থে লিখেছেন--- "According to the Marxists, cleavage arose owing to economic development resulting in the system of private property, and the state authority was brought to birth to safeguard properly relation under the cover of low. The state is thus an unethical institution, judged by the standard of social values, it is an unnecessary evil."

৬.২ ভগিনী নিবেদিতার সমাজ ভাবনাঃ

‘রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নিবেদিতা’ প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে তাঁর গুরুর মধ্যে ভারতবর্ষের সবকিছু বর্তমান—– সামাজিক চিত্র, অর্থনৈতিক ভিত, আধ্যাত্মিক চেতনা ও ধর্মীয় পরিকাঠামো। তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁর গুরুর নিরন্তর রক্তক্ষরণ দুঃখী, নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষদের মুক্তির কামনায়। স্বামীজীর কণ্ঠে তিনি শুনেছিলেন,----- “আমাদের সকল সংগ্রাম মুক্তির জন্য। আমরা সুখও চাইনা দুঃখও চাইনা– মুক্তি চাই”। বিবেকানন্দের স্বপ্নকে নিবেদিতা নিজের স্বপ্ন করেছিলেন। স্বামীজী INDIA শব্দটি যে আবেগের সঙ্গে উচ্চারণ করতেন তা তাঁর দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা, উদ্দীপ্ত শৌর্য এবং তীব্র আকাঙ্খা থেকে। স্বামীজীর INDIA শব্দের উচ্চারণে কি ছিল জানা নেই, সেই স্বর শুনে ভগিনী নিবেদিতা এবং সিস্টার ক্রিস্টিন ভারত প্রেমে পড়েছিলেন। সেই স্বরক্ষেপের মধ্যে ছিল কি অকুণ্ঠ ভালোবাসা, কি জ্বালাময়ী বাসনা, কি তীব্র আকাঙ্খা, কি অনন্ত পূজা, কি গভীর বিষাদ, কি উদীপ্ত শৌর্য এবং কি পবিত্র ভালবাসা– ভালবাসা এবং ভালবাসা। বিবেকানন্দের বজ্র বাণীতে এবং আঘাতে আঘাতে মার্গারেট নোব্‌ল তৈরী হলেন ভগিনী নিবেদিতাতে। বিবেকানন্দের আহ্বানে জেগে উঠলেন ভগিনী নিবেদিতা। বিবেকানন্দের কথার প্রতিধ্বনি নিবেদিতার কণ্ঠে। বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্ব থেকেই সমাজতন্ত্রের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় ঘটে। বিবেকানন্দের অগ্নিগর্ভ বাণীতে নিবেদিতা ক্রমশ হয়ে ওঠেন এক মহিয়সী নারীতে যিনি সর্বান্তকরণে ভারতভূমির জন্য নিবেদিত প্রাণ। এভাবেই মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল হয়ে ওঠেন ভারত দুহিতা, কন্যা, সেবিকা ও বান্ধবী, বিবেকানন্দের মানস কন্যা হয়ে উঠলেন ভারতদুহিতা।

বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার আগে থেকেই সমাজতন্ত্রের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় ঘটেছিল। ১৮৯৭ সালে যখন রামকৃষ্ণ মিশন দুঃস্থ ও দুর্গতদের মধ্যে সেবামূলক কাজ করতে চেয়েছেন, তখন নিবেদিতা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন যে এই সেবামূলক কাজ পৃথিবীর সমস্ত সমাজবাদীদের প্রশংসা আদায় করে নেবে। বিশেষ করে সমকালীন ইউরোপীয় শ্রমিক, কৃষকেরা মালিক শ্রেনির অত্যাচারের বিরুদ্ধে আক্রোশ গড়ে তুলছিল তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য।

স্বামীজীর কথার প্রতিধ্বনি নিবেদিতার ‘Democratic Feeling in England’ প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে নিবেদিতা লিখেছেন, “দরিদ্র যখন দরিদ্রতর হচ্ছে, ধনী সেখানে টাকার স্তুপ জমিয়ে যাচ্ছে আর এই দুই শ্রেণীর ব্যবধান ক্রমেই বর্ধিত আকারে মুখব্যাদান করেছে।” তিনি আরও বলেছেন, “বিশেষ অধিকারভোগী শ্রেণী দেশের পক্ষে পরগাছা, বিশেষ অধিকারভোগী দেশ পৃথিবীর পক্ষে পরগাছা...।”

যে জাতি তার সকল সন্তানের সুখকে কয়েকটি লোকের সুখসম্পদের কাছে উৎসর্গ করে দিয়েছে সে জাতি ইতিমধ্যেই মৃত্যুপথে পা বাড়িয়েছে।

সমাজ সম্পর্কে সচেতন নিবেদিতা চেয়েছিলেন প্রিন্স ক্রপট্‌কিনের ‘ফ্রেঞ্চ রিভোলিউশন’ বইটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বইটির উপর একটি পূর্ণমূল্যায়ন তৈরি করতে। যাতে সরকার শিক্ষার সম্প্রসারে সচেষ্ট হয়। রাশিয়াতে যেখানে বহুসংখ্যক ইঞ্জিনিয়ার, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষিত সমাজ, ভূতাত্বিক দরকার – সেখানে রাশিয়ার কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষার সংকোচন ঘটাবার জন্য সচেষ্ট। নিবেদিতা বোঝাতে চেয়েছেন ভারতবর্ষের মতো একটি এতবড় দেশেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষিত মানব সম্পদের প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন মিটছে না কারণ লর্ড কার্জনের ভ্রান্ত শিক্ষানীতি ভারতীয়দের জন্য শিক্ষার সংকোচন ঘটিয়েছে। নৈরাজ্য তত্ত্বের প্রবক্তা ক্রপট্‌কিন তাঁর লেখায় তুলে ধরেছেন রাশিয়ার তরুন সমাজ কিভাবে প্রতিবাদী হয়ে উঠছেন সেন্ট পিটারসবার্গ এর মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে। কারণ ওই সকল মন্ত্রীরা জোরপূর্বক তাদের ভাবনা চিন্তাগুলিকে রাশিয়ার সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তারা মুখে বলতেন আদর্শের কথা কিন্তু বাস্তবে তাঁরা বিপরীত কাজ করতেন। যার ফল স্বরূপ সাধারণ মানুষের দুর্দশা চরমে ওঠে। নিবেদিতা ওই তত্ত্বটিকে তুলে ধরার মাধ্যমে ভারতের শিক্ষিত সমাজকে আসন্ন রুশ বিপ্লবের ছবি দেখাতে চেয়েছিলেন।

নিবেদিতার আধুনিক পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন ফরাসি বিপ্লব এবং রুশ বিপ্লবের মতো ভারতেও বিপ্লব শুরু হোক। প্রয়োজনে রাশিয়ার বিপ্লবীদের ন্যায় আমাদের তরুণদেরও আঘাতের পথ ধরতে হবে। রুশ বিপ্লবীদের ন্যায় আমাদের তরুণদেরও ছড়িয়ে পড়তে হবে গ্রামে গঞ্জে, শিক্ষিত করতে হবে

সর্বসাধারণকে, বিপ্লবী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে আসমুদ্র হিমাচল কোটি কোটি ভারতবাসীকে, সমাজতন্ত্রের ভাবধারায় দীক্ষিত করতে হবে সমস্ত মানুষকে। নিবেদিতা চেয়েছিলেন ভারতবর্ষ থেকে ভূমিদাস প্রথার অবসান এবং জমিদারী প্রথার বিলোপ। নিবেদিতার মূল্যায়নে রাশিয়া এবং ভারত দুটি দেশেই গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যে ঐক্য রয়েছে। সেই কারণেই দুটি দেশের ক্ষেত্রেই প্রবল জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মুশকিল কিছু হবে না। নিবেদিতার মধ্যে পাশ্চাত্য থেকে তুলে আনা কোন সমাজতান্ত্রিক ভাবনা ভারতের ক্ষেত্রে কার্যকারী হবে না বরং ভারতভূমির প্রাচীন ঐতিহ্য ও সাম্যবাদের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক ভাবনার সংমিশ্রনেই এই কার্য সম্ভব। ভারতবর্ষে নিবেদিতার অবদান সম্পর্কে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ যে উক্তিটি ব্যক্ত করেছেন তা হল – "If the country was astir again and fast moving forward, it was entirely due to her ceaseless efforts; she urged, appealed, argued, cajoled or scolded, only to make the people feel confident, work hard and shape their destinies as they thought best, without waiting for others to shape Them from them." (Swami Lokeswarananda, ২০১৮। পৃ. ৩০৫)

নিবেদিতা কেবলমাত্র Socialist ভাবধারায় অনুপাণিত ছিলেন এমন নয়, তিনি একই সঙ্গে Socialist ছিলেন। তাঁর বিভিন্ন লেখায় এবং চিঠিতে তাঁর সমাজতন্ত্রী ভাবধারার অবকাশ লক্ষ্য করা যায়। যেমন, জমির উপরে কৃষকের অধিকার পবিত্র এবং সর্বাত্মক। তিনি লিখেছেন, আমাদের দেখতে হবে আগামী বহুশতাব্দী পর্যন্ত জমির উপরে কৃষকদের অধিকার যেন বলবৎ থাকে। কেবলমাত্র আর্থিক ক্ষমতার দ্বারা কেউ যেন জমির অধিকারকে জন্মগত অধিকার হিসেবে না ভাবে। তাঁর মতে শুধু ভারতবর্ষ নয় পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে এমনকি জেনিভাতেও তিনি লক্ষ্য করেছেন সমাজের একটি শ্রেণী প্রাসাদ-হোটেলে মখমলে মোড়া আসবাবে বসবাস করেন, আকণ্ঠ পান-ভোজনে নিয়োজিত থাকেন, শুধুমাত্র সংবাদপত্র পড়েন বাজারে টাকার ওঠানামা বোঝার জন্য। কিন্তু এরা পৃথিবীর সবচেয়ে গর্বিত মহৎবংশধারাকে চোখেও দেখেন না, কারণ তাঁরা ছোট মাপের কৃষক, আপসহীন দোকানদার বা সাধারণ শ্রমিকশ্রেণী। তাই নিবেদিতার মতে ইংল্যান্ডের যার বঞ্চিত, অবহেলিত, অত্যাচারিত – সেই সমস্ত কৃষক-শ্রমিক সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম' হিসাবে চিহ্নিত।

নিবেদিতা স্বচক্ষে দেখেছেন ইংল্যান্ড সেই সময়ে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে কারখানা অঞ্চলে। বানিজ্যের ওঠাপড়ায় নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে অগনিত মানুষের ভাগ্যের ওঠা পড়া, আর লন্ডন শহর বেকারে ভর্তি। বেকার যুবক যুবতীদের মুখে নৈরাশ্যের ছায়া। তাই সাধারণ মানুষ তখন ভিড় করতে শুরু করেছে সমাজতন্ত্রীদের চারপাশে, তারা সমাজতন্ত্রীদের কথা শুনতে চাইছে। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী নিবেদিতা তাই আশা প্রকাশ করেছেন যে ইংল্যান্ডে শীঘ্রই শুরু হবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং মানুষের কাছে ক্রমশ সুস্পষ্ট হবে সমাজতন্ত্রের প্রকৃতরূপ। কারণ নিবেদিতার মতে, দারিদ্র্য এবং নৈরাশ্য ইংল্যান্ডের সাধারণ মানুষকে ক্রমশ গ্রাস করেছে। তিনি অনুভব করেছিলেন যে সর্বহারাদের প্রতিটি প্রজন্ম ক্রমশ জাতীয় উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আরও দারিদ্র্য বরণ করতে এবং হতাশার গভীরে নিমজ্জিত হতে বাধ্য হচ্ছে। আর এই সামাজিক এবং অর্থনৈতিক হতাশা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে আসন্ন করে তুলছে। যে কোন ইন্ধন বারুদের স্তূপে অগ্নিসংযোগ ঘটাবে। তিনি র‍্যাটক্লিফকে চিঠিতে লিখেছিলেন যে– ইউরোপে যে কোন মুহূর্তে আগুন জ্বলে উঠতে পারে। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে এই আগুন জ্বলে ওঠা সহায়ক হবে। নিবেদিতার চিন্তায় শূদ্র শক্তির উত্থানের কথার উল্লেখ রয়েছে। (বিষ্ণুপদ নন্দ, ‘সমকালের প্রেক্ষিতে আলোর দ্যুতি নিবেদিতা’, যন্ত্রস্থ)।

১৯০৮ সালে অক্টোবর মাসে ভগিনী নিবেদিতা র‍্যাটক্লিফকে জানালেন যে ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু হতে আর বিশেষ দেরী নেই।

১৯০৮ চিঠির সত্যাসত্য ধরা পড়লো ১৯১১ সালে যখন বিশ্ব দেখল ইংল্যান্ডের মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং সংঘর্ষ।

১৯১০ সালের ৩১ শে আগস্ট নিবেদিতা দুটি চিঠি লিখলেন পাশ্চাত্যের দুই সমাজতান্ত্রিক র‍্যাটক্লিফ এবং ড. চেনীকে। র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন, “হ্যাঁ, ধর্মঘট! ফরাসি বিপ্লবের তুল্য কিছু শুরু হয়ে যাবে না কি?... শূদ্র জাগছে। শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলছে।... কি দেখবো আমরা? অপেক্ষা করে আছে কোন বস্তু? ঘটনার পট পরিবর্তন হতে বোধ হয় রাত্রিও কাটবে না।”

ড. চেনীকে লিখেছেন, "পাশ্চাত্য দেশ নবসৃষ্টির দ্বারপ্রান্তে। ভাবছি, তাহলে কি শূদ্র সমস্যা সম্বন্ধে স্বামীজীর ভবিষ্যৎবাণী সফল হবার পথে! জগৎ! জগৎ! পরিবর্তমান পৃথিবী! ঘটনার সর্পিল গতি – মানবাত্মা তার প্রত্যক্ষদর্শী।... তাহলে কি শূদ্র সমস্যা সম্বন্ধে স্বামীজীর ভবিষ্যৎবাণী সফল হবার পথে?" (তদেব)

১৯১১ সালের ৩১ শে আগস্ট ইংল্যান্ডের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেছেন যে সমাজতন্ত্রও শ্রেণীহীন সমাজ সৃষ্টির কথা বলে। তাই লিখেছেন, "তার বিরাট পেশী যথেচ্ছ চূর্ণ করছে। মধ্যবিত্তের স্বপ্নস্বর্গ ওই ধনী গৃহের দ্বারপথ দিয়ে দৃশ্যমান কোনকিছুকে তার বর্বর বল শ্রদ্ধা করতে বা অব্যাহতি দিতে প্রস্তুত নয়।" (তদেব) নিবেদিতা সরল বর্বরতা বলতে শূদ্রশক্তিকে বুঝিয়েছেন এবং ধনবানদের শক্তিতে দেখিয়েছেন পচনশীল বিকৃতিকে। ১৯১১ সালে ১৪ ই সেপ্টেম্বর নিবেদিতা র‍্যাটক্লিফকে লিখেছেন "ক্ষমতা ও সম্পদ এর চেয়ে বড় নরক আর কিছু নেই। দেহে রক্ত মাংসের কারাগারে আধ্যাত্মিক তমসার সেই নরক; তার তুলনায় ধর্মঘট, ক্ষুধা ও দুর্বলতার নরকও শ্রেয়।" (তদেব) ঐদিন র‍্যাটক্লিফকে আর একটি চিঠিতে লিখলেন, "শ্রমিকদের মধ্যে প্রচারক চাই – যাঁরা তাদের দৃষ্টির প্রসার ঘটাবেন, মানবতাবোধ তাদের মধ্যে জাগাবেন, মানবজাতির ঐক্যবোধের চেতনা তাদের মধ্যে আনবেন, পথ দেখাবেন আত্মোৎসর্গের। যদি এমন ঘটে, যদি বিশাল অধ্যাত্ম উৎস থেকে শক্তি আহরণ করা হয়, যদি ত্যাগধর্মী মানুষ সৃষ্টি করা যায়, তবেই তাদের মধ্যে পূর্ণ শক্তিমান নেতার জন্ম ঘটবে।" (তদেব)।

সুতরাং নিবেদিতা কেবলমাত্র কৃষক বা সাধারণ গরিব মানুষদের কথাই ভাবেননি, একই সঙ্গে চিন্তা করেছেন শ্রমিক শ্রেণীর কথাও। বিবেকানন্দের সাম্যবাদের ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করবার লক্ষ্যে নিবেদিতা কৃষক-শ্রমিক-শ্রমজীবীদের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে সামিল করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন যে সমাজতন্ত্র শ্রমজীবীদের যেমন ঐক্যবদ্ধ করবে তেমনি তাদেরকে আত্মোৎসর্গের জন্যও পথ দেখাবে। নিবেদিতা সমস্ত শ্রমজীবী কৃষকশ্রেণী ও বঞ্চিতদের স্বার্থের অনুকূলে কলম ধরেছেন এবং মানুষের মধ্যে বিদ্রোহের অগ্নিশিখাকে জ্বালাতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর মত ছিল সমস্ত ধরনের সংগ্রামী আন্দোলনের ভিত্তি হবে মানবতাবোধ। তিনি

মানুষের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন, তাদেরকে বের করে আনতে চেয়েছেন বর্তমান অবস্থা থেকে, প্রয়োজনে ধর্মকেও এ কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছেন।

নিবেদিতা 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় ক্রপট্কিনের নৈরাজ্যতত্ত্বকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং সেই প্রসঙ্গে রাশিয়ার ন্যায় ভারতেও তরুণ বিপ্লবীরা অগ্রজ ও বয়স্কদের সহায়তা থেকে বঞ্চিত হবেন জেনেও তরুন সমাজকে বিপ্লবের পথে অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি চেয়েছেন ভারতের বিপ্লবীরাও রাশিয়ার বিপ্লবীদের ন্যায় পথে-প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়বে গ্রামে-গঞ্জে, শিক্ষিত করতে হবে সর্বসাধারণকে, বিপ্লবী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে আসমুদ্র হিমাচল কোটি কোটি ভারতবাসীকে, সমাজতন্ত্রের ভাবধারায় দীক্ষিত করতে হবে সমস্ত মানুষকে এবং সর্বোপরি ভারতবর্ষ থেকে ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ ঘটাতে হবে ও জমিদারী শাসনের অবসান আনতে হবে। 'লোকমাতা নিবেদিতা' (তৃতীয় খন্ড) তে শঙ্করীপ্রসাদ বসু বলেছেন নিবেদিতা সমাজতন্ত্র বিষয়ে ক্রপট্কিনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। (পৃ. ২৪৮-২৪৯) ক্রপট্কিন নিবেদিতাকে প্রভাবিত করেছেন সাক্ষাৎকারকালে শেষের কয়েকটি উক্তিতে – "স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে? স্বাধীনতা কখনও দেওয়া হয় না। স্বাধীনতা সর্বদাই কেড়ে নেওয়া হয়।... সাহস বন্ধু, সাহস। জেনো, কোনভাবেই স্বাধীনতাকে দীর্ঘকাল আটকে রাখা যায় না।" (তদেব)

নিবেদিতা তাঁর বিভিন্ন লেখায় এবং বক্তব্যের মধ্যে স্বীকার করেছেন যে ভারতের সাম্যবাদকে অস্বীকার করে সমাজতাত্ত্বিক ধারণার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ কখনোই সম্ভব নয়। পাশ্চাত্য থেকে তুলে নিয়ে আসা কোন ধারণা ভারতবর্ষে কার্যকরী হবে না, তার রূপের মধ্যে যতই জৌলুষ এবং চাকচিক্য থাক না কেন। নিবেদিতার সমস্ত স্বপ্ন, সমস্ত চিন্তনের বিষয়বস্তু ছিল ভারতবর্ষ। তাঁর সাধনা ছিল জগতের সম্মুখে ভারতবর্ষকে পরিচিত করানো এবং ভারতের মর্মবাণীকে ভারতবাসীর হৃদয়ঙ্গম করানো।

৬.৩ বেগম রোকেয়ার সমাজ ভাবনা :

বেগম রোকেয়া যে সময় বঙ্গভুমিতে জন্ম নেন, সে সময়ে ভারতবর্ষ ছিল ব্রিটিশ সরকারের তত্ত্বাবধানে। ঔপনিবেশিক শাসনের কড়া শোষণ নীতিতে সমাজ নামক প্রতিষ্ঠানটি একেবারেই বিদ্ধস্ত। সমাজের প্রতিটি স্তম্ভ ঔপনিবেশিক মানসিকতার শিকার হয়েছিল। কালক্রমে যেটুকু সমাজ সংস্কারের প্রয়োজন ছিল তা ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা বিন্দুমাত্র হয়নি। অপরদিকে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট বঙ্গবাসীর অগ্রগতির অনুকূলে ছিল না। তার উপর মুসলমান সমাজের রক্ষণশীলতা মেয়েদের সমাজ জীবনের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, সকলের দৃষ্টির অগোচরে। আর পুরুষজাতি নিজেদের উন্নতির কথা ভাবতে ভাবতে একসময় দেখে যে তারা একা হয়ে পড়েছে, সঙ্গ দেওয়ার জন্য কেউ নেই। তখনই তাদের নজর পড়ে নারী জাতির উপর– হিন্দু – মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নারী শিক্ষার অগ্রগতি সে সময়ে প্রায় রুদ্ধ ছিল। হিন্দু নারী শিক্ষার জন্য সচেষ্ট হলেও মুসলমান সম্প্রদায় তখনও এ ব্যাপারে বিশেষ কোন ইতিবাচক ভাবনা গ্রহণ করেনি।

একথা—'Mohamedan Education in Bengal' শীর্ষক প্রবন্ধে Abdul Latif এর কথায় প্রতিফলিত হয়েছে। কলকাতা মাদ্রাসার মৌলবী আব্দুল হাকিমের মত ছিল, ধর্মীয় কারণে মেয়েদের পর্দানসীন রাখতে হবে এবং ধর্মীয় আচরণ বিধি মানতে হবে-----সুতরাং মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় পাঠানো হবে না। এমনকি মুসলমান আধুনিকতার জনক স্যার সৈয়দ আহমেদ খাঁও মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় বিভিন্ন বাঙালী মুসলিম নারীরা এই সময়ে নিয়মিত লিখতেন। এই পত্রিকাটি বাঙালী মুসলিম নারী সমাজের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে বেশ ভালোরকম ভূমিকা নিয়েছিল। এছাড়াও অন্যান্য পত্রিকাগুলি হল 'নবনূর' (১৮০৩-১৯০৭), 'দি মুসলমান' (১৯০৬-১৯৩৬), 'কোহিনূর' (১৯১১), 'সওগাত' (১৯১৮–১৯৪৬), প্রভৃতি।

একদিকে নারী শিক্ষাকে সমর্থন এবং অন্যদিকে পর্দা প্রথার মতো অন্যান্য সামাজিক কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে গর্জে উঠে তৎকালীন শিক্ষিত মুসলমান ব্যক্তিত্বরা। যে সব ব্যক্তি নারী শিক্ষা তথা মুসলমান মেয়েদের সামাজিক উন্নয়নের স্বপক্ষে একই সঙ্গে সোচ্চার হয়েছিলেন তাঁরা হলেন বেগম রোকেয়া, জোবেদা খাতুন, মিসেস এম. রহমান, খায়রুন্নেসা, করিমুন্নেসা, সহিফা বানু, সুফিয়া কামাল, শামসুন্নাহার মামুদ, ফজিলাতুন্নেসা প্রমুখ। এছাড়াও

আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমির আলি, জালালাবাদী, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজি, এস. ওয়াজেদ আলি, মীর মোশারফ হোসেন, ড. মহম্মদ শহিদুল্লা, কাজী ইমদাদুল হক, হুমায়ূন কবীর চৌধুরী প্রমুখ শিক্ষিত সমাজ সংস্কারকদের নাম উল্লেখযোগ্য।

অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে শুধু ভারতবর্ষ নয় ইউরোপের দেশগুলিতেও নারী শিক্ষার প্রায় কোন সুযোগই ছিল না। ১৮৭০ সাল নাগাদ কোন কোন দেশে নারী শিক্ষার প্রচলন হলেও তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মেয়েদের গৃহকর্মে নিপুণ করে তোলা এবং সন্তান প্রতিপালনে সমর্থ করে তোলা। ফরাসি বিপ্লবের কালে রুশো তাঁর 'Emile' (১৭৬২) গ্রন্থে লিখেছেন "পুরুষের সম্পর্কের নিরিখেই নারীকে শিক্ষা দেওয়া দরকার-- পুরুষকে খুশি করার জন্য, তার কাজে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য, তাদের দ্বারা সম্মানিত হওয়ার জন্য, ভালোবাসা পাওয়ার জন্য, শৈশবে তাদের প্রতিপালন করার জন্য, কৈশরের যত্ন নেওয়ার জন্য, তাদের পরামর্শ দেওয়ার জন্য, সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য, জীবনকে সুন্দর ও সহনীয় করে তোলার জন্য।"

অপরদিকে এঙ্গেলস লেখেন---"মাতৃস্বত্ত্ব যেদিন পারাভূত হয় সেদিনই পৃথিবীর ইতিহাসে নারীর পরাজয় ঘটে। গৃহের কর্তৃত্বও পুরুষের হাতে চলে যায়; নারীর মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় এবং নারীর দাসত্বের সূচনা হয়।" (দাশগুপ্ত, ২০০৬)। উদারনৈতিক নারীবাদী গ্রিম সারা নারী জাতির স্বপক্ষে মতামত দিতে গিয়ে বলেছেন, পুরুষের সমান অধিকার প্রপ্তিই নারীদের জন্য যথেষ্ট নয়। নারীর অবস্থার উন্নতির জন্য প্রয়োজন সামাজিক পরিবর্তন। নারীদের শিক্ষিত করার মাধ্যমে তাদের বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটালে তারা স্বাধীনতা অর্জনের পথ খুঁজে নেবে।

কোন কোন সমাজবাদী নারীদের ভোটাধিকারের কথাও বলেছেন যাতে তারা রাজনৈতিক ভাবে সমান অধিকারী হয়। সুসান. বি. অ্যান্টনিও বলেছেন--- ভোটাধিকার নারীর উপর পুরুষের প্রভুত্ব এবং পারিবারিক এলাকার মধ্যে নারীর দাসত্বের অবসান ঘটাবে। বেগম রোকেয়া হতাশার সঙ্গে বলেছেন,---"In India almost all the doors to wealth, health and wisdom are shut against muslims on the plea of inefficiency." (Rokeya Rachanaboli, 2006. P. 491)

উক্ত সময়ে গোঁড়ামী ও ভ্রান্ত ধারনা হিন্দু ধর্মের মানুষদের মধ্যেও সমান মাত্রায় ছিল যা বেগম রোকেয়া তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন। শাস্ত্রজ্ঞ হিন্দুরাও তাঁদের মেয়েদের শিক্ষিত করার পরিবর্তে অল্পবয়সে বিবাহের আয়োজন করত–"It is an irony of fate that the Hindus who are bound by their cartload of Shastras to treat women like slaves and cattle and to get their daughters married before they are hardly above their girlhood, i.e. within ten years of age..." (তদেব)

বিংশ শতকের প্রথম দিকে বঙ্গভূমির মুসলমান সমাজের মধ্যে বাংলা ভাষা থেকে উর্দু ও আরবি ভাষার উপর বেশি জোর দেওয়া হত। এছাড়া উল্লেখযোগ্য যে সে সময় কলকাতার বুকে বাংলা মাধ্যমে পড়াশুনার জন্য মুসলমান মেয়েদের কোন বিদ্যালয় ছিল না। রোকেয়া ভীষণভাবে মুসলমান মেয়েদের জন্য একটি বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয় চেয়েছিলেন, সেই উদ্দেশ্যে তিনি 'দি মুসলমান' নামক দৈনিক পত্রিকায় শেখ মুজিবর রহমানের উদ্দেশ্যে একটি সম্পাদকীয় চিঠি লেখেন যেখানে উল্লেখ করেন, "What I regret is that in the capital of a presidency inhabited by an overwhelming majority of Bengali - speaking people, there is not a single institution for mussalman girls where education is imparted through medium of Bengali. If any separate school for Bengali speaking mussalman girls be needed it ought to be started without delay." (Letter to Mujibar Rahaman; R.S. Hossain, 'The Musalman', Nov 30, 1917) (তদেব। পৃ. ৫২০)

বেগম রোকেয়া যে সময় তাঁর সমাজ কল্যাণ কার্যক্রম শুরু করেন, সেটি একেবারে অনুর্বর ভারতভূমি ছিল না। নানাবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তাঁর কর্ম পন্থাকে অনেকটা রসদ জুগিয়েছিল পূর্ববর্তী সমাজ কর্মীদের নিরলস কর্ম প্রচেষ্টা। ১৮২৪ সাল নাগাদ বিভিন্ন খ্রিস্টান মিশনারী সংস্থা কলকাতা, চুঁচুড়া, বর্ধমান, ঢাকা, চট্টগ্রামে ৭১ টি নারী শিক্ষা বিদ্যালয় স্থাপন করেন যেখানে প্রায় ১২৭০ জন ছেলে মেয়ে পড়াশুনা করত ('সমাচার দর্পণ')। সনাতন শিক্ষা ব্যবস্থায় যেখানে লেখাপড়ার কোন সুযোগ ছিল না, সেখানে খ্রিস্টান মিশনারীদের দ্বারা বিদ্যালয়, পাঠক্রম, পরীক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে মূল্যায়নের ব্যবস্থা হয়। নারী শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 'হিবারানিয়ান অক্সিলারি সোসাইটি'র রিপোর্ট হল– "স্ত্রী শিক্ষা কেবল কলকাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। সমগ্র

মহাদেশে এর নিশ্চয় ব্যাপ্তি ঘটবে। সমগ্র দেশে জ্ঞানের আলো ও সংবাদ প্রচারের কেন্দ্র হবে এই কলকাতা, তখন হিন্দু মহিলারা সমাজে প্রভাব বিস্তার করে সামাজিক পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে।... শিক্ষার দ্বারা জ্ঞানের আলো প্রাপ্ত হয়ে কুসংস্কারকে দূর করতে সচেষ্ট হবে"। (মল্লিকা ব্যানার্জী, ২০১৪। পৃ. ৫১)

ভারতে মোট জনসংখ্যা এবং তাদের জীবন যাপন কতকাংশে নির্ভর করে দেশের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক রীতিনীতির উপর। দারিদ্র্যের জন্ম হয় এই রকম বিশেষ সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে। ভারত একটি নানা জাতি, নানা ধর্মের দেশ– সুতরাং সাধারণ ভাবেই সমাজের অনেকগুলি স্তর তৈরি হয়। আর সমস্ত স্তরের সাধারণ মানুষের কাছে সরকার কর্তৃক প্রণীত প্রকল্পের আর্থিক সাহায্য পৌঁছায় না। ফলস্বরূপ কিছু স্তরের মানুষ সহায়হীন হয়ে দরিদ্র মানুষে পরিণত হন। রোকেয়ার মতে ধর্মীয় গোঁড়ামি যে কোন মানুষকে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বেঁধে রাখে। অর্থ উপার্জনের জন্য বিশ্বের দরবারে সাধারণ মানুষ নিজেকে তুলে ধরেনা। ফলে ধারাবাহিক ভাবে এই দারিদ্র্য চলতেই থাকে কোন পরিবার, সমাজ ও কোন একটি নির্দিষ্ট শ্রেনির মানুষের জীবনে।

একবিংশ শতাব্দীতে এসেও মেয়েরা এখনও দাসী থেকে গেছে। মেয়েদের এটাই হল চরম দুর্দশা। রোকেয়া তাঁর 'স্ত্রী জাতির অবনতি' প্রবন্ধে বলেছেন, "আদিম কালের অবস্থা কেহই জানে না বটে, তবু মনে হয় যে পুরাকালে যখন সভ্যতা ছিলনা কোন অজ্ঞাত কারণ বশত মানব জাতির এক অংশ (নর) যেমন ক্রমে নানা বিষয়ে উন্নতি করিতে লাগিল, অপর অংশ (নারী) তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেরূপ উন্নতি করিতে পারিলনা বলিয়া পুরুষের সহচরী বা সহধর্মিনী না হইয়া দাসী হইয়া পড়িল।" (রোকেয়া রচনাবলী, ২০০৬। পৃ. ১১-১২)

সম্ভবত সুযোগের অভাবই নারী জাতির দাসী হওয়ার প্রধাণ কারণ। স্ত্রী জাতি সুবিধা না পেয়ে সংসারের সকল প্রকার কাজ থেকে অবসর নিয়েছে এবং এদের এই অক্ষম ও অকর্মন্যতা ও অলসতা দেখে পুরুষ জাতি এদের সাহায্য করতে আরম্ভ করল। ক্রমে নারীরা যতই সাহায্য পেতে শুরু করল পুরুষের থেকে, নারীরা ততই অকর্মন্য হতে লাগল। এদেশের ভিক্ষুকদের সহিত আমাদের বেশ তুলনা হতে পারে। ভিক্ষুকরা যেমন ভিক্ষা গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ভিক্ষুকরা তার ফলে নিজেদেরকে অকর্মন্য করে তোলে এবং অলসে পরিণত হয়, দিনের পর দিন তাদের কাজের প্রতি অনিহা দেখা দেয়– ঠিক তেমনি নারী জাতি পুরুষের দ্বারা ভিক্ষা গ্রহণ করতে করতে

নিজেকে অকর্মন্য করে তুলেছে এবং এই অকর্মন্যতা তাদেরকে দুর্বল করে তোলায় তাদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হয় যা তাদের মধ্যে একটি স্বভাবগত কারণে পরিনত হয়। নিজেকে পুরুষ জাতির তুলনায় নিকৃষ্ট ভাবার কারণেই সর্বস্তরে অর্থাৎ তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক সুবিধা এবং রাজনৈতিক আধিপত্য সবথেকে বঞ্চিত হয়। আর দীর্ঘ সময় ধরে সমাজের একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ অকেজো হয়ে থাকায় সমাজ সভ্যতা নারী জাতির থেকে প্রাপ্য উপহার থেকে বঞ্চিত হয় যা এখন সমাজ–সভ্যতা-রাষ্ট্র নামক এখন প্রতিষ্ঠানকে ক্রমশ দুর্বল করে তোলে, যার এক অন্যতম বাহ্যিক প্রকাশ হল দারিদ্র্য। আর এই অসামঞ্জস্যতার কারণে দারিদ্র্য এখনও চরম শিখরে। নারীরা যেদিন সকল প্রকার ভয় থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন ভাবে কাজ করবে, অন্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজেই নিজের জীবন অতিবাহিত করার ক্ষমতাটুকু অর্জন করবে সেই দিন এই দারিদ্র্য থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব হবে।

বেগম রোকেয়া মুসলমান সমাজের বিভিন্ন সমস্যার দিকে মুসলমান সমাজকে দৃষ্টি দিতে বলেছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মুসলমান পুরুষরা কথায় কথায় ‘তালাক’ দিতেন। ফলে ওই সমস্ত মেয়েরা স্বামীর ঘরে এমনকি বাবার ঘরেও স্থান না পেয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভিক্ষাজীবীতে পরিণত হতেন। অশিক্ষিতা মুসলমান মেয়েরা নিজেদের সুন্দর ধর্ম, সুন্দর সামাজিক আচার প্রথা বিসর্জন দিয়ে এক অদ্ভুত রকমের জানোয়ার সাজতেন। (তদেব, পৃ. ২৪৯)

‘ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম’ প্রবন্ধে রোকেয়া দেখিয়েছেন উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে মুসলমান নারী পুরুষ নিজে ধর্মকে ত্যাগ করে পরের ধর্মকে গ্রহণ করছেন। রোকেয়ার অন্যতম জীবনীকার শামসুননাহার ‘রোকেয়া জীবনী’ তে লিখেছেন, “ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অশিক্ষা ও কুসংস্কারের ভিতর দিয়া আসিয়াছিল জাতির সবচেয়ে বড় অকল্যাণ। ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা ভুলিয়া হৃতসর্বস্ব মুসলমান সেদিন হাবুডুবু খাইতেছিল কুসংস্কার আর গোড়ামির পাঁকে।” (রোকেয়া জীবনী, শামসুননাহার, পৃ. ২২)

রোকেয়ার মতে উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে মুসলমান সমাজ নানাবিধ কুসংস্কারের জালে জড়িয়ে পড়ে। ইসলামের মূল আদর্শ সাম্যবাদ ও ভাতৃত্বের নীতি থেকে ভারতীয় মুসলিম তথা বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায় অনেক দূরে সরে

গিয়েছিল। ধর্মীয় অনুশাসন গুলিকে বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হত। মুসলমান সমাজের মধ্যে সত্যিকারের সাহসী সংস্কারকের অভাব ছিল প্রকট। তাই রোকেয়াকে সমাজসংস্কারকের ভূমিকাতেও দাঁড়াতে হয়। 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে রোকেয়া স্বীকার করেছেন যে উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে মুসলমান মেয়েদের মন দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে না। তারা বাস্তবকে বুঝতে এবং গ্রহণ করতে অসমর্থ। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা পেলে মুসলমান মেয়েরা পুরুষের প্রাধান্য না মেনেও স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারবেন, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অনুশীলনের কৃতিত্ব দেখাতে পারবেন, এমনকি বিদেশী আক্রমণ থেকে স্বদেশকে রক্ষা করতে পারবেন। 'Sultana's Dream' নামক লেখায় এই কথাই রোকেয়া স্পষ্ট করে জানিয়েছেন।

তিনি চেয়েছিলেন মুসলমান নারী পুরুষ এমনকি হিন্দু নারীরাও যাতে সমস্ত রকমের নির্যাতন, নিষ্পেষণ ও শোষণের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হতে পারেন। অধ্যাপক মওলানা মনিরুজ্জামান ফরিদী 'নারী আন্দোলন ও বেগম রোকেয়া' প্রবন্ধে জানিয়েছেন যে, রোকেয়া চেয়েছিলেন রক্ষণশীলতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা ও পশ্চাৎমুখীতা গ্রাসে আবদ্ধ থাকা মুসলমান সমাজ যেন উঠে দাঁড়ায়। তিনি আরো বলেছেন, "Islam also teaches that male and female are equally bound to say their daily prayers five times, and so on." ('God Gives, Man Robs', দি মুসলমান পত্রিকায় রোকেয়া প্রসঙ্গ। পৃ. ২৩)

বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে রোকেয়া হিন্দু এবং ইসলাম ধর্মের ফারাককে খুব স্পষ্ট করে প্রকাশ করেছেন। তিনি 'রানী ভিখারিণী' প্রবন্ধে বলেন যে, "হিন্দু স্ত্রীকে মৃত স্বামীর সহিত পোড়াইয়া মারিবার ব্যবস্থা আছে। বিধবা গণ এমন সহমৃতা না হইলেও জীবন্মৃতা হইয়া থাকে। তাহাদের (হিন্দুদের) গাড়ি-বোঝাই শাস্ত্রের ব্যবস্থা এই যে, বিধবা শুধু দ্বিতীয়বার বিবাহ হইতে বিরত থাকিলেই চলিবে না। নারীর উচিত যে, স্বামীর মৃত্যুর পর সর্বপ্রকার সুখাদ্য ত্যাগ করিয়া মাত্র ফল-মূল খাইয়া কোনরূপে বাঁচিয়া থাকে।" কিন্তু ইসলাম নারীকে পুনর্বিবাহের অনুমতি দিয়াছে, বিধবার প্রতি কোন অত্যাচার নাই; তাহার বসন, ভূষণ, আহার সম্বন্ধে কোন বাঁধা নিয়ম নাই।.. হিন্দুগণ প্রাণপণে বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করিতেছেন। আর আমাদের তথাকথিত আশরাফগণ সপ্তম বর্ষীয়া বিধবা কন্যাকে চির-বিধবা রাখিয়া গৌরব বোধ করেন।" (রোকেয়া রচনাবলী, ২০০৬। পৃ. ২৯০-২৯১)

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বেগম রোকেয়া 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' নামক এক মুসলিম মহিলা সমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম মেয়েদের নীতিশিক্ষা, ধর্মশিক্ষা, চরিত্র গঠন প্রভৃতি বিষয়ে অধিক মনোযোগ দান করা। বালিকা দিগকে অতি উচ্চ আদর্শের সুকন্যা, সুগৃহিণী ও সুমাতা হইতে এবং দেশ ও ধর্মকে প্রাণের অধিক ভালবাসিতে শিক্ষা দেওয়া হত। (তদেব, পৃ. ৩২৯) তিনি দরিদ্র পরিত্যক্তা পথকন্যাদের কল্যাণের জন্য এবং পতিতাদের পুনর্বাসনের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'নারী তীর্থ' নামক প্রতিষ্ঠান। ('পথে প্রান্তরে', দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা, ১৩.১২.১৯৯৮)

রোকেয়া বাল্যবিবাহের চূড়ান্ত বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। 'Sultana's Dream' নামক পুস্তিকায় তিনি বাল্যবিবাহ এবং পণপ্রথা অবসানের জন্য দাবি জানিয়েছেন। একুশ বৎসর বয়সের পূর্বে কোন কন্যার যাতে বিবাহ না হয় সেজন্য তিনি আইন প্রণয়ন করতে অনুরোধ করেন। 'রানী ভিখারিণী' প্রবন্ধে তিনি জানিয়েছেন যে, ইসলাম ধর্ম স্ত্রীলোককে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। মুসলমান সমাজে স্বেচ্ছাকৃত সম্মতি ছাড়া কোন নারীর বিয়ে হতে পারে না। অর্থাৎ মুসলমান সমাজে পরোক্ষভাবে বাল্যবিবাহ রহিত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবটি যে ভিন্ন তা রোকেয়া 'God Gives, Man Robes' নামক নিবন্ধে লিখেছেন "Many a time a bride bitterly bewails her fate on being compelled to marry a bridegroom whom she knows to be a drunkard or an old man of sixty, but the marriage celebration proceeds despite her silent protest. And so-called respectable families in our society take pride in preventing widow-marriage, no matter whether the widow be a girl of thirteen or a child of seven years of age!" (রোকেয়া রচনাবলী, ২০০৬। পৃ. ৪৯১)

রোকেয়া মুসলমান সমাজে অন্যায় পথে বিবাহ বিচ্ছেদ বা তিন তালাক প্রথার বিরোধিতা করেছেন। কারণ যেহেতু মুসলমান সমাজে ইসলাম ধর্মমতে বিবাহ সম্পূর্ণ হয়–পাত্র-পাত্রীর সম্মতির দ্বারা তাই বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক ও উভয়ের সম্মতিক্রমে হওয়া উচিত। কিন্তু এক পক্ষে কেবল স্বামী বহুলোকের সামনে স্ত্রীকে রেখে বা স্ত্রীকে শুনিয়ে তিন তালাক উচ্চারণ করেন–

“আয়েন তালাক বায়েন তালাক,
তালাক তালাক, তিন তালাক,
আজ জরুরে দিলাম তালাক।”

‘পদ্মরাগ’ উপন্যাসে তিনি অকারণ তালাকের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের জন্য প্রস্তাব পেশ করেছেন। (তদেব, পৃ. ৩৯১) আবার ‘নারীর অধিকার’ প্রবন্ধে রোকেয়া তালাক কালে মেয়েদের উপর কিরূপ নির্যাতন হত সে সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। (তদেব, পৃ. ২৫৭) রোকেয়া স্পষ্ট করে বুঝিয়েছেন যে পদ্ধতিতে তিন তালাক দেওয়া হয় তা সম্পূর্ণ ইসলাম বিধানের বিপরীত ও বিকৃত। তাই বেগম রোকেয়া অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বাধ্য হয়েছিলেন, যা ছিল তাঁর মতো শিক্ষিতার পক্ষে একেবারে ‘ফরজ’ বা অবশ্য কর্তব্য। মুসলমান সমাজের প্রতি তাঁর আহ্বান যে ইসলামে যে পদ্ধতিতে নারী পুরুষের সম্মতিক্রমে তিন তালাক দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে সেই বিধি গুলিকে রপ্ত করতে হবে এবং সমাজ থেকে অন্যায় ভাবে তালাক প্রয়োগের প্রথা বন্ধ করতে হবে। মেয়েদেরকে এ ব্যাপারে আরও বেশি উদ্যোগী হতে হবে।

বেগম রোকেয়া ছিলেন মুসলমান নারী মুক্তির দিশারী। প্রায় একশ বছর আগে যখন মুসলমান সমাজ অন্ধ পুরুষতান্ত্রিকতার মধ্যে আটকে ছিল তখন তিনি তাঁর সমাজে মেয়েরা কিভাবে শোষিত ও অত্যাচারিত হয় তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরেছেন এবং নারী মুক্তির পথপ্রদর্শনের দুরূহ কাজ করেছিলেন। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে তিনি যে সমস্ত লেখা লিখেছেন তার মধ্যে গোঁড়া সংস্কারে আচ্ছন্ন পিছিয়ে থাকা মুসলমান সমাজের মেয়েরা কিভাবে অত্যাচারিত হয় তা তাঁর বিভিন্ন লেখায় প্রকাশ করেছেন। মুসলমান মরচে ধরা, ক্ষয়ে যাওয়া সমাজকে তিনি আঘাত করেছিলেন তাঁর ক্ষুরধার চিন্তা এবং লেখনীর দ্বারা। তিনি বুঝেছিলেন মুসলমান মেয়েরা পিছিয়ে রয়েছে কারণ তাদের অশিক্ষা। এই অশিক্ষার কারণে তাদের মধ্যে চেতনার বিকাশ ঘটেনি। চেতনাহীন সমাজ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থাকবে, অন্ধবিশ্বাসকে জড়িয়ে রাখবে এটিই স্বাভাবিক। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন মুসলমান সমাজের মধ্যে ভয়াবহ লিঙ্গবৈষম্য। তাঁর যুক্তিগ্রাহ্য এবং মনোনিষ্ঠ লেখা দিয়ে তিনি মুসলমান সমাজকে বারে বারে আঘাত করেছেন, এবং তাদের মধ্যে চেতনাকে জাগাতে চেয়েছেন।

মুসলিম নারী সমাজে মেয়েদের অবনতির কারণ বেগম রোকেয়া প্রথম তুলে ধরেন তাঁর লেখা 'স্ত্রীজাতির অবনতি' (১৩১০ বঙ্গাব্দ) প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে বেগম রোকেয়া নারী এবং পুরুষ যে সমকক্ষ, বিদ্যা-বুদ্ধিতে তারা যে পরস্পর থেকে এগিয়ে বা পিছিয়ে নেই সে কথা যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন। মুসলমান সমাজ জীবন কঠোরভাবে পুরুষতান্ত্রিক ছিল। মেয়েরা সেখানে ব্রাত্য। তারা কেবলমাত্র পুরুষের ভোগের সামগ্রী এবং সন্তান জন্মদান ও পরিবারের লালন পালন তাদের একমাত্র কাজ। তাঁর মতে পুরুষের ন্যায় নারী জন্মগতভাবে কিছু অধিকার পেয়েছে, বাকি অধিকারটুকু তাকে অর্জন করতে হবে। তিনি বলেছেন, "একটা পরিবারে পুত্র ও কন্যায় যে প্রকার সমকক্ষতা থাকা উচিত আমরা তাহাই চাই। যেহেতু পুরুষ সমাজের পুত্র আমরা সমাজের কন্যা। আমরা ইহা বলি না যে 'কুমারের মাথায় যেমন উষ্ণীষ দিয়াছেন, কুমারীর মাথায়ও তাহাই দিবেন।' বরং এই বলি, কুমারের মস্ত শিরস্ত্রাণে সাজাইতে যতখানি যত্ন ও ব্যয় করা হয়, কুমারীর মাথা ঢাকিবার ওড়না খানা প্রস্তুতির নিমিত্তও ততখানি যত্ন ব্যয় করা হউক।" (তদেব, পৃ. ৩৮)

মুসলমান সমাজে পুরুষ এবং নারীর সমতা এবং নারীর প্রগতির কথা প্রথম বলেছেন রোকেয়া। তিনি বারে বারে আঘাত দিয়ে বুঝিয়েছেন যে মেয়েদের অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও চেতনাহীনতা তাদেরকে গৃহপালিত পশু পাখির ন্যায় পরাধীন করেছে। 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "আমাদের যখন স্বাধীনতা ও অধীনতা জ্ঞান বা উন্নতি ও অবনতির যে প্রভেদ তাহা বুঝিবার সামর্থটুকুও থাকিল না, তখন কাজেই তাঁহারা ভূস্বামী, গৃহস্বামী প্রভৃতি হইতে ক্রমে আমাদের 'স্বামী' হইয়া পড়িয়াছেন।" (তদেব, পৃ. ৩০) রোকেয়ার মত ছিল মুসলমান সমাজের মেয়েদের সঙ্গে কেবলমাত্র সাধারণ ভিখারিদের তুলনা করা যায়। এই ভিখারির ন্যায় চরিত্র মুসলমান মেয়েদেরকে দাসীতে পরিণত করেছে। সমাজে লিঙ্গবৈষম্য যে নারীর অবনতির কারণ তা তিনি 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। তাঁর মত ছিল মেয়েদের কোন গয়না পরা উচিত নয়, কারণ পুরুষরাই গয়না গড়িয়ে দেয় এবং এই গয়নাগুলোই মেয়েদের দাসত্বের নিদর্শন। তাঁর মতে পুরুষকে প্রলুব্ধ করার জন্য মেয়েরা নিজেদেরকে সুন্দরী করে তোলেন। আর এর দ্বারা মেয়েরা নিজেদের হীনমন্যতা বোধকে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি চেয়েছেন মেয়েদের মধ্যে আত্ম-উপলব্ধি ঘটুক এবং তাদের চেতনার বিকাশ ঘটুক। মেয়েদের মনের কক্ষে জ্ঞান সূর্যালোকের প্রবেশ তিনি প্রত্যাশা করেছেন। তাঁর মত ছিল মুসলমান মেয়েরা শিক্ষা গ্রহণ করলে তা মুসলমান

পুরুষদের পক্ষে চরম বিভীষিকা হয়ে উঠবে। তাঁর কথায়, "...আমাদের অবস্থা আমরা চিন্তা না করিলে আর কেহ আমাদের জন্য ভাবিবে না।" (তদেব, পৃ. ৩৭) নারী যতদিন না স্বাধীনতা অর্জন করবে ততদিন কর্মক্ষেত্রে সে সস্তায় বিকিয়ে যাবে। এই লেখাতে রোকেয়া যে প্রকৃতই একজন সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিসম্পন্ন সেকথা বোঝা যায়। বেগম রোকেয়া ছিলেন সত্যদ্রষ্টা। তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের মেয়েদের মধ্যে আধুনিকতা তথা স্বাধীনতার ভাবকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। পর্দানসীন মুসলমান মেয়েদের তিনি তালাক প্রথা, বাঁদি প্রথা প্রচলিত জীর্ণ কুসংস্কারে চূড়ান্ত আঘাত হেনেছেন।

তিনি বাঙ্গালীর শ্রমবিমুখতা, পরশ্রীকাতরতা, পরমুখাপেক্ষিতা ইত্যাদিকে নিন্দা করেছেন। তিনি এইভাবে আঘাত করেছেন যে বাঙ্গালীর ব্যবসা করা উচিত। ব্যবসা ব্যতীত বাঙ্গালী জাতি আর্থিকভাবে স্বয়ম্ভর হয়ে উঠতে পারবেনা। তিনি লিখেছেন, "বাণিজ্য আমাদের প্রধান ব্যবসা... বাণিজ্য ব্যবসায় যে কঠিন পরিশ্রম আবশ্যক তাহা বর্জন করিয়াছি।" (তদেব, পৃ. ৪২) এই প্রবন্ধে তিনি পরিশ্রম বিমুখ, আরামপ্রিয় বাঙ্গালীদের বিদ্রূপ করেছেন এবং বলেছেন বাঙ্গালী জাতি আর পুরুষ নয়।

মুসলমান মেয়েদের তিনি দাসত্ব থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আহ্বান করেছেন। 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "আমাদের একটি রোগ আছে– দাসত্ব।" দাসত্ব ভুলে যেদিন সমাজ পুরুষ এবং নারীকে সমান অধিকার দেবে সেদিন নর-নারীর সমন্বয়ে একটি সুস্থ সমাজ গড়ে উঠবে। এর জন্য প্রয়োজন পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে সমান অধিকার, সমান অবস্থান এবং সমকক্ষতা। এই অংশে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনার প্রতিফলন দেখি রোকেয়ার ভাবনার মধ্যে। মুসলিম সমাজে কথিত আছে যে, "দুইজন নারী একজন নরের সমতুল্য।" তিনি এই ভাবনাকে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে শারীরিক দুর্বলতার কারণে নারী-পুরুষের ওপর নির্ভরশীল কিন্তু তাই বলে পুরুষ নারীর প্রভু হতে পারে না। তিনি বারে বারে বলেছেন যে পুরুষেরা আমাদের সুশিক্ষা থেকে পশ্চাৎপদ রেখে আমাদের অকর্মণ্য করে তুলেছেন। সম্পত্তি বিভাজনের ক্ষেত্রে পুত্র এবং কন্যার যে সমান অধিকার যা ইসলামে স্বীকৃত তার পক্ষে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছেন মানবতাবাদী রোকেয়া। দেশপ্রেমী রোকেয়ার স্বজাতি প্রীতি থেকে বোঝা যায় রোকেয়া কতখানি দেশ এবং দেশের মানুষদের ভালোবেসে ছিলেন।

মুসলমান মেয়েদের বোরখা পরা নিয়ে বহু লেখক লেখিকা প্রতিবাদ করেছেন, কিন্তু রোকেয়া বোরখাকে স্ত্রীজাতির উন্নতির অন্তরায় বলে স্বীকার করেননি। বরঞ্চ তিনি মনে করতেন যে বোরখা মেয়েদের রূপকে আরও উন্নত করেছে এবং মেয়েদের শালীনতাকে বজায় রেখেছে।

রোকেয়া রচনাবলীর 'গৃহ' নামক প্রবন্ধে রোকেয়া বলেছেন যে মেয়েদের প্রকৃত অর্থে কোনো ঘর নেই। তারা পিতার সম্পত্তিরও অধিকারী নয়। মহম্মদীয় আইনে পিতার সম্পত্তিতে পুত্র কন্যার সমান অধিকারকে স্বীকার করা হয়েছে। রোকেয়া সম্পত্তি নিয়ে মহম্মদীয় আইনে পুত্র-কন্যা সমানাধিকারের পক্ষে উদ্যত খড়্গের ন্যায় লেখনী ধরেছেন এবং মুসলমান সমাজে বিশেষত মুসলমান মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কারণ মুসলমান সমাজে বিবাহিতা মেয়েদেরকে সম্পত্তির অধিকার থেকে অন্যায় ভাবে সরিয়ে রাখা হয়। যেহেতু মুসলমান মেয়েরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অশিক্ষিতা তাই তাদের পক্ষে তাদের জন্য মহম্মদীয় আইনে কি বলা হয়েছে তা তাদের জানার উপায় ছিল না। রোকেয়া এখানে মুসলমান মেয়েদের জীবনের অন্যতম সামাজিক সমস্যা থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। মুসলমান মেয়েদের সমাজে রোকেয়ার আগমন এবং তাঁর চিন্তাধারার প্রকাশ যেন সূর্যালোকের মত প্রবেশ করেছে। রোকেয়া সঠিক অর্থে মুসলমান সমাজে হয়ে উঠেছেন মেয়েদের পথপ্রদর্শক। প্রায় একশত বছর আগে রোকেয়ার এই সমাজ ভাবনা আমাদের অবাক করে, কারণ সেই সময়ে মুসলিম সমাজে কোন অবরোধবাসিনী মেয়ের পক্ষে এই ধরনের ভাবনাচিন্তা আজও কষ্ট কল্পিত।

'নূর ইসলাম' নামক প্রবন্ধে নারীকে অবরুদ্ধ রাখাই যে সামাজিকীকরণের লিঙ্গভিত্তিক রূপ তা চূড়ান্ত বিরোধিতা করেছেন রোকেয়া। (তদেব, পৃ. ১০৬) রোকেয়া তাঁর সৃষ্ট 'গওহর' নামক চরিত্রকে দিয়ে বলিয়েছেন, "আমরা যে সামাজিক নিয়মের বশবর্তী হইয়া স্ত্রী লোকদের এমন উপাসনা– স্রষ্টার সৃষ্টি বৈচিত্র্য দর্শন হইতে বঞ্চিত রাখি ইহার জন্য ঈশ্বরের নিকট কি উত্তর দিব? ...অবলাদেরও চক্ষু কর্ণ আছে, চিন্তা শক্তি আছে উক্ত শক্তিগুলির অনুশীলন যথা নিয়মে হওয়া উচিত। তাহাদের বাক্‌শক্তি কেবল আমাদের শিখান বুলি উচ্চারণ করিবার জন্য নহে।" (তদেব, পৃ. ১১১-১১৫) 'পদ্মরাগ' উপন্যাসে সিদ্দিকা-কে দিয়ে বলিয়েছেন, "তোমরা পদাঘাত করিবে আর আমরা তোমাদের পদলেহন করিব সেদিন আর নাই।" (তদেব, পৃ. ২৮৯)

'Sultana's Dream' প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন পুরুষ শাসিত সমাজের ওপর মুসলিম নারীর এক ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ বা পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ। তিনি লিখেছেন, "This is a ladyland, free from sin and harm. Virtue herself reigns here." (তদেব, পৃ. ৪৮৮) অকর্মণ্য ও উদ্যমহীন পুরুষ সমাজের প্রতি রোকেয়ার সোচ্চার কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হতে দেখি 'পদ্মরাগ' উপন্যাসে। রোকেয়া সৃষ্ট চরিত্র সিদ্দীকা বলেছে, "তোমরা পদাঘাত করিবে আর আমরা তোমাদের পদলেহন করিব সেদিন আর নাই।" (তদেব, পৃ.- ২৮৯)

রোকেয়া বুঝেছিলেন প্রচলিত কাঠ বা কয়লা জ্বালানি রূপে বেশি দিন ব্যবহার করা যাবে না। একদিন আসবে যেদিন প্রাকৃতিক সম্পদ মানুষের অবিমৃষ্যকারিতার কারণে শীঘ্রই শেষ হবে। তাই বিজ্ঞানমনস্ক রোকেয়া সূর্যের উত্তাপকেই জ্বালানি বা শক্তিরূপে ব্যবহার করে দূরদৃষ্টি ও বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় দিয়েছিলেন। রোকেয়ার আগে অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০ - ১৮৮৬), রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২ - ১৮৯১), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৮০) প্রমুখরা সাহিত্যে বিজ্ঞান চর্চার পথ প্রস্তুত করেছিলেন। সুলতানার স্বপ্নে আধুনিক বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ও তার পরিণতি কেমন হবে সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট মত জানিয়েছেন। রোকেয়ার জীবনীকার শামসুননাহার মাহমুদ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, "এ যুগে আমরা দেখিতে পাই কামাল পাশা, মুসোলিনি প্রমুখ মহামানব জীবনকালেই নিজের আরাধ্য কার্যের ফল ভোগ করিতে পারিতেছেন। এদিক দিয়া ইহাদের ভাগ্যের সহিত রোকেয়ার ভাগ্যের তুলনা হয়। ইহাদেরই মত রোকেয়ারও জীবদ্দশাতে তাঁহার সাধের স্বপ্ন বাস্তবরূপ লাভ করিয়া ছিল।" (রোকেয়া জীবনী, ২০০৯। পৃ. ৬২-৬৩)

রোকেয়া তাঁর আধুনিক সমাজবিজ্ঞান সম্মত চিন্তাভাবনার পরিচয় দিয়েছেন লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণের উপর বক্তব্য রেখে। হিন্দু সমাজের বিদুষী নারী অরু দত্ত, তরু দত্ত (১৮৫৬ – ১৮৭৭) প্রমুখদের সাহিত্যচর্চা ও ইংরেজি ভাষার উপর ব্যুৎপত্তি তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। তাই তিনিও মেয়েদের জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়, মহিলা প্রিন্সিপাল, কোর্টে মহিলা বিচারক এবং উকিল, সরকারি দপ্তরে মহিলা অফিসার প্রমুখদের কথা বলেছেন। তিনি যে শুধুমাত্র লিঙ্গ বিভাজনের বিপক্ষে কথা বলেছেন তাই নয়, একইসঙ্গে নারীর ক্ষমতায়নের স্বপক্ষে জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। 'ডেলিশিয়া হত্যা' -তে ডেলিশিয়া ও মিস্টার করলিঅনের কথোপকথনে সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ডেলিশিয়ার মুখ দিয়ে রোকেয়া চপেটাঘাত করেছেন। ডেলিশিয়া বলছে, "বটে? যখন পুরুষেরা স্ত্রীলোক দিগকে

চতুষ্প্রাচীরের অভ্যন্তরে আবদ্ধা রাখিত—যেমন গবাদিপশুকে খোঁয়াড়ে রাখা হয় এবং তাহাদের বিবেচনায় যতটুকু খাদ্য রমণীদের পাওয়া উচিত মনে করিত, তাহাই তাহাদের দিত— আর নারীগণ অবাধ্য হইলে তাহাদের প্রহার করিত। হইতে পারে, সেকাল সুখের ছিল। কিন্তু আমি তাহার পক্ষপাতী নহি। আমি জগতের ক্রমোন্নতি দেখিতে চাই—আমি চাই সভ্যতা—যাহাতে নারী ও পুরুষ সুশিক্ষা লাভ করে।" (রোকেয়া রচনাবলী, ২০০৬। পৃ. ১৩৩-১৩৪)

বিবাহ, পরবর্তীতে তিন তালাক নারীকে হয়ত পিশাচ হৃদয়হীন স্বামীর থেকে মুক্তি দেয় কিন্তু নারীর শরীর এবং মনে চিরস্থায়ীভাবে থেকে যায় শারীরিক অত্যাচারের প্রমাণ এবং মানসিক অত্যাচার নিঃশব্দে ঘটায় রক্তক্ষরণ। নারী নির্যাতনের প্রতিভূ পুরুষ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য, "কুকুর পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; যদি স্বার্থপরতা, ধূর্ততা এবং কপটাচারকে সদগুণ বলা যায় তবে অবশ্য পুরুষজাতি কুকুরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ।" (তদেব, পৃ. ১৪৭) সমাজে তথা নিজ পরিবারের পুরুষের দম্ভ ও আধিপত্য, নারীর উপর অত্যাচার এবং যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথ খুঁজেছেন রোকেয়া তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে। তাই রোকেয়া বালিকা দিগকে আহ্বান জানিয়েছেন, "আইশ ভগিনি। তোমরাও যোগদান কর; আমরা কোদালি দ্বারা ভূমি প্রস্তুত করি, তোমরা স্বহস্তে বীজ বপন কর।" (তদেব, পৃ. ১৫৩) তাঁর 'জ্ঞানফল' প্রবন্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অপশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে, ভারতবর্ষকে লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে তিনি প্রবল প্রতিবাদ করেছেন 'জ্ঞানফল' নামক প্রবন্ধে। তিনি বুঝেছিলেন পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদেরকেও শিক্ষায় এবং কর্মে এগিয়ে যেতে হবে। তবেই সমাজের অগ্রগতি সম্ভব। আর এখানেই রোকেয়ার স্বদেশপ্রেম এবং স্বাজাত্যবোধ প্রকাশিত হয়েছে।

মেয়েদেরও যে শিশুপালন বিধি, সাধারণ পারিবারিক চিকিৎসা ইত্যাদির জ্ঞান থাকা জরুরী, মেয়েদেরও যে পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন, নিয়মিত ব্যায়াম করা আবশ্যক সে বিষয়ে 'শিশুপালন' নামক ছোটগল্পে রোকেয়া স্পষ্ট বক্তব্য যুক্তি সহকারে তুলে ধরেছেন। মুসলমান সমাজে বহুবিবাহ এবং মেয়েদের বাল্যবিবাহ রোকেয়ার অন্তঃকরণকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। বিদ্যাসাগরের ভাবধারায় প্রভাবিত রোকেয়া ভবিষ্যতের গৃহিণী তথা বংশধরের জননীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। মেয়েরা অভিশপ্তা নয়, তারা কাঙালিনীও নয়। পুরুষ জাতি তাদের জীবনকে করে তুলেছে অভিশপ্ত এবং কাঙালিনী।

রোকেয়ার সাহিত্যচর্চা কোন নান্দনিক তত্ত্বের প্রকাশ নয়, তাঁর সাহিত্য সমাজ জাগরণের জন্য সুলিখিত হয়েছিল। সাহিত্যের আঙ্গিকে রোকেয়া একজন সুনিপুণ সমাজ সমীক্ষক। তাঁর বলবার ভঙ্গিমাতে যে দৃপ্ততা, যে সাহস, যে সোচ্চার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে তাতে তিনি কেবলমাত্র একজন সমাজ সমীক্ষকই নন, তিনি একজন সত্যদ্রষ্টা বিদুষী। তাঁর বিভিন্ন লেখায় রোকেয়া পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে মেয়েদের উঠে দাঁড়ানোর স্বপক্ষে দৃপ্ত বক্তব্য রেখেছেন। মেয়েদের বিয়ের ক্ষেত্রেও মেয়েরা যাতে মনোমত পাত্র পছন্দ করতে পারে সেই বিষয়ে রোকেয়া তাঁর ভাবনা স্পষ্ট করেছিলেন। সমাজের পরিবর্তন যে কেবলমাত্র বাইরে থেকে হয় না, অন্তঃপুরের মধ্যেও যে সেই পরিবর্তনকে আনা জরুরী এ বিষয়ে রোকেয়া ছিলেন সোচ্চার। কলকাতা যে ভারতবর্ষ নয়, কয়েকজন ধনী ব্যক্তি যে ভারতবর্ষের জনগণ নয় একথা বুঝিয়ে রোকেয়া বলেছেন দেশের সাধারণ চাষির দুঃখ যন্ত্রণার কথা। কুটির শিল্প, স্বদেশী আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়েও তিনি প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

বেগম রোকেয়া প্রকৃত অর্থেই নারী প্রগতির অগ্রদূত। তিনি বলেছেন, "বুক ঠুকিয়া বল মা। আমরা পশু নয়; বল ভগিনী! আমরা আসবাব নয়; বল কন্যে! আমরা জড়োয়া অলংকার রূপে লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নয়; সকলে সমস্বরে বল, আমরা মানুষ! আর কার্যত দেখাও যে আমরা সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠ অংশের অর্ধেক।" (তদেব, পৃ.- ৪০০) নারীর প্রতি নির্মম অবমাননার বিরুদ্ধে রোকেয়া ছিলেন প্রবল প্রতিবাদী। তাই তিনি তিন তালাক প্রথার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করেছেন। মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নারীর অধিকারের স্বপক্ষে আন্দোলন করেছেন, মুসলমান মেয়েদের পথ চিনিয়েছেন, প্রতিবাদের ভাষা দিয়েছেন, তিনি হয়ে উঠেছেন মুসলমান নারী সমাজের দিশারী। সুতরাং রোকেয়ার সমাজ ভাবনা বর্তমান সময়েও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' রোকেয়ার লেখনীতে নতুন রূপ নিয়েছে। এইখানে নারী ভাবনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এবং রোকেয়া একই সুরে বাঁধা পড়েছেন। গোলাম মুরশিদ- এর কথায়—"কন্যা নন, স্ত্রী নন, তিনি যে একজন ব্যক্তি এ পরিচয় তাঁর মধ্যে অকম্পিত।" ('রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া– নারী প্রগতির একশ বছর, ১৯৯৩। পৃ. ১৫৫) রোকেয়া ছিলেন নারী মুক্তির প্রতীক, পুরুষতন্ত্রের শিকল ভাঙার কারিগর– আধুনিক সমাজ আজও সেই পথের পথিক।

ইসলামে নারী মুক্তির কথা বলা হয়েছে কিন্তু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখক নারী মুক্তির প্রসঙ্গকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। রোকেয়া ইসলামী দর্শন দ্বারাই নিজের বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগে সেসব বিধানের পুনর্জন্মের চেষ্টা

করেছেন। রোকেয়া ছিলেন নারীবাদী এবং নারী মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পথপ্রদর্শক। তিনি সেই যুগে ধর্মীয় কঠোরতা থেকে সমাজের মুক্তি খুঁজেছেন ধর্মীয় বন্ধন শিথিল হওয়ার মধ্যে কিন্তু ইসলামের প্রমাণিত বিধান মেনেই তিনি মুসলমান সমাজকে পরিচালিত হতে বলেছেন। রোকেয়ার সমাজ ভাবনা আদ্যন্ত নারী শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী মুক্তির আন্দোলন ভিত্তিক। তিনি বুঝেছিলেন সমাজের উন্নতি ঘটাতে হলে মেয়েদের উন্নতির প্রয়োজন। বিবেকানন্দ বলেছেন নারী ও পুরুষ এই দুটি ডানার উপর সমানভাবে ভর দিয়ে সমাজ এগিয়ে যায়। সুতরাং যে সমাজে নারীরা পিছিয়ে থাকে সেই সমাজ তার অর্ধেক ডানার উপর ভর করে অর্থাৎ কেবলমাত্র পুরুষ শক্তির সহায়তায় এগোতে পারে না। যেহেতু মুসলমান সমাজে মেয়েরা বোরখার মধ্যে ঢাকা থাকে এবং শিক্ষার সুযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন তাই রোকেয়ার সমাজ ভাবনা নারীর ভাবনায় পরিণত হয়েছে।

৬.৪ দারিদ্র্য দূরীকরণে নিবেদিতা ও রোকেয়ার ভাবনা :

একসময় ভারতবর্ষের বিপুল ধন সম্পদের প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে মধ্যপ্রাচ্য থেকে লুণ্ঠনকারীরা বারেবারে ভারতে এসেছিলেন এবং যথেচ্ছ ভাবে ধনরত্ন লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছেন। শেষ পর্যন্ত কিছু কিছু লুণ্ঠনকারী ভারতবর্ষেই স্থায়ীভাবে থেকে যান এবং ভারতের শাসনভার নিজেরা গ্রহণ করেন। মধ্যযুগ থেকেই ইংরেজ রাজত্ব পর্যন্ত শাসক শ্রেণী ভারতবর্ষে প্রজা সাধারণকে ছলে-বলে-কৌশলে যৎপরোনাস্তি শোষণ করেছেন। একই সঙ্গে ভারতীয়রা যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে তাই ভারতবর্ষের চিরন্তন শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেন। এর সবচেয়ে মারাত্মক প্রভাব পড়েছিল সাধারণ প্রজাবর্গ এবং মেয়েদের উপর। ক্রমশ মানুষ শিক্ষার আলোক থেকে দূরে সরে গিয়ে অশিক্ষা, কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার অতলে ডুবে যেতে থাকে। মানুষ শিক্ষার অভাবে প্রথমে চিন্তন শক্তি ও পরবর্তীতে কর্মশক্তি হারিয়ে দারিদ্র্যের কবলে পড়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত সর্বসাধারণ তথা মেয়েরা কর্মহীন হয়ে দারিদ্র্যকে বরণ করতে বাধ্য হয়। এই রূপ প্রেক্ষাপটে ভারতবর্ষে এসেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা এবং এখানেই জন্মেছিলেন বেগম রোকেয়া।

৬.৪.১ দারিদ্র্য দূরীকরণে নিবেদিতার ভাবনা :

নিবেদিতা যে সময় কলকাতায় আসেন তখন চারিদিকে অর্ধউলঙ্গ পুরুষ ও নারীর মধ্যে তিনি নিজেকে আবিষ্কার করেন। বঙ্গবাসীদের মধ্যে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, ধর্মান্ধতা এবং দারিদ্র্য ছিল রন্ধ্রে রন্ধ্রে। বিবেকানন্দের আন্তরিক আহ্বানে মার্গারেট নোব্‌ল এদেশে এসেছিলেন ভারতীয় ভাবে ভারতীয় মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটাবার লক্ষ্যে। স্বামীজীর কথায় শূদ্র ও নারী জাতির উত্থান ব্যতিরেকে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। কারণ যে পাখির একটি ডানা কাটা গেছে সে তার অপর ডানাটির দ্বারা আকাশে উড়তে পারে না। সুতরাং নারী এবং শূদ্র জাতির উন্নয়ন ব্যতিরেকে ভারত রাষ্ট্রের উন্নতি সম্ভব নয়। বিবেকানন্দের এই সুদূর প্রসারী চিন্তা নিবেদিতার অন্তঃকরণকে স্পর্শ করেছিল। বিবেকানন্দ রূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সংস্পর্শে মার্গারেট নোব্‌ল ভগিনী নিবেদিতাতে পরিবর্তিত হলেন এবং নিজেকে পুরোপুরি ভারতীয় ভাবে গড়েপিটে নিতে লাগলেন। স্বামীজীর লক্ষ্য ছিল ভারতমাতার দারিদ্র্য দূরীকরণ। অর্থাৎ সমস্ত ভারতবাসী যেন দারিদ্র্যমুক্ত জীবন-যাপন করতে সমর্থ হয়। স্বামীজী বুঝেছিলেন এক দারিদ্র্য থেকে সমস্ত ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়। দেশের যুব সম্প্রদায়কে দারিদ্র্যের অভিশাপ মুক্ত করতে তাদের উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। আর এই কাজে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন মা-বোনেরা। কিন্তু এ জন্য মা-বোনেদের সুশিক্ষার প্রয়োজন।

যে সময়ে মার্গারেট নোব্‌ল ভারতে আসছেন তার বহু পূর্ব থেকে অর্থাৎ পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সময়কাল থেকেই বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেখানে বহু সংখ্যক মেয়ে ও মহিলা নিয়মিত লেখাপড়া করতেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় গুলিতে পাশ্চাত্যের ঢঙে শিক্ষাদান করা হত। স্বামীজী চেয়েছিলেন সম্পূর্ণ ভারতীয় এবং সনাতনী ভাবধারায় মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে। স্বামীজীর আন্তরিক আগ্রহে নিবেদিতা স্কুল স্থাপন ও চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার কালে বিভিন্ন ধরনের পর্বতপ্রমাণ সমস্যার সম্মুখীন হন। যার মধ্যে আর্থিক সমস্যা ছিল প্রবল। কলকাতা থেকে বঙ্গ দেশে বহু সংখ্যক ধনী ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও নিবেদিতার

বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা কল্পে কেউই স্বতঃস্ফূর্তভাবে আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেননি। কিছু বিদেশি মহিলার আর্থিক এবং অন্যান্য ধরনের সহায়তায় নিবেদিতা তাঁর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়টি চালিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। ছাত্রীরা কেউই বেতন দিতেন না।

নিবেদিতা বুঝেছিলেন কেবলমাত্র ভাষা শিক্ষা ও তাত্ত্বিক শিক্ষা দিয়ে মেয়েদের তথা বাঙালী সমাজের উন্নতি ঘটানো সম্ভব নয়। পরিবারে উন্নতি ঘটাতে গেলে মেয়েদের তাত্ত্বিক শিক্ষাদানের সাথে সাথে হাতে-কলমে প্রয়োগিক শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা ভগিনী অনুভব করেন। তাই মেয়েদের তিনি আচার তৈরী, বড়ি তৈরী, সূচি শিল্প, সেলাই এবং পরবর্তী সময়ে, রন্ধনশিক্ষা, বিভিন্ন ধরনের আলপনা, মাটির ছাঁচ, মাটির বেনেপুতুল, পুরান কাশ্মীরী শালের কাজ, কাঁথার কারুকার্য, ছবি আঁকা ও রং তুলির কাজ ইত্যাদি শেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। হাতে-কলমে এই প্রায়োগিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে তিনি তার ছাত্রীদের স্বাবলম্বী এবং উপার্জনশীলা করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন কেবলমাত্র স্বামীর উপার্জনে সংসারে স্বচ্ছলতা আসবে না। সংসারকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে হলে স্বামীর পাশে থেকে স্ত্রীকে উপার্জন করতে হবে। আবার উপার্জনে সক্ষম নারী স্বাধীনতা, মুক্তি এবং ক্ষমতায়ন লাভ করতে পারে। মুক্তি বলতে এখানে অজ্ঞতা, ধর্মান্ধতা এবং কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে মহিলাদের স্বাধীনতার আলো দেখবার কথা বলেছেন। যুবক তরুণদেরও তিনি নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকার বিরোধী ছিলেন। সব সময় নিজের মনকে কোন কাজে নিবিষ্ট করে রাখতে পারলে মনের মধ্যে কুচিন্তা এবং অলসতার স্থান থাকবে না। দুপুরবেলা রান্নার শেষে মেয়েদের ঘুমানো অথবা গল্পগুজব ও পরচর্চা করবার তিনি বিরোধী ছিলেন। তাঁর মত ছিল ওই অবসর সময়টুকুতে মেয়েরা বড়ি, আচার, সূচের কাজ করলে সময় যেমন ভালোভাবে কাটবে তেমনি ওইগুলি বিক্রি করে মেয়েরা আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জন করবে। স্বাভাবিকভাবেই এরূপ মেয়েরা পরিবার তথা নিকট সমাজের দারিদ্র্য মোচনে সহায়ক হবে।

৬.৪.২ দারিদ্র্য দূরীকরণে রোকেয়ার ভাবনা :

বেগম রোকেয়ার সমাজ ভাবনার একটি অন্যতম দিক হল ভারতবাসী তথা বঙ্গবাসীকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা। নারীবাদী রোকেয়ার সমস্ত চিন্তা ভাবনা এবং কর্মকাণ্ড কেন্দ্রীভূত হয়েছে মেয়েদের শিক্ষা, ক্ষমতায়ন এবং মুক্তির লক্ষ্যে। মেয়েদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি কখনো কখনো পুরুষদের কথা বলেছেন, যদিও পুরুষদের নিয়ে রোকেয়ার সুস্পষ্ট কোন ভাবনা উঠে আসেনি। নারীবাদী রোকেয়া মেয়েদের কথা বললেও তিনি মূলত মুসলমান মেয়েদের কথাই বলেছেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর শিক্ষা ভাবনা, সমাজ ভাবনা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে মুসলমান মেয়েদের প্রসঙ্গই মূলত উঠে এসেছে। রোকেয়া বলেছেন, "...পুরা কালে যখন সভ্যতা ছিল না, সমাজ বন্ধন ছিল না তখন আমাদের (মেয়েদের) অবস্থা এরূপ ছিল না। কোন অজ্ঞাত কারণ বশত মানবজাতির এক অংশ (নর) যেমন ক্রমে নানা বিষয়ে উন্নতি করিতে লাগিল, অপর অংশ (নারী) তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেরূপ উন্নতি করিতে পারিল না বলিয়া পুরুষের সহচরী বা সহধর্ম্মিণী না হইয়া দাসী হইয়া পড়িল।" (রোকেয়া রচনাবলী, ২০০৬। পৃ. ১১-১২)

রোকেয়ার মতে মেয়েদের এই বিশ্বব্যাপী অধঃপতনের কারণ মেয়েদের সুযোগ-সুবিধা লাভের অভাব। ধীরে ধীরে মেয়েরা অক্ষম ও অকর্মণ্য হয়েছে। একসময়ে মেয়েদেরকে অলস ভিক্ষুকদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বহুকাল ধরে মেয়েরা দাসী থাকতে থাকতে দাসত্বে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং তাদের মন পর্যন্ত দাস (enslaved) হয়ে গিয়েছে। ফলে মেয়েরা আর সাহসী নয়, স্বাবলম্বী নয়। তারা এখন অযোগ্য, পরনিন্দাকারী, অপরের উন্নতিতে হিংসাকারী, মূর্খ এবং সবকিছুতেই তাদের অসন্তোষ। অনেকেই বলে থাকেন যে, মেয়েরা 'যুক্তি জ্ঞানহীন' (unreasonable)। অতিরঞ্জিত কথা বলা এবং মিথ্যা ভাষণ তাদের অলংকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরুষের কাছে বঙ্গবালারা 'ক্ষীণাঙ্গী', 'কোমলাঙ্গী', 'অবলা', 'ভয়-বিহ্বলা'। পুরুষের অধিক যত্নে মেয়েদের ঘটেছে সর্বনাশ, তাই আজ বাংলার মেয়েরা যেন জড়পিণ্ড। এর ফলশ্রুতিতে মেয়েদের দেহে এবং মনে দারিদ্র্য আজ প্রকট।

বেগম রোকেয়ার মতে মেয়েদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে নিজেদের দারিদ্র্য থেকে মুক্তি লাভ করতে। মেয়েরা যদি নিজেরা সচেষ্ট না হয়, নিজেদের উন্নতির দ্বার নিজেরা খুলতে এগিয়ে না আসে, ভাগ্যের উপরে নিজেদের ভবিষ্যৎকে ছেড়ে দেয় তাহলে তারা পুরুষের ধন হয়ে থেকে যাবে। স্বাধীনতা, ওজস্বিতা এবং উপার্জনের শক্তি অর্জন করতে অপারগ হবে। যতক্ষণ না মেয়েরা যুগোপযোগী শিক্ষা লাভ করে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের জন্য সচেষ্ট না হবে ততক্ষণ তারা দরিদ্র থাকবে। এই প্রসঙ্গে রোকেয়া 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধে লিখেছেন, "যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডী কেরানি হইতে আরম্ভ করিয়া লেডী ম্যাজিস্ট্রেট, লেডী ব্যারিস্টার, লেডী জর্জ– সবই হইব! পঞ্চাশ বৎসর পরে লেডী Viceroy হইয়া এদেশের সমস্ত নারীকে 'রাণী' করিয়া ফেলিব! উপার্জ্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কি নাই? যে পরিশ্রম আমরা 'স্বামী'র গৃহকার্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না?" (তদেব, পৃ. ২১) রোকেয়ার মতে বঙ্গ দেশে লেডী কেরাণী হওয়ার কথায় আশ্চর্য বোধ হলেও পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের বিশেষত আমেরিকায়, ইংল্যান্ডে লেডী ব্যারিস্টার বিরল নয়। মুসলমান সমাজেও মেয়েরা যে উচ্চশিক্ষিতা এমনকি পুরুষদের সঙ্গে সমানে তাল মিলিয়ে সমাজের বিভিন্ন পদে আসীন রয়েছেন। কেবল বঙ্গদেশেই এরূপ রমণী রত্ন নেই।

মেয়েরা যদি পুরুষদের সমকক্ষ হয়ে উপার্জন করে তাহলে পরিবারে দারিদ্র্য ভূষণ হয় না। যে সকল মেয়েরা শরীর এবং বুদ্ধিকে ব্যবহার করে উপার্জন করে তারা ধন উপার্জনের গুরুত্ব বোঝে এবং কাপড়, গয়না, দাস-দাসী ইত্যাদির পেছনে অনর্থক ব্যয় করতে অস্বীকার করে। সুতরাং মুসলমান পরিবার গুলিতে যদি দারিদ্র্যকে দূরীকরণের চেষ্টা করা হয় তাহলে মুসলমান মেয়েদের শিক্ষিতা হতেই হবে এবং উপার্জনের পথে অগ্রসর হতেই হবে। মেয়েদেরকেও কৃষিকার্যে অংশগ্রহণ করে শস্য উৎপাদন করতে হবে এবং অর্থ উপার্জনের জন্য সচেষ্ট হতে হবে। যে পরিবারের মেয়েরা শিক্ষিতা, পরিশ্রমী এবং উপার্জনশীলা সেই পরিবারে দারিদ্র্য বা অন্নকষ্ট বাসা বাঁধতে পারে না।

রোকেয়া ‘অর্ধাঙ্গী’ প্রবন্ধে লিখেছেন, “আমরা পুরুষের ন্যায় সুশিক্ষা ও অনুশীলনের সম্যক সুবিধা না পাওয়ায় পশ্চাতে পড়িয়া আছি। সমান সুবিধা পাইলে আমরাও কি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিতাম না? আশৈশব আত্মনিন্দা শুনিতেছি, তাই এখন আমরা অন্ধভাবে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করি, এবং নিজেকে তুচ্ছ মনে করি।... পুরুষগণ আমাদিগকে সুশিক্ষা হইতে পশ্চাৎপদ রাখিয়াছেন বলিয়া আমরা অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছি। ভারতে ভিক্ষু ও ধনবান –এই দুই দল লোক অলস; এবং ভদ্রমহিলার দল কর্তব্য অপেক্ষা অল্প কাজ করে। আমাদের আরামপ্রিয়তা খুব বাড়িয়েছে। আমাদের হস্ত, পদ, মন, চক্ষু ইত্যাদির সদ্ব্যবহার করা হয় না। দশজন রমণীরত্ন একত্র হইলে উহারা বিশেষতঃ আপন আপন অর্ধাঙ্গের নিন্দা কিংবা প্রশংসা করিয়া বাকপটুতা দেখায়। আবশ্যক হইলে কোন্দলও চলে।” (তদেব, পৃ. ৩১-৩২)

দারিদ্র্য থেকে মুক্তির জন্য রোকেয়া ‘সুগৃহিণী’ নামক নিবন্ধে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মেয়েদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন –

১. গৃহ যেমনই হোক তাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলা সুগৃহিণীর কর্তব্য। আর এর জন্য প্রয়োজন মেয়েদের শিক্ষা। সুগৃহিণী পরিবারকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত রাখতে সমর্থ হবেন।

২. পরিমিত ব্যয় করা সুগৃহিণীর একটি প্রধান গুণ। পুরুষরা বহু কষ্ট করে যে অর্থ উপার্জন করেন, শিক্ষিতা সুগৃহিণী সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করবেন, স্বামীর অল্প আয়ের জন্য কটু কথা বলবেন না, এরূপ শিক্ষিতা গৃহিণী দারিদ্র্যমুক্ত পরিবার তৈরী করতে সক্ষম।

৩. “স্বামীর আয় অনুসারে ব্যয় করাই অর্থের সদ্ব্যবহার।” (তদেব, পৃ. ৩৫)

৪. সুশিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে আমরা (গৃহিণীরা/মহিলারা) টাকার সদ্ব্যবহার শিখিব কিরূপে?” (তদেব) গৃহিণীর সুশিক্ষার অভাবে বহু প্রেমিক পুরুষের অনিষ্ট সাধিত হয়।

৫. শিক্ষিতা গৃহিণীর কেবলমাত্র রান্না শিখলেই চলবে না তাকে কিছুটা চিকিৎসা বিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, ধাত্রীবিদ্যা, খাবার স্থানের পরিবেশ, উদ্যানবিদ্যা, সেলাই, সূচিকার্য্য, পরিবারভুক্ত লোকদের সেবা যত্ন করা, রোগীর সেবা শুশ্রূষা ইত্যাদি গুণে গুণান্বিতা হতে হবে।

রোকেয়ার মতে শিক্ষা মেয়েদেরকে উপরের বিভিন্ন গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করবে। মেয়েরা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত না হলে সমাজও উন্নত হবে না। পরিবার ও সমাজের দারিদ্র্যও ঘুচবে না। তিনি লিখেছেন, "আমরা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে সমাজ ও উন্নত হইবে না। যতদিন আমরা আধ্যাত্মিক জগতে পুরুষদের সমকক্ষ না হই, ততদিন পর্যন্ত উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র। আমাদিগকে সকল প্রকার জ্ঞানচর্চা করিতে হইবে।" (তদেব, পৃ. ৪৫)

রোকেয়ার বিভিন্ন লেখা থেকে এটুকু স্পষ্ট যে মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া একটি সুস্থ-সুন্দর সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। শিক্ষিতা মেয়েরাই পারে দারিদ্র্যমুক্ত পরিবার ও সমাজ গড়ে তুলতে।

৬.৫ সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার চিন্তা ভাবনার দূরদর্শিতাঃ

বেগম রোকেয়া এবং নিবেদিতার চিন্তাভাবনা এবং সমাজদর্শন বর্তমান সমাজের সাম্প্রদায়িক হিংসার নিস্পত্তিকরণে কতখানি প্রাসঙ্গিক তা নিম্নে আলোচনা করা হল...

স্বামী বিবেকানন্দ মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌লকে চিঠিতে লিখেছিলেন যে তাঁর (নোব্‌ল) মতো একজন 'সিংহিনী'-র প্রয়োজন যিনি ভারতে নারী শক্তির বিকাশ ঘটাতে সমর্থ হবেন। কারণ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন মার্গারেটের মধ্যে আত্মসংযম, বাক্পটুতা, প্রকৃত শিক্ষা, তেজস্বীতা, প্রয়োজনে তর্ক করার সামর্থ্য, বাগ্মীতা, ব্যক্তিত্ব এবং সর্বোপরি আইরিশ রক্ত। বংশানুক্রমে মার্গারেটের মধ্যে ছিল আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজ। তাই সঠিক ভাবেই বিবেকানন্দ ভারতে তথা কলকাতায় মেয়েদের শিক্ষাদানের জন্য মার্গারেটকে চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি এও বুঝেছিলেন যে মার্গারেট কেবলমাত্র মেয়েদের শিক্ষাদানের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারবেন না। তাঁর চিন্তন ও সামর্থ্যের বিস্তৃতি তাঁকে অনায়াসে কর্মের নব নব ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে বাধ্য করবে।

বিবেকানন্দ মার্গারেটকে ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষা দেওয়ার পর যখন উত্তর ভারত ও কাশ্মীর ভ্রমণে সঙ্গে নিয়ে যান ভারত আত্মাকে দেখবার, বুঝবার এবং অনুভব করার জন্য– তখনই মার্গারেট অনুভব করেন যে স্বামীজীর মধ্যে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দৃঢ় মনোভাবকে। কাশ্মীরে 'ক্ষীরভবানী'-র মন্দিরে স্বামীজী স্থানীয় এক মুসলমান শিকারা চালকের কন্যাকে দেবীজ্ঞানে পূজা করেন। এখানেই নিবেদিতা বুঝেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু সন্ন্যাসী হয়েও সমস্ত রকমের ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে, যদিও স্বামীজী তাঁর লেখার মধ্যে খুব বেশী মুসলমান বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষদের কথা বলেননি। কারণ স্বামীজীকেও হিন্দু ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এবং কলকাতায় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিরন্তর লড়াই করতে হয়েছিল। স্বল্পায়ু বিবেকানন্দের পক্ষে তাই মুসলমান সমাজের সমস্যার মধ্যে প্রবেশ করা সম্ভব হয়নি। এছাড়াও এই স্বল্প সময়ের মধ্যে স্বামীজী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য ভারতবাসী তরুন ও যুবকদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে জাগিয়ে তুলেছিলেন এবং প্রকারান্তরে বপন করেছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবের বীজ। নিবেদিতার মধ্যেও জন্মসূত্রে ছিল এই বীজ। তিনি আপাত দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের কলকাতার খিদিরপুর জেটিতে পা রেখেছিলেন কলকাতায় তথা ভারতবর্ষে ভারতীয়ভাবে মেয়েদের শিক্ষাদানের লক্ষ্যে – যে শিক্ষা কেবলমাত্র বর্ণমালার বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মাত্র নয়, যা নারীর মধ্যে লুকিয়ে থাকা সিংহীর তেজ তথা মাতৃশক্তিকে জাগিয়ে তুলবে। স্বামীজীর আকস্মিক অন্তর্ধানের পর নিবেদিতা হঠাৎ করে আবিষ্কার করলেন জাতীয় জীবনের আসন্ন উন্মাদনাকে। নিবেদিতা এক অনন্য ভূমিকায় ভারত মাতার অন্তরের স্পন্দনকে অনুভব করলেন– গৌরবময় ১৯০৫ সালে। প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা তাঁর 'নিবেদিতা : চিরন্তন প্রেরণা' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন মর্মস্পর্শী ভাষায় নিবেদিতার কথাকে– "শ্মশানচিতার সামনে অজস্র সমালোচনা - নিন্দা যখন স্তব্ধ হল তখনই সমস্ত জাতি সাড়া দিক এক সুরে। সেই সুরকে ধারণ করে রেখেছিলেন নিবেদিতা। সে- সুর জাতীয়তার। সেদিন নিবেদিতার সামনে জাতীয়তাই ছিল জাগ্রত বাস্তব দেবতা। মহাসমাধিতে লীন স্বামীজী সেদিন যেন ভারতের অন্তরে বাইরে ওতপ্রোত। নিবেদিতা কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।" (প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা, ২০১৭, পৃ. ৫২)

বেলুড় মঠ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর নিবেদিতার বহুমুখী প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। সারা পৃথিবী অবনত মস্তকে লক্ষ্য করে মনে দাগ কাটার মত লেখিকা, শরীর ও মনকে ঝংকৃত করার মতো বক্তা, কথাবার্তায় মোহিত করে রাখার মত অসাধারণ ক্ষমতা, গতিময় ব্যক্তিত্ব এবং জ্বলন্ত আত্মোৎস্বর্গে উদ্ভাসিত ভগিনী নিবেদিতাকে। ঋষি অরবিন্দের

কথায় তিনি ‘শিখাময়ী’। প্রেম দীপ্ত ও স্বার্থশূন্য নিবেদিতা তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা এবং জলন্ত কর্মের সহায়তায় ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছেন জাতীয়তা তথা সশস্ত্র বিপ্লবের ভাবে ভারতবাসীকে উজ্জীবিত করতে। তাঁর অন্তরের পবিত্র হোমশিখা যাঁকেই স্পর্শ করেছে তিনি হয়ে উঠেছেন অগ্নিময় এবং বজ্রকঠোর।

যখন বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং স্বার্থপরতায় মাতৃভূমি আচ্ছন্ন, তখন নিবেদিতা বলেছেন– “আমি বিশ্বাস করি ভারতবর্ষ এক, অখন্ড, অবিভাজ্য।” (তদেব, পৃ. ৫২) “জাতিগত, ভাষাগত অথবা রাজনৈতিক কোন একটি বিচ্ছিন্ন কাহিনী কখনো ভারতের প্রকৃত ইতিহাস হতে পারে না।” (তদেব, পৃ. ৫৪) “ভারতীয়দের ঐক্য সূত্রটি কোথায় রয়েছে? তা আছে জনগণের অন্তরের দেশপ্রেমে।” (তদেব) রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, “And Sister Nivedita has uttered the vital truths about Indian life.” অর্থাৎ নিবেদিতা ভারতীয় জীবন সম্বন্ধে গভীর সত্য সমূহ উচ্চারণ করেছেন। (‘The Web of Indian Life’ গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন।)

নিবেদিতা পরোক্ষভাবে ও সাম্প্রদায়িকতাকে স্বীকার করেননি। তিনি জাতীয়তাবাদে, ঐক্য ও অখণ্ড ভারতবর্ষের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই সংকীর্ণ হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও পার্সি ধর্মের বিভাজনকে আলাদা করে দেখেননি। তাঁর স্বচ্ছ, মুক্ত ও সত্য দৃষ্টি দিয়ে ভারতের জাতীয়তা স্পন্দনকে হৃদয়ে অনুভব করেছিলেন এবং তাকেই তুলে ধরেছিলেন তাঁর বজ্র-নির্ঘোষ বাণীতে।

স্বামী বিবেকানন্দ, প্যাট্রিক গেডেস, ক্রপট্কিন প্রমুখদের কাছে তিনি পেয়েছিলেন Mutual Aid (পারস্পরিক সহায়তা), Co-operation (সহযোগিতা), Self-organisation (স্বয়ংসংস্থা) প্রভৃতি ধারণা। নিবেদিতা স্বীকার করেছেন বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর “ভারত পরিক্রমা ও পৃথিবীর নানা দেশ পরিভ্রমণ কালে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সামাজিক সংগঠন, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, আর্থিক সংগঠন প্রভৃতি সম্পর্কে বিপুল জ্ঞান আয়ত্ব করেছিলেন।... চলমান বহ্নি বিবেকানন্দ হিমালয়ের পথে পথে এবং সমুদ্রবক্ষে অর্ধ পৃথিবী পরিক্রমা কালে এই বিপুল জ্ঞান ভান্ডার শিষ্যাকে অকাতরে দান করেছিলেন। (সান্ত্বনা দাসগুপ্ত, ২০১৭। পৃ. ৬০)

নিবেদিতার মতে ভারতবর্ষ গড়ে উঠেছে গোষ্ঠীর পর গোষ্ঠী, সভ্যতার পর সভ্যতা, যুগের পর যুগ, বহিরাগত মানবগোষ্ঠীর বন্যা প্রবাহ মিলেমিশে এক হয়ে একটি জাতীয় সত্তায় পরিণত হয়েছে। তাই এই অখণ্ড, অবিভাজ্য ভারতবর্ষে জাতীয় চেতনা একটি সুরেই স্পন্দিত– সেখানে জাতির নামে, ধর্মের নামে সংকীর্ণ সম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই। ঐক্যবদ্ধ ভারতীয়দের যত উপাদান বৈচিত্র্য ততই তার শক্তি, তার ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য। তাই ভারতবর্ষের উপাদানের বৈচিত্র্য, জাতীয় ধর্মের বৈচিত্র্য, ভাষা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য– জাতি হিসেবে ভারতীয়দের শক্তির লক্ষণ। তাই নিবেদিতা সম্পূর্ণত জাতিভেদ প্রথা তথা সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ ভাবনার বিরোধিতা করেছেন।

বাঙালী লেখিকা, শিক্ষাবিদ এবং নারীমুক্তি আন্দোলনের পথিকৃত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) বেগম রোকেয়া নামে পরিচিত। বেগম রোকেয়ার জন্ম এমন একটি সন্ধিক্ষনে হয়েছিল যখন সম্পূর্ণ দক্ষিণ এশিয়ার হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও রক্তক্ষরণের এক চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা ছিল বেগম রোকেয়ার। এই সময় বাংলার স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১) ও গান্ধিজীর স্বরাজ আন্দোললনের সময়, যে সময় ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি চূড়ান্ত টানাপোড়নের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল সেই সময় সমগ্র ভারতের রাজনীতি ছোট ছোট খন্ড শিবিরে বিভক্ত হয়ে ব্রিটিশ রাজকে উৎখাত করার জন্য সমগ্র শক্তি এক করে দেয় দেশীয় স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য। আর সেই সময় হিন্দু, মুসলিম, শিখ ও অন্যান্য ধর্মের মানুষেরা নিজেদের অধিকারের দাবীতে পরস্পরের মধ্যে দাঙ্গায় জড়িয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদকে কেন্দ্র করে এক তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বেগম রোকেয়া তাঁর জীবনে অনেকগুলি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সাক্ষী হয়েছেন, যেমন-- ১৯৩০ সালের কানপুর দাঙ্গা, কাশ্মীর দাঙ্গা, এবং ভেলোরের সাম্প্রদায়িক হানাহানি – এই সবকিছুই ভারতের অখন্ডতা এবং শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে। বেগম রোকেয়া নিজে একজন মুসলমান মহিলা, তিনি নিয়মিত কোরান পড়তেন এবং কোরানের সারমর্ম থেকে নিজের আদর্শ গড়ে তুলেছিলেন এবং এই আদর্শকে সমাজকল্যানের জন্য ব্যবহার করতেন। তিনি কোরান পড়ে জানতে পারেন যে জাতির মুক্তি সম্পূর্ণভাবে মানসিক এবং সামাজিক স্তরে না হলে সমাজের সার্বিক বিকাশ সম্ভব নয়। বেগম রোকেয়া একজন মহান দেশপ্রমিকও ছিলেন। তিনি সারাজীবন ভারতীয় মূল্যবোধের চর্চা করেছেন এবং ভারতের ঐতিহ্যকে জাতীয় স্তরে উপস্থাপন

করার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। একই রকম ভাবে তিনি তাঁর প্রবন্ধ 'সুগৃহিণী'-তে লিখেছেন, "...আমরা শুধু হিন্দু বা মুসলমান কিংবা পার্সি বা খ্রিস্টান অথবা বাঙালী, মান্দ্রাজী (মাদ্রাজী), মাড়ওয়ারী বা পাঞ্জাবী নহি– আমরা ভারতবাসী। আমরা সর্বপ্রথমে ভারতবাসী তারপরে মুসলমান, শিখ বা আর কিছু। সুগৃহিণী এই সত্য আপন পরিবার মধ্যে প্রচার করিবেন। তাহার ফলে তাঁহার পরিবার হইতে ক্ষুদ্র স্বার্থ, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি ক্রমে তিরোহিত হইবে এবং তাঁহার গৃহ দেবভবন সদৃশ ও পরিজন দেবতুল্য হইবে।" (রোকেয়া রচনাবলী, ২০০৬ পৃ. ৩৯-৪০)

পরিবারে বেড়ে ওঠা সন্তান যখন পূর্ণ মানুষে পরিণত হবে তখন আর জাতি-ধর্ম- বর্নের ভিত্তিতে কোন ভেদাভেদ থাকবে না। রোকেয়া বিশ্বাস করতেন যে, সমস্ত ধর্মেরই এক মন্ত্র, উদ্দেশ্য একই– আর তা হল মানব সমাজের উন্নতি সাধন এবং সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠা। ভারতীয় মেয়েদের উন্নতির জন্য রোকেয়া নিজের ধর্মগ্রন্থ বাদ দিয়ে সমস্ত ধর্মের মানুষকে উপনিষদ, ভগবৎ-গীতা পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ এই বই গুলির মধ্যেই রোপিত আছে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা যা প্রাচীনতার সঙ্গে আধুনিকতাকে মিশিয়ে মানব সমাজকে উন্নতি সাধনের শিক্ষা দিয়েছে। তিনি দুটো পর্যায়ে নিজের সমস্ত চিন্তা চেতনাকে বিন্যস্ত করেছেন। প্রথমটি হল ভারতীয়দের বিশ্বাস করতে হবে যে তাদের জাতীয় পরিচয় একটি গর্বের বিষয়। এবং তাদের বিশ্বাস রাখতে হবে দেশীয় শিক্ষা পদ্ধতির উপর। এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি এটাও ভেবেছেন যে, পাশ্চাত্য শিক্ষার উপাদান গুলিকেও গ্রহণ করতে হবে। এবং এই দ্বৈত পথে ভারত যদি এগোয় তাহলে একটি আধুনিক উন্নত ঐক্যবদ্ধ সমাজে পরিণত হবে। রোকেয়া তাঁর 'সৃষ্টিতত্ত্ব' প্রবন্ধে হিন্দু এবং মুসলিম চরিত্রগুলোকে মিশিয়ে দিয়েছেন যেখানে তিনি দেখিয়েছেন, জাহেদা বেগম, সিরিন বেগম, ননীবালা দত্ত এবং বিনাপানি ঘোষ একই ছাদের তলায় রাত কাটিয়েছেন বন্ধুর মতো। সেখানে ধর্ম কোন বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। 'প্রেম রহস্য' নামক আত্মজীবনী গল্পে রোকেয়া বলেছেন---– আমি সমস্ত ধর্মের মানুষকে ভালোবাসি—হিন্দু, খ্রিস্টান, মুসলিম কিন্তু কেন আমি নিজের বিষয়ে 'সন্দিগ্ধ' [যে সন্দেহ করে]। যদিও মানুষের সাধারণ প্রবৃত্তি হল সুন্দর ও আকর্ষণীয় বস্তু বা বিষয়কে ভালোবাসা। কিন্তু এই ভালোবাসা কেবল জাতি- ধর্ম- বর্ণের ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। ভালোবাসা সমস্ত সীমারেখা অতিক্রম করে যায়। আমরা সমস্ত মানুষই সক্ষম এই ভালোবাসার ক্ষমতায় যা দিয়ে আমরা সম্পূর্ণ

বিপরীতধর্মী পরিচয়ের মানুষকে ভালোবাসতে পারবো। যদি তার সংস্কৃতি- জাতি- শ্রেনি সবকিছুই আলাদা হয় তবুও। বেগম রোকেয়া তাঁর এই দর্শনকে নিজস্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর ভালোবাসার মানুষ ছিল চম্পা, যিনি ওড়িষ্যার এক অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত মহিলা। তাঁর বন্ধু ছিলেন একজন ইংরেজ মহিলা মিসেস ডি এবং উত্তর ভারতের একজন বয়স্কা মহিলা যাকে তিনি তাঁর পেশেন্ট বলে উল্লেখ করেছেন। যদিও এই মানুষগুলি ছিলেন ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির, তবুও সবাই কে রোকেয়া আপন করে নিয়েছিলেন। রোকেয়া তাঁর জীবন আদর্শ দিয়ে আমাদের সামনে এটাই প্রতিষ্ঠা করেছেন যে ভালোবাসার উপর ভিত্তি করে আন্তঃসংস্কৃতি ও আন্তঃধর্মের মধ্যে এক অপার সমন্বয় সাধন করা সম্ভব। আমাদের একবিংশ শতাব্দীর নাগরিকদেরকে আধুনিক প্রযুক্তির উপর ভর করে রোকেয়ার এই উদার মানবিক ধর্মকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌছে দিয়ে এক অখন্ড ঐক্যের বীজ বপন করতে হবে। এটাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, সাধনা ও আকাঙ্খা হওয়া উচিত। বেগম রোকেয়া উপনিষদ পড়ে উপনিষদের মূলমন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। এটি হল--- 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। এর অর্থ হল বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব; সারা পৃথিবীই একটি পরিবার।

বেগম রোকেয়া যে সময়ে মুসলমান সমাজে বড় হয়েছেন এবং পরিবার ও সমাজের শত বাধা এবং বিরোধকে দমন করে বাইরের জগৎ-এ এসে দাঁড়িয়েছেন তা প্রায়ই অবিশ্বাস্য। একবিংশ শতাব্দীর বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সেই সময়কে বিচার করা অত্যন্ত কঠিন যখন মুসলমান মেয়েরা বোরখার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতেন—স্বামী, পুত্র, ভ্রাতা এবং পিতা ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের সামনে বের হওয়ার কথা যাঁরা কল্পনাতেও ভাবতে পারতেন না। 'রোকেয়া রচনাবলী'-র বিভিন্ন নিবন্ধ এবং গল্পগুলি পড়লে এ কথার যৌক্তিকতা জানা যায়। রোকেয়া তাঁর লেখার মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত কোথাও হিন্দু মহিলাদের প্রসঙ্গ তোলেননি। তিনি মূলত নিজের কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্রীভূত করতে চেয়েছেন মুসলমান সমাজের বিশেষত্ব মুসলমান মেয়েদের উন্নতিকল্পে। এর অর্থ এই নয় যে তিনি সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছিলেন। মুসলমান সমাজের মধ্য থেকে উঠে আসার কারণে তাঁকে ঘরে বাইরে যে প্রবল চাপের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তারপর তাঁর পক্ষে আর হিন্দু সমাজের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানো সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে হিন্দু সমাজের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের সমস্যাকে প্রত্যক্ষ করার বিশেষ সুযোগও রোকেয়া পাননি।

হিন্দু মুসলমান শিখ নির্বিশেষে তিনি ধর্মকে সরিয়ে রেখে সমস্ত বাঙালী তথা ভারতবাসীকে পরস্পরের ভাই হিসেবে গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর বিভিন্ন লেখার মধ্যে এই ভাবটি উঠে এসেছে। তাঁর কথায়, "...ধার্ম্মিক হও বা নাস্তিক হও, যাই হইতে চাও, তাহাতেই মানসিক উন্নতির (Mental Culture) প্রয়োজন।" (তদেব, পৃ. ৪১) তাঁর মতে সাম্প্রদায়িকতাকে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দিতে হলে "শিক্ষা বিস্তারই এইসব অত্যাচার নিবারণে একমাত্র মহৌষধ।" (তদেব, পৃ. ২৪) আর এজন্য প্রথমে মেয়েদেরকে প্রকৃত সুশিক্ষা দিতে হবে – "যাহা তাহাদিগকে নাগরিক অধিকার লাভে সক্ষম করিবে।" (তদেব) সুতরাং রোকেয়ার মত ছিল ভারতবাসীকে সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হলে পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মুসলমান মেয়ে এবং মহিলাদেরও উপযুক্ত সুশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

সাম্প্রদায়িক ঐক্যের কথা বলতে গেলে গান্ধিজির অমুল্য কথাটি না বললেই নয়---- "Always aim at complete harmony of thought and word and always aim at purifying yours thoughts and everything will be well."

তথ্যসূত্রঃ

- ‘Karma- Yoga’, *Complete Works of Swami Vivekananda,* vol- 1, P. 99
- Swami Lokeswarananda, (2018). Impact of Sister Nivedita on Indian Society, কালোত্তীর্ণ নিবেদিতা। রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সিটিউট অফ কালচার, গোলপার্ক। পৃ. ৩০৫
- বিষ্ণুপদ নন্দ, *সমকালের প্রেক্ষিতে আলোর দ্যুতি নিবেদিতা,* লালমাটি, যন্ত্রস্থ
- বিষ্ণুপদ নন্দ (যন্ত্রস্থ)। তদেব।
- বিষ্ণুপদ নন্দ (যন্ত্রস্থ)। তদেব।
- বিষ্ণুপদ নন্দ (যন্ত্রস্থ)। তদেব।
- বিষ্ণুপদ নন্দ (যন্ত্রস্থ)। তদেব।
- শঙ্করীপ্রসাদ বসু (তৃতীয় খণ্ড), লোকমাতা নিবেদিতা, পৃ. ৪৮-৪৯
- শঙ্করীপ্রসাদ বসু (তৃতীয় খণ্ড), তদেব।
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। God Gives, Man Robs, *রোকেয়া রচনাবলী।* বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃ. ৪৯১
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব।
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। Letter to Mujibar Rahaman; R.S. Hossain, The Mussalman, Nov 30, 1917*, রোকেয়া রচনাবলী।* বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃ. ৫২০
- মল্লিকা ব্যানার্জী (২০১৪)। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে দু একটি ভাবনা, *ইতিহাসে নারী শিক্ষা,* প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স। পৃ. ৫১
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। *রোকেয়া রচনাবলী।* বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃ. ১১-১২
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ. ২৪৯
- শামসুন নাহার (১৯৮৭)। রোকেয়া জীবনী। বুলবুল পাবলিশিং হাউস, শান্তিনগর, ঢাকা। পৃ. ২২
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ. ২৩

- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ. ২৯০-২৯১
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ. ৩২৯
- ‘পথে প্রান্তরে’(১৩.১২.১৯৯৮) । *দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা।*
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। *রোকেয়া রচনাবলী।* বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃ. ৪৯১
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ. ৩৯১
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ. ২৫৭
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ. ৩৮
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ. ৩০
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ. ৩৭
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ. ৪২
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ. ১০৬
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ. ১১১-১১৫
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ. ২৮৯
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ. ৪৮৮
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ. ২৮৯
- রোকেয়া জীবনী’, (২০০৯) সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ৬২-৬৩)
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। *রোকেয়া রচনাবলী।* বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃ. ১৩৩-৩৪
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ. ১৪৭
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ-১৫৩
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ-৪০০
- গোলাম মুর্শিদ (১৯৯৩)। নারী প্রগতির একশো বছরঃ রাস সুন্দরী থেকে রোকেয়া। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা পৃ. ১৫৫

- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। *রোকেয়া রচনাবলী*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃ. ১১-১২
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ. ২১
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব। পৃ. ৩১-৩২
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব। পৃ. ৩৫
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব। পৃ. ৪৫
- প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা (সম্পাদনা) (২০১৭)। *নিবেদিতা : চিরন্তন প্রেরণা। শ্রী সারাদা মঠ, দক্ষিনেস্বর, কোলকাতা।* পৃ. ৫২
- প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা (সম্পাদনা) (২০১৭)। তদেব।
- প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা (সম্পাদনা) (২০১৭)। তদেব, পৃ. ৫৪
- প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা (সম্পাদনা) (২০১৭)। তদেব।
- সান্তনা দাসগুপ্তা (২০১৭)। নিবেদিতার ভারত চেতনা। *দক্ষিনেস্বর, কোলকাতা।* পৃ. ৬০
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। *রোকেয়া রচনাবলী*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃ. ৩৯-৪০
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ. ৪১
- আব্দুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব, পৃ. ২৪
- আব্দুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। তদেব।

সপ্তম অধ্যায়

আলোচনা

৭.১	নিবেদিতা ও রোকেয়া সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মতামত
৭.২	আলোচনা
৭.৩	জাতীয় শিক্ষানীতি 2020—ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার ভাবনার প্রতিফলন
৭.৪	উপসংহার
৭.৫	বর্তমান কালে শিক্ষা ক্ষেত্রে ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার’ শিক্ষা ও সমাজ ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা
৭.৬	গবেষকের সুপারিশ
৭.৭	গবেষণার সীমাবদ্ধতা সমূহ
৭.৮	পরবর্তী গবেষণার পথ নির্দেশ
	তথ্যসূত্র

সপ্তম অধ্যায়

আলোচনা

৭.১ ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়া সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মতামত

বর্তমান গবেষিকা একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার শিক্ষা ও সমাজ ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা কতখানি তা জানার চেষ্টা করেছেন। এজন্য বর্তমান গবেষিকা চারজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ তথা ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়া চর্চায় আধুনিক কালের পথিকৃৎদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণের জন্য গবেষিকা কার্যদর্শী বা সুপারভাইজার -এর সহায়তায় চারটি মুক্ত প্রশ্নাবলী (Open-ended question naire) তৈরি করেন এবং ভগিনী নিবেদিতার ও বেগম রোকেয়ার চর্চায় অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া ব্যক্তিত্বদের সম্মুখীন হন। নীচে চারজন ব্যক্তিত্বের দেওয়া প্রশ্নোত্তরগুলি যথাক্রমে পর্যায়ক্রমে সাজানো হয়েছে।

অধ্যাপক মনোতোষ দাশগুপ্ত

অধ্যাপক মনোতোষ দাশগুপ্ত – রসায়ন বিজ্ঞানে Ph.D. ডিগ্রী প্রাপ্ত। প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতে অধ্যাপনা করেছেন। বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্ক, কলকাতাতে ভারততত্ত্ব বিভাগে ভিজিটিং অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ প্রাচীন ভারতের পরিবেশ বিজ্ঞান, বিবেকানন্দ, নিবেদিতা, রবীন্দ্রনাথ,

বেগম রোকেয়া প্রমুখদের বিষয়ে বহু পুস্তকের রচয়িতা এবং একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ প্রাবন্ধিক। ভারত এবং বাংলাদেশে ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার রচনার অন্যতম পথিকৃৎ।

প্রথম প্রশ্ন : বিবেকানন্দ কেন ভগিনী নিবেদিতাকে আহ্বান জানালেন ভারতবর্ষে আসার জন্য?

বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে প্রথম ভারতবর্ষে আসবার জন্য আহ্বান জানাননি। কারণ বিবেকানন্দের মনে হয়েছিল কোন বিদেশিনীর পক্ষে ভারতবর্ষে কল্যাণময়ী নারীদের শিক্ষাদান করা এবং তাদের স্বশক্তিকরণ করা প্রায় অসম্ভব। এখানকার দারিদ্র, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, রুগ্ন-জীর্ণ-শীর্ণ প্রায় উলঙ্গ মানুষগুলির পক্ষে কোনো বিদেশিনীর দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ সহজ নয়। কিন্তু একদিকে নিবেদিতার পক্ষে ছিল ভারতবর্ষে আসার এবং স্বামীজীর হয়ে ভারত মাতার সেবা করার প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ এবং অন্যদিকে তাঁর বাবার এক বন্ধুর ভবিষ্যৎবাণী যে ভারতবর্ষ তোমার জন্য আকুল হয়ে অপেক্ষা করছে। তোমাকে যেতে হবে। এমন নয় যে, বিবেকানন্দের সমসাময়িক কালে ভারতবর্ষে নারী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। বিদ্যাসাগর এই কাজ শুরু করেছিলেন এবং কতক অংশে সফলও হয়েছিলেন – যদিও তা ছিল মেয়েদের জন্য পাশ্চাত্যধর্মী শিক্ষার অনুকরণ। বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন এমন একজন মহীয়সীকে যিনি ভারতবর্ষের নারীদের কল্যাণকল্পে আত্মনিবেদন করবেন। বিবেকানন্দ তাঁর সময়কালে এমন কাউকে পাননি যিনি নিবেদিতার ন্যায় শিক্ষিতা এবং একইসঙ্গে শিক্ষিকাও বটে। তাই বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে ভারতবর্ষে আসতে আহ্বান জানিয়েছিলেন ভারতবর্ষের নারী শক্তির শিক্ষা ও উন্নয়নকল্পে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : বেগম রোকেয়ার নারী শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস এবং ভগিনী নিবেদিতার নারী শিক্ষা প্রসারের যে প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে সম্পর্ক কি?

ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়া এই দুই মহীয়সী নারীর শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস এবং প্রচেষ্টার মধ্যে সামান্য মিল থাকলেও অমিলটাই বেশি। নিবেদিতা কিংবা রোকেয়া কেউই বঙ্গদেশে প্রথম মেয়েদের জন্য শিক্ষার কাজ শুরু করেননি। বিদ্যাসাগর, বেথুন সাহেব, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ বাঙালি কৃতি পুরুষেরা নিবেদিতা এবং রোকেয়ার পূর্বেই মেয়েদের শিক্ষার কাজ শুরু করে

দিয়েছিলেন। নিবেদিতা এবং রোকেয়ার প্রয়াস নারী শিক্ষায় নতুন শক্তি সঞ্চারিত করেছিল। নিবেদিতা যদিও বিবেকানন্দের আহ্বানে ভারতবর্ষে এসেছিলেন মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারের জন্য কিন্তু তিনি কেবলমাত্র নারী শিক্ষাদানে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেননি। বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, চিত্রাঙ্কন এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি অনায়াসে পা ফেলে দিয়েছিলেন—সমস্ত ক্ষেত্রকেই তিনি উদ্দীপিত করে গেছেন। ভারতীয় মেয়েদের জন্য ঠিক যেমন শিক্ষাটি প্রয়োজন তেমনটির ব্যবস্থা করেছিলেন নিবেদিতা। কারণ নিবেদিতা ধরতে পেরেছিলেন ভারতীয় নারীর অন্তরের সুরটিকে। তিনি কেবলমাত্র প্রথাগত শিক্ষাদানের মধ্যে নিজেকে আটকে রাখেন নি, প্রথা ভেঙে তিনি শিক্ষাদানের নতুন দিগন্তকে উন্মোচন করেছেন। এই হিসাবে তিনি একজন শিক্ষা বিজ্ঞানী। মেয়েদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলা, আত্মবলিদান ইত্যাদি বিষয়ের উপর যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন, তেমনি সেই সময়কার প্রয়োজন অনুযায়ী মেয়েদেরকে ঘরকন্যার হাতের কাজের প্রশিক্ষণও দিয়েছিলেন। শিক্ষিকা হিসেবে নিবেদিতা যেমন একজন সফল ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন তেমনি লেখিকা তথা পত্র সাহিত্যিক হিসেবেও তাঁর সামর্থ্য ছিল প্রশ্নাতীত।

বেগম রোকেয়া নিবেদিতার সমসাময়িক ছিলেন। তাঁকে জীবনে অসংখ্য বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আর তাই মেয়েদের মধ্যে আপন ভাগ্য জয় করবার সামর্থ্যটুকু তৈরি করে দিতে চেয়েছিলেন। রোকেয়া বুঝেছিলেন শিক্ষা ব্যতীত মেয়েদের উন্নতি সম্ভব নয়। মুসলমান সমাজে এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দু সমাজেও বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, পর্দাপ্রথার অভিশাপ মেয়েদেরকে বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছিল। এই অবস্থার মুক্তি সম্ভব ছিল কেবলমাত্র মেয়েদের শিক্ষার মাধ্যমে। তাই স্বাভাবিকভাবেই মেয়েদের মধ্যে বিশেষত মুসলমান সমাজের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য রোকেয়া চেষ্টা করেছিলেন। রোকেয়া রচনাবলীর প্রতিটি ছত্রে নারী শিক্ষার জন্য তাঁর কতখানি ব্যাকুলতা ছিল তার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই।

নিবেদিতা ছিলেন একজন শিক্ষা বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞান সাধনায় মগ্ন থেকে নিত্য নতুন আবিষ্কারের লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। নিবেদিতাও তেমনি বিজ্ঞানীদের ন্যায় শিক্ষাক্ষেত্রে নিত্যনতুন আবিষ্কারের নেশায় মেতে থাকতেন। তাঁর এ কাজ শুরু হয়েছিল সুদূর লন্ডনে আর তার পরিপূর্ণতা ঘটে ভারতবর্ষ তথা বঙ্গদেশে। অন্যদিকে বেগম রোকেয়া ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ। কারণ তিনি তৎকালীন সময়ের প্রথাগত স্কুল শিক্ষার

ঘেরাটোপ থেকে নিজেকে বার করতে পারেননি। বিজ্ঞানীদের ন্যায় শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিত্য নতুন আবিষ্কারে মেতে উঠতে পারেননি, যদিও তাঁর সেই সুযোগ ছিল।

তৃতীয় প্রশ্ন : ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়া উভয়েই কি সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করতে পেরেছিলেন?

সাম্প্রদায়িকতা বা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি বলতে বোঝায় নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রীতি এবং অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ। নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার লেখা বই, পত্র-পত্রিকা এবং বিভিন্ন সভার বক্তৃতা গুলি পড়লে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়া কেউই সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট ছিলেন না। নিবেদিতা যদিও মূলত হিন্দু মেয়েদের নিয়ে কাজ করেছিলেন, কিন্তু কোনভাবেই মুসলমান বা অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম সমাজের মধ্যে সে সময়ে তাঁর পক্ষে কাজ করার সুযোগ ছিল না। একজন বিদেশিনীর পক্ষে মুসলমান মহল্লাতে গিয়ে পর্দানসীন মেয়েদের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা সেই সময়ে প্রায় অসম্ভব ছিল। তাছাড়া বাগবাজার অঞ্চল ছিল মূলত হিন্দু অধ্যুষিত। বাগবাজারে নিবেদিতা বাস করতেন এবং নিজগৃহে বাগবাজার পল্লীর মেয়ে এবং মহিলাদের শিক্ষার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। তাই আপাতভাবে ভগিনী নিবেদিতা কেবলমাত্র হিন্দু মেয়েদের শিক্ষার জন্য চেষ্টা করেছিলেন এই কথাটি সঠিকভাবে প্রযোজ্য নয়।

বেগম রোকেয়াকেও কোন অর্থেই সাম্প্রদায়িক বলতে পারিনা। নিজে মুসলমান মহিলা হওয়ার কারণে মুসলমান সমাজে মেয়েদের যন্ত্রণাকে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি নিজেও সারা জীবন আপাতভাবে নারীর সুখের সুযোগ লাভ করেননি। যেহেতু মুসলমান সমাজের মধ্যেই তার আনাগোনা অধিক ছিল এবং যেহেতু মুসলমান মেয়েরা শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং স্বশক্তি অর্জন করার সুযোগ পাচ্ছিলেন না, তাই রোকেয়া মুসলমান মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর স্কুলে বহু হিন্দু পরিবারের মেয়েরাও শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন। এমনকি এখনও তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলে বহু সংখ্যক হিন্দু মেয়ে লেখাপড়া করেন। বেগম রোকেয়ার কোন লেখায়, বক্তৃতায় বা চিঠিপত্রে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী বক্তব্য

ছিল না। তাই কোন অর্থেই বেগম রোকেয়াকে সাম্প্রদায়িক বলা চলে না। দুজনেই সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করতে পেরেছিলেন।

চতুর্থ প্রশ্ন : আজকের সমাজে এই দুই মহীয়সী নারীর শিক্ষাভাবনার প্রাসঙ্গিকতা কতখানি?

ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়া এই দুই জন মহীয়সী নারীর শিক্ষা ভাবনা আজও অবশ্যই প্রাসঙ্গিক। নিবেদিতার সম্বন্ধে এক কথায় বলতে পারি, তাঁর শিক্ষা ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা তিনটি বিশেষ ক্ষেত্রে –

১. সাধারণ শিক্ষা

২. বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা

৩. শিশু শিক্ষা।

শিশু শিক্ষা সবচেয়ে কঠিনতম কাজ। পাশ্চাত্যের কোন কোন দেশে সবচেয়ে বুদ্ধিদীপ্তরা শিশু শিক্ষক/শিক্ষিকা হিসেবে নিযুক্তি লাভ করেন। এজন্য তাদের অধিক বেতনও দেওয়া হয়। কারণ একজন উন্নত গুণমানের শিক্ষক শিশুদেরকে তৈরি করার সামর্থ্য রাখেন জাতির মেরুদণ্ড হিসেবে গড়ে তুলতে। নিবেদিতার শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে যে সমস্ত গবেষণা হয়েছে এবং তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্রীরা যে অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরেছেন তার থেকে স্পষ্ট যে নিবেদিতা প্রকৃত অর্থেই ছিলেন একজন শিশু শিক্ষিকা। বাস্তব উদাহরণ প্রয়োগ করে তিনি অত্যন্ত কঠিন এবং জটিল বিষয়গুলিকে নবাগত শিক্ষার্থীদের সামনে সহজভাবে তুলে ধরতেন – যা হয়ে উঠতো তাদের মনের খাদ্য। নবাগতা মেয়েদের এবং মহিলাদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কিভাবে ইংরেজির বর্ণগুলিকে প্রয়োগ করা যায় সে সম্বন্ধে তিনি অতি উচ্চগুণমানের ভাবনা সমূহ রেখে গেছেন। তিনি আপাতভাবে বিমূর্ত বিষয়গুলিকে ছবির মত শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করতেন। Reading, Writing, Arithmetic বিষয়ে পাঠদান কালে তিনি ৫ টি জ্ঞানেন্দ্রিয়কেই ব্যবহার করতেন।

তিনি তাঁর গুরুদেবের মতো শিক্ষার্থীর অন্তরে যে সম্পূর্ণতা প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে তার পরিপূর্ণ বিকাশের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি চেয়েছিলেন প্রতিটি একক শিক্ষার্থী হয়ে উঠবে একটি সমগ্র সমাজ। প্রতিটি

একক হবে Community Atom। তার মত ছিল প্রতিটি শিক্ষার্থী তথা প্রতিটি শিশু এমন কিছু করে যাবে যাতে সে সমাজের পক্ষে সমাজের একজন হয়ে উঠতে পারে।

বেগম রোকেয়া ছিলেন একাধারে লেখিকা শিক্ষাব্রতী। তিনি লড়াই করেছিলেন মুসলমান মেয়েদের পর্দার বাইরে সমাজের মূল স্রোতের মধ্যে বের করে আনতে। এজন্য তিনি লেখনীকে যেমন তুলে নিয়েছিলেন তেমনি গড়ে তুলছিলেন মুসলমান মেয়েদের জন্য একটি আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাঁর ভাবনা অনেকখানি ছিল একমুখী। মুসলমান সমাজে বিশেষত মুসলমান মেয়েদের অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং অজ্ঞানতা তাদেরকে এবং তাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের যূপকাষ্ঠে যুগ যুগ ধরে করেছে নিষ্পেষিত। প্রায় একশত বছর আগে বেগম রোকেয়া এই সত্যকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাই প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং নিশ্চয়তাকে ত্যাগ করে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মুসলমান সমাজের বিশেষত মুসলমান মেয়েদের উন্নয়নে। আজও পর্যন্ত মুসলমান সমাজ একশো বছর পূর্বের দারিদ্র, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারেনি, তাই আজও রোকেয়ার শিক্ষা ও সমাজ ভাবনা সমানভাবেই প্রাসঙ্গিক।

অধ্যাপক রাধারমন চক্রবর্তী

অধ্যাপক রাধারমন চক্রবর্তী নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রথিতযশা অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপক চক্রবর্তী বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা -এর 'মানবাধিকার' এবং 'ভারততত্ত্ব চর্চা' বিষয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক। সুবক্তা, ক্ষুরধার যুক্তি সমন্বিত সমালোচক তথা প্রাবন্ধিক হিসেবে পরিচিত। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নিবেদিতা, বেগম রোকেয়া প্রমুখদের বিষয়ে নিরন্তর চর্চারত এবং এঁদের উপরে প্রকাশিত বইতে তিনি অধ্যায় দান করেছেন।

প্রথম প্রশ্ন : বিবেকানন্দ কেন ভগিনী নিবেদিতাকে আহ্বান জানালেন ভারতবর্ষে আসার জন্য?

বিবেকানন্দ প্রথমেই মার্গারেট এলিজাবেথ-এর মধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন গভীর অনুসন্ধিৎসা। মার্গারেটের আহ্বানে স্বামী বিবেকানন্দ লন্ডনে তার স্কুলে গিয়েছিলেন এবং লক্ষ্য করেছিলেন যে, মার্গারেট কেবলমাত্র একজন শিক্ষিকা নয়, একজন শিক্ষা বিজ্ঞানী হওয়ার সমস্ত উপকরণ রয়েছে তাঁর মধ্যে। বিবেকানন্দের বক্তৃতায়, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে, ব্যক্তিত্বে এবং সর্বোপরি ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর অনন্ত প্রেম মার্গারেটকে ভারতে আসার জন্য ভেতর থেকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। মনে মনে মার্গারেট স্বামীজীকে গুরু বলে স্বীকার করেন। মার্গারেট একাধিকবার চিঠিতে স্বামীজীকে লিখেছেন তাঁর ভারতে আসার ইচ্ছার কথা এবং বিবেকানন্দের নেতৃত্বে ভারতমাতার সেবায় আত্মনিয়োগ করার আগ্রহের কথা। বিবেকানন্দ প্রথমেই নিবেদিতার ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন কিন্তু তাঁর সন্দেহ ছিল একজন বিদেশিনী মহিলা যিনি আপাদমস্তক অতি উচ্চ গুণমানের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতা, তাঁর পক্ষে ভারতে এসে ভারত মাতার সেবা করা সম্ভব কিনা? কারণ ভারতবর্ষের দারিদ্র্য, সর্বসাধারণের অজ্ঞতা, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা এবং ধর্মবিদ্বেষ, প্রতিকূল আবহাওয়া এবং সর্বোপরি অর্ধ উলঙ্গ নারী পুরুষের সমাহার বঙ্গদেশে মেয়েদের শিক্ষাদানের গুরুত্ব বিষয়ে বিবেকানন্দের কোন সন্দেহ ছিল না। যদিও ইতিপূর্বে বিদ্যাসাগর এবং অন্যান্যরা বাংলার বহু স্থানে সাধারণ মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু ভারতীয় ভাবে একটি স্কুলের প্রয়োজনীয়তা বিবেকানন্দ গভীরভাবে অনুভব করেন। অথচ এদেশে তাঁর চোখের সামনে এমন কেউ ছিলেন না যাঁকে দিয়ে তিনি তাঁর ভাবনা মত মেয়েদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন। তাই একপ্রকার বাধ্য হয়ে স্বামী বিবেকানন্দ মার্গারেটকে ভারতে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন মার্গারেট এর ভিতরের ব্যক্তিত্ব, স্বাধীন চেতা মনোভাব, কর্মে ঐকান্তিকতা এবং সর্বোপরি তাঁর কেল্টিক রক্ত তাঁকে এই বিশেষ কাজের জন্য সর্বতোভাবে উপযোগী করেছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : বেগম রোকেয়ার নারী শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস এবং ভগিনী নিবেদিতার নারী শিক্ষা প্রসারের যে প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে সম্পর্ক কি?

ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়া দুজনেই কলকাতায় থেকে মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী হয়েছিলেন। ইংল্যান্ড থেকে আসার কারণে আয়ারল্যান্ড দুহিতা মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্লকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এবং তার সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে পাঠ গ্রহণ করতে হয়েছিল এবং বিবেকানন্দের ব্যবস্থাপনায় ব্রহ্মচারী সদানন্দের নিকট বাংলা ভাষা শিখতে হয়েছিল। নিবেদিতা বুঝেছিলেন দেশকে না জানলে দেশের মানুষকে জানা যায় না। আবার দেশের মানুষকে জানতে না পারলে তাদের সমস্যাগুলো অনুধাবন করা সম্ভব নয়। তাই নিবেদিতা এ দেশে নারী শিক্ষার প্রসারে ভূমিকা পালনের পূর্বেই নিজেকে ঐ কাজের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি ভারতীয় ভাবে ভারতীয় মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী হয়েছিলেন। তাঁর পাশ্চাত্য শিক্ষা, বিভিন্ন বিষয়ে পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, লন্ডনের সমাজের উচ্চ সামাজিক মর্যাদার মানুষের সঙ্গে পরিচয় এবং ওঠাবসা, এভেঞ্জার কুকু-এর সান্নিধ্যে চিত্রাঙ্কনে দক্ষতা অর্জন, প্রচুর বই পড়বার অভ্যাস এবং সর্বোপরি শিক্ষিকা তথা শিক্ষাবিদ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস তাঁকে এদেশে মেয়েদের শিক্ষাকার্যে এগিয়ে আসতে প্ররোচিত করেছে। নিজস্ব ভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি অবলম্বন করে তিনি এদেশের মেয়েদের দেশীয়ভাবে শিক্ষাদানের চেষ্টা করেছেন।

বেগম রোকেয়া বঙ্গ দেশে জন্মান এবং প্রথমে ভাগলপুরে ও অনতিকাল পরে কলকাতায় তাঁর কাজ শুরু করেন। তাঁর চিন্তা ভাবনা ছিল মূলত মুসলমান মেয়েদের শিক্ষাকে কেন্দ্র করে। যদিও তাঁর এই কাজটি সেই সময়ে সহজ ছিল না। কোন কোন প্রগতিশীল মুসলিম পরিবার তাঁদের মেয়েদের জন্য অন্দরের চার দেওয়ালের মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করলেও সামগ্রিকভাবে মুসলমান সমাজ এবং তাদের মেয়েরা শিক্ষার আঙিনা থেকে দূরেই ছিলেন। পশ্চাৎপদ মুসলিম পরিবারের মেয়েদেরকে সেই সময়ে শিক্ষার আঙিনায় আনা সহজ বিষয় ছিল না। রোকেয়ার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, দৃঢ়চেতা মনোভাব এবং কাজের প্রতি নিষ্ঠা তাঁকে মুসলমান মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে

সক্ষম করেছিল। যদিও তাঁর সময়েই তাঁর দ্বারা স্থাপিত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলে মুসলমান মেয়েদের সাথে সাথে হিন্দু মেয়েরাও লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

উভয়ের কর্মপদ্ধতি এক ছিল না। সমস্যার প্রকারভেদ এবং মাত্রাও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। প্রায় একই সময়কালে দুজনেই কলকাতাকে ভিত্তি করে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু দুজনের মধ্যে কখনো সাক্ষাৎ হয়নি বা হয়ে থাকলেও এ বিষয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি। এমনকি একজন অন্যজনের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র জ্ঞাত ছিলেন কিনা তাও জানা যায়নি।

তৃতীয় প্রশ্ন : ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়া উভয়েই কি সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করতে পেরেছিলেন?

ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়া কেউই সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। আপাতভাবে স্থূল বুদ্ধিতে মনে হতে পারে দুজনেই ছিলেন চরম সাম্প্রদায়িক। নিবেদিতা জন্মগতভাবে প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। স্বামী বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে এসে বেদান্তের পথে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেন এবং মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল্ থেকে ভগিনী নিবেদিতাতে রূপান্তরিত হন। তিনি কলকাতার বাগবাজার অঞ্চলে থাকতেন। বাগবাজার, শ্যামবাজার, শোভাবাজার, হাতিবাগান প্রভৃতি স্থানে তখন কেবলমাত্র হিন্দু পরিবারেরই বাস ছিল। তাই স্বাভাবিকভাবেই ভগিনী নিবেদিতা হিন্দু পরিবারের মেয়েদের নিয়ে স্কুল তৈরি করেছিলেন এবং ছাত্রীদেরকে হিন্দু ভাবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর লেখায়, চিঠিপত্রে, বক্তৃতায় – কোথাও তিনি মুসলমান মেয়ে বা খ্রিস্টানদের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ ছিলেন এমন কথা জানা যায় না।

বেগম রোকেয়া অভিজাত মুসলিম পরিবারের কন্যা ছিলেন। বিয়েও করেছিলেন একজন অভিজাত উচ্চশিক্ষিত উচ্চপদে কর্মরত মুসলমানকে। পিতৃ পরিবার এবং স্বামীর ঘরে থাকাকালীন আপন প্রচেষ্টায় যথাক্রমে নিজের বড় দাদা এবং স্বামীর সান্নিধ্যে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। বাকিটুকু আপন প্রচেষ্টায় অর্জন করেছিলেন। মুসলমান মেয়েদের দুরবস্থা তিনি নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং অনুভব করেছিলেন অশিক্ষিত-ধর্মান্ধ-দরিদ্র মুসলমান পরিবারের মেয়েদের অসহায় অবস্থা। ঐ সকল মেয়েদের কান্না তাঁকে স্পর্শ করেছিল এবং তাঁর

হৃদয়কে দ্রবীভূত করেছিল। তাই শত বাধা বিঘ্নের পাহাড়কে অতিক্রম করে মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা এবং বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর লেখায়, চিঠিপত্রে, বক্তৃতায় কোথাও হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ধর্মের বিরোধিতা চোখে পড়েনি। এমনকি তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর স্কুলে মুসলমান মেয়েদের সাথে সাথে হিন্দু মেয়েরাও লেখাপড়া করত। তাই স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন আসা উচিত নয় যে রোকেয়া সাম্প্রদায়িক ছিলেন কিনা?

চতুর্থ প্রশ্ন : আজকের সমাজে এই দুই মহীয়সী নারীর শিক্ষাভাবনার প্রাসঙ্গিকতা কতখানি?

ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার শিক্ষাভাবনা ও সমাজ ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা আজও যথেষ্টই রয়েছে। স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পরেও একশ বছর পূর্বে ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়া যে ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তা আজও সমান ভাবে প্রযোজ্য। বর্তমানে মেয়েরা ঘরে ঘরে উচ্চশিক্ষা লাভ করছে। প্রাক বিবাহ এবং বিবাহ পরবর্তী যুগে যথাক্রমে পিতৃগৃহে এবং স্বামীর গৃহে তারা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করছে। কর্মক্ষেত্রেও মেয়েদের অংশগ্রহণ যথেষ্ট চোখে পড়ার মত। কিন্তু এতদ্ স্বত্বেও মেয়েরা আজও ঘরে-বাইরে এবং কর্মস্থলে ধর্ষণের শিকার। শ্লীলতাহানিও প্রাত্যহিক ঘটনা। অনেক রকমের সুযোগ পাওয়ার পরেও মেয়েরা আজও সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন, একাকী। শিক্ষালাভ করেও সমাজের সর্বস্তরে তাদের ক্ষমতায়ন ঘটেনি। এমনকি বহু ক্ষেত্রে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেও তাদের কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা এখনো নেই। কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা যে অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করতে পারে না। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বর্তমানের প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিতা মেয়েরা। ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়া চেয়েছিলেন শিক্ষার মাধ্যমে মেয়েদের ক্ষমতায়ন ঘটবে এবং তাদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তাধারার বিকাশ ঘটবে। যেহেতু আজও তা সম্ভব হয়নি তাই আজও ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার শিক্ষা ভাবনা ও সমাজ ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে যায়নি।

অধ্যাপক সনৎকুমার ঘোষ

অধ্যাপক সনৎকুমার ঘোষ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা বিভাগে অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান এবং কলা অনুষদে অধ্যক্ষ রূপে সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন। অবসর গ্রহণের পর অধ্যাপক ঘোষ নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুল অফ এডুকেশনে অধ্যাপক রূপে দীর্ঘকাল কর্মরত ছিলেন। শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণার জন্য অধ্যাপক ঘোষ ভারতে এবং বহির্ভারতে একজন পরিচিত ব্যক্তিত্ব। শিক্ষা বিজ্ঞান বিষয়ক তাঁর একাধিক উল্লেখযোগ্য বই প্রকাশিত। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক অধ্যাপক ঘোষ ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়া চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ।

প্রথম প্রশ্ন :–বিবেকানন্দ কেন ভগিনী নিবেদিতাকে আহ্বান জানালেন ভারতবর্ষে আসার জন্য?

প্রথমত হচ্ছে বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে আয়ারল্যান্ড থেকে নিয়ে এলেন না নিবেদিতা নিজেই হিন্দু ধর্মের যে বৈদান্তিক ব্যাখ্যা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজেই এলেন, এ নিয়ে দ্বিমত থাকতেই পারে। আমার ধারণা নিবেদিতা নিজেই আগ্রহী হলেন ভারতীয় দর্শন বা বেদান্ত দর্শনকে আরো ভালো করে জানতে বা বুঝতে। ভারতীয়দের অবস্থা কেমন সেটা জানার জন্য তিনি নিজেই আগ্রহী হয়েছিলেন এখানে আসার জন্য। এবং যেহেতু স্বামী

বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত হলেন ফলে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনে এসে যোগদান করলেন। যদিও পরবর্তীকালে সেটির কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছিল। মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় সংস্কৃতি, সভ্যতা, সমাজ জীবন বোঝার জন্য এবং জানার জন্য তাঁর এদেশে আগমন। বিবেকানন্দের বেদান্ত সম্পর্কিত বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ হয়েই নিবেদিতা এদেশে এসেছিলেন। নিবেদিতা কিন্তু প্রথম থেকেই স্পিরিচুয়ালিস্টিক ছিলেন, বিভিন্ন গির্জায় যেতেন, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখালেখি করতেন বিভিন্ন বিষয় Publish করতেন এবং তার মধ্যে একটা Spiritualism ছিল এবং তার সঙ্গে ভারতীয় যে Spirituality সেটাকে তিনি মেলানোর চেষ্টা করেছেন এবং তিনি বুঝতে পারলেন এতদিন ধরে তিনি যা জানতেন তার থেকে অনেকটা আলাদা হচ্ছে এই ভারতীয় দর্শন তত্ত্ব। আর এই জন্যই নিবেদিতা আকৃষ্ট হয়েছিলেন ভারতে আসার জন্য। এসে তিনি দেখলেন যে অনেক রকম কুশিক্ষা রয়েছে, অনিয়ম রয়েছে, বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে। এসব দেখে তিনি বুঝতে পারলেন যে এখানে একটা পরিবর্তন দরকার এবং সেই পরিবর্তনটা শিক্ষার মধ্য দিয়েই হতে পারে। তারপর তিনি এসে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং Develop করার চেষ্টা করেন। এটাই আমার ধারণা।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : বেগম রোকেয়ার নারী শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস এবং ভগিনী নিবেদিতার নারী শিক্ষা প্রসারের যে প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে সম্পর্ক কি?

উনারা যে সময় এসেছিলেন এবং চেষ্টা করেছিলেন সেটা একটা সময় ছিল। তার আগের অবস্থাটা কেমন – আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের অশিক্ষা, কুশিক্ষা, নারীদের শিক্ষার ব্যাপারে কোন বন্দোবস্ত ছিল না এবং নারীরা কি শিখবে কিভাবে শিখবে সে বিষয়েও কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। উনারা যেটা করেছিলেন তা হল তাদের মতো করে মেয়েদের শিক্ষাটা শুরু করেছিলেন। নারী শিক্ষা শুরু হয়েছিল। তখন নিবেদিতা গার্লস স্কুলে যে কজন ছাত্রী ভর্তি হত এখন তার থেকে অনেক বেশি ছাত্রী ভর্তি হয়। একটা expectation তো রয়েছেই। সেদিক থেকে এটা অন্তত পরিমাণগত দিক। একটা পরিবর্তন তো হয়েছে। কারণ এখন বহু মেয়েরা স্কুলে পড়ছে, কলেজে পড়ছে, ইউনিভার্সিটি যাচ্ছে, পড়ছে এবং তার সূচনাটা কিন্তু ঐ সময় থেকেই হয়েছে। বিদ্যাসাগর শুরু করেছিলেন তার আগেই কিন্তু মেয়েদের জন্য যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেটা কিন্তু নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার উদ্যোগেই শুরু হয়েছিল আমাদের এই অঞ্চলে। ভারতীয় উপমহাদেশের এই অংশটিতে বেগম

রোকেয়া যেমন মুসলিম নারীদের শিক্ষার জন্য গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন কারণ উনি দেখেছিলেন মুসলিম নারীরা ভীষণ কষ্টের মধ্য দিয়ে চলছে। মেয়েরা তাদের স্বাধীন চিন্তাভাবনা, চেতনা প্রকাশ করার কোন সুযোগ পাচ্ছে না, অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে। এই বিষয়ে রোকেয়ার একটা লেখা আছে 'অবরোধবাসিনী'। রোকেয়া মেয়েদের এই অবস্থা গুলি অনুভব করেছিলেন সেজন্য তিনি মনে করেছিলেন প্রথমে দরকার হল মেয়েদের সঠিক শিক্ষাটা দেওয়া।

আর বেগম রোকেয়ার Activity গুলি কলকাতাকে ভিত্তি করে শুরু হয়েছিল ঠিকই কিন্তু তার আগে শুরু হয়েছিল ভাগলপুরে। ভাগলপুরে প্রচণ্ড বিরোধিতা হয়েছিল পরিবারের মধ্যে এবং পরিবারের বাইরে। কলকাতায় তারপর তিনি সেই Space টা পেয়েছিলেন। কলকাতায় তিনি স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন, শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। সেই সময় সিস্টার নিবেদিতা স্কুল এবং সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করেছিল কিনা সেটিও গবেষণার বিষয় হতে পারে।

আর বেগম রোকেয়ার জন্মস্থান হচ্ছে রঙপুরে। ওই অঞ্চলেও তাঁর প্রচুর অবদান আছে। বিশেষ করে শেখার সঙ্গে সঙ্গে হাতে-কলমে কাজ করার ব্যবস্থা কিন্তু ওই অঞ্চলে শুরু হয়েছিল। তার মানে আজকের দিনে যেটাকে আমরা ভোকেশনাল এডুকেশন এর কথা বলছি সেটা কিন্তু বেগম রোকেয়া মুসলিম নারীদের জন্য বিদ্যালয় শিক্ষার পাশাপাশি একটা ব্যবস্থা করেছিলেন। এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক। মানে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার জন্য। শুধু স্বাবলম্বী নয় নারীর ক্ষমতায়ন করার জন্য নারীকে স্বাবলম্বী করে তোলা প্রয়োজন - এটা বেগম রোকেয়ার একটা বড় অবদান ছিল।

এদিকে সিস্টার নিবেদিতাও কিন্তু একই রকম ভাবে যখন রামকৃষ্ণ মঠের সঙ্গে তাঁর একটু মতবিরোধ হল, কারণ মঠ-মিশনের যে আইন সেই আইনের মধ্যে তো উনি পড়ছিলেন না। স্কুলগুলি পরিচালনা করার ক্ষেত্রে তখন তিনি বাইরে বেরিয়ে এসে নিজেই শুরু করলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল বিশেষ করে সারদা মা-এর সঙ্গে। বিবেকানন্দের সমসাময়িক অন্যান্য যেসব সদস্যরা ছিলেন তাদের সঙ্গে ব্যাক্তিগত ভাবে যোগাযোগ ছিল। শুধু তাই নয় সিস্টার নিবেদিতা সেই সময় আমাদের দেশের যেসব মহাপুরুষ ছিলেন – রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন আর সুসম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের ভারতমাতার ছবি কিন্তু নিবেদিতার অনুপ্রেরণায় হয়েছিল। নিবেদিতার একটা বইও

ছিল - কালি দ্য মাদার। তাই নিবেদিতার অবদান ছিল ব্যাপক। মানে শুধু পড়াশোনা তো আছেই তার সঙ্গে সঙ্গে দর্শন চিন্তা, সমাজ চেতনা এবং ব্রিটিশ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি করে দেওয়া এই সমস্ত গুলি কিন্তু নিবেদিতা শুরু করেছিলেন এবং করেও দিয়েছিলেন। এই দিক থেকে নিবেদিতার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তার মানে উভয়েই চেষ্টা করেছেন যে শুধু পড়াশোনা নয়, নারীশিক্ষা তো হবেই তার সঙ্গে সঙ্গে নারী সচেতনতা, তাদের স্বাবলম্বী হওয়া, তাদের ক্ষমতার বিকাশ ঘটানো সবই যাতে হয় তাঁরা তার চেষ্টা করেছিলেন। এই কারণেই এনাদের শিক্ষাভাবনাকে শিক্ষাদর্শনও বলা যেতে পারে বিশেষ করে নারীদের উন্নতির জন্য।

মুসলমান নারী মুক্তি আন্দোলনের প্রবক্তা হওয়া সত্তেও সেই যুগের মুসলমান সমাজ যে বেগম রোকেয়াকে হত্যা করার বিধান দেন নি – এযুগে দাঁড়িয়ে সেটাকে আশ্চর্য বলে মনে হয়।

তৃতীয় প্রশ্ন : ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়া উভয়েই কি সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করতে পেরেছিলেন?

আমি তো তাই মনে করি। আর একটি বিষয় নিয়েও বলতে চাই। সিস্টার নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়া এই দুজনের মধ্যে নিবেদিতা কিন্তু Trained Teacher ছিলেন। Teacher Training এর সঙ্গে তিনি (নিবেদিতা) যুক্ত ছিলেন এবং pedagogy টা তিনি ভালো বুঝতেন সেই জন্য তিনি Teaching Learning Process ভালোভাবে Develop করেছিলেন। ফলে এটা একটা দিক।

আর অন্যদিকে বেগম রোকেয়ার Teacher Training সম্পর্কে কোন প্রথাগত Training ছিল না মানে pedagogy সম্পর্কে ধারণা ছিল না। কিন্তু রোকেয়ার গভীর বাস্তববোধ ছিল দেশে মেয়েদের কি অবস্থা, তারা কতটা শিখতে পারছে বা পারছে না, মেয়েদের অসুবিধা গুলি কোথায়, বাধা গুলি কোথায় সেগুলি তিনি খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেইগুলি তার শিক্ষা চিন্তার মধ্যে এসেছিল।

নিবেদিতা হচ্ছেন একেবারেই খুব Sophisticated লেখাপড়া জানা। Theory থেকে Practice এ আনার চেষ্টা করেছিলেন, যে সমাজ জীবনে কিভাবে সেটা প্রয়োগ করা যায়। এটা একটা দিক। আর বেগম রোকেয়া সেক্ষেত্রে

ঠিক উল্টো। তিনি বাস্তব অবস্থা থেকে কিছু Theory বা পদ্ধতি Develop করে সেটাকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিলেন বলে আমার মনে হয়।

দুটো পদ্ধতিই কিন্তু আজকের দিনে Teaching Method এর ক্ষেত্রে খুব গুরুত্ব পূর্ণ, দুটো পদ্ধতিই অবলম্বন করা হয়। মানে একটা হচ্ছে যেটাকে Pedagogy-র ভাষায় আমরা বলি – Abstruct থেকে Concrete আর একটা হচ্ছে Concrete থেকে Abstract এর দিকে। দুজনেই কিন্তু এই দুটো পদ্ধতি প্রয়োগ করে আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন। Concrete থেকে Abstract এর ধারণা বেগম রোকেয়ার। কারণ বাস্তবে কি অবস্থা সেটার সম্পর্কে রোকেয়ার খুব ভালো ধারণা ছিল, তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কোন কোন জায়গা গুলিকে আরও Develop করা উচিত সেই ভাবে তিনি করলেন এবং শেখালেন মেয়েদেরকে।

আর সিস্টার নিবেদিতা হচ্ছেন উল্টোপথের, মানে তিনি Abstract থেকে Concrete এ নিয়ে গেছেন। তিনি Theory বা তত্ত্বে কি কি আছে সেগুলি খুব ভালো জানতেন এবং ইংরেজিটাকে খুব ভালো জানতেন। এবং সেখান থেকেই স্কুলে কিভাবে প্রয়োগ করা যায় সেই ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। সংক্ষেপে এটাই আমার মনে হয়।

চতুর্থ প্রশ্ন : আজকের সমাজে এই দুই মহীয়সী নারীর শিক্ষাভাবনার প্রাসঙ্গিকতা কতখানি?

নিশ্চয়ই। আসলে শিক্ষাটাই তো আসল। শিক্ষাই তো আমাদের চিন্তাভাবনা, আমাদের আচার-আচরণ, আমাদের বোধ, আমাদের ভাবনা এগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রকৃত শিক্ষার কথা এই দুজনেই ভেবেছিলেন। সাধারণভাবে যে কিছু মুখস্থ করে পাস করে যাওয়ার কথা কিন্তু এনারা বলেননি। এই যে বোধের বিকাশটা যদি ঠিকমতো হয় তবেই কিন্তু আমাদের সমাজে যে সমস্ত সমস্যাগুলি আছে, যে সমস্ত অস্বাভাবিকতা গুলি রয়েছে সেগুলি থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারবো।

মনে রাখতে হবে এনারা কেউই কিন্তু ধর্মীয় শিক্ষার কথা বলেননি, একদমই বলেননি। তো ধর্মীয় শিক্ষার কথা যেখানে বলেননি সেখানে ধর্মকে ভিত্তি করে হানাহানি এই সমস্ত ব্যাপারগুলিতো কমে যাওয়ার কথা। কারণ সেটা বাদ দিয়ে এনারা নিরপেক্ষ শিক্ষার কথাই বলেছিলেন। এবং সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলও আজও সেই ভাবেই

চলছে। বাংলাদেশে যে সমস্ত স্কুলগুলি তৈরি করেছিলেন সেগুলির মধ্যে একটা স্কুল রোকেয়া তার দিদির নামে তৈরি করেছিলেন। সেই স্কুলগুলি চলে বেগম রোকেয়ার ভাবধারার মাধ্যমেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেগম রোকেয়া হল নামে একটি হল আছে যেখানে ছাত্রীরা থাকে। এই সবগুলি করার উদ্দেশ্য হল বেগম রোকেয়াকে স্মরণে রাখা এবং তাঁর যে নীতি-আদর্শ-শিক্ষাভাবনা সেগুলিকে প্রয়োগ করা। আমাদের দেশের তুলনায় বাংলাদেশে বেশি প্রয়োগ করা হয়েছে বেগম রোকেয়ার ভাবনাকে। আর আমাদের দেশে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁর চিন্তা ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে।

তুলনায় নিবেদিতা হচ্ছেন অনেক বেশি প্রসারিত মনের, অনেক বেশি স্বাধীন চিন্তার এবং অনেক বেশি খোলামেলাভাবে তিনি শিক্ষা ভাবনাটাকে প্রচার করেছিলেন। সেইগুলি আজও চলছে। সিস্টার নিবেদিতার নামে অনেকগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। আমাদের রাজ্যের বাইরেও আছে। তামিলনাড়ুতে সিস্টার নিবেদিতা নামে একাধিক স্কুল রয়েছে। আমাদের এখানে সিস্টার নিবেদিতার নামে স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটিও তৈরি হয়েছে, যেমন সিস্টার নিবেদিতা বিশ্ববিদ্যালয়। এইসব গুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে সিস্টার নিবেদিতাকে স্মরণ করা এবং তাঁর যা শিক্ষাভাবনা সেগুলির যাতে প্রচার ও প্রসার হয় এবং সাধারণ নারীদের মধ্যে যাতে তার প্রয়োগ হয় তার ব্যবস্থা করা। চিন্তাভাবনার যে 'অবরুদ্ধতা' রয়েছে সেটার যাতে মুক্তি ঘটে। শিক্ষার মাধ্যমে আসলে Empowerment বা ক্ষমতায়ন বা স্বশক্তিকরণ আসবে।

এখনও যে মেয়েদের মধ্যে সার্বিকভাবে ক্ষমতায়ন হচ্ছে না তার কারণ হচ্ছে আমরা ঠিক ঠিক ভাবে Implement করতে পারছি না, আমরা ঠিক মতো ভাবে প্রয়োগ করতে পারছিনা।

প্রশ্নঃ স্যার তাহলে কিভাবে আমরা এগিয়ে গেলে এই জায়গাটাকে Achieve করতে পারব?

আসলে আমাদের লক্ষ্য তো ঠিক হয়ে গেছে তাহলে এই লক্ষ্যটাকে ঠিক রেখে, স্থির রেখে খুব Honestly একেবারে সম্পূর্ণ সততা বজায় রেখে যদি চেষ্টা করা হয় তাহলে কিছুটা ফল তো আমরা নিশ্চয়ই পাবো। অর্থাৎ এই সাম্প্রদায়িক হানাহানিটা কমবে বলে আশা করা যায়, বা একদিন হয়তো উধাও হয়ে যাবে এই সাম্প্রদায়িক হানাহানি। এটাই মনে হয় আমার। Exactly তো কোন Prescription দেওয়া যাবে না।

অধ্যাপক স্বপন মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপক স্বপন মুখোপাধ্যায় 'The Statesman' পত্রিকার এডিটোরিয়াল বোর্ডে দীর্ঘকাল অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন। পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক গবেষণা ক্ষেত্রে তাঁর নাম ভারতে এবং বাংলাদেশে বহু চর্চিত। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তাঁর রচিত অনবদ্য পুস্তকগুলি পাঠককে ঋদ্ধ করে এবং যুক্তিবাদী চিন্তার খোরাক যোগায়। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নিবেদিতা, বেগম রোকেয়া, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখদের বিষয়ে তাঁর লেখা প্রবন্ধ পাঠককূলকে বিশেষভাবে উদ্দীপিত করেছে।

প্রথম প্রশ্ন : বিবেকানন্দ কেন ভগিনী নিবেদিতাকে আহ্বান জানালেন ভারতবর্ষে আসার জন্য?

আমরা জানি যে মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল অর্থাৎ ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে প্রথম স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজী উইম্বলগুনে তাঁর স্কুলও দেখতে যান। সেখানে তিনি দেখেন যে মার্গারেট একটি ব্যতিক্রমী বিদ্যাশ্রম পরিচালনা করেন যেখানে ছোটরা আনন্দের সাথে হেসে খেলে শিক্ষার্জন করে। স্বামীজীর মনে পড়ে শিক্ষার আলোবঞ্চিত ভারতে পশ্চাৎপদ মেয়েদের কথা। তিনি চেয়েছিলেন ভারতের মেয়েদের মধ্যে যে কল্যাণময়ী সেবাব্রতী রূপটি রয়েছে তাকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে মেয়েদের হাতে শিক্ষার হাতিয়ার তুলে দিতে

যে শিক্ষা তাদের মধ্যে আত্মমর্যাদা বোধের জাগরণ ঘটাবে, সেই সঙ্গে নারী ক্ষমতায়নের পথ প্রশস্ত করবে। এই শিক্ষার প্রসারের জন্য এমন একজন দরকার যিনি ভারতীয় সংস্কৃতিকে ভালোবেসে মেয়েদের শিক্ষা দেবেন এবং এ কাজে ঈশ্বরের সেবার মত নিজেকে নিবেদন করবেন। তিনি মার্গারেটের মধ্যে একই সঙ্গে এক তেজস্বিনী সিংহী আবার ভারতের প্রতি নিবেদিত প্রাণা শিক্ষয়িত্রীকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই ভারতের নারী শিক্ষার প্রয়োজনে স্বামীজী নিবেদিতাকে ভারতে আসার জন্য আহ্বান জানান বলে আমার মনে হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : বেগম রোকেয়ার নারী শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস এবং ভগিনী নিবেদিতার নারী শিক্ষা প্রসারের যে প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে সম্পর্ক কি?

ভগিনী নিবেদিতা ও মহীয়সী নারী রোকেয়া বেগম উভয়ে চেয়েছিলেন নারীকে আপন ভাগ্য জয় করবার যোগ্য করে তুলতে। উভয়ে বাংলার নারী মুক্তি আন্দোলনের পথের দিশারী। কিন্তু নিবেদিতা প্রধানত বাংলার হিন্দু মেয়েদের মধ্যে কাজ করেছেন এবং বেগম রোকেয়া মূলত বাংলার মুসলমান মেয়েদের মধ্যে কাজ করেছেন। দুজনেই নানা সামাজিক বাধা অতিক্রম করে মেয়েদের অন্তঃপুর থেকে শিক্ষাঙ্গনে নিয়ে আসতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বেগম রোকেয়ার কাজ ছিল অনেক বেশি কঠিন বলে আমার মনে হয়। নিবেদিতা যখন বিদ্যালয় স্থাপন করছেন তখন হিন্দু মেয়েদের মুক্তি আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। বিদ্যাসাগর, বেথুন, মেরিকারপেন্টারের প্রচেষ্টায় মেয়েদের স্কুলমুখী রথের চাকা গড়াতে শুরু করেছে। কিন্তু বেগম রোকেয়া বাঙালি মুসলমান নারী মুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ। ধর্মান্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন পুরুষশাসিত সমাজে মুসলমান নারীদের ভয়ঙ্কর নিপীড়নের হাত থেকে মুক্ত করতে যিনি একইসঙ্গে কলম ধরেছেন এবং সংগ্রামী চেতনায় মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে জীবন উৎসর্গ করেছেন তিনি রোকেয়া বেগম। 'Sultana's Dream' এর মতো যে স্যাটায়ারধর্মী রচনা সেটা পুরো মুসলমান সমাজে একটা বিপ্লব ঘটিয়েছে। আমার মতে মুসলমান নারী মুক্তি আন্দোলনে রোকেয়া সবথেকে বড় বিপ্লবী। রোকেয়া মুসলমান মেয়েদের হাতে অক্ষরের হাতিয়ার তুলে দিতে চাইলে তার হাতখানাই যে কেটে ফেলা হয়নি এটা রোকেয়া বেগমের সৌভাগ্য।

তৃতীয় প্রশ্ন : ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়া উভয়েই কি সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করতে পেরেছিলেন?

আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে কাজকে সীমাবদ্ধ রাখা আর সাম্প্রদায়িকতা বা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি এক কথা নয়। সাম্প্রদায়িকতার একটা নঞর্থক দিক আছে। সাম্প্রদায়িক মানে স্বসম্প্রদায় প্রীতি শুধু নয় অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি অবজ্ঞা বা বিদ্বেষ। বলার প্রয়োজন নেই নিবেদিতা এবং রোকেয়া বেগম কারো দূরতম সীমার মধ্যেও সাম্প্রদায়িক ভাবনা প্রশ্রয় পায়নি। কিন্তু নিবেদিতা ১৮৯৮ থেকে ১৯১১ এই অল্প সময়ের মধ্যে কেবল হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিজের কর্মময় জীবন সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু তাঁর রচনায় মুসলমান সম্প্রদায়ের নারীদের জাগরণের কথাও পাওয়া যায়। রোকেয়া সাম্প্রদায়িক ছিলেন না এ কথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না, কিন্তু নিজ মুসলমান সম্প্রদায়ের নারীদের দুর্দশা তাঁকে এতটাই পীড়িত করেছিল যে স্বামী মারা যাওয়ার পর শত বাধা অতিক্রম করে তাঁর নামে বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মেয়েদের শিক্ষা ও স্বাধীন ভাবনার পাশাপাশি আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকেন। তিনি যদি আপন সম্প্রদায়ের কথা না ভেবে নিজের সাহিত্য খ্যাতির পিছনে অগ্রসর হতেন তবে হয়তো অনেক বেশি খ্যাতি পেতে পারতেন। কিন্তু স্বসম্প্রদায়ের পরাধীনতা, হতাশা ও পীড়ন তাঁকে ব্যথিত করে তোলে। তিনি নিজ সম্প্রদায়ের বাইরে যাওয়ার মতন সময়ও পাননি, সুযোগও পাননি।

চতুর্থ ও শেষ প্রশ্ন হলঃ আজকের সমাজে এই দুই মহীয়সী নারীর শিক্ষাভাবনার প্রাসঙ্গিকতা কতখানি?

ভগিনী নিবেদিতা এবং রোকেয়া বেগম মোটামুটি সমসাময়িক। তাদের কর্ম সাধনা প্রায় এক সময়ে এবং বাংলারই বুকে। ভগিনী নিবেদিতার কর্ম সাধনার দিগন্ত নানা দিকে বিস্তৃত। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি এবং হিন্দু দর্শনের ব্যাখ্যাতা, শিল্পবেত্তা, স্বাধীনতা সংগ্রামী, সাংবাদিক, লেখিকা ও শিক্ষাব্রতী। কিন্তু রোকেয়া বেগম একাধারে অসাধারণ লেখিকা ও শিক্ষাব্রতী। কিন্তু তাঁর লেখিকাসত্তা ও শিক্ষাদানের একমাত্র উদ্দেশ্য বাঙালি মুসলমান

মেয়েদের ক্ষমতায়নের পথ খুলে দিয়ে তাদের সামাজিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করা। তাঁর জীবন সংগ্রাম একমুখীন। একশো বছরের ব্যবধান কিন্তু সমাজ কতখানি পরিবর্তন হয়েছে? বিশেষ করে মুসলমান সমাজ থেকে ধর্মান্ধতার পাহাড় প্রমাণ বাধা কতখানি দূর হয়েছে? আজও হিন্দু সমাজে বর্ণবিদ্বেষ ও নারীর উপর নির্মম সামাজিক নিপীড়ন কতটুকু বন্ধ হয়েছে? যতদিন নারীকে সমাজ দাসের মতো ব্যবহার করবে আমার মনে হয় ততদিন নিবেদিতা ও রোকেয়া প্রাসঙ্গিক থাকবেন।

উল্লিখিত চারজন ব্যক্তিত্ব পূর্ব পরিকল্পিত সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়া সম্বন্ধে বর্তমান গবেষিকার প্রশ্নের সপক্ষে যে উত্তরগুলি দিয়েছেন তার সারাংশ প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে সাজানো হল–

প্রথম প্রশ্ন : বিবেকানন্দ কেন ভগিনী নিবেদিতাকে আহ্বান জানালেন ভারতবর্ষে আসার জন্য?

প্রথম প্রশ্নের সারাংশ

ক. বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে ভারতবর্ষে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন।

খ. এই সময় বিবেকানন্দের চোখে নিবেদিতার ন্যায় কোন নারী ধরা পড়েননি যিনি ভারতবর্ষকে ভালোবেসে তাঁর মেয়েদের শিক্ষার জন্য সর্বতভাবে চেষ্টা করবেন।

গ. মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল্ এর মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ লক্ষ্য করেছিলেন গভীর অনুসন্ধিৎসা।

ঘ. স্বামীজী লক্ষ্য করেছিলেন যে নিবেদিতা একজন তেজস্বী সিংহী এবং ভারতবর্ষের প্রতি নিবেদিতা প্রাণা শিক্ষয়িত্রী। তাঁর মধ্যে একজন শিক্ষা বিজ্ঞানী হওয়ার সম্ভাব্য উপকরণ ছিল। কারণ প্রথাগত শিক্ষাদানের মধ্যে তিনি নিজেকে আটকে রাখেননি, প্রথা ভেঙ্গে তিনি শিক্ষাদানের নতুন দিগন্তকে উন্মোচন করেছেন।

ঙ. একজন বিদেশিনীর পক্ষে কি ভারতবর্ষে মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারে কাজ করা সম্ভব?

চ. নিবেদিতা ভারতীয় বেদান্ত দর্শন অধ্যাত্মবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

ছ. ভারতে এসে নিবেদিতা অনুভব করেন–এখানে একটা পরিবর্তন দরকার এবং সেই পরিবর্তন আসতে পারে শিক্ষার মধ্য দিয়ে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : বেগম রোকেয়ার নারী শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস এবং ভগিনী নিবেদিতার নারী শিক্ষা প্রসারের যে প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে সম্পর্ক কি?

দ্বিতীয় প্রশ্নের সারাংশ

ক. নিবেদিতা ছিলেন প্রকৃত অর্থেই একজন শিক্ষাবিজ্ঞানী। আর রোকেয়া ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ।

খ. নিবেদিতা বিজ্ঞানীদের ন্যায় শিক্ষাক্ষেত্রে নিত্যনতুন আবিষ্কারের নেশায় মেতে থাকতেন, কিন্তু বেগম রোকেয়া সেই সময়ের প্রথাগত স্কুল শিক্ষার ঘেরাটোপ থেকে নিজেকে বার করতে পারেননি।

গ. নিবেদিতা এবং রোকেয়া দুজনেই কলকাতায় থেকে মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেছেন।

ঘ. নিবেদিতা বহু মনীষীর সান্নিধ্য পেয়েছেন, যা রোকেয়ার ভাগ্যে ঘটেনি।

ঙ. উভয়ের কর্মপদ্ধতি এক ছিল না এমনকি তাঁরা যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন তার প্রকারভেদ ও মাত্রাও ছিল ভিন্ন।

চ. বেগম রোকেয়া মুসলিম নারীদের জন্য বিদ্যালয় শিক্ষার পাশাপাশি কিছু হাতে-কলমে কাজ শেখারও ব্যবস্থা করেছিলেন।

ছ. বেগম রোকেয়া নারীকে উপার্জনের ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করার মধ্যে দিয়ে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য চেষ্টা করেছেন।

জ. অবনীন্দ্রনাথের ভারতমাতার ছবি নিবেদিতার অনুপ্রেরণায় তৈরি হয়েছিল।

ঝ. উভয়েই নারী শিক্ষা সহ নারী সচেতনতা, মেয়েদের স্বাবলম্বী হওয়া এবং মেয়েদের ক্ষমতার বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে চেষ্টা করেছিলেন।

ঞ. নিবেদিতা মূলত বাংলার হিন্দু মেয়েদের মধ্যে এবং রোকেয়া বাংলার মুসলমান মেয়েদের মধ্যে কাজ করেছেন।

ট. রোকেয়া বাঙালী মুসলমান মেয়েদের পথিকৃত ছিলেন।

তৃতীয় প্রশ্ন : ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়া উভয়েই কি সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করতে পেরেছিলেন?

তৃতীয় প্রশ্নের সারাংশ

ক. নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়া কেউই সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট ছিলেন না। তাঁদের লেখা চিঠিপত্র এবং বক্তৃতার মধ্যে কোথাও সাম্প্রদায়িকতার সুর বাজেনি।

খ. দুজনের কেউই অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ন ছিলেন না।

গ. নিবেদিতার মত একজন বিদেশিনীর পক্ষে সে সময় মুসলমান মহল্লাতে গিয়ে পর্দানসীন মেয়েদের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা ছিল প্রায় অসম্ভব।

ঘ. নিবেদিতা হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে থাকার কারণে পল্লীর হিন্দু মেয়ে এবং মহিলাদের শিক্ষার জন্য চেষ্টা করেছিলেন।

ঙ. বেগম রোকেয়া মুসলমান মহিলা হওয়ার কারণে মুসলমান সমাজের মেয়েদের যন্ত্রণাকে অনুভব করতে পেরেছিলেন বলে মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার জন্য আজীবন লড়াই করেছেন।

চ. নিবেদিতা এবং রোকেয়ার পাঠদানের তাত্ত্বিক দিক এবং প্রয়োগ এর মধ্যে কিছু ফারাক রয়েছে।

ছ. নিবেদিতা ছিলেন Trained Teacher এবং রোকেয়া ছিলেন Self-made Teacher।

চতুর্থ ও শেষ প্রশ্ন হল আজকের সমাজে এই দুই মহীয়সী নারীর শিক্ষাভাবনার প্রাসঙ্গিকতা কতখানি?

চতুর্থ প্রশ্নের সারাংশ

ক. ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার শিক্ষা ভাবনা আজও একশো বছর পূর্বের ন্যায় সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

খ. নিবেদিতা প্রকৃত অর্থে ছিলেন একজন শিশু শিক্ষিকা।

গ. তাঁর দেওয়া পাঠ শিক্ষার্থীদের মনের খাদ্য হয়ে উঠত।

ঘ. শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তিনি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়কে ব্যবহার করেছেন এবং সাফল্য লাভও করেছেন।

ঙ. নিবেদিতা তাঁর গুরুর ন্যায় শিক্ষার্থীর অন্তরে লুকিয়ে থাকা সম্পূর্ণতার বিকাশের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

চ. নিবেদিতার ভাবনা ছিল প্রতিটি শিক্ষার্থী হয়ে উঠবে একক সমাজ তথা Community Atom।

ছ. রোকেয়া ছিলেন একজন শিক্ষিকা ও শিক্ষাব্রতী।

জ. রোকেয়ার ভাবনা অনেকাংশে ছিল একমুখী।

ঝ. রোকেয়া বুঝেছিলেন দারিদ্র্য মুক্ত মুসলমান সমাজ গড়ে তুলতে হলে মুসলমান মেয়েদের শিক্ষিতা করে তোলা অপরিহার্য।

ঞ. মেয়েরা আজ উচ্চশিক্ষিতা হলেও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা শ্লীলতাহানী ও ধর্ষণের শিকার।

ট. পুঁথিগত শিক্ষা পেলেও আজকের মেয়েদের মধ্যে অন্তরাত্মার বিকাশ ঘটেনি। এই বিকাশের জন্য একবিংশ শতাব্দীর নারী শিক্ষা ভাবনায় নিবেদিতা এবং রোকেয়ার শিক্ষা ভাবনার প্রতিফলন ঘটানো দরকার।

ঠ. নিবেদিতা এবং রোকেয়া ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার কথা বলেছেন।

ড. সততার সঙ্গে চেষ্টা করলে একদিন আমাদের মধ্যেকার সাম্প্রদায়িক হানাহানি বন্ধ হয়ে যাবে আর এর জন্য প্রয়োজন ভগিনী নিবেদিতা ও রোকেয়ার অসাম্প্রদায়িক ভাবনার প্রয়োগ।

ঢ. আমাদের সমাজে মেয়েদেরকে আমরা যেভাবে দাসীর মতো দেখি সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে।

ন. বর্ণবিদ্বেষ ও নারীর উপর নিপীড়ন বন্ধ করতে না পারলে একবিংশ শতাব্দীতেও আমাদের সমাজ থেকে সাম্প্রদায়িকতার বীজকে পুরোপুরি তুলে ফেলা যাবে না।

৭.২ আলোচনা

ভারতবর্ষে মেয়েরা সব দিক থেকে পিছিয়ে ছিল। প্রাক ব্রিটিশ পর্ব থেকে সমগ্র বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত নারীর পশ্চাৎপদ অবস্থান থেকে নারী মুক্তির সূর্যোদয়ে ক্রমাগত উত্তরণ ঘটেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্বে শুরু হয়েছিল নারী মুক্তি আন্দোলন। শিল্প বিপ্লবের হাত ধরে যে মানবতাবাদী চেতনা সমগ্র ভারত ভূমিতে আছড়ে পড়েছিল সেই চেতনা পরিণত হয়েছিল সংস্কারবাদী আন্দোলনে। অন্ধকার জগতে বন্দী, ব্রাত্য, অপাংক্তেয় মেয়েদের মুক্তির প্রয়োজনীয়তা যেমন কিছু পুরুষ অনুভব করেছিলেন তেমনি অনুভব করেছিলেন কিছু নারী। ইতর প্রাণী রূপে মেয়েদের অবস্থানকে গ্রহণ করতে পারেনি সেদিনের সমাজ। তাই প্রয়োজন হয়েছিল নারী মুক্তি ভাবনার প্রথম সূর্যোদয়ের। ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়া হলেন সেই দুই মহীয়সী নারী যাঁদের অন্তর কেঁদেছিল নারী সমাজের মুক্তির প্রত্যাশায়। তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তাঁদের সর্বশক্তি দিয়ে। ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার নারী শিক্ষা ভাবনা এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজ ভাবনা সে যুগের প্রেক্ষাপটে ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

ভগিনী নিবেদিতা :

মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল্ [যিনি পরবর্তীকালে ভগিনী নিবেদিতা নামে পরিচিতি লাভ করেন] এর ঐকান্তিক আগ্রহে এবং স্বামী বিবেকানন্দের উদাত্ত আহ্বানে ভগিনী নিবেদিতা ভারতে এসেছিলেন ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। খিদিরপুর ডকে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ। নিবেদিতার ভারতে আসার প্রধান কারণ নারী জাতির উন্নতি সাধন। স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে বলেছিলেন, "কখনো ভুলিও না, নারী জাতির ও নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তিগণের উন্নতি সাধনই আমাদের মূলমন্ত্র।" (প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, আগস্ট ১৯৮৫। পৃ. ১৪৫)

বাস্তবিকই তাই, নিবেদিতার ধ্যান-জ্ঞান হয়ে উঠেছিল ভারতের নারী জাতির উন্নতি সাধন। স্বামী বিবেকানন্দের দেহরক্ষার পর নিবেদিতা নানা কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লেও তাঁর মন প্রাণ সর্বদা নারীজাতির উন্নয়নের চিন্তায় ব্যাপৃত থাকত। তিনি লিখেছেন, "এখানে ভারতে ভবিষ্যৎ রমণী আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়া আছেন, তাঁহার সৌন্দর্য প্রতিনিয়ত আমাদের দৃষ্টিপথে উদিত হয়। তাঁহার কণ্ঠস্বর সতত আমাদের আহ্বান করিতেছে।" (প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, ২০২২। আনন্দবাজার পত্রিকা, শতবর্ষ সংকলন, পৃ. ২২২)

এই দেশের প্রতি এবং এদেশের প্রতিটি নারী ও পুরুষের প্রতি তাঁর নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আমাদের অবাক করে। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা'র কথায়, "ভগিনী নিবেদিতা বলিয়াছেন : ভারতবর্ষকে আমি ভালোবাসি, কারণ ভারত হইল জগতের সকল ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম ধর্মের জন্মদাত্রী... ভারতবর্ষই সেই দেশ, যেখানে অন্তঃপুর সরলতায় ভরা, যেখানে পারিবারিক জীবনের আনন্দ সর্বাপেক্ষা অধিক। এই সেই দেশ যেখানে নারীগণ নিঃস্বার্থ ও অনলসভাবে বিন্দুমাত্র অভিযোগ না করিয়া প্রতিদিন সূর্যোদয় হইতে শিশির স্নিগ্ধ সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রিয়জনের সেবায়

ব্যবহৃত থাকে। এই দেশেই মাতা ও মাতামহী-পিতামহীগণ পরিবারস্থ সকলের প্রয়োজনের প্রতি পূর্ব হইতেই লক্ষ্য রাখিয়া এবং নিজের সুখের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিয়া থাকেন; এবং এই আত্মসুখ উদাসীনতা ও নিঃস্বার্থপরতাই ভারতীয় নারীকে সর্বোচ্চ মহিমায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।" (তদেব, পৃ. ২২২)

নিবেদিতা যদিও ঊনবিংশ শতকের একেবারে শেষে ভারতে এসেছিলেন কিন্তু বিংশ শতকের এক দশক তিনি খুব কাছ থেকে এবং অত্যন্ত গভীরভাবে ভারতীয় মেয়েদের পর্যবেক্ষণ করার এবং অনুভব করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তার উপর ভিত্তি করেই তিনি বলেছিলেন উপরের বক্তব্যটিকে। সেদিন নিবেদিতা যেভাবে ভারতীয় নারীদেরকে দেখেছিলেন আজ একবিংশ শতাব্দীতে তার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। পরাধীন ভারতবর্ষে মেয়েদের অশিক্ষা, কুসংস্কার, বাল্যবিবাহ, বলপূর্বক সতীদাহ, অন্তঃপুর পর্দাপ্রথা এবং পুরুষ অপেক্ষা নারী জাতির হীন অবস্থা এবং নারীদের হীনমন্যতাবোধ তাঁকে ব্যথিত করে তুলেছিল। তিনি বুঝেছিলেন এর পিছনে প্রধান কারণ ভারতবর্ষের পরাধীনতা। ষোড়শ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতবর্ষ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। নিবেদিতা সমগ্র ভারতবর্ষকে দেখার, জানার এবং বোঝার সুযোগ পেয়েছিলেন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে। নারী জাতির উপরে শত শত যুগ ব্যাপী যে শারীরিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক এবং নৈতিক অত্যাচার চলে ছিল তার ফলে মেয়েরা নিজেদের দেবী সত্তাকে ভুলে গিয়ে কেবলমাত্র পুরুষের চাহিদা পরিতৃপ্তির এবং সন্তান ধারণের যন্ত্ররূপে নিজেকে বুঝতে শেখে। যুগ যুগ ধরে নারী জাতির এই অবমাননায় প্রবল প্রতিবাদ করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ সেই কালের মনস্বী ব্যক্তিরা। নারীজাতির অবমাননায় ব্যথিত হয়ে স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলেছেন, "শত শত যুগব্যাপী মানসিক, নৈতিক ও দৈহিক অত্যাচার ভগবতীর প্রতিমাস্বরূপ নারীকে সন্তান উৎপাদন করিবার যন্ত্রস্বরূপ করিয়া ফেলিয়াছে এবং জীবন বিষময় করিয়া তুলিয়াছে।" (তদেব, পৃ. ২২৩) স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে প্রশ্ন তুলেছেন যে আমরা ভারতীয়রা কি মেয়েদের উন্নতি করতে পারি? একমাত্র তাহলেই আমাদের আশা আছে। কারণ বিবেকানন্দ বারবার বলেছেন নারী জাতি এবং শূদ্র জাতির উত্থান ব্যতিরেকে কোন রাষ্ট্রেরই উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারী জাগরণ প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি, "মেয়েদের আগে তুলতে হবে, Mass -কে জাগাতে হবে; তবে তো দেশের কল্যাণ – ভারতের কল্যাণ।" (স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, 2002, পৃ. ১৭) বাণী ও রচনার সপ্তম খণ্ডের ২৫৪ পৃষ্ঠায় স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন, "মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে। যে-দেশে, যে-জাতে মেয়েদের পূজা নেই, সে-দেশ – সে-জাত কখনও বড় হতে পারেনি, কস্মিন কালে পারবেও না।" (তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ২৫৪) স্বামীজী চেয়েছিলেন সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিটি জনসাধারণকে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার পাঠদান করতে এবং এর জন্য নারী-পুরুষ, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকে শিক্ষিত করে তুলতে, যাতে তাদের চরিত্র এবং বুদ্ধিবৃত্তির বিস্তার ঘটে। বাণী ও রচনার সপ্তম খণ্ডে ২৮৪ পৃষ্ঠায় আত্মনির্ভরশীল হওয়া'র শিক্ষার স্বপক্ষে তিনি বলেছেন – "জনসাধারণকে যদি আত্মনির্ভরশীল হতে শেখানো না যায়, তবে জগতের সমগ্র ঐশ্বর্য ভারতের একটা ক্ষুদ্র গ্রামের পক্ষেও পর্যাপ্ত হবে

না। আমাদের কাজ হওয়া উচিত প্রধানত শিক্ষাদান– চরিত্র এবং বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনের জন্য শিক্ষা বিস্তার।" (তদেব, পৃ. ২৮৪)

নিবেদিতা স্বামীজীর দ্বারা প্রভাবিত হলেও নির্বিচারে তাঁর সমস্ত বক্তব্যকে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না–ফলে প্রবল সংঘর্ষ ছিল অনিবার্য। নিবেদিতা একদিকে যেমন লক্ষ্য করেছিলেন ভারতীয় নারীদের হীন অবস্থার চিত্র তেমনি অপরদিকে তিনি অনুভব করেছিলেন ভারতীয় মনীষীদিগের উচ্চতর চরিত্র ও কর্মময় জীবনের পশ্চাতে ছিল তাঁদের জননীর অবদান। তাঁর মতে, যদি আদর্শ চরিত্রকেই আমরা সর্বাপেক্ষা মূল্য দিয়া থাকি তবে সে বিষয়ে ভারতের ন্যায় সৌভাগ্যশালিনী দেশ আর একটিও নেই। যেদিকেই দৃষ্টিপাত করিবে সেদিকেই তাহাদের মহিমাময় জীবন উদ্ভাসিত। নিবেদিতার দৃষ্টিতে তাই চিতোরের রানী পদ্মিনী, ঝাঁসির রানী, চাঁদ বিবি, রানী ভবানী, অহল্লাবাঈ, ময়মন সিংহের জাহ্নবী, মহাভারতের গান্ধারী, সীতা ও সাবিত্রী প্রমুখরা উজ্জ্বলতর আদর্শের প্রমাণ হিসেবে নিজেদের তুলে ধরতে পেরেছিলেন। আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য সমাজে নারীর যেরূপ আত্মপ্রকাশ তাহাই নারীর যথার্থ প্রকাশ বলে নিবেদিতা স্বীকার করেননি। কারণ তিনি বিদেশি পর্যটকের ন্যায় দূর থেকে অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে ভারতের সমাজ ব্যবস্থা ও তার অন্তঃপুর প্রথার সমালোচনা করেননি। তিনি অত্যন্ত কাছ থেকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন ভারতীয় রমণী দিগকে। ভারতীয় নারী সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব তিনি তুলে ধরেছেন 'The Web of Indian Life' পুস্তকে। এছাড়াও ভারতীয় পরিবারে মাতা, স্ত্রী এবং জাতীয় সংস্কৃতি ও ভাবধারার রক্ষয়িত্রী রূপে মেয়েদের যে প্রকৃত পরিচয় তা তিনি তুলে ধরেছিলেন, 'Detroit Free Press' নামক পত্রিকায়। এই পত্রিকায় ভারতীয় নারীদের সম্বন্ধে নিবেদিতার মতামতকে পাঠ করে এক আমেরিকান মহিলা ঐ পত্রিকার সমালোচনামূলক চিঠি পাঠিয়ে লিখেছিলেন, "ভারতবর্ষের পারিবারিক জীবনে নারীগণের স্থান সম্বন্ধে এ পর্যন্ত আমাদের সমুদয় জ্ঞান মিশনারীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত। জনৈকা ইংরেজ মহিলা, মিস নোবল্ তাঁহাদের [ভারতীয় নারীদের] জীবনযাত্রার যে উচ্চ আদর্শ, মহত্ব, সৌন্দর্য প্রভৃতির বর্ণনা দিয়াছেন তাহা পাঠে আমরা তাঁহাদের সম্বন্ধে নতুন এবং যথার্থ জ্ঞান আহরণ করিলাম।" (প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, ২০২২। আনন্দবাজার পত্রিকা, শতবর্ষ সংকলন, পৃ. ২২৩)

নিবেদিতা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখায় প্রকাশ করেছেন যে ভারতীয় মেয়েরা স্ত্রী রূপে, কন্যা রূপে, ভগিনী ও শিষ্যা রূপেও সর্বদাই পূর্ণতা লাভ করেছেন। খ্রিস্টান মিশনারীরা ভারতীয় মেয়েদের সম্বন্ধে এবং পরিবারের অন্দরমহল সম্বন্ধে যে সমস্ত নিন্দনীয় অপবাদ রটনা করতেন তার অধিকাংশই মিথ্যা কল্পনা প্রসূত অতিশয়োক্তি। তিনি 'Lamb among Wolves' নামক প্রবন্ধে মিশনারীদের দ্বারা পরিবেশিত সমস্ত অসত্য ভাষণকে ক্ষুরধার যুক্তি সহযোগে খণ্ডন করেছেন। ভারতের জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ভারতীয় নারীদের মহৎ চরিত্র। আপাতভাবে তাদের অক্ষরজ্ঞান না থাকায় বিশেষত ইংরেজি সাহিত্য পাঠের সামর্থ্য অর্জন না করায় তাদেরকে নিরক্ষর বা অশিক্ষিত বলা হয় বটে কিন্তু বাস্তব ঘটনা তা নয়। নিবেদিতার মতে যে মা, ঠাকুরমা, দিদিমারা নিয়মিত তাঁদের সন্তান-সন্ততিদেরকে বেদ-উপনিষদ-পুরাণের গল্পগাথা নিয়মিত শোনান এবং ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক রূপে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে সাংস্কৃতিক সম্পদের উত্তরাধিকারকে তুলে দেন তথা উত্তরাধিকারী হয়ে ওঠার প্রশিক্ষণ

দেন তাঁদেরকে কি উপায়ে নিরক্ষর বা অশিক্ষিতা বলা সম্ভব। তিনি এও স্বীকার করেছেন যে মেয়েদের জন্য বিজ্ঞান এবং আধুনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে ঠিকই, কিন্তু পরিবার পরিচালনার জন্য গৃহ কর্মের শিক্ষা ধর্মীয় ভাবনা এবং ভারতীয় নারীর চিরন্তন নমনীয়তাকে কোনভাবেই বিসর্জন দিয়ে নয়। তাই পাশ্চাত্যের অনুকরনে নারীশিক্ষার এবং সমাজে মেয়েদের অবস্থান সূচিত করার চূড়ান্ত বিরোধিতা করেছেন নিবেদিতা। ভারতীয় ভাবকে অক্ষুণ্ণ রেখে প্রকৃত অর্থে ভারতীয় হয়ে ওঠার শিক্ষার মধ্যে দিয়ে তিনি ভারতীয় নারীদের তৈরি করার স্বপ্ন দেখেছেন। তাই তাঁর ভাবনায় ভারতে নারী শিক্ষার আদর্শ, পাঠক্রম এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতিতে তিনি সেই সময়ের এমনকি বর্তমান সময়ের বহু নারীবাদীদের থেকে পৃথক হয়েছিলেন। তাই পাঠদান কালে তাঁর বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনের জন্য ইতিহাসের উপাখ্যানগুলিকে যেমন ভাবে তুলে ধরতেন ঠিক তেমনি করে শিক্ষাদানের পদ্ধতিতে ছিল তাঁর নতুনত্ব। শাসন তথা শৃঙ্খলা রক্ষা সম্বন্ধে তাঁর ভাবনার মধ্যে ছিল আশ্চর্য বিশেষত্ব। নিবেদিতার স্কুলের ছাত্রী তথা নিবেদিতার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ পাওয়া নির্ঝরিণী সরকার -এর উক্তিটি এ বিষয়ে আমাদেরকে নতুন ভাবে আলোকপাত করে। তিনি লিখেছেন, [ভগিনী নিবেদিতা] “যাঁর উপরে অসন্তুষ্ট হতেন, স্বল্পকথায় তাঁর ভৎর্সনা যেন সেই লোকটির অন্তঃস্থলে বিদ্ধ হয়ে যেত। আমি নিজেও এ বিষয়ে ভুক্তভোগী, স্কুলে থাকতে দু’দিন সিস্টারের কাছে তিরস্কার লাভ করি। সে সময় আমার মনের নিদারুণ অবস্থার কথা এখনও মনে পড়ে। সামান্য দু একটি কথা যে কীরকম কঠোর শাস্তি, যাঁরা তাঁর কাছে তিরস্কার লাভ করেছেন, তাঁরাই এ বিষয়ে ভালো বলতে পারবেন।” (নির্ঝরিণী সরকার, ২০২২, আনন্দবাজার পত্রিকা, শতবর্ষ সংকলন ২০২২, পৃ. ১০৮)

শিক্ষয়িত্রী রূপে নিবেদিতা ছিলেন অন্যান্য শিক্ষিকাদের থেকে একেবারেই আলাদা। তিনি তাঁর ছাত্রীদের বারবার বলতেন যে, তাঁর ছাত্রীরা যেন পূর্বকালের হিন্দু রমণীদের ত্যাগ, নিষ্ঠা, ভক্তি, সেবাপরায়ণতা, আশ্রিত বৎসলতা ও সরলতা কখনো হারিয়ে না ফেলে কারণ ভারতীয় হিন্দু রমণীদের পূর্বপুরুষেরা সংসারের সেবা কার্যের মধ্যে ডুবে থেকেও অনায়াসে উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থায় পৌঁছেছিলেন, যা অনেক ক্ষেত্রে তপস্যার দ্বারা সম্ভবপর ছিল না।

ভারতীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবনে নিবেদিতার প্রচেষ্টা এবং প্রভাবকে ভারতীয় চিত্রকলার সমঝদার ব্যক্তিরা শ্রদ্ধার সাথে আজও স্মরণ করেন। শিক্ষয়িত্রী রূপে শ্রেণীকক্ষে তাঁর ছাত্রীদের বিভিন্ন শিল্পকার্য শিখতে সর্বদাই উৎসাহিত করতেন। তিনি যত্নের সাথে বিভিন্ন ধরনের আলপনা, মাটির ছাঁচ, মাটির বেনেপুতুল, পুরান কাশ্মীরি শালের কাজ, কাঁথার কারুকার্য সযত্নে সংগ্রহ করতেন এবং মেয়েদের যত্ন করে শেখাতেন। আলপনা যে এত সুন্দর হতে পারে এবং এটি যে এত মূল্যবান শিল্প সে সম্বন্ধে নিবেদিতার পূর্বে সেই যুগে ভারতীয় নারীদের সামনে কেউ তুলে ধরেননি। বৌদ্ধ যুগের স্থাপত্য, শিল্প, স্তূপ, শিলালিপি প্রভৃতিতে তাঁর ছিল অত্যধিক অনুরাগ। তিনি তাঁর শিক্ষার্থীনীদের মধ্যে সকলের প্রতি ভালবাসার শিক্ষা এবং মাথা উঁচু করে বসবার এবং দাঁড়াবার শিক্ষা তিনি তাঁর ছাত্রীদেরকে দিয়েছিলেন।

ভগিনী নিবেদিতার সমাজ ভাবনার সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ দিক হল – তিনি ভারতের সামাজিক জীবনকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন, তার ব্যাখ্যাদান করেছেন এবং পাশ্চাত্যের সামনে ভারতীয় সমাজ ভাবনার গুরুত্বকে তুলে ধরেছেন। তিনি চেয়েছিলেন লাঙ্গল করার মতো করে ভারতীয় ভাবনাকে চষে দেখতে। তাই তিনি লিখেছেন, "Let me plough my furrow across India just as deep– deep– deep to the very centre of things, as it will go." (Sankari Prasad Basu, 'Letters of Sister Nivedita', vol- II, 1982, p. 582)

বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে করতে ভগিনী নিবেদিতার সমাজ ভাবনার চিত্রটি ধীরে ধীরে একটি আকৃতি লাভ করে। প্রাচীন ভারতের বেদ- উপনিষদ, পুরান সমূহ, গীতা-ভাগবত এবং বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনে এবং বেদান্ত দর্শনে গভীর পাঠে তিনি মনোনিবেশ করেন। প্রাচীন ভারতের সমাজ ভাবনা এবং নিবেদিতার কালের ভারতীয় সমাজের বাস্তব সমস্যার স্বরূপকে বুঝে নিবেদিতার মনে সমাজ ভাবনা তথা সমাজ নীতি একটি সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছিল। তাঁর কথায়, "...our theories do in fact spring out of our practical problems, and direct themselves towards their re-solution." (Ibid, p. 1219) মানুষ এবং মানব সভ্যতার প্রতি বিশেষত ভারতীয় এবং ভারতীয় সভ্যতার প্রতি তাঁর সহানুভূতি এবং আনুগত্য ভারতীয় সমাজের গভীর অন্তঃস্থলে প্রবেশ করবার সুযোগ করে দিয়েছিল নিবেদিতাকে। ভারতীয় সমাজকে বহু দূর থেকে অন্যান্য বিদেশীদের মত তিনি দেখেননি, তিনি দেখেছেন একজন ভারতীয় নারী হিসেবে, যিনি সমস্ত অর্থেই হয়ে উঠেছিলেন ভারতীয় নারী। এই একই ভাবনার প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'লোকমাতা নিবেদিতা' সম্পর্কিত লেখায়। ভারতের সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে যে সমস্ত চিন্তাবিদরা চর্চা করেছেন তাঁদের মধ্যে নিবেদিতার নাম একেবারে উপরের সারিতে উঠে আসে –কারণ প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ভাবনা নিয়ে নিবেদিতা ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাকে দেখার, বিশ্লেষণ করার এবং তার ব্যাখ্যা দান করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর কথায়, "...the search for stereo truth is the best fruit of the best scientific training." (Works of Sister Nivedita : Complete Works, vol- IV, p. 19)

নিবেদিতার সমাজ ভাবনার প্রেক্ষাপটে রয়েছেন তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দ, আধুনিক সমাজ বিদ্যার অন্যতম জনক পি. আলেকজান্ডার ক্রিপ্টোকিন এবং প্যাট্রিক গেডেস। সমাজতত্ত্বের একজন ছাত্রীর ন্যায় তিনি সমকালের সমাজতাত্ত্বিক ভাবনাগুলিকে গভীরভাবে পাঠ করেছেন এবং এতদ্ স্বত্বেও তিনি অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডেসের কাছ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। প্যাট্রিক গেডেস ফ্রান্সের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ কমেট এর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। অধ্যাপক গেডেস সমাজতত্ত্বের চর্চায় মানব প্রতিষ্ঠানগুলিকে (যেমন- বিবাহ, পরিবার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) বৈজ্ঞানিক ভাবনার নিরিখে তুলে ধরেছেন। নিবেদিতার মতে প্যাট্রিক গেডেসের বৈজ্ঞানিক দূরদৃষ্টি সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর বিভিন্ন লেখায়, "Correlation phenomena into hitherto unobserved sequences all the time." (Letters of Sister Nivedita, vol- I, p. 323) প্যাট্রিক গেডেস নিবেদিতাকে শিখিয়েছিলেন তাঁর বিভিন্ন শিক্ষার মধ্যে কিভাবে সম্পর্ক তৈরি

করতে হয়। এ কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই নিবেদিতার সমাজতাত্ত্বিক ভাবনার উপর লেখা 'The Web of India Life' গ্রন্থের ভূমিকা অংশে। গেডেসকে তাঁর ভাবনার পশ্চাতের শিক্ষক রূপে স্বীকৃতি দিয়ে নিবেদিতা লিখেছেন, "In sending this book out into the world, I desire to record my thanks to... Prof. Patrick Geddes, who by teaching me to understand a little of Europe, indirectly gave me a method by which to read my Indian experience. ...I am glad that I found my own place in the world before I met him." (Ibid, p. 322)

নিবেদিতা মনে করতেন আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক সমাজতাত্ত্বিক চর্চা সে সময়ে ভারতে ছিল না। তাঁর মতে সমাজতাত্ত্বিক চর্চার লক্ষ্য নৈরাশ্যবাদকে প্রতিষ্ঠিত করা নয় বরঞ্চ সামাজিক সংগঠনের মধ্যে প্রত্যাশা এবং উৎসাহকে সঞ্চারিত করা। অর্থাৎ ভারতীয় প্রাচীন সমাজ ভাবনা এবং সামাজিক রীতিনীতি গুলি যে ফেলে দেবার নয় বরঞ্চ বৈজ্ঞানিক ভাবনার দ্বারা সেগুলির পশ্চাতে সত্যকে বিশ্লেষণ করা এবং মানুষকে জানানো যে আপাত ভাবে চালু থাকা ভারতীয় সমাজ ভাবনা এবং সামাজিক রীতিনীতি কোন কুসংস্কার গ্রস্থ অন্ধকূপ থেকে উঠে আসা নয়। এর পিছনে রয়েছে অতি উচ্চমানের বিজ্ঞান। যুগ যুগ ধরে ভারতীয় সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা তাঁদের অভিজ্ঞতার নিরিখে যে সামাজিক রীতিনীতি গুলিকে চালু করে গেছেন তার পিছনে লুকিয়ে রয়েছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাবনা। নিবেদিতা আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে ভারতের ইতিহাসের অন্যতম প্রবক্তা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি মনগড়া কোন তত্ত্বে বা চিরাচরিতভাবে চালু থাকা অভ্যাসকে স্বীকৃতি দেননি। তিনি চেয়েছিলেন ইতিহাস গবেষণার পশ্চাতে থাকবে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাবনা। যুক্তিসিদ্ধ পদ্ধতিতে ঐতিহাসিক সমস্ত তথ্য, সম্পদ এবং ঘটনাকে তিনি চুলচেরা বিশ্লেষণ করবার পদ্ধতি দেখিয়ে গিয়েছেন। আর এভাবেই সমাজতাত্ত্বিক ভাবনার বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা দানের ক্ষেত্রে নিবেদিতার দেওয়া পদ্ধতি আলাদাভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। যুক্তিসম্মত, বৈজ্ঞানিক এবং ধারাবাহিক বৌদ্ধিক সামর্থ্যকে প্রয়োগ করবার কথা বলেছেন সমাজতাত্ত্বিক ভাবনার বিশ্লেষণে এবং ব্যাখ্যা দানের ক্ষেত্রে। অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডেস তাই স্বীকার করেছেন যে ভারতীয় সমাজ ভাবনার বিশ্লেষণে এবং ব্যাখ্যা দানের ক্ষেত্রে নিবেদিতা তাৎক্ষণিক মূর্ত এবং বিমূর্ত চিন্তন ও বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক চিন্তনকে একই সঙ্গে তুলে ধরে একটি সত্যে উপনীত হতে পারতেন। কারণ নিবেদিতা পেয়েছিলেন সেই অন্তর্দৃষ্টি। (Nivedita Centenary Memorial Volume, 1967. pp. 87-88).

মানব সমাজের সাধারণ প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করে নিবেদিতার সমাজতাত্ত্বিক ভাবনা গড়ে ওঠেনি। বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক কমেট বলেছেন যে কোন মানব সমাজ হল একটি জটিল সংগঠন। মানব সমাজের এই জটিল সংগঠনকে বুঝতে গেলে প্রয়োজন সমাজতত্ত্বের উপর বিশেষীকৃত জ্ঞান, যা ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে ছিল। নিবেদিতার কথায়, "Perhaps the very Foundation Stone of Sociological truth lies in that Unity of Humanity..." (Complete Works of Sister Nivedita, Vol- IV, P. 236)

প্যাট্রিক গেডেসের মত ভগিনী নিবেদিতা ও আদর্শ খোঁজার ক্ষুধা অনুভব করেছেন ঠিক যেমন করে অন্ন ও রুটির জন্য ক্ষুধার্ত মানুষ হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়। নিবেদিতার কথায় এর প্রমাণ মেলে– "...We are first of all moral beings with social sympathies and an appetite for ideals that is quite as real as that for bread, and far more imperative..." (Sankari Prasad Basu 1982. 'Letters of Sister Nivedita', Vol- II, P. 1219)

ভগিনী নিবেদিতা তাঁর সমাজতাত্ত্বিক ভাবনায় মূলত ভারতীয় সমাজ নিয়ে গভীর পর্যবেক্ষণ করেছেন। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার পিছনে যে নৈতিকতা এবং আদর্শ রয়েছে তিনি তাকে অনুধাবন করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ এবং বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক কমেট এর পথ ধরে তিনি ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার অতীত থেকে বর্তমান হয়ে ভবিষ্যৎকে ধরেছেন। তাঁর মতে আদর্শের কখনো মৃত্যু হয় না। নতুন নতুন আদর্শ পুরাতনের উপরে চেপে বসে মাত্র। ভারতের বর্তমান অবস্থা প্রোথিত রয়েছে অতীতের সমাজব্যবস্থার মধ্যে, যা তাঁর চোখে ভাবি কালে ভারত আবার আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। প্রকৃতপক্ষে সমাজতাত্ত্বিক হিসেবে নিবেদিতা ভারতীয় সমাজ ভাবনাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন একজন তদন্তকারী হিসেবে, কোন রকম নেতিবাচক সমালোচনা করা থেকে তিনি নিজেকে বিরত রেখেছেন। তাই ভারতবর্ষের অতীত গৌরবের সঙ্গে তিনি বর্তমানকে মিশিয়েছেন এবং ভবিষ্যতের আলোকিত দিকগুলিকে খোঁজার চেষ্টা করেছেন। তাই তিনি কোন সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় নিজেকে দাঁড় করাননি। নিবেদিতার ভাবনায় তাই ভারতবর্ষ তাঁর চোখের সামনে ভারতমাতা রূপে উঠে এসেছেন। রবীন্দ্রনাথের কথায় ভগিনী যখন বলতেন– আমার দেশ, আমার ভারতবর্ষ তখন যে সুরটি তাঁর কণ্ঠে ঝংকৃত হত তেমনটি আর কারোর গলায় শোনা যায় না। নিবেদিতার সমাজতাত্ত্বিক ভাবনা থেকে তাঁর মেয়েদের জন্য শিক্ষা ভাবনাকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। তাঁর সমাজ ভাবনা এবং শিক্ষা ভাবনা যেন একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে বা একই মুদ্রার দুটি পিঠ হিসেবে হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর কথায়, "...was accustomed to Education for Centuries, to the preoccupation with race, in its proper sense of the term, environment to him was not all." (Sankari Prasad Basu 1982. 'Letters to Sister Nivedita', Vol- II, P. 1244)

ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক উৎস নিয়ে ভগিনী নিবেদিতার মনে কোন প্রশ্ন ছিল না। বরঞ্চ তিনি বলছেন যুগে যুগে বিদেশীরা আক্রমণ করেছে ভারতবর্ষকে, কিন্তু ভারতবর্ষ বিদেশীদের সংস্কৃতিকে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করেছে এবং বিদেশীদেরকেও ভারতবর্ষের জাতীয় ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্তিকরণ করেছে। ভাষা বা বর্ণের ওপর ভিত্তি করে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার বিভাজনকে তিনি স্বীকার করেননি, বরঞ্চ তিনি বলেছেন সমস্ত ধরনের কাজে দক্ষ মানুষেরা সমবেত হয়ে ভারতীয় সমাজকে গড়ে তুলেছেন। তিনি ভারতবর্ষের হিন্দু এবং মুসলমানকে একত্রে থাকার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন কারণ একই অঞ্চলে হিন্দু এবং মুসলমানের জন্ম। ভারতবর্ষের বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যের সুরটিকে ভগিনী ধরতে পেরেছিলেন তাই সমগ্র ভারতবর্ষকে তিনি একটি অবিভক্ত সমাজ বলে স্বীকৃতি

দিয়েছেন। কোন একটি অঞ্চলে মানুষ যে অভিজ্ঞতা অর্জন করছে তাকে অন্য অঞ্চলের সঞ্চারিত করার স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন, সবকিছুর মধ্যে তিনি প্রকৃত সত্যটিকে খুঁজে বেড়িয়েছেন এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, শ্রী অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ মনীষীদের নেতৃত্বে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যে জাতীয় আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার প্রতি ভগিনী নিবেদিতা আন্তরিক স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, বিভিন্ন সময়ে তিনি সক্রিয়ভাবে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন অবিভক্ত ভারতবর্ষের। তিনি স্বীকার করে গেছেন অজ্ঞতার কারণে বিদেশীরা ভারতবর্ষের ঐক্য এবং স্বাধীনতাকে স্বীকার করতে পারছেন। তিনি ভারতবর্ষে শ্রমিক আন্দোলন এবং শ্রমিক ঐক্য, কৃষক ঐক্য, রেল কর্মচারীদের অ্যাসোসিয়েশন এবং সরকারি কর্মচারীদের ঐক্যের স্বপক্ষে জোরালো যুক্তি দিয়েছেন। কারণ এর মাধ্যমে পরস্পর নিজেদের ভাবনা এবং অভিজ্ঞতাকে ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ পাবে। নারীশিক্ষা, নারীমুক্তি, নারী জাগরণ এবং নারীর ক্ষমতায়নের ধারণা তিনি লাভ করেছিলেন তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে। নিবেদিতা তাঁর সমাজতাত্ত্বিক ভাবনার মধ্যে গুরুর কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ভারতীয় নারী বিষয়ক ভাবনাগুলিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পেয়েছেন এবং যুগোপযোগী করে তাকে প্রয়োগ করেছেন ও এই বিষয়ে ভবিষ্যতের পথনির্দেশ করেছেন। শূদ্র সমস্যা নিয়েও ভগিনী নিবেদিতা তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের অনুসরণ করেছেন। কারণ নিবেদিতার মতে ভারতের জাতি ব্যবস্থায় কর্মের ওপর ভিত্তি করে চারটি বর্ণ সৃষ্টি হয়েছিল। স্বামীজী ছাড়াও শ্রীমদভগবত গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি তিনি পড়েছিলেন– "চাতুরবর্ণং ময়া সৃষ্টম্ গুণ কর্ম বিভাগশঃ"। প্রাচীনকালে জাতি ব্যবস্থায় কর্মের বিভাজন থাকলেও সেখানে কেউই ব্রাত্য বা অস্পৃশ্য ছিল না। ভারতীয় সমাজে বর্ণ ব্যবস্থায় অস্পৃশ্যতার ধারণা অনেক পরে এসেছে তাই নারী এবং শূদ্র জাতির উত্থানের স্বপক্ষে নিবেদিতা জয়গান গেয়েছেন কারণ তিনি জানতেন এই দুই শ্রেণীর শিক্ষা, জাগরণ এবং ক্ষমতায়ন ব্যতিরেকে ভারতরাষ্ট্রের উন্নতি সম্ভব নয়। এই প্রেক্ষাপটেই তাঁর মেয়েদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা। যদিও স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে ভারতবর্ষে আসার জন্য আকুল ভাবে আহ্বান করেছিলেন ভারতীয়ভাবে ভারতীয় মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে। এই কাজে নিবেদিতা সাফল্য পেয়েছিলেন–এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। স্বামীজীর দেহরক্ষার (৪ ঠা জুলাই, ১৯০২) পরে নিবেদিতা ভারতের জাতীয় আন্দোলন এবং জাতীয় উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার কারণে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মেয়েদের স্কুলের জন্য তিনি যথেষ্ট সময় দিতে পারেননি ঠিকই কিন্তু সব সময় তাঁর মনের মধ্যে বিদ্যালয় ভাবনা এবং মেয়েদের শিক্ষা তাঁকে নাড়া দিত।

ভগিনী নিবেদিতা একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেছিলেন যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলে শিক্ষার সুযোগ লাভ করবে এবং সামর্থ্য অনুযায়ী নিজেকে বিকশিত করতে পারবে। একটি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা ব্যতিরেকে কখনোই ভারতবর্ষ আবার নিজেকে পূর্বের মহিমায় প্রতিষ্ঠা করতে পারবেনা। এই একই কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছি স্বামী বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখায়। পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্র বসুও

বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-নিবেদিতার সমাজ ও শিক্ষা ভাবনার সঙ্গে একাত্মবোধ করেন। সুভাষ রচনাবলীর ছত্রে ছত্রে এর প্রমাণ পাই।

নিবেদিতার হিন্দু ধর্মভিত্তিক সমাজ ও শিক্ষা ভাবনার প্রকৃত চিত্রটি ধরা পড়ে নিবেদিতার লেখায় –

“The religious education of Hinduism is a complete development not only of the religious, but also of the domestic and social mind. But the Department does not understand this. This image is a means of basing the idea of divine mercy for concrete sensation. The girls' vratas, the cow-puja, and fifty other things, are a complete inclusion of this theory in Hinduism itself, and the right way would be to start from them, and go further if possible. Meanwhile, the beginning of education may be in the concrete, but its end lies in the trained attention, and power of concentrating the mind – and that India understands, as Europe never can.” (‘Letters of Sister Nivedita’, Vol- II, P. 580)

নিবেদিতার সমগ্র ভাবনার এবং কর্মের নির্যাসকে তাঁর কথায় তুলে ধরা যেতে পারে, “Be a nation. Think great of yourselves. Believe in your organic relatedness. Imagine a life in which all have common interests, common needs and mutually complementary duties.” (Ibid, P. 664) অবাক বিস্ময়ে আমরা তাকিয়ে দেখি যখন নিবেদিতা তাঁর প্রত্যাশা রেখে যান এই বলে যে–সেই দিনটি কত না সুখকর হবে যেদিন আমার মেয়েরা তাল পাতার ওপর সংস্কৃত ভাষায় লিখে আমার ঘরখানিকে সাজিয়ে দেবে।

বেগম রোকেয়া :

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সমস্ত কাজের পিছনে মূল চালিকা শক্তি ছিল তাঁর নারী শিক্ষা সম্বন্ধীয় ভাবনা এবং কীভাবে ভারতবর্ষের নারী জাতিকে সচেতনতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে তাঁর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। Ferdousi (2014) রোকেয়ার মৃত্যুর কয়েক বছর আগে Bengal Women's Educational Conference -এ রোকেয়ার বক্তব্যের একটি উদ্ধৃতিকে তুলে ধরেছেন– “You shall be perhaps surprised to know that for the last twenty two years I have been weeping for the most unfortunate being of India. Do you know who they are? They are Indian women. Nobody's heart ever wept for these being. The sorrows or the untouchable communities have moved the heart of Mahatma Gandhi. There are even people who think about animals, we find associations for the prevention of distress to animals here and there but to weep for women like you, who are Captive's of speculation; there is not a single person in the whole of India.”

একবিংশ শতাব্দীতে আজকে মেয়েদের যে উন্নয়ন লক্ষ্য করা যাচ্ছে তার পিছনে বেগম রোকেয়ার প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ। ১৯০১ সালে থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত রোকেয়া তাঁর বিভিন্ন সাহিত্যের মধ্যে নারীর পারিবারিক পরিমণ্ডলে তার শিক্ষার অধিকার, পুরুষের যোগ্য সহধর্মিণী হয়ে ওঠার অধিকার, স্বনির্ভরতার অধিকার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়ার অধিকার এবং একটি পরিপূর্ণ নারীতে রূপান্তরিত হওয়ার অধিকারের কথা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তুলে ধরেছেন। তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে সমস্ত ধরনের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বিপন্ন নারীকে বিভিন্ন ভাবে যুগিয়েছেন সাহস, দেখিয়েছেন পরিত্রাণের পথ। তিনি আহ্বান জানিয়েছেন মেয়েদেরকে কর্মজগতে আত্মসচেতনতার সাথে কর্মে প্রবেশ করতে। সর্বোপরি তাঁর শক্তিশালী লেখনী উঠে এসেছে নারীর জন্য পুরুষের ন্যায় সমান অধিকারের দাবিতে। প্রকৃতপক্ষে তার লেখনী পুরুষ তন্ত্রের বিরুদ্ধে যেন উদ্যত এক শাণিত তরবারি। সেদিন বেগম রোকেয়ার বিরুদ্ধে সমগ্র মুসলমান সমাজ প্রতিবাদে সামিল হয়েছিলেন কিন্তু রোকেয়ার একক প্রচেষ্টাকে সেদিনের মুসলমান নারী সমাজ কুর্নিশ জানিয়েছিলেন, কারণ মুসলমান মহিলারা ততক্ষণে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্তির আস্বাদন পেতে শুরু করেছেন।

রোকেয়া অনুধাবন করেছিলেন মুসলমান মেয়েদের পরিবারে তথা বৃহত্তর সমাজে পশ্চাৎপদতার অন্যতম কারণ তাঁদের মধ্যে শিক্ষার অভাব। যুগ যুগ ধরে অশিক্ষিতা থাকা মুসলমান নারী সমাজ তাই হারিয়েছিল নারী হিসেবে তাদের সচেতন থাকার অধিকারকে। "শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপ্লব।" বেগম রোকেয়া সঠিকভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে মুসলমান নারী সমাজকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করে তুলতে পারলে তাদের মধ্যেকার পর্বত প্রমাণ বাধা নিমেষে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে, আর তখনই মুসলমান মেয়েদের মধ্যে ঘটবে সমাজ বিপ্লব। তাই মুসলমান সমাজের মেয়েদেরকে মূল স্রোতের আঙিনায় পুরুষের সমকক্ষ করে তুলতে রোকেয়া আমৃত্যু ধনুর্ভাঙ্গা পণ করেছিলেন। এখানেই রোকেয়ার ভাবনার বৈশিষ্ট্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে জন্মগ্রহণ করা পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজে এক নারীর চিন্তন এবং কর্মের উত্থান বিংশ শতাব্দীর থেকে একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সমস্ত চিন্তাবিদকে তাই নাড়া দিয়ে যায়।

১৯১২-১৩ সালে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ঘটালেও মুসলমান মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ কোন অগ্রগতি ঘটেনি। তার কারণ অন্তঃপুর বাসিনী পর্দানসীন মুসলমান মেয়েদের পর্দা খুলে রেখে ছেলেদের সঙ্গে সহশিক্ষায় পাঠানোর কথা ভাবতে পারেননি সে যুগের মুসলমান সমাজ। কোন কোন পরিবার মক্তবে তাদের মেয়েদের পাঠাতেন কারণ সেখানে পর্দাপ্রথা বজায় থাকত। কাজী আব্দুল ওদুদ তাঁর বাংলার জাগরণ প্রবন্ধ লিখেছেন, "বিংশ শতাব্দীর প্রথম এবং দ্বিতীয় দশক গুলিতেও মুসলিম সম্প্রদায় ধর্মীয় কারণে মেয়েদের পর্দানসীন করে রাখতে বাধ্য হত।" (পৃ.- ২২) তাই কোন কোন মুসলমান মহিলার একক প্রচেষ্টায় মুসলমান মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হলেও বাস্তবে শিক্ষা, সচেতনতা ও সমাজ ভাবনার ক্ষেত্রে মেয়েদের মধ্যে বিশেষ কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। সমগ্র মুসলমান নারী সমাজকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে হয়েছিল ১৯০৯ সালের ১ লা অক্টোবর পর্যন্ত অর্থাৎ ভাগলপুরে রোকেয়ার বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার দিকে। ১৯১১ সালের ১৬ই মার্চ ১৩ নম্বর ওয়ালিউল্লাহ রোডে

মাত্র আট জন ছাত্রী ও দুটি বসার বেঞ্চ নিয়ে রোকেয়া শুরু করেছিলেন 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'। শুরুতেই বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি, আর্থিক অনটন, সমাজের কুৎসা রটনা ও মিথ্যা অভিযোগের পাহাড় প্রমাণ বেদনা নিয়ে রোকেয়া শুরু করলেন একাকী পথ চলা, সঙ্গে নিলেন অগণিত জনগণের সাহায্য, ভালবাসা এবং আশীর্বাদ। বিভিন্ন মানুষ রোকেয়াকে এই কাজে আর্থিক সহায়তা দান করেন। এদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজন হলেন – বোম্বের বাসিন্দা মিস্টার মালাবারী, কলকাতার মরহুম নওয়াব বদরুদ্দিন হায়দার, স্যার এ. কে. গজনভী, শরফুদ্দিন সাহেব, সৈয়দ শামসুল হুদা, জনাব মাহবুব আলি, মহম্মদ সুলতান আহমেদ, মৌলবী এম. এস. আব্দুল বারি, জজ আমিন মহম্মদ, জি. এম. কাসেমী, বেগম সুলতান জাহান, মিসেস পি. কে. রায়, মিসেস হাকাম, মিসেস সাকিনা চৌধুরী, লেডি চেমস্ফোর্ড ও লেডি কারমাইকেল প্রমুখরা। আলীগড়ে এক অতি দরিদ্র মহিলা হাতের সোনার আংটিটি খুলে রোকেয়ার হাতে তুলে দিয়েছিলেন স্কুলের চাঁদা হিসেবে। নিদারুণ আর্থিক প্রতিকূলতা, আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যে অপরিসীম ধৈর্য নিয়ে রোকেয়া গড়ে তুলছিলেন তাঁর স্বপ্নের বিদ্যালয়– মুসলমান নারী শিক্ষার পীঠস্থান।

রোকেয়া কোনদিন স্কুলে যাননি অথচ তিনিই হয়ে উঠলেন নারী শিক্ষার কর্ণধার। পর্দানসীন মুসলমান মেয়েদের স্কুলে আনা-নেওয়ার জন্য তিনি গাড়ির ব্যবস্থাও করেছিলেন অভিভাবকদের অনুরোধে। এ প্রসঙ্গে রোকেয়া মরিয়মকে ১৯১৫ সালে একটি চিঠিতে লেখেন– "The only reason I couldn't answer to your letter is because I have little time. By Allah's grace we have 70 students studying in five classes. The school was a primary school at this time. We also have to horse-drawn carriages, two pairs of horses, a syce and a driver. I have to keep an eye on everything. I even have to make sure that the horses are regularly messaged in the evening." এই সময়ে স্কুলে আনা নেওয়ার কালে পর্দাপ্রথা বিঘ্নিত হচ্ছে বলে বহু অভিভাবক এবং 'কাঠমোল্লা'-রা রোকেয়াকে চূড়ান্ত হেনস্থা করেছিলেন, চারিত্রিক অপবাদ দিয়েছিলেন। বিনিময়ে রোকেয়া আক্ষেপ করে লিখেছেন,–"আমার হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পরিবর্তে সমাজ বিস্ফারিত নেত্রে আমার খুঁটিনাটি ভুল ভ্রান্তির ছিদ্র অন্বেষণ করিতেই বদ্ধপরিকর।" (রোকেয়া পরিচিতি, পত্র নং- ১, ১৯৯৬। পৃ. ৫০৯)

সে সময়ে শুধু কাঠমোল্লারা নয়, ধর্মান্ধ মোল্লা মৌলবীরাও রোকেয়ার শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমের অঙ্গ হিসাবে বিদ্যালয় স্থাপনের প্রচেষ্টাকে ধিক্কার দিয়েছিলেন। (মোতাহার হোসেন সুফি, ২০০৯। পৃ. ৪৮)। এত কিছুর মধ্যেও মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষার স্বপক্ষে বিদ্রোহের প্রথম ধ্বজাটি তুলে ধরেছিলেন শিক্ষাব্রতী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তাঁর হাত ধরেই মুসলমান নারী সমাজের কণ্ঠস্বর আর অশ্রুত রইল না। মেয়েদের সামনে খুলে গেল তাদের চিন্তা-চেতনার এক বৃহত্তর জগৎ।

রোকেয়া অনুধাবন করেছিলেন মেয়েদের চিন্তা চেতনার জাগরণ ঘটাতে গেলে শুধুমাত্র বিদ্যালয় স্থাপন করাই যথেষ্ট নয়। তাই বিবাহ, তালাক প্রথার বিরোধিতা, শিশুপালন বিধি ইত্যাদি সম্বন্ধে মুসলমান নারী সমাজকে জাগিয়ে তুলতে তিনি গড়ে তুললেন 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' সংগঠন (১৯১৬, ফেব্রুয়ারি)। বিস্ময়ের উদ্রেক করে যে বিংশ শতাব্দীর প্রথমে একজন নারী বিশেষত একজন মুসলিম নারী মুসলমান সমাজের মেয়েদেরকে সচেতন এবং সঙ্ঘবদ্ধ করার লক্ষ্যে গড়ে তুলেছেন এক মুসলিম মহিলা প্রতিষ্ঠান যাতে করে মুসলমান মেয়েরা এগিয়ে যেতে পারেন পূর্ণতার দিকে। এই প্রসঙ্গে শামসুল নাহার মাহমুদ লিখেছেন, "গভীর অন্ধকারে রোকেয়া শিক্ষার মঙ্গলদীপ জ্বালিলেন; সমাজের ভবিষ্যৎ জননীদিগকে নিজের হাতে গড়িয়া তুলিবার ভার নিলেন; সেই সঙ্গে মুসলিম নারীদের সামাজিক জীবন গঠন করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন।"('রোকেয়া পরিচিত', পত্র নং– ১, ১৯৯৬। পৃ.৫০)

ওই প্রতিষ্ঠানের কর্ম সমিতিতে নিযুক্ত ছিলেন বহু মুসলমান মহিলা। এই সমিতির মাধ্যমে রোকেয়া একদিকে যেমন নারী শিক্ষা এবং নারী জাগরণের আলো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তেমনি সহায় সম্বলহীনা বিধবা নারীকে সাহায্য দান, লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত নারীর রক্ষা, সমাজ পরিত্যক্ত ও দুঃস্থ মেয়েদের এবং অনাথ শিশুদের সাহায্য দান, রাজনৈতিক সচেতনতা মেয়েদের মধ্যে জাগিয়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধকে জাগিয়ে তোলা ছিল এই সমিতির উদ্দেশ্য। (গীতশ্রী বন্দনা সেনগুপ্ত, ১৯৯৯। পৃ. ২৪২)

এ প্রসঙ্গে শামসুল নাহার মাহমুদ লিখেছেন, "আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে তাঁহার এই দীর্ঘকালের জীবনে কী কী কাজ করিয়াছে তাহার বিবরণ আলোচনা করিলে দেখা যায়, অতীতে বহু বিধবা নারী ইহার নিকট হইতে অর্থ সাহায্য পাইয়াছে, বহু বয়ঃপ্রাপ্তা দরিদ্রা কুমারী ইহার সাহায্যে সৎপাত্রস্থা হইয়াছে, বহু অভাবগ্রস্থা বালিকা ইহার অর্থে শিক্ষালাভ করিয়াছে। ...কলিকাতার মুসলমান নারী সমাজে গত বিশ বৎসরে ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্টই বোঝা যায় এই সমিতি দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর আড়ালে মুসলমান সমাজকে কতখানি ঋণী করিয়া রাখিয়াছে।" (শামসুল নাহার মাহমুদ, ১৯৯৬। পৃ. ৫০)

এই সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল নারীকে বিশেষত মুসলমান নারী সমাজকে স্বনির্ভর করে তোলা। অসহায় মেয়েদের সাহায্যকল্পে নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বও এই সমিতিকেই নিতে বলা হয়েছে। নারী কল্যাণ এবং নারীর সামাজিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এখানে মেয়েদের বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ যেমন – আচার, চাটনি, জেলী, মোরব্বা ইত্যাদি তৈরির ব্যবস্থা ছিল, সূচি কর্ম ও সেলাই, হোম নার্সিং শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল এবং একই সঙ্গে মহিলাদের বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থাও এই সমিতিতে ছিল। তাই শামসুল নাহার মাহমুদ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, "নারীর সামাজিক, শিক্ষা বিষয়ক ও আইনগত অধিকার অনধিকার লইয়া সমিতি যে আন্দোলন করিয়াছে তাহা একেবারে নিরর্থক হয়ে নাই। ...ভারতবর্ষের আগামী শাসন সংস্কারে নারীর রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে এই সমিতি এককভাবে এবং অন্যান্য নারী প্রতিষ্ঠানের সহিত একযোগে যথেষ্ট কর্ম তৎপরতার পরিচয় দিয়াছে।" (তদেব, পৃ. ৩২)

রোকেয়ার সমাজ ভাবনা ছবির মত উঠে এসেছে আঞ্জুমানে খাওয়াতীনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে। রোকেয়ার জীবন প্রবাহ সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল হয়ে নদীর ধারার মতো আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে নামক মোহনায় এসে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। তাই রোকেয়া স্বয়ং লিখেছেন – "আঞ্জুমানের কাগজপত্র আলোচনা করিয়া দেখ, আমার কর্মজীবনের বহু কথা তাহারই মধ্যে খুঁজিয়া পাইবে।" (তদেব, পৃ. ৫০) রোকেয়া আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে বছরে একটি 'মিলাদ মহফিল' অনুষ্ঠান করতেন। সেই সময়ে তিনি বস্তিতে গিয়ে মেয়েদের শিক্ষাদান কর্মসূচি নিতেন। পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ সচেতনতা, কুটির শিল্পের প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যবিধি সচেতনতা ইত্যাদি বিষয়ে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বস্তির মহিলাদের শিক্ষা দিতেন। তাই প্রকৃত অর্থে তিনি বাংলাদেশের ব্যাপক উন্নয়নে এবং মুসলমান সমাজে নারী চেতনার নতুন ফলক প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। যেদিন তাঁর ভিতরে নতুন সাড়া জেগে উঠল, যেদিন তাঁর অপূর্ব প্রাণে প্রদীপের শিখা উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠল, সেদিনই মুসলমান নারী সমাজে সৃষ্টি হল নতুন চেতনা। অন্তঃপুরচারিণী নারী শিক্ষাহীনতার জড়তাকে কাটিয়ে, সমস্ত অপটুতাকে সরিয়ে দিয়ে রোকেয়ার নেতৃত্বে প্রথম দেখল স্বাধীনতার নতুন আলো। তিনি যে শুধু মেয়েদের শিক্ষা দিলেন তাই নয় তাঁর স্বপ্ন সঞ্চারিত করলেন মেয়েদের মায়েদের মধ্যে। তাদের মধ্যেও এলো নতুন আলো, মুক্ত বাতাস এবং স্বাধীন চিন্তা চেতনা। সমস্ত জীবন ধরে কৃচ্ছসাধন করেছেন, লোকের দুয়ারে দুয়ারে ফিরেছেন মেয়েদের শিক্ষা দান করার আহ্বান নিয়ে–বিনিময়ে পেয়েছেন শুধুই অপমান, উপহাস, চরিত্রহীনতার দুর্নাম। কিন্তু তিনি সরে আসেননি। আরও শক্ত মুঠিতে দৃঢ় পদক্ষেপ ফেলে এগিয়ে গিয়েছেন তাঁর আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে– 'মন্ত্রের সাধন, কিংবা শরীর পাতন'। তিনি মেয়েদের মধ্যে জাগিয়ে তুললেন আত্মমর্যাদাবোধ, সমান অধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষা, রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশীদারিত্ব। নারী শুধু নিজের স্বার্থেই জেগে উঠবে না, সে বদলে দেবে পুরুষ শাসিত সমাজকে, নারীকে হীনমন্যতা বোধ থেকে তুলে নিয়ে যাবে তার অধিকারের ক্ষেত্রে, নারী-পুরুষের পাশে দাঁড়াবে হাতে-হাত ধরে, পরিবার-সমাজ তথা রাষ্ট্রের সে হয়ে উঠবে সজাগ প্রহরী।

১৯২৫ সালে আলীগড়ে এক শিক্ষা কনফারেন্সের বক্তৃতায় রোকেয়া নারীত্বের যে জয়ধ্বজা উড়িয়েছিলেন সেই সম্বন্ধে এক প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন, "সে বৎসর আলিগড় শিক্ষা কনফারেন্সে মেয়েদের প্রতি অন্যায় অবিচারের জন্য বম্বের আতিয়া বেগমের নেতৃত্বে মেয়েরা যে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়াছিলেন, সেদিনও বাংলার মুখ রক্ষা করিয়া ছিলেন এই অপূর্ব মেয়েটি। পুরুষ নেতা ও অসংখ্য জনতার মধ্যে নির্ভীক পদবিক্ষেপে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া পুরুষের পক্ষপাত ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উত্তোলন, পরিশেষে নিজের অধিকার ও হক আদাই করিয়া লওয়া কম পৌরুষের কথা নয়।" (সুতপা ভট্টাচার্য, রোকেয়া, পৃ. ৭২-৭৩)

রোকেয়া যে মুসলমান নারী সমাজকে জাগিয়ে তুলছিলেন এবং পুরুষ শাসিত সমাজের মধ্যে মেয়েদের স্থানটিকে সম্মানের স্তরে উন্নীত করেছিলেন সেই বিষয়ে আনোয়ার হোসেন লিখেছেন– "Muslim women gradually began to be involved with the programmes and activities of the Women's Education

Conference, All Bengal Women's Conference and Bengal Women's Education League. All these associations were founded in 1927 in Calcutta. ... R. S. Hossain, a suffragist, a feminist and a social worker, got involved with the Education League alone with Saraladevi Chowdhurani, Mrinalini Sen, Kumudini Bose and others in order to press the government in enacting laws for the uplift of women." (Anowar Hossain, 1873-1940. p. 181)

বেগম রোকেয়া তাঁর সমস্ত জীবন ধরে নারী জাগরণ তথা সমাজের জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর আধুনিক চিন্তাধারা বিংশ এবং একবিংশ শতাব্দীর বহু শিক্ষাবিদ এবং সমাজতাত্ত্বিককে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। মেয়েদের ভোটাধিকারের স্বপক্ষে বেগম রোকেয়া সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। শামসুল নাহার মাহমুদ তাই লিখেছেন, "রোকেয়া শুধু কর্মী ছিলেন না, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছিলেন স্বাপ্নিক। নারী জাগরণের যে অভিনব স্বপ্ন জীবনের সোনালী ঊষায় তাঁহার চোখের সম্মুখে জাগিয়া ছিল, তাহাকেই বাস্তবে পরিণত করিবার চেষ্টায় তাঁর সমস্ত জীবন অতিবাহিত হয়।" (রোকেয়া জীবনী, ১৯৯৬। পৃ. ৬২)। চিন্তায় এবং চেতনায় রোকেয়া ছিলেন সে যুগের নারী সমাজের এক অগ্রণী ব্যক্তিত্ব। মুসলিম সমাজে তিনি প্রথম নিজের পথ নিজেই তৈরি করেছিলেন। শূন্য থেকে শুরু করে তাঁর যাত্রা শেষ হয় পূর্ণতায়। অমাবস্যার গাঢ়তর অন্ধকার থেকে মুসলিম সমাজকে, বিশেষত মুসলিম নারী সমাজকে তিনি নিয়ে আসেন পূর্ণিমার আলোকোজ্জ্বল রাত্রিতে। চেতনায় তিনি যুগোত্তীর্ণা কিন্তু যুগ মানসিকতাকে ধরেই শুরু হয়েছিল তাঁর যাত্রা। মুসলমান সমাজের রক্ষণশীল মূল্যবোধকে অগ্রাহ্য করে পুরুষতন্ত্রের খাঁচায় বন্দী মুসলিম মহিলাদের তিনি মুক্তি দিয়েছিলেন, নারীর বঞ্চনার বিরুদ্ধে তুলে ধরেছিলেন বিদ্রোহের পতাকা। সামাজিক চেতনার জাগরণ ঘটাতে গিয়ে সমকাল দেখেছিল তাঁর সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক, সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং লড়াকু চারিত্রিক গঠন। এখানেই রোকেয়া যুগোত্তীর্ণা, কালোত্তীর্ণা। তাই সমকালের গণ্ডি পেরিয়ে আজও তাঁকে নিয়ে পাঠ, গবেষণা এবং আলোচনা সমানভাবেই প্রাসঙ্গিক।

৭.৩ জাতীয় শিক্ষানীতি 2020—ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার ভাবনার প্রতিফলন

ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়াকে নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে ভারতের বর্তমান জাতীয় শিক্ষানীতির (National Education Policy, 2020) কথা উঠে আসে। ২০২০ সালে যে জাতীয় শিক্ষানীতি পাশ হয় তাতে বলা হয়েছে, "Pedagogy must evolve to make education more experiential, holistic, integrated, inquiry-driven, discovery-oriented, learner-centered, discussion-based, flexible, and of course, enjoyable." (NEP, 2020. p. 3) ভগিনী নিবেদিতা যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করেছিলেন তার মধ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ -র প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। তিনি শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক অভিজ্ঞতাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন তাঁর পাঠদান কালে। কোন বিষয়ে পড়ানোর সময় তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রশ্ন করার মানসিকতা জাগিয়ে দিতেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে, মুখস্থ করে যে শিক্ষা বা অন্যকে অনুকরণ করে যে শিক্ষা লাভ হয় তা প্রকৃত শিক্ষা নয়। মুখস্থ করা, পরীক্ষা পাশ করা, নম্বর পাওয়া বিদ্যাকে তিনি গুরুত্ব দেননি। তিনি চেয়েছিলেন মেয়েদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে একটি সামগ্রিক (holistic) ভাবনা উঠে আসুক। তাঁর সমস্ত শিক্ষা ভাবনা ছিল সমন্বিত ভাবনা। তিনি বিভিন্ন বিষয়কে আলাদা করে দেখেননি – বরঞ্চ আপাত বিভিন্ন বিষয় গুলির মধ্যে একটি সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। একটি ভাবনা বা একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে কিভাবে অন্যান্য বিষয়গুলিকে পাঠদান করা যায় সে বিষয়ে তাঁর দীর্ঘ গবেষণা প্রসূত অভিজ্ঞতাকে তিনি শিক্ষাদান কার্যে ব্যবহার করেছেন। তিনি নিজে যেমন নিত্যনতুন আবিষ্কারের নেশায় মেতে থাকতেন তেমনি শিক্ষার্থীদেরও অতি সাধারণ আপাতত ছোট ছোট গুরুত্বহীন বিষয়ের মধ্যে নতুন তথা নিত্য সত্যকে আবিষ্কারের জন্য উদ্বুদ্ধ করে তুলতেন। পাঠক্রম প্রস্তুতকরণ, পাঠদান পদ্ধতি, শৃঙ্খলাবোধ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই নিবেদিতা তাঁর নমনীয় মনোভাবকে প্রকাশ এবং প্রয়োগ করেছেন। তিনি তাঁর ছাত্রীদেরকেও নমনীয় হয়ে উঠতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ভারতীয় নারী চরিত্রের মধ্যে নমনীয়তা ও সহনশীলতার অবহমানকাল ব্যাপী চর্চাকে তিনি সম্মান জানিয়েছেন এবং নিজের ছাত্রীদের মধ্যে সেই গুণাবলীর প্রকাশ ঘটানোর জন্য চেষ্টা করে গেছেন। তিনি যখন ছাত্রীদের নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যেতেন তখন সেই স্থান সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করতেন এবং প্রতিটি ছাত্রীকে সেই আলোচনার পরিসরের মধ্যে নিজস্ব মনোভাবকে প্রকাশ করবার সুযোগ করে দিতেন। রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্যদের সঙ্গে বুদ্ধগয়াতে গিয়ে একইভাবে তিনি নিজের অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতিকে আলোচনার পরিসরে তুলে ধরেছেন। আবার ইনি যখন শিক্ষার্থীদের পাঠদান করতেন তখন প্রকৃত অর্থেই তা হয়ে উঠত আনন্দপাঠ। শিক্ষণ এবং শিখন প্রক্রিয়া যে আসলেই একটি আনন্দের অনুভূতি লাভের বিষয় তা নিবেদিতার পাঠদান পদ্ধতিতে প্রতিফলিত হয়েছে। নিবেদিতার প্রত্যক্ষ ছাত্রীদের বয়ানে সেই কথা বারে বারে উঠে এসেছে।

ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতি (২০২০) বার বার Equity-র উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। নিবেদিতা তাঁর ছাত্রীদের যার যেমন সহায়তা প্রয়োজন তাকে তেমন সহায়তাই দিতেন। অর্থাৎ, সহায়তার দান হয়ে উঠত শিক্ষার্থীর প্রয়োজন ভিত্তিক। প্রায় একশত বছর আগে Equity বিষয়ে নিবেদিতার যে দূরদৃষ্টি তা একবিংশ শতাব্দীতে এসে ভারত সরকার অনুধাবন করলেন এবং ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতিতে তাকে গুরুত্ব দিলেন।

বর্তমান শিক্ষা প্রসঙ্গে Sustainable development -এর উপর গুরুত্ব দানের কথা বলা হয়েছে। নিবেদিতা অতি সাধারণ এবং অতি ক্ষুদ্র জিনিস গুলিকেই কিভাবে ব্যবহারিক কাজে লাগানো যায়, সেই অভিজ্ঞতার এবং যুক্তিকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চারিত করতেন। রবীন্দ্রনাথের ভাবনার মধ্যেও নিবেদিতার এই মনোভাবের প্রতিফলন দেখি।

জাতীয় শিক্ষানীতি (২০২০) ভারতের প্রাচীন গৌরব, প্রাচীন সংস্কৃতির উত্তরাধিকার এবং প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয়রা জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং সত্যের সাধনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এ বিষয়ে প্রাচীন ঋষিরা এবং আচার্যরা জীবনকে সম্পূর্ণরূপে, সর্বতোভাবে অনুভব করার এবং আত্মার মুক্তির সাধনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রাচীন ভারতের তক্ষশীলা, নালন্দা, বিক্রমশীলা, বল্লভী প্রভৃতি স্থানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষাদান এবং গবেষণায় যে উচ্চতায় পৌঁছেছিলেন জাতীয় শিক্ষানীতি (২০২০) তাকে সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করেছেন। নিবেদিতা ছাত্রীদের পাঠদান কালে উল্লিখিত বিষয়গুলিকে উল্লেখ করতেন এবং তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণে শিক্ষার্থীদের অন্তরে অখণ্ড ভারতবর্ষ সম্বন্ধে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং ভালোবাসাকে জাগিয়ে তুলতেন। প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন বিষয়ে নিবেদিতার ভাবনা এবং একবিংশ শতাব্দীতে ভারত সরকারের ভাবনার মধ্যে কোথাও সামান্যতম পার্থক্য পাওয়া যায় না। তিনি প্রায়ই তাঁর মেয়েদের গার্গী, মৈত্রেয়ী, অপালা, ঘোষা, বিশ্ববারা, সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, গান্ধারী, কুন্তী প্রমুখদের বিষয়ে কাহিনী শোনাতেন, তাঁদের জীবন ও কর্মকে বিশ্লেষণ করতেন এবং তাঁর শিক্ষার্থীদেরও সেই অনুভূতির মধ্যে প্রবেশ করাবার চেষ্টা করতেন। এর দ্বারা তিনি তাঁর ছাত্রীদের মধ্যে প্রাচীন যুগ এবং মহাকাব্যের যুগে নারীদের প্রতি যেমন শ্রদ্ধার বোধ জাগিয়ে তুলতেন তেমনি তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতেন আত্মসম্মান বোধ, আত্মশ্রদ্ধা এবং আত্ম-স্বীকৃতিকে।

জাতীয় শিক্ষানীতি (২০২০) সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভাবে পশ্চাৎপদদের শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এই কথার প্রতিফলন আমরা দেখেছি স্বামী বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা ভাবনার মধ্যে। বিবেকানন্দের ভাবধারায় স্নাত নিবেদিতাও পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর শিক্ষা এবং উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

বেগম রোকেয়া পশ্চাৎপদ, কুসংস্কারের পঙ্কিল আবর্তে হাবুডুবু খেতে থাকা মুসলিম মেয়েদেরকে অজ্ঞানতার ও অশিক্ষার অন্ধকার থেকে জ্ঞান ও শিক্ষার আলোকে টেনে এনে মুক্তি দিয়েছেন। মুসলিম সমাজ বিশেষত তাদের মেয়েরা যুগ যুগ ধরে পিছিয়ে ছিল, এমনকি আজও অনেকাংশেই পিছিয়ে রয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি (২০২০) –তে সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার ভাবনার প্রতিফলন তাই দেখতে পাই।

জাতীয় শিক্ষানীতি (2020) উচ্চ শিক্ষায় সমতা এবং একীভবন (Equity and Inclusion in Higher Education) সম্বন্ধে আলোচনাতে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের করণীয় গুলি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "Ensure sensitization of faculty, counselor, and students on gender - identity issue and its inclusion in all aspects of the HET (Higher Education Institution), including curricula" (Ibid, p. 42). সুতরাং একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে ভারত সরকারের পক্ষে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রককে স্বীকার করতে হয়েছে যে, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও মেয়েদের শিক্ষা এবং সমস্যার বিষয় গুলিকে কম গুরুত্ব দিয়ে বিচার করলে চলবে না। আর এজন্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকা, পেশাদার মনোবৈজ্ঞানীক, পরামর্শদাতা এমনকি শিক্ষার্থীদেরও মেয়েদের শিক্ষা এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের সমস্যা বিষয়ে যথেষ্ট অবহিত করাতে হবে। ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়া দুজনেই একশ বছরেরও পূর্বে এই বিষয়ে সমাজের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন এবং নিজেরাও সক্রিয়ভাবে মেয়েদের শিক্ষা, স্বাধীনতা, উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। জাতীয় শিক্ষানীতি (2020) সমস্ত স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে সমস্ত দক্ষতা এবং শিখন সামর্থ্যের বিকাশ ঘটানোর কথা বলেছেন তার অনেকগুলি ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়া শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে বহুলভাবে ব্যবহৃত হতো। যেমন – "creativity and innovativenesss, sense of aesthetics and art, oral and written communication, health and nutrition... wellness, sports, collaboration and teamwork, problem solving and logical reasoning, vocational exposure and skill, ethical and moral reasoning, values, gender sensitivity, citizenship skill and values, knowledge of India, environmental awareness including water and resource conservation..." (ibid, p. 15)

জাতীয় শিক্ষানীতি (2020) তে যদিও সরাসরি ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার নামের উল্লেখ নেই কিন্তু স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, এঁদের চিন্তাভাবনা এবং কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন জাতীয় শিক্ষানীতিতে রয়েছে।

৭.৪ উপসংহার

ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়া কেউই সমাজ-সংস্কারের লক্ষ্যে কাজ করেননি। দুজনের প্রধান লক্ষ্য ছিল মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার। নিবেদিতা মূলত হিন্দু সমাজের মধ্যে থেকে হিন্দু পরিবারের মেয়েদের শিক্ষার দায়িত্ব নিজ আগ্রহে কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। অপরদিকে বেগম রোকেয়া মুসলমান পরিবারের মেয়ে হওয়ায় নিজের চোখে দেখেছিলেন মুসলমান মেয়েদের দুরবস্থা। তাই তিনিও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মুসলমান মেয়েদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব তাঁর জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। নিবেদিতা মুসলমান সমাজের মধ্যে প্রবেশ করার সুযোগ পাননি এবং অন্যদিকে পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করতে গেলে অনেক বেশি বাধার সম্মুখীন হতেন। তবে বাগবাজারে হিন্দু পল্লীর ভিতরে হিন্দু মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা, ছাত্রী সংগ্রহ এবং এর জন্য অর্থের ব্যবস্থা করতে গিয়ে তাঁকেও বিভিন্ন প্রকারের বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। অন্যদিকে রোকেয়ার সমস্ত জীবনই ছিল সমস্যায় দীর্ণ।

প্রায় একই সময়ে দুজনেই কলকাতায় মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দুজনের মধ্যেই কখনো সাক্ষাৎ হয়েছে বা পরস্পর পরস্পরকে চিনতেন বা পরস্পর পরস্পরের কাজের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এরূপ কোন প্রমাণ জানা যায়নি। নিবেদিতা যদিও মূলত হিন্দু সমাজের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে মনোনিবেশ করেছিলেন কিন্তু সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায় সম্বন্ধে কখনো কোন নেতিবাচক উক্তি করেননি। একই ভাবে বেগম রোকেয়া যদিও মুসলমান সমাজের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন কিন্তু তিনিও কখনো হিন্দু সমাজ বা হিন্দু মহিলাদের সম্বন্ধে নেতিবাচক উক্তি করেননি বা নেতিবাচক মনোভাব দেখাননি। বরঞ্চ রোকেয়ার বিভিন্ন লেখায় হিন্দু মহিলাদের উদাহরণ টেনেছেন ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে।

ভগিনী নিবেদিতা অনেকের মতে একজন বৈজ্ঞানিক সমাজতাত্ত্বিক। কারণ সমাজব্যবস্থা নিয়ে তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে। স্বামী বিবেকানন্দ, প্যাট্রিক গেডেস, ক্রিপ্টকিন, কমেট প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিকদের দ্বারা এবং রুশ বিপ্লবের দ্বারা নিবেদিতা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা, ভারতীয় বর্ণাশ্রমধর্মী জাতি ব্যবস্থা, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বিপ্লব এবং ভারতবর্ষের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি যে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন তার যথার্থতা আজও প্রাসঙ্গিক। নিবেদিতা পরবর্তীকালের সমাজতাত্ত্বিকরা নিবেদিতাকে ভারতবর্ষে সমাজতত্ত্বের অন্যতম ব্যাখ্যাতা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ভারতবর্ষে নিবেদিতার অবদান সম্বন্ধে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ যে উক্তিটি প্রকাশ করেছেন সেটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য– "If the country was astir again and fast moving forward, it was entirely due to her claseless efforts; She urged, appealed, argued, cajoled or scolded only to make the people feel confident, work hard and shape their destinies as they thought best, without waiting for others to shape them." (Impact of Sister Nivedita on Indian society, 2018. p. 305)

বেগম রোকেয়ার সমাজ ভাবনাও শুধু সেযুগের জন্য নয় বর্তমান কালের জন্যও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। স্বশিক্ষিকা রোকেয়া শুধুমাত্র লেখিকা বা মেয়েদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাত্রী মাত্র ছিলেন না, একই সঙ্গে তিনি ছিলেন একজন সেই যুগের সমাজ সংস্কারক। তাঁর মানসিক দৃঢ়তার জন্য তিনি ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের সঙ্গে পর্বত প্রমাণ প্রতিবন্ধকতাকে ভেঙে গুড়িয়ে দিয়ে নিজের কাজের জগৎ তৈরি করেছিলেন। তাঁর সাহিত্য কৃতির প্রতিটি ছত্রে ভারতীয় মুসলমান মেয়েদের ক্ষেত্র বিশেষে হিন্দু মেয়েদেরও শিক্ষিতা হওয়ার, জেগে উঠবার, অর্থ উপার্জন করার এবং স্বশক্তিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয়তাকে দীপ্ত কণ্ঠে প্রকাশ করেছেন। তাঁর ক্ষুরধার লেখনীকে তিনি ব্যবহার করেছেন মুসলমান সমাজের মৌলবাদের বিরুদ্ধে, বিশেষত 'কাঠমোল্লা'দের বিরুদ্ধে। তিনি বুঝেছিলেন ভারতবর্ষে মুসলমান সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে শুধুমাত্র মুসলমান পুরুষদের শিক্ষা, অর্থোপার্জন এবং ক্ষমতায়ন যথেষ্ট নয়। মুসলমান মেয়েদেরকেও পুরুষদের সমকক্ষ করে তুলতে না পারলে মুসলমান সমাজের অগ্রগতি অসম্ভব। মুসলমান সমাজের পশ্চাৎপদতার অন্যতম কারণ মুসলমান মেয়েদের জন্য পর্দা প্রথা এবং তাদেরকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখা। তাঁর মতে পুরুষ এবং মহিলা মুসলমান সমাজেও সমকক্ষ হবে এবং একে অন্যের পরিপূরক হবে। কেবলমাত্র মুসলমান পুরুষদের উন্নয়ন দ্বারা মুসলমান সমাজের উন্নতি সাধন অসম্ভব। পুরুষ এবং নারী উভয়েরই পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটা প্রয়োজন। যে কোনো উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হল, নারী এবং পুরুষের মধ্যে ঐক্য সাধন। মুসলমান সমাজের সমাজ ভাবনা সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে রোকেয়া বলতে পেরেছিলেন কারণ তাঁর বুদ্ধিমত্তা, চিন্তনের গভীরতা, ভাষা ব্যবহারের সাবলীল দক্ষতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি স্পষ্ট বক্তব্য তুলে ধরার সামর্থ্যের জন্য। তাই রোকেয়া কেবলমাত্র একজন মুসলিম সমাজের নারী শিক্ষা বিস্তারে অন্যতম প্রবক্তা মাত্র ছিলেন না, তাঁর সমাজ ভাবনা, তাঁর শিক্ষা দর্শন, আদর্শ, চিন্তন, দৃষ্টিভঙ্গি এবং সামাজিক সচেতনতা তাঁকে একই সঙ্গে মুসলমান সমাজে সমাজ ভাবনার অন্যতম পথিকৃৎ রূপে স্বীকৃতি দিয়েছে। তিনি মুসলমান মেয়েদেরকে সমস্ত ধরনের সংকীর্ণতা, শোষণ, বঞ্চণা, সামাজিক পতন, ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন এবং মুসলমান সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে মেয়েদেরকে শিক্ষিতা এবং ক্ষমতা অর্জন করাতে চেয়েছেন। রোকেয়ার সমাজ ভাবনা ছিল মানবতাবাদী এবং যুক্তিবাদী ভাবনার সংমিশ্রণ। সাহসের সঙ্গে তিনি সমস্ত ধরনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সমস্ত শক্তিকে তিনি নিঃশেষিত করেছেন মুসলমান সমাজে পশ্চাৎপদ মহিলাদের উন্নয়নে এবং এর মধ্য দিয়ে মুসলমান সমাজের উন্নয়নে। মুসলমান সমাজে মহিলাদের ক্ষমতায়নে তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টা বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

৭.৫ বর্তমানকালে শিক্ষা ক্ষেত্রে ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়া'র শিক্ষা ও সমাজ ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা :

ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়া উভয়েই বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে চিরাচরিতভাবে চলে আসা ভাবনা থেকে অনেকটা এগিয়ে ভাবতে পেরেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে একশত বছর পেরিয়ে এসেও আজও আমরা ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার সমাজ ভাবনা এবং শিক্ষা ভাবনার প্রাসঙ্গিকতাকে অস্বীকার করতে পারিনা। উল্লিখিত দুজন মহীয়সী নারী বুঝেছিলেন সে যুগের সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েদের যে অবস্থান চালু ছিল তার থেকে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে মেয়েদেরকে বের করে আনতে না পারলে উপযুক্ত আধুনিক সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম স্বপ্ন ছিল নারী এবং শূদ্রের জাগরণ। তাঁর মতে শিক্ষাবিস্তার এবং জ্ঞানের উন্মেষ ছাড়া ভারতবর্ষের উন্নতি সম্ভব নয়। সাধারণের ভেতর আর মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার না করতে পারলে নারী এবং শূদ্রের জাগরণ হবে না। ভারতবর্ষের সমস্ত মেয়েদেরকে তুলতে হবে, জনসাধারণকে জাগাতে হবে একমাত্র তাহলেই ভারতবর্ষের কল্যাণ সাধন হবে। আর এই কারণে তিনি স্ত্রী শিক্ষা এবং শূদ্র জাতির শিক্ষার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর কথায়, "Never forget! Women and the people—they have to be raised first." বিবেকানন্দের শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতাও তাঁর শিক্ষা ভাবনায় স্বামীজীর ন্যায়ই মেয়েদের এবং সাধারণ মানুষের শিক্ষার স্বপক্ষে কাজ করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথও মনে করতেন স্বভাবে সম্পূর্ণ এক না হলেও মনুষ্যত্বে নারী ও পুরুষ এক। দুজনেই শরীর-মন-জৈবতায় পরস্পর থেকে পৃথক কিন্তু একই সঙ্গে পরস্পরের পরিপূরক। কোন একজনকে বাদ দিয়ে আরেকজন অসম্পূর্ণ। তাই শিক্ষা প্রণালীতে মেয়ে পুরুষে কোথাও কোন ভেদ রাখা উচিত নয়।

রোকেয়া বিবেকানন্দের 'বাণী ও রচনা' পড়েছিলেন কিনা বা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ভাবনার সঙ্গে তাঁর কোন পরিচয় হয়েছিল কিনা তা আমরা জানি না। কিন্তু নারী প্রগতির অগ্রনায়িকা বেগম রোকেয়া বুঝেছিলেন যে নারীর শিক্ষা ব্যতীত সমাজের উন্নয়ন অসম্ভব। নারীর শিক্ষা এবং সামর্থ্যের বিকাশ ব্যতীত পুরুষেরও উন্নয়ন অসম্ভব। তাই তিনি মনে করতেন পুরুষের স্বার্থ এবং নারীর স্বার্থ কখনোই ভিন্ন নয়—একই। আজ থেকে প্রায় নব্বই বছর পূর্বে বেগম রোকেয়া গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন যে, নারীর শিক্ষা, উপার্জন সক্ষমতা এবং উন্নতি ব্যতীত পুরুষ জাতির অগ্রগমন অসম্ভব। সুতরাং সমাজের উন্নয়নে পুরুষের সঙ্গে নারীকেও শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সামাজিকতায় অন্তর্ভুক্তির স্বপক্ষে রোকেয়া দৃঢ় এবং দীপ্ত কণ্ঠে বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন, এমনকি হাতে-কলমে তাঁর ভাবনাকে প্রয়োগ করে দেখিয়েছিলেন।

যখন আমরা ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার নারী শিক্ষাদান প্রসঙ্গে শিক্ষার উদ্দেশ্য, পাঠক্রম, শিক্ষাদানের পদ্ধতি, শ্রেণীকক্ষে এবং শ্রেণীকক্ষের বাইরে শৃঙ্খলাবোধ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করি, তখন দেখতে পাই যে

একবিংশ শতাব্দীতেও নারীশিক্ষা, নারী জাগরণ এবং নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে তাঁদের দেখানো পথ কোন অংশে ভুল ছিল না। আজও আমরা লড়াই করে চলেছি মেয়েদের সার্বজনীন শিক্ষা, শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়ে এবং ছেলেদের সমান সুযোগ সুবিধার অধিকার, মেয়েদেরকে ঘরের বাইরে উপার্জন করার সুযোগ সমষ্টির মধ্যে দিয়ে নারী স্বাধীনতা এবং নারী ক্ষমতায়নের স্বপক্ষে। আর এর দ্বারাই নারী জাতির জাগরণ সম্ভব। ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়া দুজনেই উল্লিখিত লক্ষ্যে কাজ করেছেন।

আমরা জানি, "শিক্ষা আনে চেতনা, এবং চেতনা আনে বিপ্লব।" বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের ভাবধারায় স্নাত ভগিনী নিবেদিতা এবং নিজের জীবন দিয়ে মেয়েদের অবস্থাকে অনুভব করা বেগম রোকেয়া বুঝেছিলেন সমাজের উন্নয়ন ঘটাতে না পারলে ভারতবর্ষের উন্নয়ন অসম্ভব। বিবেকানন্দ সমাজকে একটি পাখির সঙ্গে তুলনা করেছেন, যার দুটি ডানা একই সময়ে সমানভাবে সক্ষম না হলে পাখিরূপ সমাজের উড্ডয়নরূপ অগ্রগমন সম্ভব নয়। কোন একটি ডানা যদি দুর্বল থাকে তাহলে অপর একটি ডানার উপর ভর করে পাখিরূপ সমাজ এগিয়ে যেতে পারে না। সমাজের এই দুটি ডানা হল যথাক্রমে নারী এবং সাধারণ মানুষ অর্থাৎ শূদ্র জাতি, যাকে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন Mass। ভগিনী নিবেদিতার সমাজ ভাবনার মধ্যেও সেই একই কথাই প্রতিফলিত হয়েছে যে নারী এবং সমাজকে আমাদের জাগাতে হবে। অন্যথায় ভারতবর্ষের অখণ্ডতা বজায় রাখা, ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের উন্নয়ন এবং প্রতিটি ভারতীয়র সার্বিক বিকাশ কখনই সম্ভব হবে না। বেগম রোকেয়ার সমাজ ভাবনার মধ্যেও একই কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। রোকেয়া মুসলিম সমাজে সমাজপতিদের রক্ষণশীল মনোভাবের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। মুসলিম সমাজপতিরা ধর্মের নামে, চিরাচরিত প্রথার নামে যেভাবে মুসলিম মহিলাদের মন, মস্তিষ্ক ও বুদ্ধিবৃত্তিকে বধ করে চলেছেন তার প্রবল প্রতিবাদ করেছেন রোকেয়া। একইসঙ্গে স্বীকার করেছেন যে, নারী শিক্ষার বিস্তার ব্যতীত এই অবাধ হত্যা লীলাকে বন্ধ করা যাবে না। স্ত্রী শিক্ষার দ্বারা রোকেয়া একদিকে যেমন নারীর অন্তরে আপন অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা, আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা এবং আত্মমর্যাদা বোধকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন তেমনি সেই সকল শিক্ষিতা নারীরা পুরুষদের স্বার্থ রক্ষা নিয়ে কীভাবে কাজ করবে তথা সমাজের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে সে বিষয়ে তাঁর সাহিত্যে বিভিন্ন চরিত্রের মুখ দিয়ে নিজের কথা বলেছেন। আজও আমরা বিশ্বাস করি যে নারীর উন্নয়ন ব্যতীত পুরুষের উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারী এবং পুরুষের উভয়ের উন্নয়ন এবং ঐক্য সাধন ব্যতীত সমাজের উন্নয়ন অলীক কল্পনা মাত্র।

সুতরাং স্বীকার করতেই হয় যে ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার শিক্ষা ভাবনা ও সমাজ ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা বিংশ শতাব্দী পেরিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে আজও সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক। উত্তরোত্তর এই প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বিষয়ে আরও গভীরভাবে অনুসন্ধানের প্রয়োজন।

৭.৬ গবেষকের সুপারিশ :

ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার শিক্ষা ভাবনা ও সমাজ ভাবনার সম্বন্ধে গবেষণার পর বর্তমান গবেষিকা নিম্নলিখিত সুপারিশ গুলি করেছেন –

১. ভগিনী নিবেদিতার সমস্ত রচনা এবং চিঠিপত্র ইংরেজিতে লিখিত হওয়ার কারণে সাধারণ মানুষের পক্ষে তাকে অনুধাবন করা সম্ভবপর হয় না। তাই নিবেদিতার ভাবনাকে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হলে বাংলা, হিন্দি এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় তার অনুবাদ করা প্রয়োজন।

২. বেগম রোকেয়ার প্রায় সমস্ত রচনা বাংলা ভাষায় সুলিখিত হওয়ার কারণে অবাঙালি এবং অ-বাংলা ভাষীদের পক্ষে রোকেয়া সম্বন্ধে পাঠ গ্রহণ করা সহজসাধ্য হয় না। তাই রোকেয়ার সমস্ত লিখিত কর্মকে ইংরেজি, হিন্দি এবং অন্যান্য ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ করা প্রয়োজন।

৩. বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যক্রমে ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার জীবনীর সম্বন্ধে পাঠ নেওয়ার সুযোগ থাকা প্রয়োজন।

৪. ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার শিক্ষা ভাবনা ও সমাজ ভাবনার পাঠক্রম, শিক্ষাদানের পদ্ধতি, মূল্যায়ন, শৃঙ্খলার ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাবিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ গ্রহণ এবং চর্চার সুযোগ থাকা প্রয়োজন।

৫. ভারতের জাতীয় আন্দোলনে নিবেদিতার গুরুত্ব, সাহিত্য-বিজ্ঞান-চিত্রাঙ্কন-ইতিহাস প্রভৃতির চর্চায় ভগিনী নিবেদিতা কিভাবে ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন সেই বিষয়ে বিস্তারিত পাঠ গ্রহণের সুযোগ থাকা জরুরী। সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের এ বিষয়ে বিস্তৃত পাঠের সুযোগ থাকা প্রয়োজন।

৬. পরাধীন ভারতবর্ষে মহিলাদের শিক্ষা, জাগরণ, ক্ষমতায়ন এবং সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার গুরুত্ব বিস্তারিতভাবে আলোচনার দাবি রাখে।

৭. আজও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশে মুসলিম সমাজের মেয়েদের পশ্চাদপদতার কারণ অনুসন্ধান করে বেগম রোকেয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে কিভাবে সমস্যার সমাধান সম্ভব সেই বিষয়ে আলোচনা দরকার।

৮. ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার জীবনী, কর্ম, বর্তমানকালে তাদের প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োগ সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত চর্চা হওয়া জরুরি।

৭.৭ গবেষণার সীমাবদ্ধতা সমূহ :–

গবেষিকার দীর্ঘ সময়ের নিরলস প্রচেষ্টার পরেও বর্তমান গবেষণায় কিছু সীমাবদ্ধতা থেকে গেছে –

১. বর্তমান কালের শিক্ষা ব্যবস্থায়, পাঠক্রম রচনায় এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতির অনুসরণে ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার কোনো প্রভাব রয়েছে কিনা সে বিষয়ে বর্তমান গবেষণায় পর্যাপ্ত অনুসন্ধান করা হয়নি।

২. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ 'Indian Knowledge System' এবং 'Sustainable Development' বিষয়ে আরো চর্চার কথা বলেছেন। উল্লিখিত দুটি বিষয়ে ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার চিন্তাভাবনা ও কর্মসাধনা কেমন ছিল সে বিষয়ে বর্তমান গবেষণায় পর্যালোচনা করা হয়নি।

৩. ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়া মহীয়সী নারীতে রূপান্তরিত হতে গিয়ে কোন কোন প্রভাবকের সান্নিধ্যে এসেছিলেন সে বিষয়ে ও বিস্তৃত চর্চা করা জরুরী ছিল।

৭.৮ পরবর্তীকালে এই বিষয়ে আরও গবেষণা সম্বন্ধে সুপারিশ (Further Scope of Research) :-

১. অবিভক্ত বঙ্গদেশে নারী শিক্ষা এবং নারীজাতির উন্নয়নে ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার প্রভাব।

২. বর্তমান মুসলমান সমাজে মেয়েদের পশ্চাদপদতার কারণ অনুসন্ধান এবং সমস্যার সমাধানে বেগম রোকেয়ার কর্ম সাধনার প্রয়োগ বিষয়ে গবেষণা।

৩. ভারতের জাতীয় আন্দোলন এবং জাতীয় সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীতে নিবেদিতার ভূমিকা সম্বন্ধে গবেষণা।

৪. বঙ্গদেশে সাহিত্যচর্চা, বিজ্ঞানচর্চা, সমাজবিজ্ঞান চর্চা, চিত্রাঙ্কন চর্চা বিষয়ে ভগিনী নিবেদিতার ভূমিকার বিস্তৃত পর্যালোচনা।

৫. লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণে নারী শিক্ষার প্রয়োগ এবং এই বিষয়ে ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার চিন্তাভাবনা বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা।

৬. ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার সাহিত্যচর্চা বিষয়ে আলোচনা।

তথ্যসূত্রঃ

- প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা (১৯৮৫)। *ভগিনী নিবেদিতা*। সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, পৃ. ১৪৫।
- প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা (২০২২)। *ভগিনী নিবেদিতার দৃষ্টিতে ভারতীয় নারী*। আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রবন্ধ ও কবিতা), শতবর্ষ সংকলন, পৃ. ২২২।
- প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা (২০২২)। তদেব, পৃ. ২২২।
- প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা (২০২২)। তদেব, পৃ. ২২৩।
- স্বামী বিবেকানন্দ (২০০২)। *বাণী ও রচনা* । উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, নবম খন্ড, পৃ. ১৭।
- স্বামী বিবেকানন্দ (২০০২)। তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ২৫৪।
- স্বামী বিবেকানন্দ (২০০২)। তদেব, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ২৮৪।
- প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা (২০২২)। *ভগিনী নিবেদিতার দৃষ্টিতে ভারতীয় নারী* । আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, প্রবন্ধ ও কবিতা, শতবর্ষ সংকলন, পৃ. ২২৩।
- নির্ঝরিণী সরকার (২০২২)। *ভগিনী নিবেদিতা ও তাঁহার বালিকা বিদ্যালয়* । আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, প্রবন্ধ ও কবিতা, শতবর্ষ সংকলন, পৃ. ১০৮।
- Sankari Prasad Basu, (Collected and Edited) (1982). *Letters of Sister Nivedita* (Vol- I and II). Nababharat Publishers, Calcutta, P. 582.
- Sankari Prasad Basu (1982). Ibid, P. 1219.
- *Works of Sister Nivedita: Complete Works,* (1968). Sister Nivedita Girls' School, Calcutta (1st edition), p. 19.
- Sankari Prasad Basu, (Collected and Edited) (1982). *Letters of Sister Nivedita* (Vol-I). Nababharat Publishers, Calcutta, P. 323.
- Sankari Prasad Basu, (Collected and Edited) (1982). Ibid, P. 322.
- *Nivedita Centenary Memorial Volume* (1967). Ramakrishna Sarada Mission Sister Nivedita Girls' School, Calcutta, pp. 87-88.
- *Works of Sister Nivedita: Complete Works, (1968).* (*vol- IV),* Sister Nivedita Girls' School, Calcutta, p. 236.
- Sankari Prasad Basu, (Collected and Edited) (1982). *Letters of Sister Nivedita* (Vol-II). Nababharat Publishers, Calcutta, P. 1219.
- Sankari Prasad Basu, (Collected and Edited) (1982). Ibid, P. 1244.

- Sankari Prasad Basu, (Collected and Edited) (1982). Ibid, P. 580.
- Sankari Prasad Basu, (Collected and Edited) (1982). Ibid, P. 664.
- Ferdousi, S. A. (2014), A Social Reformer is Peeping Through Sultana's Dream. *IOSR Journal of Manities and Social Science.* (IOSR-JHSS), 19 (4), 68.
- কাজী আব্দুল ওদুদ (১৯৫৬)। *বাংলার জাগরণ* । বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, পৃ. ২২।
- শামসুন নাহার মাহমুদ (১৯৯৬)। *রোকেয়া পরিচিতি, পত্র নং ১,* নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, পৃ. ৫০৯।
- মোতাহার হোসেন সুফী (২০০৯)। *বেগম রোকেয়া - জীবন ও সাহিত্য* । সুবর্ণ, ঢাকা, পৃ. ৪৮।
- শামসুন নাহার মাহমুদ (১৯৯৬)। *রোকেয়া পরিচিতি, পত্র নং ১,* নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, পৃ. ৫০।
- গীতশ্রীবন্দনা সেনগুপ্ত (১৯৯৯)। *স্পন্দিত অন্তর্লোক - আত্মচরিতে নারী প্রগতির ধারা* । প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ- ২৪২।
- শামসুন নাহার মাহমুদ (১৯৯৬)। *রোকেয়া জীবনী* । নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, পৃ- ৫০।
- শামসুন নাহার মাহমুদ (১৯৯৬)। *রোকেয়া জীবনী* । তদেব, পৃ. ৩২।
- শামসুন নাহার মাহমুদ (১৯৯৬)। *রোকেয়া জীবনী* । তদেব, পৃ. ৫০।
- সুতপা ভট্টাচার্য (১৯৯৯), রোকেয়া, প্যাপিরাস, কলকাতা, পৃ. ৭২-৭৩।
- Anowar Hossain (2003), *Muslim Women's Struggle for Freedom in Colonial Bengal (1873-1940)* . Progressive Publishers, Calcutta, 2003, 1st Publication. P. 181
- শামসুন নাহার মাহমুদ (১৯৯৬)। *রোকেয়া জীবনী* । নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, পৃ. ৬২।
- National Education Policy, 2020, P. 3
- National Education Policy, 2020, P. 42
- National Education Policy, 2020, P. 15
- Swami Lokeswarananda (2018). *Impact of Sister Nivedita on Indian Society. কালোত্তীর্ণা নিবেদিতা।* রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা, পৃ. ৩০৫।

গ্রন্থপঞ্জী

(Bibliography)

গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)

- আচার্য, পরমেশ (২০১৭)। নিবেদিতা : অনন্যা অগ্নিকন্যা ও নারী মুক্তির প্রতীক। বিষ্ণুপদ নন্দ, *উদ্ভাসিত মহিমা : শ্বেতপদ্ম নিবেদিতা* সম্পাদিত গ্রন্থ / যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ.- ১৫৩-১৫৯।
- আফরোজ, তনয়া (২০১৬)। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) বাংলার মুসলমান সমাজে নারী শিক্ষার প্রসারে এক জেহাদী কন্যা। ইউ.জি.সি. -এর অর্থানুকূল্যে জাতীয় আলোচনা সভা '*Women's Education in India: Past Predicaments and Future Possibilities'.* পরিচালনায় সংস্কৃত বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ এবং সমাজ তত্ত্ব বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন এবং মহারানী কাশীশ্বরী কলেজ, ২৩-২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৫, ৩৯০-৩৯৭।
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। *রোকেয়া রচনাবলী* / বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃ. ১১, ১২, ১৫, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৩, ২৪, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৪, ৪৫, ৬২, ৬৩, ৭১, ৮০, ৮৩, ৮৫, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৬, ১১১-১১৫, ১৩৩-১৩৪, ১৪৭, ১৫৩, ২৪৯, ২৫৭, ২৭০, ২৮৯, ২৯০-২৯১, ৩২৯, ৩৯১, ৪০০, ৪৯১, ৪৯৩, ৫২০,
- কাজী আব্দুল ওদুদ (১৯৫৬)। *বাংলার জাগরণ* । বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, পৃ. ২২।
- গোপা মজুমদার (দাস) (২০১১)। *নারী প্রগতির ধারায় বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন।* পিএইচ.ডি (বাংলা) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অবিসন্ধর্ভ, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ৩
- গীতশ্রীবন্দনা সেনগুপ্ত (১৯৯৯)। *স্পন্দিত অন্তর্লোক - আত্মচরিতে নারী প্রগতির ধারা* । প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ- ২৪২।
- গোলাম মুরশিদ (১৯৯৩)। *নারীপ্রগতির একশো বছরঃ রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া* অবসর প্রকাশনা সংস্থা। পৃ. ৬, ১৫৫, ১৭৪-১৭৫, ১৭৭
- চিত্রা দেব (সম্পা।)(১৯৯১)। *নির্ঝরিণী সরকার রচনা সংগ্রহ* / আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ২০

- ড. মিজান রহমান (সংকলন ও সম্পাদনা) (২০১২)। অর্ধাঙ্গী, *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ বেগম রোকেয়া।* কথা প্রকাশ, শাহবাগ, ঢাকা। পৃ. ৮
- নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধূরানী, একরাম আলী (২০০৫)। *রবিবাসরীয়, আজকাল পত্রিকা,* ১৯ শে ফেব্রুয়ারী
- নির্ঝরিনী সরকার (২০২২)। *ভগিনী নিবেদিতা ও তাঁহার বালিকা বিদ্যালয়।* আনন্দ বাজার পত্রিকা, শতবর্ষ সংকলন। পৃ. ১০৭, ১০৮, ১০৯
- নিবেদিতা বিদ্যালয় শতবর্ষ স্মারক পত্রিকা (১৯৯৮ নভেম্বর)। দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ৫০
- 'পথে প্রান্তরে'(১৩.১২.১৯৯৮) । *দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা।*
- প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা (১৯৮৫)। *ভগিনী নিবেদিতা।* সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, বাগবাজার, কোলকাতা। পৃ. ৩, ১৫, ১৭, ৩৩, ৩৯-৪০, ৪৪, ৪৫, ৫১, ৮৬, ১৩৫, ২২৩, ২৩১, ৪০১-৪০২
- বন্দনা ভট্টাচার্য (২০১৭)। *নিবেদিতা : আলোর দূতী।* শ্রীশারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কোলকাতা। পৃ. ৫
- বামাবোধিনী পত্রিকা (১৮৬৪) অক্টোবর – নভেম্বর।
- বেগম রোকেয়া রচনাবলী (১৯৮৪)। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃ. ২১
- বিপিনচন্দ্র পাল (পুস্তক প্রকাশনার সময় অজ্ঞাত)। *সত্তর বৎসর।* পৃ. ২২৩
- বিষ্ণুপদ নন্দ, *সমকালের প্রেক্ষিতে আলোর দ্যুতি নিবেদিতা,* লালমাটি, যন্ত্রস্থ
- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় (১৩৬২)।*সাহিত্য সাধক রচিত মালা।* ২য় খন্ড, ৫ম সংস্করণ,কলকাতা, পৃ. ৭০, ৭১
- ভারতবাণী (১৯৯৯)। শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা, পৃ. ২২
- মজুমদার (দাস), গোপা (২০১১)। নারী প্রগতির ধারায় বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি. (বাংলা) প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, শিলিগুড়ি।
- মহম্মদ সামসুল হক (২০০০)। হাজার বছরে বাঙালি নারী। পাঠক সমাবেস ঢাকা।
- মল্লিকা ব্যানার্জী (২০১৪)। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে দু একটি ভাবনা, *ইতিহাসে নারী শিক্ষা,* প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স। পৃ. ৫১

- মুখোপাধ্যায়, অদিতি (২০১৭)। পরিবেশ ভাবনায় এবং নারী শিক্ষার জাগরণে ভগিনী নিবেদিতা, সম্পাদিত গ্রন্থ বিষ্ণুপদ নন্দ, *উদ্ভাসিত মহিমা : শ্বেতপদ্ম নিবেদিতা।* যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ.- ২১৬-২২০।
- মোতাহার হোসেন সুফী (২০০৯)। *বেগম রোকেয়া - জীবন ও সাহিত্য* । সুবর্ণ, ঢাকা, পৃ. ৪৮।
- রামমোহনঃ চরিত্রপূজা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্ররচনাবলী চতুর্থ খন্ড, বিশ্বভারতী পৃ. ৫১৭
- শঙ্করী প্রসাদ বসু। নিবেদিতা লোকমাতা, প্রথম খণ্ড, প্রথম পর্ব, পৃ. ৬, ৪৮, ৪৯, ২৬৭
- শঙ্করীপ্রসাদ বসু (১৯১১)। *মর্ডান রিভিউ।* কলকাতা। পৃ. ৬, ৭
- শামসুন নাহার মাহমুদ (১৯৯৬)। *রোকেয়া পরিচিতি, পত্র নং ১,* নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, পৃ*. ২২, ৩২, ৫০, ৬২,* ৫০৯।
- শ্রী সুশান্ত দত্ত (সম্পা।)(২০১৯)।*ভগিনী নিবেদিতার সার্ধশত জন্মজয়ন্তী স্মারক সংখ্যা।* কোলকাতা।পৃ. ২৩
- শ্যামলী গুপ্ত (সম্পা) (আষাঢ় ১৪১৬)। *একসাথে।* গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, কলকাতা।
- সফীউন্নেসা (১৪২৯)। *ইসলাম ধর্মে নারীর অধিকার রক্ষা।* সজ্ঞসাথী, চতুর্থ -পঞ্চম সংখ্যা, পৃ. ১৬৮ – ১৬৯
- সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় (পুস্তক প্রকাশনার সময় অজ্ঞাত)। *ভারতের স্বামীজিঃ স্বামীজীর ভারত।*
- সান্তনা দাসগুপ্তা (২০১৭)। নিবেদিতার ভারত চেতনা। *দক্ষিনেশ্বর, কোলকাতা।* পৃ. ৬০
- সাপ্তাহিক কলম (২০০৬)। ইদ সংখ্যা, বর্ষ -২৫, পৃ. ৫০-৫১, ২২-২৯ অক্টোবর
- সুতপা ভট্টাচার্য (১৯৯৯), রোকেয়া, প্যাপিরাস, কলকাতা, পৃ. ৭২-৭৩।
- সুপর্না গুপ্ত (সম্পাদনা)। *ইতিহাসে নারী : শিক্ষা।* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা- ৭৩
- স্বপন বসু (১৪০৪)। বাঙালি সমাজে স্ত্রী শিক্ষাঃ শিবনাথ শাস্ত্রী ভূমিকা। ‘পশ্চিমবঙ্গ শিবনাথ শাস্ত্রী সংখ্যা, কোলকাতা।
- স্বামী-চৈতন্যানন্দ (সম্পা.) (২০১৭)। *ভারত চেতনায় ভগিনী নিবেদিতা।* উদ্বোধন কার্যালয়, কোলকাতা। পৃ. ৪৯০
- স্বামী বিবেকানন্দ (২০০২)। *বাণী ও রচনা* । উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, নবম খন্ড, পৃ. ১৭, ২৪৮, ২৫৪

- Swami Lokeswarananda (2018). *Impact of Sister Nivedita on Indian Society. কালোত্তীর্ণা নিবেদিতা।* রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা, পৃ. ৩০৫।
- Anowar Hossain (2003), *Muslim Women's Struggle for Freedom in Colonial Bengal (1873-1940)* . Progressive Publishers, Calcutta, 2003, 1st Publication. P. 181
- Basak, S. (1992). Sister Nivedita and Women's Education in Bengal in the First Decade of the 20th Century. *Indian History Congress.* Vol. 53 (1992), pp. 414-422.
- Begum, A. (2021). Begum Rokeya Sakhawat Hossain's Sultana's Dream: An Echo of Enlightened Women's Leardership in the Feminist Utopia. *International Journal for Asian Contemporary Research, I*(III), 130-133.
- Benerjee, S. N. (2021). Nivedita: Religion and Society- an Impeccable act of Civic Service by the Sister During Calcutta Plague Pandemic. *ResearchGate.*
- Biswas, I. (2020). Sister Nivedita and the Upliftment of Indian Women. *International Journal of Research on Social and Natural Sciences.* V (2).
- Biswas, S. (2014). From Noble to Nivedita: Sister Nivedita and her Passages Through India, 1895-1911. *Indian History Congress.* Vol. 75, Platinum Jubilee (2014), pp. 790-797.
- Denzin, N.K., and Lincoln, Y. S. (2005). *Introduction In N.K. Denzin and Y. S. Lincoln* (Eds.), The SAGE handbook of Qualitative Research (3rd ed., pp. 1-29). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Denzin, N.K. (2006). *The elephant in the Living room: or extending conversation about the politics of evidence.* Qualitative Research, 9, 139–160.

- Ferdousi, S. A. (2014), A Social Reformer is Peeping Through Sultana's Dream. *IOSR Journal of Manities and Social Science.* (IOSR-JHSS), 19 (4), 68.
- Hadiuzzaman, S. (2016). *Education of Muslim Women in Colonial Bengal,* N.U Journal of Humanity, Social Science & Business Studies, 2 (2).
- Hiatt, J. K. (1986). *Spirituality, Medicine, and Healing.* Southern Medical Journal, 79, 736-743).
- Inaga, S. (2004). Sister Nivedita and Her "Kali The Mother, The Web of Indian Life", and Art Criticism: New Insights into Okakura Kakuzō's Indian Writings and the Function of Art in the Shaping of Nationality. *International Research Centre for Japanese Studies, National Institute for the Humanities.* 16, pp. 129-159.
- Joardar, H. & Joardar, S. (1980). *Begum Rokeya: The Emancipator.* Nari Kalyan Sangstha, Dhaka
- 'Karma- Yoga', *Complete Works of Swami Vivekananda,* vol- 1, P. 99
- Khatun, R. (2018). Educational Ideas and Practices of Rokeya Sakhawat Hossain with Reference to Mordern Perspective. Thesis submitted to Visva- Bharati (A Central University) for the Award of the degree of Doctor of Philosophy in Education, Department of Education, Visva - Bharati.
- Khatun, M. (1994). Begum Rokeya: An Enquiry it to her Educational Idea and Practice. Thesis submitted to the University of Calcutta for the PH.D. Degree in Education in Calcutta, Calcutta.
- Knathwohl, D.R. (1988). How to prepare a Research Proposal : Guidelines for Funding and Dissertations in the Social and Behavioral Sciences. *Syracuse NY : Syracuse University Press.*

- Mahmud, M. (1965). *Patre Rokeya Parichiti.* Bangla Academi Dhaka
- Mahmud, R. (2016). Rokeya Sakhawat Hossain: Tireless Fighter of Female Education and Their Independance. *International Journal on Studies in English Languageand Literature,* 4(9), 40-48.
- Mahmud, S. (1937). *Rokeya Jibani.* Bulbul Publishing House, Calcutta
- Mallick, S. (2013). Swami Vivekananda and Sister Nivedita at Crossroads. *International Journal of Electronics and Communication Technology,* 4(1).
- Merriam, S. (2009). *Qualitative Research : A guide to Design and Implementation.* San Francisco, CA: Jossey - Bass.
- Mohammad Shafiqul Islam and Ruma Islam. (2012). Emancipation of Women through Education and Economic Freedom: A Feminist Study of Begum Rokeya's Utopia. *SUST Journal of Social Science,* 18(4), 11-19.
- Mukherjee, D. A. (2017). Sister Nivedita's Vision on Education in India. *International Journal of History, Archaeology, Indology and Numismatics,* 4(1).
- Mukherjee, Saradindu (2018). A Message for the Youth of India: Relevance of Sister Nivedita's Teachings. In Swami Kamalasthananda (Ed.), *Sister Nivedita and her Contributions to India.* Ramakrishna Mission Vivekananda Centenary College, Rahara. Pp- 29-40.
- National Education Policy, 2020, P. 3, 15, 42

- *Nivedita Centenary Memorial Volume* (1967). Ramakrishna Sarada Mission Sister Nivedita Girls' School, Calcutta, pp. 87-88.
- O' Doherty, M. (2018). Sister Nivedita—A Psychological Reassessment. *History Ireland,* 26(1) (January–February 2018), pp. 26-29.
- Parkinson, G., and Drislane, R. (2011). *Qualitative Research. In Online Dictionary of the Social Sciences.* Retrieved from http://bitbucket.icaap.og/dict.pl
- Paul, S. (2009). Nationalist Discourse and Education in India : Views of Sister Nivedita. Thesis submitted to Assam University, Silchar in partial fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy in Education, Department of Education, School of Humanities, Assam University, Silchar.
- Pramanik, S. (2018). Nivedita: The Lady with the Lamp - an Incarnation of Empowered Woman. *International Research Journal of Humanities, Language, and Literature,* 5(8).
- Rai, S. (2018). Indian Education System: A Comprehensive Analysis By Sister Nivedita. *PEOPLE: International Journal of Social Sciences,* 4(2), 17-26.
- Rani, T. (2020). Sister Nivedita: The Embracer of India. *RJPSS,* 14(2).
- Roy, A. K. (2019). Educational Thoughts of Begum Rokeya and Her Contribution in the Upliftment of Women Education in Bengal. *International Journal of Research in Social Sciences,* 9(3).
- Roy, S. (1987). Social and Political Ideas of Sister Nivedita. Ph. D. (Ants) Dissertation submitted to the University of Calcutta, Calcutta.

- Sahoo, D. S. (2018). Women Empowerment in Bengal and Sister Nivedita: A Sequential Accolade. *International Journal for Innovative Research in Multidisciplinary Field,* 4(6).
- Sankari Prasad Basu, (Collected and Edited) (1982). *Letters of Sister Nivedita* (Vol- I and II). Nababharat Publishers, Calcutta, P. 322, 323, 580, 582, 664, 1219, 1244
- Sufi, M. H. (1986). *Begum Rokeya: Jiban O Sahitya* [Life and works of Begum Rokeya], University Press Limited, Dhaka.
- Sultana, S. (2021). Contribution of Savitribai Phule and Begum Rokeya Sakhawat Hossain in Women Education Reform. *EduQuad,* 1(2).
- Swami Balabhadrananda (2018). *Sister Nivedita's Concept of National Education in India.* In Swami Kamalasthananda (Ed.), *Sister Nivedita and Her Contributions to India.* Ramakrishna Mission Vivekananda Centenary College, Rahara. Pp- 17-22.
- Uddin, M. J. (2020). Education as a Tool of Women in Begum Rokeya's Sultana's Dream. *ResearchGate.*
- *Works of Sister Nivedita: Complete Works,* (1968). Sister Nivedita Girls' School, Calcutta (1st edition), p. 19, 236

সারাংশ (Summary)

ভূমিকাঃ

আধুনিককালে সমগ্র পৃথিবী জুড়েই নারী প্রগতি একটি বিশেষভাবে আলোচিত বিষয়। এই ভাবনা থেকে উঠে এসেছে ‘Women Study’ বা ‘Gender Study’। এই বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিক, মনোবিদ, শিক্ষাবিদ প্রমুখরা গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেছেন এবং একদল বুদ্ধিদীপ্ত শিক্ষার্থীকে এই বিষয়ে গবেষণা কর্মে যুক্ত করেছেন। পুরুষতন্ত্র যুগে যুগে নারীকে পরিবারের মধ্যে আটকে রেখেছে। নারীকে শৃঙ্খলিত করা পুরুষের কাজ ছিল। কারণ শক্তিশালী পুরুষরা নারীর দেহ এবং মনের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নারীকে করেছেন শৃঙ্খলিত। পুরুষ এমনভাবে যুগে যুগে নারীকে করায়ত্ত করেছে যাতে নারী ভাবতে শিখেছে যে সে অবলা। তার এককভাবে কোন কাজ করার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার অধিকারটুকুও ছিল না। এমনকি আজও অধিকাংশ শিক্ষিতা, উপার্জনশীলা নারী যে কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পুরুষের উপর নির্ভরশীল। নারী অবলা– এই ভাবনাকে মিথে পরিণত করার দায়িত্ব পালন করেছে পুরুষ। তাই শৃঙ্খলিত নারী যুগে যুগে বাধ্য হয়েছে সবকিছুকে সহ্য করতে। তার এই অনন্ত সহ্য শক্তিকে আমরা তুলনা করতে পারি কেবলমাত্র সর্বংসহা পৃথিবীর সঙ্গে। পুরুষ দাঁড়িয়েছে উৎপাদনশীলতার কেন্দ্রে, আর নারী সেখানে সন্তান উৎপাদনের এবং লালন পালনের জন্য নিজেকে করেছে দায়বদ্ধ। তাই নারী যুগে যুগে গৃহের গণ্ডিবদ্ধ জীবনে নিজেকে করেছে অন্তরীণ। প্রাচীনকালে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ক্রমশ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে পুরুষের আধিপত্য বিস্তারের কামনা থেকে। নারী হয়ে উঠেছে পুরুষের কাছে সম্পদ– যে সম্পদকে ভোগ করার, দখল করার, রক্ষা করার দায়িত্বও গ্রহণ করেছে পুরুষ। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী ভুলে গেছে তার অমিত বীর্য এবং বুদ্ধিমত্তাকে। নারী হয়ে উঠেছে একটি বিশেষ শ্রেণী যে সর্বতোভাবে পুরুষতন্ত্রের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। ফলে সমাজে তৈরি হল লিঙ্গ বৈষম্য বা নারী-পুরুষের অসম অবস্থান। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকবার এবং স্বনির্ভর হওয়ার ইচ্ছেটাই হারিয়ে ফেলে ফলে মানুষ হিসেবে নারীর যে বাঁচবার অধিকার রয়েছে, সাম্যের অধিকার রয়েছে সেকথা নারী ভুলে যায় অথবা পুরুষের চাপের কাছে সে ভুলে যেতে

বাধ্য হয়। বাঁচবার এই অধিকারবোধ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে সাম্যবাদ তথা সমাজতন্ত্রের ভাবনা। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পড়লে পাওয়া যায় ভারতে সাম্যবাদী ভাবনার বিকাশ ঘটেছিল বৈদিক যুগ থেকে।

নারী বিষয়ে গবেষণার ফসল হল নারী ও পুরুষের সমানাধিকার এবং পুরুষের প্রকৃতি ও যোগ্যতা লিঙ্গ নিরপেক্ষ। এর ফলে ধর্মকে নতুনভাবে বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। ভারতবর্ষে হিন্দু এবং মুসলিম সমাজে পুরুষের বহুবিবাহ প্রথা, হিন্দু সমাজের রাঁঢ়প্রথা, মুসলিম সমাজের বাঁদী প্রথা থেকে মেয়েদের ঘটলো মুক্তি। সমাজতন্ত্রে নারী বাস্তবে রক্তমাংসের নারীতে পরিণত হল পুরুষতন্ত্রের তলায় চাপা পড়ে থাকা থেকে মুক্ত হয়ে। নারী প্রমাণ করলো বিদ্যা, বুদ্ধি, মেধা, মননের বিভাজন হয় না। শিক্ষা নারীর মধ্যে সৃষ্টি করল চেতনা যা নারীর অন্তরলোককে স্পর্শ করল, আর এর থেকে দানা বাঁধল নারী প্রগতির সুনিশ্চিত ভাবনা ও সচেতনতা। নারী ক্রমশ পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব এমনকি বিদ্রোহের আঙিনায় নিজের সামর্থ্যকে করল প্রতিষ্ঠিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণ, ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন পাশ, ১৮৭২ সালে নতুন বিধবা বিধি আইন পাশ, ১৮৯১ সালে সহবাস সম্মতি আইন প্রবর্তন ও সঙ্গে কৌলীন্য প্রথা বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল এবং নারীর সচেতনতার বিকাশ ঘটল–যা বিস্তৃতি লাভ করল বিংশ শতাব্দী হয়ে একবিংশ শতাব্দীতে।

কাব্যে, সাহিত্যে, দর্শনে, রাজনীতিতে নারীচর্চা শুরু হল অবিভক্ত ভারতবর্ষে। ১৮২৪ থেকে ১৮৭৩ সালের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন-এর আবির্ভাব নারীকে দিল স্বাতন্ত্র্যের অধিকার। ১৮৬২ সালে বীরাঙ্গনা কাব্যে মধুসূদন নারীর ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের উদ্বোধন ঘটালেন। নারীর নিজের কথা বলার ক্ষেত্রে তৈরি হল মোক্ষদাদায়িনী মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'বঙ্গমহিলা' পত্রিকা (১৮৭০), থাকমনির সম্পাদনায় 'অনাথিনী' (১৮৭৫) পত্রিকায়, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) উপন্যাসে এবং দেবী চৌধুরানী (১৮৮৪) উপন্যাসে, স্বর্ণকুমারী দেবীর 'ভারতী' পত্রিকায়, কৃষ্ণরঞ্জিনী বসু ও শ্যামাঙ্গিনী দের সম্পাদনায় 'সোহাগিনী' পত্রিকায় এবং ১৯০৮ সালে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের 'সুলতানা'র স্বপ্ন' প্রভৃতিতে মেয়েরা নিজেদের কথা বলেছেন, নিজেদের ক্ষমতায়নের স্বপ্নকে তুলে ধরেছেন। ১৯১৩ সালে শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্য' এবং ১৯১৪

সালে রবীন্দ্রনাথের ‘স্ত্রীর পত্র’ প্রভৃতিতে নারী মুক্তি পেতে চেয়েছে পুরুষতান্ত্রিকতার দৃঢ় নাগপাশ থেকে প্রকৃতির উদার দাক্ষিণ্যের মধ্যে। তার শরীরে এসে লেগেছে মুক্তির ঢেউ, মনোজগতে পেয়েছে মুক্তির আস্বাদন।

রাজা রামমোহন রায়ের ‘ব্রাহ্মসমাজ’ (১৮২৮ সালের ২০ আগস্ট), কেশবচন্দ্র সেন এর ‘ব্রাহ্মিকা সমাজ’ (১৮৬৫) তৈরি করেছিল নারীমুক্তির বাতায়ন। মুম্বাইতে ড. আত্মারাম পান্ডুরঙ্গ এর প্রচেষ্টায় স্ত্রী শিক্ষার প্রসার এবং পর্দা প্রথার অবসান কল্পে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘প্রার্থনা সমাজ’ (১৮৬৭)। নারী জাতির উন্নতি এবং দরিদ্রের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ও কল্যাণের লক্ষ্যে কেশবচন্দ্র সেন স্থাপন করেন ‘ভারতীয় সংস্কার সমিতি’ (১৮৭০)। পণ্ডিতা রমা বাঈ এর প্রতিষ্ঠিত ‘আর্য সমিতি’ (১৮৮২), স্বর্ণকুমারী দেবী’র ‘সখী সমিতি’ (১৮৮৬) ও ‘নারী শিক্ষা সমিতি’ (১৯১০), কৃষ্ণভামিনী দাস এর ‘ভারত শ্রী মহামণ্ডল’ (১৯১৩) ইত্যাদি সমাজ কল্যাণকর সংগঠন মহিলারা নিজেরাই প্রতিষ্ঠা করেন এবং দক্ষ হাতে পরিচালনা করেন।

রাজনীতি ক্ষেত্রেও মেয়েদের আত্মপ্রকাশ ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এঁদের মধ্যে মাদাম কামা (১৮৬১ – ১৯৩৬), মোহিনী সেন (১৮৬৩ - ১৯৫৫), ভগিনী নিবেদিতা (১৮৬৭ - ১৯১১), জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি (১৮৮৯ - ১৯৪৫), মনোরমা বসু (১৮৯৪ – ১৯৭২), লীলা নাগ (১৯২৬) প্রমুখদের কর্মকাণ্ড মেয়েদের প্রতি পুরুষকে শ্রদ্ধাশীল করে তোলে। শ্রমিক আন্দোলনের নেত্রী সুধা রায়, চটকল শ্রমিক আন্দোলনের নেত্রী সন্তোষ কুমারী দেবী এবং বেগম সাকিনা ফারুক মোয়াজেদা প্রমুখ মহিলারা কিংবদন্তি শ্রমিক নেত্রী রূপে আত্মপ্রকাশ লাভ করেন এবং প্রমাণ করেন যে মেয়েরা কোন ক্ষেত্রেই পুরুষের থেকে কম নয়। ক্রমশ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং শ্রমিক আন্দোলনে মেয়েদের অংশগ্রহণ আরো তীব্রতর হয়ে ওঠে। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মহিলা শহর, মফঃস্বল, গ্রামেও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে জড়িয়ে পড়েন এবং নিজের কৃতিত্ব ও যোগ্যতাকে প্রমাণ করেন। এঁদের মধ্যে দুকড়ি বালা দেবী, কল্পনা দত্ত, উজ্জ্বলা মজুমদার, লীলা নাগ, ইন্দুমতী ভট্টাচার্য, ইলা সেন, আভা দত্ত, শান্তশীলা পালিত, ঊর্মিলা বালা পাইয়া, নির্মল নলিনী ঘোষ, প্রফুল্লমুখী বসু প্রমুখদের নাম উল্লেখযোগ্য (শ্যামলী গুপ্ত, ১৪১৬)। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন লেডি আব্দুল কাদির, ফাতিমা বেগম, বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ প্রমুখ মহিলারা।

ভগিনী নিবেদিতা একজন অ্যাংলো আইরিশ বংশোদ্ভুত সমাজকর্মী, লেখিকা এবং স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা হিসেবে বেশি পরিচিত। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর থেকে তিনি মনস্থির করেন ভারতকে তাঁর কর্মক্ষেত্র হিসাবে মেনে নিতে। ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ নভেম্বর তিনি কলকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর সঙ্গে তিনি নানা ধরনের কল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। সকল বর্ণের ভারতীয় নারীর জীবন যাত্রার উন্নতির লক্ষ্যে তিনি কাজ শুরু করেন। স্বনামধন্য ভারতীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশ চন্দ্র বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছিলেন নিবেদিতার বন্ধু স্থানীয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে 'লোকমাতা' আখ্যা দিয়েছিলেন।

নিবেদিতার শিক্ষাচিন্তা পূর্ণতায় পৌঁছানো প্রসঙ্গে 'বেঙ্গলী' পত্রিকা (২৪ মার্চ ১৯১২ সংখ্যা) লিখেছিল – "পাশ্চাত্যে তাঁর জন্ম, ভারতে কর্মজীবন ও মৃত্যু – ইনি পৃথিবীকে দুই দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। ভারতের সুন্দর সুকুমার নারী আদর্শের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন ইউরোপীয় ঐতিহ্যপ্রাপ্ত সুদৃঢ় মনস্বিতা এবং দৃষ্টি ভঙ্গির আধুনিকতা"।

আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিন্তু প্রাচীন কালের মৌনতা, মাধুর্য, নিষ্ঠা, ধর্মভাব বিসর্জন দিয়ে নয়। যে শিক্ষা বর্তমান কালের প্রত্যেক নারীকে একাধারে ভারতের অতীত কালের সকল নারীর শ্রেষ্ঠত্ব বিকাশে সহায়তা করতে সমর্থ, তাই হবে আদর্শ শিক্ষা।

বেগম রোকেয়া একটি বিখ্যাত মুসলিম পরিবারে জন্মেছিলেন এবং সারাজীবন কখনই মুসলিম ধর্মের আবেগ ও রীতি রেওয়াজ থেকে বেরিয়ে আসেননি বরং তিনি বিশ্বাস করতেন যে "ধর্মই হল জাতীয়তাবোধ, আধ্যাত্মিকতা, নৈতিক অগ্রগতির উৎস" ('মতিচূর', ২য় খণ্ড, প্রবন্ধ 'নূর'- ই- ইসলাম', পৃ. ৭১)। যদিও আজকের দিনে মেয়েরা অনেকাংশ ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা লাভ করেছে। তবে তার বেশিরভাগই পুরুষ জাতির ইচ্ছা আর সহানুভূতির সার্বিক ক্ষমতায়নে সহায়ক নয়। তিনি লিখেছেন, "আমরা ভিক্ষা বা সহানুভূতি চাই না, আমরা চাই জন্মগত অধিকার, যা ইসলাম ধর্ম মহিলাদের ১৩০০ বছর পূর্বেই দেওয়ার কথা বলেছেন।"

মুসলমান সমাজে বর্তমানে নারী শিক্ষার প্রসার কিছুটা হলেও, এরা দ্বিতীয় শ্রেনির নাগরিক হয়েই থেকে গেছে। বাড়িতে এদের দিন অতিবাহিত হয় গৃহস্থালীর কাজের মধ্যেই। আবার যে কিছু জন বাড়ির বাইরে বেরিয়ে সরকারি বেসরকারি দপ্তরে কর্মরত তারা একজন পুরুষ কর্মীর সমান মর্যাদা পায়না।

শক্তিশালী নারীবাদী প্রবক্তা বেগম রোকেয়া তাঁর 'উন্নতির পথে' ('The way of Advancement') প্রবন্ধে নারীদের যে প্রকারের উন্নতির কথা বলেছেন তা হল, প্রকৃত শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে জীবনের সর্বস্তরে, সর্বক্ষেত্রে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করা।

গবেষণার প্রশ্ন সমূহ:

১. শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার মতামত কী এবং তার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা কতখানি?

২. শিক্ষার পাঠ্যক্রম সম্পর্কে নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার মতামত কী এবং তার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা কতখানি?

৩। শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার মতামত কী এবং তার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা কতখানি?

৪। শৃঙ্খলা সম্পর্কে নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার মতামত কী এবং তার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা কতখানি?

৫. বর্তমান সমাজের সাম্প্রদায়িক সমস্যা দূরীকরণে নিবেদিতা ও রোকেয়ার মতাদর্শ কতখানি প্রাসঙ্গিক?

৬. বর্তমান সমাজের সামাজিক সমস্যা দারিদ্রের নিবারণ কল্পে নিবেদিতা ও রোকেয়ার ভাবনা চিন্তা কতখানি প্রাসঙ্গিক?

গবেষণার উদ্দেশ্য সমূহ:

১. শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে নিবেদিতা এবং রোকেয়ার চিন্তা ভাবনাকে খুঁজে বের করা এবং তার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণ করা।

২. শিক্ষার পাঠ্যক্রম সম্পর্কে নিবেদিতা এবং রোকেয়ার চিন্তা ভাবনাকে খুঁজে বের করা এবং তার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা নিরূপণ করা।

৩. শিক্ষা দানের পদ্ধতি সম্পর্কে নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার যে দৃষ্টিভঙ্গি তা খুঁজে বের করা এবং তার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা নিরূপণ করা।

৪. শৃঙ্খলা সম্পর্কে নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার মনোভাবকে খুঁজে বের করা এবং তার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা বোঝার চেষ্টা করা।

৫. ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার সমাজ ভাবনাকে আলোচনা করা এবং তার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করা।

৬. ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার শিক্ষাভাবনা এবং সমাজভাবনা বর্তমান সমাজের সাম্প্রদায়িক হিংসা দূরীকরণে কতখানি প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করা।

৭. সাম্প্রতিক কালের সমস্যা – দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য তাঁদের চিন্তাভাবনার যে দূরদর্শিতা তা খুঁজে বের করা।

গবেষণার সীমানির্দেশকরণ:

বর্তমান গবেষণার মূল সমস্যাটি হল “ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার শিক্ষা ভাবনা ও সমাজ ভাবনাঃ একটি বিশ্লেষণ মূলক আলোচনা।” ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার সম্পূর্ণ জীবনাদর্শ তুলে ধরা এবং তার প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণ করা একজন গবেষিকার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তাই উক্ত সমস্যাটিকে নিয়ে গবেষণা করা এবং নির্দিষ্ট সময়ে তা সম্পূর্ণ করার জন্য এর সীমানির্দেশকরণ প্রয়োজন বলে গবেষিকা মনে করেছেন। এই গবেষণার সীমায়িতকরণের ক্ষেত্র গুলি হল :

১। শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা অর্থাৎ শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠ্যক্রম, পদ্ধতি ও শৃঙ্খলা সম্পর্কে নিবেদিতা ও রোকেয়ার চিন্তা ভাবনার পুনরালোচোনা।

২। বর্তমান বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা যেমন দারিদ্র্য, সাম্প্রদায়িক সমস্যা ইত্যাদি দূরীকরণে তাঁদের চিন্তা ভাবনার দূরদর্শিতা তুলে ধরা।

বর্তমান গবেষণার নক্সা :

গবেষিকা বর্তমান গবেষণায় গুণগতমান ভিত্তিক গবেষণা পদ্ধতিকে ব্যবহার করেছেন। এই পদ্ধতিতে তিনি নিম্নলিখিত উৎগুলি থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

(ক) প্রাথমিক উৎসসমূহ – বেগম রোকেয়ার রচনাবলী, বেগম রোকেয়ার চিঠিপত্র, বেগম রোকেয়ার ছবি, Complete works of Nivedita, Letters of Nivedita, pictures and documents on Nivedita ইত্যাদি।

(খ) গৌন উৎসসমূহ – বেগম রোকেয়া এবং ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে রচিত বিভিন্ন পুস্তক সমূহ, গবেষণাপত্র এবং গবেষণা অভিসন্দর্ভ, সমকালের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এবং সংবাদপত্রের কাটিং ইত্যাদি।

গবেষণায় ব্যবহৃত সহায়ক সরঞ্জাম সমূহ:

সাক্ষাৎকার গ্রহণ - বর্তমান গবেষিকা চার জন প্রথিতযশা অধ্যাপক যারা নিয়মিতভাবে ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়াকে নিয়ে চর্চা করেন তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন। এই সাক্ষাৎকারটিতে পূর্বপরিকল্পিত প্রশ্নমালা গবেষিকা ব্যবহার করেছেন।

তথ্যের বিশ্লেষণ:

গবেষিকা গবেষণায় ব্যবহৃত প্রাথমিক উৎস এবং গৌণ উৎস থেকে নিবেদিতা এবং রোকেয়া সম্বন্ধে যে সকল তথ্য পেয়েছেন সেগুলির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন, প্রাপ্ত তথ্যগুলির সত্যতা যাচাই করেছেন এবং এই উৎসগুলি সম্বন্ধে বিভিন্ন সমালোচকের বিশ্লেষণ গুলিকে মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছেন এবং সেই অনুযায়ী গবেষণাটিকে দাঁড় করিয়েছেন।

ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনীঃ

ভগিনী নিবেদিতার সংক্ষিপ্ত জীবনীঃ

নিবেদিতার পূর্ব নাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল, পিতামহীর নাম অনুসারে শিশুর নামকরণ হয়েছিল মার্গারেট এলিজাবেথ। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ শে অক্টোবর উত্তর আয়ারল্যান্ডের ডানগ্যানন নামে এক ছোট শহরে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা স্যামুয়েল রিচমন্ড নোব্‌ল পেশায় ছিলেন একজন ধর্মযাজক। তাঁর মাতার নাম মেরী ইসাবেল। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র দশ বছর বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। তাঁর পিতার মৃত্যুর পরে তাঁর মা দুটি কন্যা ও এক পুত্রকে নিয়ে পিতা হ্যামিলটনের কাছে চলে আসেন। হ্যামিলটন আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। মার্গারেটের চরিত্রের মধ্যে মাতামহের চারিত্রিক গুণাবলী পরিলক্ষিত হয়। উনি ছিলেন সদা সত্যের পূজারী। ধর্মের প্রতি অনুরাগ, দেশাত্মবোধ এবং রাজনীতির প্রতি মার্গারেটের আকর্ষণ দেখা যায় কারণ মার্গারেটের পিতা ও পিতৃপুরুষ এবং মাতামহের আদর্শের প্রভাব পড়েছিল মার্গারেটের উপর।

মোটামুটি তিনটি পর্বে ভগিনী নিবেদিতার জীবনকালকে ভাগ করা যেতে পারে। এই তিনটি পর্ব কী সুন্দর ভাবে একটি পর্ব আর একটি পর্বের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত,–

প্রথম পর্ব– তাঁহার জন্মকাল থেকে শুরু করে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা হওয়া পর্যন্ত। এই সময় বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর চরিত্রের অনন্যসাধারণ গুনগুলির বিকাশ ঘটে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ভাবে তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছিল সংশয় ও অনিশ্চয়তা।

দ্বিতীয় পর্ব– এই পর্বে তাঁর জীবনকাল শুরু হয় বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ এর পর। নিবেদিতার জীবনে দ্বিতীয় পর্বের সূচনা কালকে ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি পর্ব বললে কিছু ভুল হয় না। স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা তিনি কতখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাঁর চিন্তাজগতে যে পরিবর্তন ঘটেছিল তা নিবেদিতার স্বলিখিত বই গুলি থেকে প্রমাণ দেয়।

তৃতীয় পর্ব–এই পর্বে ঘটে তাঁর বৃহৎ এক কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ। নীরব নিরলস কর্মের মধ্য দিয়ে তাঁর এগিয়ে যাওয়া প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে – আত্মবিসর্জনই ছিল তাঁর জীবনের মূল ব্রত। নিবেদিতা জানতেন, "ব্রতের

উদযাপনে, প্রাণপাত করাই জীবনের আদর্শ, সিদ্ধির জন্য ব্যাকুল হওয়া নহে।"(তদেব, পৃ. ৩) অধ্যাত্মসাধনার কেন্দ্র ভারতভূমি ছিল তাঁর কর্মস্থল। তিনি এমন এক মহামানবী ছিলেন যে, অনেক সময় তাঁকে দেখে রক্তমাংসে গঠিত দেহের অস্তিত্ব কিনা তা নিয়ে মনে সংশয় জাগত। কারণ কখনও তিনি লোক শিক্ষয়িত্রী, কখনও স্নেহবিগলিত জননী, কখনও কর্তব্যনিষ্ঠ মায়া-মমতায় জড়িত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কর্মী, কখনও বিনীতা ছাত্রী, অথবা সেবিকা, আবার কখনও ভগবদ্ভাবে বিভোরা– বিভিন্ন ভাবের সমাবেশ পরিলক্ষিত হত একই চরিত্রে।

বেগম রোকেয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনীঃ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারী জাগরণের অগ্রদূত, সমাজসংস্কারক, শিক্ষাসংস্কারক, চিন্তা ও চেতনায় প্রগতিশীল মনোভাবের, দৃঢ়চেতা, স্বীয় কর্তব্যে অটল যে মহিয়সীর ব্যক্তিত্ব আমাদের চোখে পড়ে তিনি হলেন বেগম রোকেয়া। ইংরেজী ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই ডিসেম্বর এক মুসলিম রক্ষণশীল পরিবারে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

রোকেয়ার পিতার নাম জহিরুদ্দিন মোহম্মদ আবু আলী সাবের। মাতার নাম রাহাতুন্নেসা সাবের চৌধুরানী। রোকেয়ার তিন বোন ছিলেন আর দুই ভাই। বোনদের নাম হল – করিমুন্নেসা, রোকেয়া ও হমায়ারা। ভাইদের নাম হল – ইব্রাহিম সাবের ও খলিল সাবের। রোকেয়ার বাবা প্রচুর ধন সম্পদের মালিক হলেও উনি খুব ধর্মান্ধ ছিলেন। অত্যন্ত গোঁড়ামি, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করলেও, সব ভাই-বোন ক্রমাগত চেষ্টা করে গিয়েছেন এই কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। তাই রোকেয়ার বড় ভাই ইব্রাহিম ও খলিল সাবের পরিবারের ঐতিহ্য ভেঙে প্রথম ইংরেজী শিখলেন এবং দুভাই-ই কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে লেখাপড়া করেন এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার ফল স্বরূপ অশিক্ষা ও কু-শিক্ষায় মোড়া এই সমাজকে মুক্ত করতে তাদের মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তারা উপলব্ধি করতে শুরু করেন দেশকে জাগ্রত করতে হলে প্রথমে দরকার নারীদের জাগিয়ে তোলা। তাই তারা এই কাজ শুরু করলেন নিজেদের বোনদের শিক্ষিত করার মাধ্যমে - বাংলার নারীজাতিকে কুশিক্ষা, কুসংস্কারের অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে তৎপর হয়ে ওঠেন।

স্কুল পরিচালনা ও সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সাংগঠনিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে রোকেয়া নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। ১৯১৬ সালে তিনি মুসলিম বাঙালি নারীদের সংগঠন 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন সভায় তিনি তাঁর বক্তব্য তুলে ধরতেন। ১৯২৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'বাংলার নারী শিক্ষা' বিষয়ক সম্মেলনে রোকেয়া সভাপতিত্ব করেন।

ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার শিক্ষা ভাবনাঃ

শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার মতামতঃ

"অশিক্ষিত স্ত্রী লোকের শতদোষ সমাজ অম্লান বদনে ক্ষমা করিয়া থাকে, কিন্তু সামান্য শিক্ষা প্রাপ্ত মহিলা দোষ না করিলেও সমাজ কোন কল্পিত দোষ শত গুন বাড়িয়ে সে বেচারীকে ঐ 'শিক্ষার' ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় এবং শত কণ্ঠে সমস্বরে বলে থাকে 'স্ত্রী শিক্ষাকে নমস্কার'।" (রোকেয়া রচনাবলী, ২০০৬। পৃ. ১৮) বর্তমানে অধিকাংশ লোকে শিক্ষাকে কেবল চাকুরি লাভের পথ মনে করে। মহিলাগণের চাকুরি গ্রহণ অপ্রয়োজনীয় সুতরাং এই সকল লোকের চক্ষে স্ত্রী শিক্ষা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

'শিক্ষার' অর্থ কোন সম্প্রদায় বা জাতি বিশেষে 'অন্ধ অনুকরণ' নয়। ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা দিয়েছেন, সেই ক্ষমতাকে অনুশীলনের দ্বারা বৃদ্ধি করাই শিক্ষা। এই গুণের সদ্ব্যবহার করাই কর্তব্য এবং অপব্যবহার করাই দোষ। ঈশ্বর নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে হাত, পা, চোখ, কান, মন, বুদ্ধি এবং চিন্তাশক্তি দিয়েছেন। যদি আমরা অনুশীলনের দ্বারা হাত-পা সবল করি, হাত দ্বারা সৎ কার্য করি, চোখ দ্বারা মনযোগ সহকারে দেখি (বা Observe করি), কান দ্বারা মনোযোগ পূর্বক শুনি এবং চিন্তাশক্তি দ্বারা আরও সূক্ষ্ম ভাবে চিন্তা করতে শিখি তাহলে তাকেই বলে প্রকৃত শিক্ষা। আমরা কেবল 'পাশ করা বিদ্যা'-কে প্রকৃত শিক্ষা বলিনা। (তদেব, পৃ. ১৯)

অপরদিকে নিবেদিতা ভারতীয় নারীর ভবিষ্যৎ উল্লেখ করে বলেছেন শিক্ষার প্রয়োজন আছে। কিন্তু শিক্ষা কি ধরনের হবে তা প্রশ্ন। ইংরেজী শিখতে ও পড়তে পারাই শিক্ষা নয়। মানুষ হওয়ার শিক্ষা লাভ করা চাই।

উন্নতির সম্ভাবণার মূলে যে অন্তরায় গুলি বর্তমান, তা দূর করতে পারলে ভারতীয় নারী যথার্থ শিক্ষার আধার হবে।

শিক্ষার পাঠ্যক্রম সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার মতামতঃ

শিক্ষার পাঠ্যক্রম সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতার মতামতঃ

নিবেদিতা বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে অনুভূতির প্রশিক্ষণ ছাড়া আর কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয়। নিবেদিতা একটি ছোট্ট ভাড়ার ঘরের কুটিরে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁর সামনে সবচেয়ে বড়ো বাধা ছিল কুসংস্কার কাটিয়ে অবিভাবকরা তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে চাইতেন না। তিনি অনেক কষ্টে বিভিন্ন বয়সের কয়েকটি মেয়েকে জোগাড় করে তাদের পড়া, লেখা, পেন্টিং, অঙ্কন, স্বাস্থ্যবিধি এবং কাদামাটির মডেলিং শিখিয়েছিলেন। তিনি তাঁর শিক্ষা প্রণালী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংমিশ্রনে গড়ে তোলেন। একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে ভগিনী নিবেদিতার খ্যাতি ছিল অসামান্য এমনকি যখন তাঁর সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ হয়নি তখনও তিনি লণ্ডনে একজন বুদ্ধিমতি নাগরিক ও শিক্ষাবিদ হিসেবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। তিনি শিক্ষা দানের পদ্ধতি নিয়ে ১৮৯২ সাল থেকে গবেষণা শুরু করেন। 'কিনসলি গেট' বিদ্যালয়ে তিনি পরবর্তীকালে পরিচিত হন লেডি, রিপন এবং লেডি ইসাবেল মারগেস এর সঙ্গে যাঁরা লণ্ডনে একটি সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যা পরবর্তী সময়ে সীসেম ক্লাব নামে পরিচিতি লাভ করে।

নিবেদিতার মতে মানুষের মন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে, সে আধ্যাত্মিক শিক্ষাই হোক কিংবা কোন বিশেষ কৌশল বা দক্ষতা শিক্ষাই হোক,−সবকিছুই নির্ভর করে মনের অবস্থার উপর। তিনি চেয়েছিলেন শিশুর মনকে বুঝে সেই অনুসারে শিক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করতে। তিনি জোর দিয়েছেন স্বদেশীয় ইতিহাস বা গৌরব গাথার শিক্ষা দান করার উপর। তাঁর তৈরি পাঠক্রমের মধ্যে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র, বিজ্ঞান, গনিত এর পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষা যেমন সেলাই, মাটির জিনিস বানানো, বুনুনির কাজ, হস্ত শিল্পের শিক্ষার উপর জোর দিতেন। বৃত্তিমূলক শিক্ষা পেলে মেয়েরা স্বনির্ভর হতে পারবে। তাঁর মতে স্বদেশীয় ঐতিহ্যকে না জেনে কেউ বর্তমানকে সঠিকভাবে জানতে বা বুঝতে পারবে না।

শিক্ষার পাঠ্যক্রম সম্পর্কে বেগম রোকেয়া্র মতামতঃ

বেগম রোকেয়ার ভাবনা ও আদর্শ সাধারণ বাঙালী মুসলমান সমাজের বৃত্ত পেরিয়ে সর্বস্তরে সমাজ ব্যবস্থাকে স্পর্শ করেছিল। শিক্ষার পাঠক্রমের রূপরেখা যেভাবে তিনি নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন তা আসলেই কার্যকরী ও আদর্শ একটি রূপরেখা যা বর্তমান দিনেও সমান প্রাসঙ্গিক। শুধু তাই নয় এই পরিকাঠামোর সম্পূর্ণ প্রয়োগে সমাজের আমূল পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বেগম রোকেয়া তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের রূপরেখা নিজেই ঠিক করতেন। তিনি পাঠক্রমের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। যেমন, ১. কোরাণ অর্থাৎ ধর্মের শিক্ষা, স্বজাতির অস্তিত্বকে বোঝাতে গেলে ধর্মের চর্চা খুব প্রয়োজন। ২. ইংরেজী- বিদেশের সংস্কৃতিকে চিনতে গেলে, সেই দেশের ভাষাকে রপ্ত করতে হয় আর ইংরেজী ভাষায় যেহেতু পৃথিবীর সিংহভাগ মানুষ কথা বলেন, তাই বিশ্বজনীন সংস্কৃতির অংশ হওয়ায় ইংরেজী ভাষার শিক্ষা অনিবার্য। এছাড়া তিনি পঠক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন– ৩. উর্দু ভাষা, ৪. পার্সি ভাষা, ৫. হোম নার্সিং, ৬. ফাস্ট এইড, ৭. রান্না, ৮. সেলাই, ৯. শরীর শিক্ষা, এবং ১০. পেশাগত শিক্ষা।

শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার মতামতঃ

শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতার মতামতঃ

শিক্ষক হবেন সর্বদাই কঠোর পরিশ্রমী এবং শিক্ষকের মধ্যে কোন ভাব বিলাসিতার প্রকাশ পাবে না। কেবলমাত্র জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসেবে গ্রহণ না করে যারা শিক্ষা দানের মধ্য দিয়ে নিজের সত্ত্বাকে প্রকাশ করে এক অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করে, তাদের শিক্ষা প্রণালী স্বভাবতই চিরাচরিত পথ থেকে ভিন্ন। নিবেদিতা অঙ্ক, ইতিহাস ও ছবি আঁকা শেখাতেন। তিনি সাধারণ স্কুলের মতো পাঠ্য পুস্তক দ্বারা ইতিহাস পড়াতেন না, তিনি নিজেই ইতিহাসের গল্প বলে যেতেন এবং ছাত্রীরা শুনতেন। তিনি যেদিন যে বিষয়টি আরম্ভ করতেন সেই বিষয়টির মধ্যে যেন তিনি একেবারে ডুবে যেতেন। সিস্টার নিজে সমস্ত রাজপুতনা ঘুরে বেড়িয়ে ছিলেন, সে

সম্বন্ধে গল্প শোনাতেন শিক্ষার্থীদের। রাজপুত জাতির শৌর্য, বীর্য, দেশের জন্য ত্যাগ, কষ্ট সহিষ্ণুতা, আবার রাজপুত নারীদের বীরত্ব গাথা, আত্ম-সম্মান এই সব তিনি অগ্নিগর্ভ ভাষায় বর্ণনা করতেন এবং সেই সময় তাঁর মুখের ভাব বিভিন্ন ভাবের ছটায় উদ্ভাসিত হত এবং শিক্ষার্থীরা তা দেখে মুগ্ধ হত।

শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে বেগম রোকেয়ার মতামতঃ

রোকেয়ার মতে, কেবলমাত্র অন্যের বক্তব্য শুনে বা মুখস্থ করে তা প্রকাশ করে দেওয়াই প্রকৃত শিক্ষা নয়, চোখ, কান এবং চিন্তাশক্তির যথাযথ ভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করা সম্ভব। তাঁর মতে, গোটাকতক বই পড়া বা দু'ছত্র কবিতা লিখতে পারা শিক্ষা নয়। তিনি চেয়েছিলেন সেই শিক্ষা যা শিক্ষার্থীকে নাগরিক অধিকার অর্জন করতে সক্ষম করবে। এই শিক্ষা মানসিক ও শারীরিক দুই রকমের হতে হবে। (তদেব, পৃ. ২৭২)

রোকেয়া বুঝতে পেরেছিলেন বৈজ্ঞানিক ও মানবিক উভয় ধরনের জ্ঞান না থাকলে শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশ সুষম হবে না। ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিষয়ে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থানে পরিবেশ ও মানুষের সম্বন্ধে জ্ঞান দানের উপরে রোকেয়া গুরুত্ব দিয়েছেন। যা কিছু দরকার তার সবই শিক্ষার্থীর পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

নৈতিকতার শিক্ষার ক্ষেত্রে রোকেয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে সমস্ত গুনাবলীর বিকাশ ঘটানোর কথা বলেছেন সেগুলি হল সত্যবাদীতা, আত্মনির্ভরতা, সাহসিকতা, কর্তব্যবোধ, একতা, শিষ্ঠাচার (যেমন বড়দের সম্মান দেওয়া এবং ছোটদেরকে স্নেহ প্রভৃতি)।

শৃঙ্খলা সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার মতামতঃ

শৃঙ্খলা সম্পর্কে নিবেদিতার মতামতঃ

শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রীদের মধ্যে শৃঙ্খলার বীজবপন করতে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। ছাত্রীদের শিক্ষাদান কালে শৃঙ্খলার প্রথম পাঠ হিসেবে নিবেদিতা বলতেন, "তোমরা সর্বদাই সোজা হয়ে বসবে; নীচু হয়ে, কুঁজো হয়ে বা বেঁকে চূরে কখনো বসবে না।" (নিবেদিতা বিদ্যালয় শতবর্ষ স্মারক পত্রিকা, ১৮৯৮-১৯৯৮। পৃ. ৫০) ।

বোধ হয় নিবেদিতাই বাঙালী মেয়েদের প্রথম সোজা হয়ে মেরুদণ্ড খাড়া করে বসার পাঠ দেন। এই ঋজু বা সোজা হয়ে বসা ও দাঁড়ানোর ব্যাপ্তি বহুদূর – জীবনের সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সোজা ভাবে দাঁড়াতে না পারলে অন্যায় বাঁকাপথে প্রবেশ করবে জীবনকে নষ্ট করতে। এভাবেই তিনি প্রতিবাদ করবার শিক্ষা দিয়েছেন।

শৃঙ্খলা সম্পর্কে বেগম রোকেয়ার মতামতঃ

রোকেয়া কড়া শৃঙ্খলার বিষয়ে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মত ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য শৃঙ্খলাকে জাগিয়ে তুলতে এবং প্রতিষ্ঠিত করতে দৃঢ় শৃঙ্খলা প্রয়োজন। ছাত্রাবস্থায় যারা নিয়মিত শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন করেন তারা বড় হয়েও শৃঙ্খলার মধ্যেই জীবন পরিচলনা করতে সমর্থ হবেন। যে সকল শিক্ষার্থী শৃঙ্খলার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতে সমর্থ হয় তাদের শারীরিক, মানসিক এব নৈতিক খেত্র গুলির বিকাশ ঘটে। প্রাচীন ভারতে শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক বিকাশের জন্য শৃঙ্খলার গুরুত্বকে রোকেয়া বিংশ শতাব্দীতেও সমান গুরুত্ব দিয়ে স্বীকার করেছেন।

ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার সমাজ ভাবনাঃ

ভগিনী নিবেদিতার সমাজ ভাবনাঃ

বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার আগে থেকেই সমাজতন্ত্রের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় ঘটেছিল। ১৮৯৭ সালে যখন রামকৃষ্ণ মিশন দুঃস্থ ও দুর্গতদের মধ্যে সেবামূলক কাজ করতে চেয়েছেন, তখন নিবেদিতা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন যে এই সেবামূলক কাজ পৃথিবীর সমস্ত সমাজবাদীদের প্রশংসা আদায় করে নেবে। বিশেষ করে সমকালীন ইউরোপীয় শ্রমিক, কৃষকেরা মালিক শ্রেনির অত্যাচারের বিরুদ্ধে আক্রোশ গড়ে তুলছিল তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। সমাজ সম্পর্কে সচেতন নিবেদিতা চেয়েছিলেন প্রিন্স ক্রপট্‌কিনের 'ফ্রেঞ্চ রিভোলিউশন' বইটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বইটির উপর একটি পূর্ণমূল্যায়ন তৈরি করতে। যাতে সরকার শিক্ষার সম্প্রসারে সচেষ্ট হয়। রাশিয়াতে যেখানে বহুসংখ্যক ইঞ্জিনিয়ার, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষিত সমাজ, ভূতাত্বিক দরকার – সেখানে রাশিয়ার কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষার সংকোচন ঘটাবার জন্য সচেষ্ট। নিবেদিতা বোঝাতে চেয়েছেন ভারতবর্ষের মতো একটি এতবড় দেশেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষিত মানব সম্পদের প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন মিটছে না কারণ লর্ড কার্জনের ভ্রান্ত শিক্ষানীতি ভারতীয়দের জন্য শিক্ষার সংকোচন ঘটিয়েছে।

বেগম রোকেয়ার সমাজ ভাবনাঃ

বেগম রোকেয়া মুসলমান সমাজের বিভিন্ন সমস্যার দিকে মুসলমান সমাজকে দৃষ্টি দিতে বলেছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মুসলমান পুরুষরা কথায় কথায় 'তালাক' দিতেন। ফলে ওই সমস্ত মেয়েরা স্বামীর ঘরে এমনকি বাবার ঘরেও স্থান না পেয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভিক্ষাজীবীতে পরিণত হতেন। অশিক্ষিতা মুসলমান মেয়েরা নিজেদের সুন্দর ধর্ম, সুন্দর সামাজিক আচার প্রথা বিসর্জন দিয়ে এক অদ্ভুত রকমের জানোয়ার সাজতেন। (তদেব, পৃ. ২৪৯)

'ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম' প্রবন্ধে রোকেয়া দেখিয়েছেন উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে মুসলমান নারী পুরুষ নিজে ধর্মকে ত্যাগ করে পরের ধর্মকে গ্রহণ করছেন। রোকেয়ার অন্যতম জীবনীকার শামসুননাহার 'রোকেয়া জীবনী'

তে লিখেছেন, "ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অশিক্ষা ও কুসংস্কারের ভিতর দিয়া আসিয়াছিল জাতির সবচেয়ে বড় অকল্যাণ। ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা ভুলিয়া হৃতসর্বস্ব মুসলমান সেদিন হাবুডুবু খাইতেছিল কুসংস্কার আর গোড়ামির পাঁকে।" (রোকেয়া জীবনী, শামসুননাহার, পৃ. ২২)

রোকেয়ার মতে উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে মুসলমান সমাজ নানাবিধ কুসংস্কারের জালে জড়িয়ে পড়ে। ইসলামের মূল আদর্শ সাম্যবাদ ও ভাতৃত্বের নীতি থেকে ভারতীয় মুসলিম তথা বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায় অনেক দূরে সরে গিয়েছিল। ধর্মীয় অনুশাসন গুলিকে বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হত। মুসলমান সমাজের মধ্যে সত্যিকারের সাহসী সংস্কারকের অভাব ছিল প্রকট। তাই রোকেয়াকে সমাজসংস্কারকের ভূমিকাতেও দাঁড়াতে হয়। 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে রোকেয়া স্বীকার করেছেন যে উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে মুসলমান মেয়েদের মন দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে না। তারা বাস্তবকে বুঝতে এবং গ্রহণ করতে অসমর্থ। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা পেলে মুসলমান মেয়েরা পুরুষের প্রাধান্য না মেনেও স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারবেন, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অনুশীলনের কৃতিত্ব দেখাতে পারবেন, এমনকি বিদেশী আক্রমণ থেকে স্বদেশকে রক্ষা করতে পারবেন। 'Sultana's Dream' নামক লেখায় এই কথাই রোকেয়া স্পষ্ট করে জানিয়েছেন।

দারিদ্র্য দূরীকরণে নিবেদিতা ও রোকেয়ার ভাবনাঃ

দারিদ্র্য দূরীকরণে নিবেদিতার ভাবনাঃ

মেয়েদের তিনি আচার তৈরী, বড়ি তৈরী, সূচি শিল্প, সেলাই এবং পরবর্তী সময়ে, রন্ধনশিক্ষা, বিভিন্ন ধরনের আলপনা, মাটির ছাঁচ, মাটির বেনেপুতুল, পুরান কাশ্মীরী শালের কাজ, কাঁথার কারুকার্য, ছবি আঁকা ও রং তুলির কাজ ইত্যাদি শেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। হাতে-কলমে এই প্রায়োগিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে তিনি তার ছাত্রীদের স্বাবলম্বী এবং উপার্জনশীলা করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন কেবলমাত্র স্বামীর উপার্জনে সংসারে স্বচ্ছলতা আসবে না। সংসারকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে হলে স্বামীর পাশে থেকে স্ত্রীকে উপার্জন করতে হবে। আবার উপার্জনে সক্ষম নারী স্বাধীনতা, মুক্তি এবং ক্ষমতায়ন লাভ করতে পারে।

দারিদ্র্য দূরীকরণে রোকেয়ার ভাবনাঃ

বেগম রোকেয়ার সমাজ ভাবনার একটি অন্যতম দিক হল ভারতবাসী তথা বঙ্গবাসীকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা। মেয়েরা যদি নিজেরা সচেষ্ট না হয়, নিজেদের উন্নতির দ্বার নিজেরা খুলতে এগিয়ে না আসে, ভাগ্যের উপরে নিজেদের ভবিষ্যৎকে ছেড়ে দেয় তাহলে তারা পুরুষের ধন হয়ে থেকে যাবে। স্বাধীনতা, ওজস্বিতা এবং উপার্জনের শক্তি অর্জন করতে অপারগ হবে। যতক্ষণ না মেয়েরা যুগোপযোগী শিক্ষা লাভ করে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের জন্য সচেষ্ট না হবে ততক্ষণ তারা দরিদ্র থাকবে। এই প্রসঙ্গে রোকেয়া 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধে লিখেছেন, "যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডী কেরানি হইতে আরম্ভ করিয়া লেডী ম্যাজিস্ট্রেট, লেডী ব্যারিস্টার, লেডী জর্জ– সবই হইব! পঞ্চাশ বৎসর পরে লেডী Viceroy হইয়া এদেশের সমস্ত নারীকে 'রাণী' করিয়া ফেলিব! উপার্জ্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কি নাই? যে পরিশ্রম আমরা 'স্বামী'র গৃহকার্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না?"

সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার চিন্তা ভাবনার দূরদর্শিতাঃ

নিবেদিতা পরোক্ষভাবে ও সাম্প্রদায়িকতাকে স্বীকার করেননি। তিনি জাতীয়তাবাদে, ঐক্য ও অখণ্ড ভারতবর্ষের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই সংকীর্ণ হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও পার্সি ধর্মের বিভাজনকে আলাদা করে দেখেননি। তাঁর স্বচ্ছ, মুক্ত ও সত্য দৃষ্টি দিয়ে ভারতের জাতীয়তা স্পন্দনকে হৃদয়ে অনুভব করেছিলেন এবং তাকেই তুলে ধরেছিলেন তাঁর বজ্র-নির্ঘোষ বাণীতে। তাই এই অখণ্ড, অবিভাজ্য ভারতবর্ষে জাতীয় চেতনা একটি সুরেই স্পন্দিত– সেখানে জাতির নামে, ধর্মের নামে সংকীর্ণ সম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই। ঐক্যবদ্ধ ভারতীয়দের যত উপাদান বৈচিত্র্য ততই তার শক্তি, তার ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য। তাই ভারতবর্ষের উপাদানের বৈচিত্র্য, জাতীয় ধর্মের বৈচিত্র্য, ভাষা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য– জাতি হিসেবে ভারতীয়দের শক্তির লক্ষণ। তাই নিবেদিতা সম্পূর্ণত জাতিভেদ প্রথা তথা সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ ভাবনার বিরোধিতা করেছেন। রোকেয়া সারাজীবন ভারতীয় মূল্যবোধের চর্চা করেছেন এবং ভারতের ঐতিহ্যকে জাতীয় স্তরে উপস্থাপন করার চেষ্টা

চালিয়ে গেছেন। একই রকম ভাবে তিনি তাঁর প্রবন্ধ ‘সুগৃহিণী’-তে লিখেছেন, “...আমরা শুধু হিন্দু বা মুসলমান কিংবা পার্সি বা খ্রিস্টান অথবা বাঙালী, মান্দ্রাজী (মাদ্রাজী), মাড়ওয়ারী বা পাঞ্জাবী নহি– আমরা ভারতবাসী। আমরা সর্বপ্রথমে ভারতবাসী তারপরে মুসলমান, শিখ বা আর কিছু। সুগৃহিণী এই সত্য আপন পরিবার মধ্যে প্রচার করিবেন। তাহার ফলে তাঁহার পরিবার হইতে ক্ষুদ্র স্বার্থ, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি ক্রমে তিরোহিত হইবে এবং তাঁহার গৃহ দেবভবন সদৃশ ও পরিজন দেবতুল্য হইবে।” (রোকেয়া রচনাবলী, ২০০৬ পৃ. ৩৯-৪০)

আলোচনাঃ

ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়া সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মতামতঃ

বর্তমান গবেষিকা চারজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ তথা ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়া চর্চায় আধুনিক কালের পথিকৃৎদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণের জন্য গবেষিকা কার্যদর্শী বা সুপারভাইজার -এর সহায়তায় চারটি মুক্ত প্রশ্নাবলী (Open-ended questionnaire) তৈরি করেন এবং ভগিনী নিবেদিতার ও বেগম রোকেয়ার চর্চায় অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া ব্যক্তিত্বদের সম্মুখীন হন। নীচে চারজন ব্যক্তিত্বের দেওয়া প্রশ্নোত্তরগুলি যথাক্রমে পর্যায়ক্রমে সাজানো হয়েছে।

অধ্যাপক মনোতোষ দাশগুপ্ত – রসায়ন বিজ্ঞানে Ph.D. ডিগ্রী প্রাপ্ত। প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতে অধ্যাপনা করেছেন।

অধ্যাপক রাধারমন চক্রবর্তী- নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রথিতযশা অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপক চক্রবর্তী বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা -এর ‘মানবাধিকার’ এবং ‘ভারততত্ত্ব চর্চা’ বিষয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক।

অধ্যাপক সনৎকুমার ঘোষ- কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা বিভাগে অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান এবং কলা অনুষদে অধ্যক্ষ রূপে সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন।

অধ্যাপক স্বপন মুখোপাধ্যায়- 'The Statesman' পত্রিকার এডিটোরিয়াল বোর্ডে দীর্ঘকাল অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন। পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক গবেষণা ক্ষেত্রে তাঁর নাম ভারতে এবং বাংলাদেশে বহু চর্চিত।

প্রথম প্রশ্ন : বিবেকানন্দ কেন ভগিনী নিবেদিতাকে আহ্বান জানালেন ভারতবর্ষে আসার জন্য?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরের সারাংশ

ক. বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে ভারতবর্ষে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন।

খ. এই সময় বিবেকানন্দের চোখে নিবেদিতার ন্যায় কোন নারী ধরা পড়েননি যিনি ভারতবর্ষকে ভালোবেসে তাঁর মেয়েদের শিক্ষার জন্য সর্বতভাবে চেষ্টা করবেন।

গ. মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল্ এর মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ লক্ষ্য করেছিলেন গভীর অনুসন্ধিৎসা।

ঘ. স্বামীজী লক্ষ্য করেছিলেন যে নিবেদিতা একজন তেজস্বী সিংহী এবং ভারতবর্ষের প্রতি নিবেদিতা প্রাণা শিক্ষয়িত্রী। তাঁর মধ্যে একজন শিক্ষা বিজ্ঞানী হওয়ার সম্ভাব্য উপকরণ ছিল। কারণ প্রথাগত শিক্ষাদানের মধ্যে তিনি নিজেকে আটকে রাখেননি, প্রথা ভেঙ্গে তিনি শিক্ষাদানের নতুন দিগন্তকে উন্মোচন করেছেন।

ঙ. একজন বিদেশিনীর পক্ষে কি ভারতবর্ষে মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারে কাজ করা সম্ভব?

চ. নিবেদিতা ভারতীয় বেদান্ত দর্শন অধ্যাত্মবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

ছ. ভারতে এসে নিবেদিতা অনুভব করেন–এখানে একটা পরিবর্তন দরকার এবং সেই পরিবর্তন আসতে পারে শিক্ষার মধ্য দিয়ে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : বেগম রোকেয়ার নারী শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস এবং ভগিনী নিবেদিতার নারী শিক্ষা প্রসারের যে প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে সম্পর্ক কি?

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরের সারাংশ

ক. নিবেদিতা ছিলেন প্রকৃত অর্থেই একজন শিক্ষাবিজ্ঞানী। আর রোকেয়া ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ।

খ. নিবেদিতা বিজ্ঞানীদের ন্যায় শিক্ষাক্ষেত্রে নিত্যনতুন আবিষ্কারের নেশায় মেতে থাকতেন, কিন্তু বেগম রোকেয়া সেই সময়ের প্রথাগত স্কুল শিক্ষার ঘেরাটোপ থেকে নিজেকে বার করতে পারেননি।

গ. নিবেদিতা এবং রোকেয়া দুজনেই কলকাতায় থেকে মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেছেন।

ঘ. নিবেদিতা বহু মনীষীর সান্নিধ্য পেয়েছেন, যা রোকেয়ার ভাগ্যে ঘটেনি।

ঙ. উভয়ের কর্মপদ্ধতি এক ছিল না এমনকি তাঁরা যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন তার প্রকারভেদ ও মাত্রাও ছিল ভিন্ন।

চ. বেগম রোকেয়া মুসলিম নারীদের জন্য বিদ্যালয় শিক্ষার পাশাপাশি কিছু হাতে-কলমে কাজ শেখারও ব্যবস্থা করেছিলেন।

ছ. বেগম রোকেয়া নারীকে উপার্জনের ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করার মধ্যে দিয়ে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য চেষ্টা করেছেন।

জ. অবনীন্দ্রনাথের ভারতমাতার ছবি নিবেদিতার অনুপ্রেরণায় তৈরি হয়েছিল।

ঝ. উভয়েই নারী শিক্ষা সহ নারী সচেতনতা, মেয়েদের স্বাবলম্বী হওয়া এবং মেয়েদের ক্ষমতার বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে চেষ্টা করেছিলেন।

ঞ. নিবেদিতা মূলত বাংলার হিন্দু মেয়েদের মধ্যে এবং রোকেয়া বাংলার মুসলমান মেয়েদের মধ্যে কাজ করেছেন।

ট. রোকেয়া বাঙালী মুসলমান মেয়েদের পথিকৃত ছিলেন।

তৃতীয় প্রশ্ন : ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়া উভয়েই কি সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করতে পেরেছিলেন?

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরের সারাংশ

ক. নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়া কেউই সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট ছিলেন না। তাঁদের লেখা চিঠিপত্র এবং বক্তৃতার মধ্যে কোথাও সাম্প্রদায়িকতার সুর বাজেনি।

খ. দুজনের কেউই অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ন ছিলেন না।

গ. নিবেদিতার মত একজন বিদেশিনীর পক্ষে সে সময় মুসলমান মহল্লাতে গিয়ে পর্দানসীন মেয়েদের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা ছিল প্রায় অসম্ভব।

ঘ. নিবেদিতা হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে থাকার কারণে পল্লীর হিন্দু মেয়ে এবং মহিলাদের শিক্ষার জন্য চেষ্টা করেছিলেন।

ঙ. বেগম রোকেয়া মুসলমান মহিলা হওয়ার কারণে মুসলমান সমাজের মেয়েদের যন্ত্রণাকে অনুভব করতে পেরেছিলেন বলে মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার জন্য আজীবন লড়াই করেছেন।

চ. নিবেদিতা এবং রোকেয়ার পাঠদানের তাত্ত্বিক দিক এবং প্রয়োগ এর মধ্যে কিছু ফারাক রয়েছে।

ছ. নিবেদিতা ছিলেন Trained Teacher এবং রোকেয়া ছিলেন Self-made Teacher।

চতুর্থ ও শেষ প্রশ্ন হল আজকের সমাজে এই দুই মহীয়সী নারীর শিক্ষাভাবনার প্রাসঙ্গিকতা কতখানি?

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরের সারাংশ

ক. ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার শিক্ষা ভাবনা আজও একশো বছর পূর্বের ন্যায় সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

খ. নিবেদিতা প্রকৃত অর্থে ছিলেন একজন শিশু শিক্ষিকা।

গ. তাঁর দেওয়া পাঠ শিক্ষার্থীদের মনের খাদ্য হয়ে উঠত।

ঘ. শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তিনি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়কে ব্যবহার করেছেন এবং সাফল্য লাভও করেছেন।

ঙ. নিবেদিতা তাঁর গুরুর ন্যায় শিক্ষার্থীর অন্তরে লুকিয়ে থাকা সম্পূর্ণতার বিকাশের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

চ. নিবেদিতার ভাবনা ছিল প্রতিটি শিক্ষার্থী হয়ে উঠবে একক সমাজ তথা Community Atom।

ছ. রোকেয়া ছিলেন একজন শিক্ষিকা ও শিক্ষাব্রতী।

জ. রোকেয়ার ভাবনা অনেকাংশে ছিল একমুখী।

ঝ. রোকেয়া বুঝেছিলেন দারিদ্র্য মুক্ত মুসলমান সমাজ গড়ে তুলতে হলে মুসলমান মেয়েদের শিক্ষিতা করে তোলা অপরিহার্য।

ঞ. মেয়েরা আজ উচ্চশিক্ষিতা হলেও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা শ্লীলতাহানী ও ধর্ষণের শিকার।

ট. পুঁথিগত শিক্ষা পেলেও আজকের মেয়েদের মধ্যে অন্তরাত্মার বিকাশ ঘটেনি। এই বিকাশের জন্য একবিংশ শতাব্দীর নারী শিক্ষা ভাবনায় নিবেদিতা এবং রোকেয়ার শিক্ষা ভাবনার প্রতিফলন ঘটানো দরকার।

ঠ. নিবেদিতা এবং রোকেয়া ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার কথা বলেছেন।

ড. সততার সঙ্গে চেষ্টা করলে একদিন আমাদের মধ্যেকার সাম্প্রদায়িক হানাহানি বন্ধ হয়ে যাবে আর এর জন্য প্রয়োজন ভগিনী নিবেদিতা ও রোকেয়ার অসাম্প্রদায়িক ভাবনার প্রয়োগ।

ঢ. আমাদের সমাজে মেয়েদেরকে আমরা যেভাবে দাসীর মতো দেখি সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে।

ন. বর্ণবিদ্বেষ ও নারীর উপর নিপীড়ন বন্ধ করতে না পারলে একবিংশ শতাব্দীতেও আমাদের সমাজ থেকে সাম্প্রদায়িকতার বীজকে পুরোপুরি তুলে ফেলা যাবে না।

উপসংহারঃ

ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়া দুজনের প্রধান লক্ষ্য ছিল মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার। নিবেদিতা মূলত হিন্দু সমাজের মধ্যে থেকে হিন্দু পরিবারের মেয়েদের শিক্ষার দায়িত্ব নিজ আগ্রহে কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। অপরদিকে বেগম রোকেয়া মুসলমান পরিবারের মেয়ে হওয়ায় নিজের চোখে দেখেছিলেন মুসলমান মেয়েদের দুরবস্থা। তাই তিনিও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মুসলমান মেয়েদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব তাঁর জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। নিবেদিতা মুসলমান সমাজের মধ্যে প্রবেশ করার সুযোগ পাননি এবং অন্যদিকে পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করতে গেলে অনেক বেশি বাধার সম্মুখীন হতেন। তবে বাগবাজারে হিন্দু পল্লীর ভিতরে হিন্দু মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা, ছাত্রী সংগ্রহ এবং এর জন্য অর্থের ব্যবস্থা করতে গিয়ে তাঁকেও বিভিন্ন প্রকারের বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। অন্যদিকে রোকেয়ার সমস্ত জীবনই ছিল সমস্যায় দীর্ণ।

প্রায় একই সময়ে দুজনেই কলকাতায় মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দুজনের মধ্যেই কখনো সাক্ষাৎ হয়েছে বা পরস্পর পরস্পরকে চিনতেন বা পরস্পর পরস্পরের কাজের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এরূপ কোন প্রমাণ জানা যায়নি। নিবেদিতা যদিও মূলত হিন্দু সমাজের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে মনোনিবেশ করেছিলেন কিন্তু সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায় সম্বন্ধে কখনো কোন নেতিবাচক উক্তি করেননি। একই ভাবে বেগম রোকেয়া যদিও মুসলমান সমাজের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন কিন্তু তিনিও কখনো হিন্দু সমাজ বা হিন্দু মহিলাদের সম্বন্ধে নেতিবাচক উক্তি করেননি বা নেতিবাচক মনোভাব দেখাননি। বরঞ্চ রোকেয়ার বিভিন্ন লেখায় হিন্দু মহিলাদের উদাহরণ টেনেছেন ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে।

বর্তমানকালে শিক্ষা ক্ষেত্রে ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়া'র শিক্ষা ও সমাজ ভাবনার প্রাসঙ্গিকতাঃ

ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়া উভয়েই বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে চিরাচরিতভাবে চলে আসা ভাবনা থেকে অনেকটা এগিয়ে ভাবতে পেরেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে একশত বছর পেরিয়ে এসেও আজও আমরা ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার সমাজ ভাবনা এবং শিক্ষা ভাবনার প্রাসঙ্গিকতাকে অস্বীকার করতে পারিনা। যখন আমরা ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার নারী শিক্ষাদান প্রসঙ্গে শিক্ষার উদ্দেশ্য, পাঠক্রম, শিক্ষাদানের পদ্ধতি, শ্রেণীকক্ষে এবং শ্রেণীকক্ষের বাইরে শৃঙ্খলাবোধ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করি, তখন দেখতে পাই যে একবিংশ শতাব্দীতেও নারীশিক্ষা, নারী জাগরণ এবং নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে তাঁদের দেখানো পথ কোন অংশে ভুল ছিল না। আজও আমরা লড়াই করে চলেছি মেয়েদের সার্বজনীন শিক্ষা, শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়ে এবং ছেলেদের সমান সুযোগ সুবিধার অধিকার, মেয়েদেরকে ঘরের বাইরে উপার্জন করার সুযোগ সমষ্টির মধ্যে দিয়ে নারী স্বাধীনতা এবং নারী ক্ষমতায়নের স্বপক্ষে। আর এর দ্বারাই নারী জাতির জাগরণ সম্ভব। ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়া দুজনেই উল্লিখিত লক্ষ্যে কাজ করেছেন। আমরা জানি, "শিক্ষা আনে চেতনা, এবং চেতনা আনে বিপ্লব।" বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের ভাবধারায় স্নাত ভগিনী নিবেদিতা এবং নিজের জীবন দিয়ে মেয়েদের অবস্থাকে অনুভব করা বেগম রোকেয়া বুঝেছিলেন সমাজের উন্নয়ন ঘটাতে না পারলে ভারতবর্ষের উন্নয়ন অসম্ভব। না। স্ত্রী শিক্ষার দ্বারা রোকেয়া একদিকে যেমন নারীর অন্তরে আপন অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা, আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা এবং আত্মমর্যাদা বোধকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন তেমনি সেই সকল শিক্ষিতা নারীরা পুরুষদের স্বার্থ রক্ষা নিয়ে কীভাবে কাজ করবে তথা সমাজের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে সে বিষয়ে তাঁর সাহিত্যে বিভিন্ন চরিত্রের মুখ দিয়ে নিজের কথা বলেছেন। আজও আমরা বিশ্বাস করি যে নারীর উন্নয়ন ব্যতীত পুরুষের উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারী এবং পুরুষের উভয়ের উন্নয়ন এবং ঐক্য সাধন ব্যতীত সমাজের উন্নয়ন অলীক কল্পনা মাত্র।

সুতরাং স্বীকার করতেই হয় যে ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার শিক্ষা ভাবনা ও সমাজ ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা বিংশ শতাব্দী পেরিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে আজও সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক। উত্তরোত্তর এই প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বিষয়ে আরও গভীরভাবে অনুসন্ধানের প্রয়োজন।

গবেষকের সুপারিশঃ

ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার শিক্ষা ভাবনা ও সমাজ ভাবনার সম্বন্ধে গবেষণার পর বর্তমান গবেষিকা নিম্নলিখিত সুপারিশ গুলি করেছেন –

১. ভগিনী নিবেদিতার সমস্ত রচনা এবং চিঠিপত্র ইংরেজিতে লিখিত হওয়ার কারণে সাধারণ মানুষের পক্ষে তাকে অনুধাবন করা সম্ভবপর হয় না। তাই নিবেদিতার ভাবনাকে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হলে বাংলা, হিন্দি এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় তার অনুবাদ করা প্রয়োজন।

২. বেগম রোকেয়ার প্রায় সমস্ত রচনা বাংলা ভাষায় সুলিখিত হওয়ার কারণে অবাঙালি এবং অ-বাংলা ভাষীদের পক্ষে রোকেয়া সম্বন্ধে পাঠ গ্রহণ করা সহজসাধ্য হয় না। তাই রোকেয়ার সমস্ত লিখিত কর্মকে ইংরেজি, হিন্দি এবং অন্যান্য ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ করা প্রয়োজন।

৩. বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যক্রমে ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার জীবনীর সম্বন্ধে পাঠ নেওয়ার সুযোগ থাকা প্রয়োজন।

৪. ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার শিক্ষা ভাবনা ও সমাজ ভাবনার পাঠক্রম, শিক্ষাদানের পদ্ধতি, মূল্যায়ন, শৃঙ্খলার ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাবিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ গ্রহণ এবং চর্চার সুযোগ থাকা প্রয়োজন।

৫. ভারতের জাতীয় আন্দোলনে নিবেদিতার গুরুত্ব, সাহিত্য-বিজ্ঞান-চিত্রাঙ্কন-ইতিহাস প্রভৃতির চর্চায় ভগিনী নিবেদিতা কিভাবে ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন সেই বিষয়ে বিস্তারিত পাঠ গ্রহণের সুযোগ থাকা জরুরী। সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের এ বিষয়ে বিস্তৃত পাঠের সুযোগ থাকা প্রয়োজন।

৬. পরাধীন ভারতবর্ষে মহিলাদের শিক্ষা, জাগরণ, ক্ষমতায়ন এবং সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার গুরুত্ব বিস্তারিতভাবে আলোচনার দাবি রাখে।

৭. আজও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশে মুসলিম সমাজের মেয়েদের পশ্চাদপদতার কারণ অনুসন্ধান করে বেগম রোকেয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে কিভাবে সমস্যার সমাধান সম্ভব সেই বিষয়ে আলোচনা দরকার।

৮. ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার জীবনী, কর্ম, বর্তমানকালে তাদের প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োগ সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত চর্চা হওয়া জরুরি।

পরিশিষ্ট

(Appendix)

পরিশিষ্ট - I

ভগিনী নিবেদিতা

পরিশিষ্ট - II

বেগম রোকেয়া এবং তাঁর স্কুল

পরিশিষ্ট - III

তথ্য সংগ্রহ

পরিশিষ্ট - IV

তথ্য সংগ্রহ

পরিশিষ্ট - V

তথ্য সংগ্রহ

পরিশিষ্ট - VI

তথ্য সংগ্রহের অনুমতি পত্র

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা - ৭০০ ০৩২, ভারত

JADAVPUR UNIVERSITY
KOLKATA-700 032, INDIA

DEPARTMENT OF EDUCATION

To Whom It May Concern

This is to certify that Payel Giri is a registered Ph.D. research scholar of the Department of Education, Jadavpur University, bearing Registration No.: A00ED0501919. She is pursuing the Ph.D. degree from the Department under the supervision of the undersigned. The title of her Ph.D. thesis is ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার শিক্ষা ভাবনা ও সমাজ ভাবনা: একটি বিশ্লেষণমূলক আলোচনা

To successfully complete her research work, Payel Giri needs to collect relevant data from various sources. The undersigned hereby requests the concerned to give her permission to access and retrieve data and relevant information from the sources available in the Institute of the concerned. The undersigned solicits the earnest cooperation of the concerned in this regard.

Date: December 9, 2022

BNanda 9.12.22
(Dr. Bishnupada Nanda)
Professor
Department of Education
Jadavpur University

DR. BISHNUPADA NANDA
PROFESSOR
DEPARTMENT OF EDUCATION
JADAVPUR UNIVERSITY

* Established on and from 24th December, 1955 vide Notification No. 10986/IU-42/55 dated 6th December, 1955 under Jadavpur University Act, 1955 (West Bengal Act XXXIII of 1955) followed by Jadavpur University Act, 1981 (West Bengal Act XXIV of 1981)

দূরভাষ : (৯১) ০৩৩ ২৪৫৭-২৮৮২
Phone : (91) 033 2457-2882

E-mail
hod.education@jadavpuruniversity.in

Website
www.jadavpuruniversity.in

পরিশিষ্ট - VII

সেমিনার উপস্থাপনার শংসাপত্র

Two Days International Seminar

NEP 2020: Policy Reforms in Higher Education and Obstacles in Implementation Issues in Undergraduate Level

(10 & 11 August, 2023)

Organized by-

Sailajananda Falguni Smriti Mahavidyalaya

In Association with

Internal Quality Assurance Cell (IQAC)

Certificate of Participation

This is to certify that Payel Giri, Research Scholar (Ph.d) of Dept. of Education, Jadavpur University, Kolkatta. has presented a research paper titled SOCIAL AND EDUCATIONAL THOUGHTS OF SISTER NIVEDITA AND BEGUN ROKEYA; A CRITICAL ANALYSIS IN THE LIGHT OF NEP 2020. and has actively participated in this Seminar.

Dr. Bhaswati Ghosh Principal S.F.S. Mahavidyalaya	Dr. Ajay Saha IQAC Coordinator S.F.S. Mahavidyalaya	Imrul Kayes Alam Sarkar Joint Convener	Masud Rana Mondal Joint Convener

পরিশিষ্ট - VIII

সেমিনার উপস্থাপনার শংসাপত্র

TWO DAYS INTERNATIONAL SEMINAR

ON

"IMPLEMENTATION AND EXECUTION OF NEP 2020 IN THE LIGHT OF INCLUSIVE EDUCATION"

Date: 21st February, Tuesday & 22nd February, Wednesday, 2023

Organised by

VIVEKJYOTI COLLEGE

Estd. 2007

In

Association with "Internal Quality Assurance Cell" (IQAC)

Dakshin Mechogram :: Panskura :: Purba Medinipur :: W.B. :: 721139 :: India

Recognised by NCTE, Affiliated to Baba Saheb Ambedkar Education University and West Bengal Board of Primary Education

Certificate Of Participation

This is to certify that Payel Giri ...., *Principal / TIC /Professor /Associate Professor / Assistant Professor / Lecturer/Teacher/ Research Scholar/ Student of* Jadavpur University .... *partook as a participator/ Paper presenter/ Speaker in the TWO DAYS INTERNATIONAL SEMINAR on 21st & 22nd February, 2023 at VIVEKJYOTI COLLEGE, Mechogram, Purba Medinipur, W.B., India. His/ Her engagement enriched and enlightened us.*

Prof. (Dr.) Saumen Kumar Mahapatra
President
Vivekjyoti College

Prof. (Dr.) M. Tariq Ahsan
Institute of Education & Research (IER)
University of Dhaka

Mr. Manas kumar Sahu
Teacher-In-Charge
Vivekjyoti College

Mr. Amitava Jana and Mr. Tanmoy Das
Coordinator & Co-Coordinator
Seminar Organizing Committee
Vivekjyoti College

পরিশিষ্ট - IX

গবেষণা পত্র পাবলিকেশন এর শংসাপত্র

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH CULTURE SOCIETY

ISSN (O) : 2456 - 6683

IJRCS

A monthly Peer-Reviewed, Refereed, Indexed International Research Journal

IMPACT FACTOR : 5.743

Certificate of Publication

PAPER ID : IJRCS202101010

is awarded to

IJRCS

Payel Giri

For the research paper / article titled

Political Involvement of Sister Nivedita and its Educational Importance in Present Indian Society

Published in 'International Journal of Research Culture Society', Vol - 5, Issue - 1, Jan - 2021.

CPatel

The Managing Editor
Research Culture Society and Publication
WWW.IJRCS.ORG
Email: editorijrcs@gmail.com / editor@ijrcs.org

পরিশিষ্ট - X

প্রকাশিত গবেষণাপত্র

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH CULTURE SOCIETY ISSN: 2456-6683 Volume - 5, Issue - 1, Jan – 2021
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Scientific Journal Impact Factor: 5.743
Received on : 13/01/2021 Accepted on : 26/01/2021 Publication Date: 31/01/2021

Political Involvement of Sister Nivedita and its Educational Importance in Present Indian Society

Payel Giri
Research Scholar (Ph.D), Department of Education
Jadavpur University, Kolkata, India
Email - payelgedu21@gmail.com

Abstract: *Sister Nivedita, always have been one of the renowned personalities in India since her arrival to this country. She was not an Indian by birth but after experiencing the diversity of India, she did not return to her motherland and decided to devote herself completely for this beautiful land. India was under British rule at that time. The socio economic and educational atmosphere here was not as good as European countries. As a European, Nivedita felt the differences between these two countries and she dreamed to work hard to make India better. She strongly believed in the ideologies of Swami Vivekananda and actively involved in different activities to make people educate and aware regarding various drawbacks of their life. She loved the people of India very much. In a very short span of time, Nivedita became very much familiar with Indian philosophy, traditions, literature, culture by following the views of Swami Vivekananda. After assimilating such things, she involved herself in various social and political activities. Association with several important educated and dignified personalities of India, helped her to achieve the pre-determined goals quite easily.*
In this research paper, researcher tries to find out about the pre-determined goals of Sister Nivedita, her political contribution in India and also to analyze the educational importance of her political thought in present society. For conducting this study, researcher uses various primary and secondary sources such as letters, books, journals, articles, documents and also various important online data.

Key Words: *Sister Nivedita, Swami Vivekananda, British, Philosophy, Research, India, Motherland, Socio-economic, Education, Culture, Literature, Tradition.*

1. INTRODUCTION:

Irish quin sister Nivedita came for reawakening the masses of India. As a daughter of a college professor, she learned from her father the ideal of service to mankind as the true service to God. Nivedita first time came India in 1898. Before coming to Kolkata she met Swami Vivekananda in London in the year 1895. First few days in India Nivedita was taught by Swamiji about India and its people. Swami Vivekananda helped her to love the people of India. Swamiji explained very deeply to sister Nivedita about India's history, philosophy, literature, the life of the common masses, social traditions, and also the lives of great personalities, both ancient and modern. After observing the socio-economic situation of India she fully involved in various social and political activities and dedicated with her best for the development of Indian society. She contributed a lot for empowering the women in India.

2. Objectives of the Study:

Major objectives of the study are as follows:

- To analyze the pre-determined goals of Sister Nivedita for making India better.
- To explore the political contribution of Sister Nivedita.
- To analyze the educational importance of her political thought in present Indian society.

3. Methodology of the Study:

For conducting this study, researcher uses various primary and secondary sources such as letters, books, journals, articles, documents and also various important online materials.

4. The Context of India during Nivedita's Time:

During Nivedita's time, the rule of the British Raj was well consolidated in India. Having absorbed the shock of the Revolt of 1857, the imperial government had made deep inroads into Indian society. The English education system that was introduced in the country, largely replacing the traditional system in India. The main intention was to make clerks for them. But a group of educated Indians raised their voice against this system. They started questioning about different issues especially from the point of view of economic exploitation. Peasant unrest in the country was a natural outcome of land reforms and agrarian policies under the British. The Indian National Congress (INC) was founded in 1885 in order to articulate the grievances of educated Indians against government policies. In course of time, there

emerged a more radical section within the Congress who were dissatisfied with the petition culture of the Congress and were willing to undertake a more high-pitched struggle against the British. At that moment (1898) Nivedita arrived, Calcutta, and then Calcutta was the capital of India. It was the hotbed of politics and the rising tide of nationalism. The involvement of Sister Nivedita' in Indian nationalism was a quiver of Indian politics. Nivedita was also emerged as a major theorist of Indian nationality. Her contribution to the discourse of Indian nationhood has been practically ignored by mainstream academia, despite the fact that she engaged with this issue in great depth and breadth.

5. Nivedita's Contribution to Indian Nationalism:

Sister Nivedita deeply involved in the Indian national movement. She was on good terms with INC leaders, cutting across political differences—for instance, Gopal Krishna Gokhale, who believed in legislation as a tool against the British, Aurobindo Ghose, appealed for a more radical freedom of India. In another side Nivedita did not support any kind of division in the Congress (which finally happened in 1907). She strongly believed that unity is the only way to resist the against activities of INC and it is needed for us. Nivedita tried to develop a sense of civic nationalism among the Indians through her valuable speeches and writings. She was a famous writer and wrote on a various issue like famine in India and the role of art in shaping nationality etc. When Aurobindo left Pondicherry In 1910, Nivedita took charge as requested by Aurobindo for a few months and continue the paper. Sister Nivedita delivered her lecture at several places like Calcutta, Patna, Lucknow, Baroda, Nagpur, Wardha, Amaravati, Madras and so on. She completed works with five volumes which includes books, essays, lectures, reviews etc. And she had two volumes of letters written to different people. Actually she was an Educationist by vocation, and a nationalist by heart. She was actively involved in the 'National Education' movement, pioneered by the Dawn Society under the leadership of Satish Chandra Mukherjee. Sister Nivedita was in India for a very short time which is just 13 years and within this period of short time she devoted herself for serving Indians in different ways and tried to make Indians awake again. Within this period of time she led an active public life, dividing her time between writing, lecturing and serving India through plague relief programs and running a girls' school.

6. Political Vision of Sister Nivedita:

Sister Nivedita came to India with the desire of becoming an active worker and partner in Swami Vivekananda's social and religious activities. She was an outspoken woman in nature and also true to her commitments till the last day of her life. However, Nivedita started taking active interest in India's political regeneration and gradually involved herself in the political unrest in early twentieth century. This was intensified with the announcement of the partition of Bengal by Lord Curzon in the year 1905. The years 1905 to 1911 ushered in an era of grave political agitation in Bengal. The national struggle against the partition of Bengal took the form of two new techniques Boycott and Swadeshi - boycott of foreign goods and encouragement of country products. The Swadeshi movement in Bengal received enthusiastic support from Sister Nivedita and this brought her into the limelight of Indian politics for a considerable period. Long before coming to India, Nivedita herself was inspired by a great patriotic urge for her motherland, Ireland, where her family and ancestors belonged. She inherited a fierce independent spirit both from her father's and mother's side. Margaret's grandfather, John Noble, actively took up the cause of the Irish rebels against the pro-English Church of Ireland. Her father Samuel Noble, migrated to England, took up a job in the country Parish and worked for the welfare of the people of that area. Margaret's maternal grandfather Hamilton, also a patriotic Irishman, had fought for Home rule all his life and he was the head of the 'Young Ireland' faction. He was connected with a clandestine paper-'The Nation'. Nivedita often said that she learned a lot of things about a nation from her grandmother and grandfather. (Lizelle Reymond, 1985) During her student days in London, Margaret was close to two young Irish brothers, who were active members of Irish Associations in England. Young Margaret, under their influence, joined the 'Free Ireland' group working for Home Rule. She also met the famous Russian revolutionary in exile, Prince Peter Kropoktin, who came to speak to the 'Free Ireland' circle. Thus, before meeting Swami Vivekananda, Margaret was keen on two things her teaching carrier and Irish freedom struggle against England. When she came to India, in January 1898, her principal aim was developmental work among Indian women. Her political urge receded into the background and remained dormant, to be revived again in due course.

7. Nivedita's Political involvement:

One of the great Japani's scholar Okakura wrote a book 'Ideals of the East', where he propounded a theory that all the independent Asian countries have organized themselves in a confederation to destroy European domination. Indian sub-continent should be brought into this confederacy, after making her independent. The manuscript of this book was corrected and edited by Sister Nivedita. She also wrote a preface of the book. Along with it she took upon herself the task of introducing Okakura to her friends, acquaintances and other men of influence. The book had a political overtone and it created great commotion among the intellectuals throughout India. Nivedita planned to take Okakura's help for the nascent underground activities during the Swadeshi period (1903-1905). The Russo- Japanese war (1904) commenced the rise of Japan in Asian politics and India's admiration for Japan's military might grew immensely.

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH CULTURE SOCIETY ISSN: 2456-6683 Volume - 5, Issue - 1, Jan – 2021
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Scientific Journal Impact Factor: 5.743
Received on : 13/01/2021 Accepted on : 26/01/2021 Publication Date: 31/01/2021

However, it was Japan's political interest that prompted Okakura to plan the anti-British programme in which he was totally dependent on Sister Nivedita and her friend Josephine Macleod, who gave the financial support. Thus Okakura-Nivedita alliance may be called the first phase of Nivedita's political mission in India. However, Swami Vivekananda did not approve of Okakura's political interest and Nivedita's involvement in it. He was totally opposed to foreign help. 70 He realized that Okakura, through the active support of Nivedita, was trying to establish Japanese supremacy and furthering Japanese interest. Vivekananda vehemently discouraged Nivedita on this point. Nivedita got confused and depressed about this attitude of her Master. In later years however, Nivedita realized her mistake as she saw through Okakura's game plan and severed all connections with Okakura. Therefore, Nivedita's first attempt to organize Indian national struggle through foreign help ended abruptly.

8. Political activities of Sister Nivedita:

After the death of Vivekananda on 4th July, 1902, Nivedita with respect to her Guru's wish, officially left Ramakrishna Mission as she promised Swamiji not to involve Ramakrishm Mission in politics. Nivedita's next mission was to spread the man- making ideas that Vivekananda preached in order to arouse sense of nationalism among his countrymen. From 1902 onwards she travelled all over India, visited the big cities and gave lectures to the students, youths, women and people of various other professions. Through these lectures, she spread the messages of Swami Vivekananda, who wanted the youth to be physically and mentally strong, fearless and sincere in serving then motherland. She wrote in a letter immediately after Swamiji's demise to her friend Miss Josephine Macleod: "We talk of 'woman making' only I think my task is to awake a nation, not to influence a few women." (Letters of Sister Nivedita, Vol.I, 1982) So her task was to rouse the nation and this she continued to do. Nivedita was conscious of her own powers as a public speaker and writer and she did not hesitate when she was invited to speak or write. She was particularly keen to address the student community as they were the backbone of the nation. On January22, 1904, she addressed the Hindu Boys Association at Patna where she gave an inspiring lecture. The 'Dawn Society' started by Mr. Satish Chandra Mukheijee for popularizing the idea of National Education, was frequently visited by Sister Nivedita to give talk on various national problems. In a lecture delivered on August 14, 1904, at the Society, Calcutta, she told the students - "In talking to you this evening on the subject of nationality, I shall first of all tell you something that are not, nationality. You shall always bear in mind that there can be no nationality in a country where the people always flying at each other's throats for difference of opinion and sentiment. Let us learn how to present a united front. Let us try to learn how to reserve and concentrate our energies for the great cause we intend to serve." (The Complete Works of Sister Nivedita, vol-V, 1968) In another important public speech Nivedita said that — "I am here to teach you to become man! Live your epics today. The Ramayana is not something that 72 came once and for all, from a society that is dead and gone. Make your own Ramayana, not in written story but in service and achievement for the motherland." (The Complete Works of Sister Nivedita, vol-V, 1968) These lectures and speeches of Nivedita had tremendous impact upon the youth of Bengal. A whole new generation in Bengal came under the spell of Sister Nivedita. From 1902 onwards, she prepared the ground, in which young India was ready to plunge for the freedom of their motherland.

9. Educational Importance:

Importance of Nivedita's political life has a great impact on Indian society. As earlier said that Nivedita had a courageous and outspoken personality so that every Indian woman should follow this type of personality for the fulfilment of the needs of themselves as well as the society. She could be a great politician in India but did not devote her life fully in politics. She involved different political activities and organizations mainly for awakening and make people aware. At the time when Nivedita came in India, the social, political, economic and also educational situation was not so good. After observing the situation of India she decided not to come back to her motherland and she devoted her life for the upliftment of Indian people. Nivedita played a great role specially for empowering the women in India.

10. Conclusion:

In conclusion, it may be pointed out that it is time to move beyond colonial legacies and think about a truly Indian narrative even on something such as 'nationalism', which is usually associated with the West. The lesson that India has to offer in the histories and prehistories of nationalism is perhaps that one should learn to look at the phenomenon beyond its ideological dimensions and not conceive it exclusively in political terms. Nivedita's active participation in the national struggle of India covers the period from the end of 1902 to the middle of 1911. Her great and unparalleled contribution to the building up the national awakening it must be acknowledged to be a very short span of time. It is important to note that Nivedlta was closely connected with every attempt which was being made then to take India forward, be it political, social or intellectual. In some cases, she herself initiated the attempt, while in others, she gave it strength, vigor or new turn, to ensure that it might progress further and help the country the tremendous and irresistible force of nationalism. Against all attempts at domination and oppression by imperialist powers was emphasized vigorously by Nivedita. Through all her activities she tried to reawaken the masses of India and make India a better representative across the globe.

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH CULTURE SOCIETY ISSN: 2456-6683 Volume - 5, Issue - 1, Jan – 2021
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Scientific Journal Impact Factor: 5.743
Received on : 13/01/2021 Accepted on : 26/01/2021 Publication Date: 31/01/2021

REFERENCES:

1. Sister Nivedita. The complete works of Sister Nivedita. Vol. I (1995), Vol. II (1999), Vol. III (2000), Vol. IV (1996) and Vol. V (1999), Calcutta : Advaita Ashrama.
2. Reymond, L. (1953). The Dedicated : A Biography of Nivedita. New York : The John Day Company.
3. Basu, S.P. (1982). Letters of Sister Nivedita. Vol. I and Vol. II, Calcutta: Nababharat Publishers.
4. Basu, S.P. Nivedita Lokamata, Vol. I, Part I (1999), Vol. I, Part II (2004), Vol. II (1987), Vol. III (2000) and Vol. IV (1994), Calcutta : Ananda Publishing.
5. Ramakrishna Mission Institute of Culture (2002). Nivedita of India. Calcutta : RKMIC.
6. Centenary Souvenir (1998). Ramakrishna Sarada Mission, Sister Nivedita Girls' School, Calcutta.
7. Pravrajika Atmaprana (2007). Sister Nivedita of Ramakrishna-Vivekananda, Calcutta : Sister Nivedita Girls' School.
8. Foxe, B. (1975). Long Journey Home : A Biography of Margaret Noble (Nivedita), London : Rider.
9. Pravrajika Muktiprana (1959). Bhagini Nivedita, Calcutta. Sister Nivedita Girls' School.
10. Roychaudhury, G. (1969). Bhagini Nivedita o Banglaya Biplabbad. Calcuta : Jignasa.

Web References:

- https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/160025/7/07_chapter%204.pdf
- https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/94124/10/10_chapter%204.pdf
- https://www.vifindia.org/sites/default/files/sister-nivedita-s-ideas-on-indian-nationhood-and-their-contemporary-relevance.pdf
- https://www.vivekananda.net/PDFBooks/nivedita-reymond.pdf

পরিশিষ্ট - XI

প্রকাশিত গবেষণাপত্র

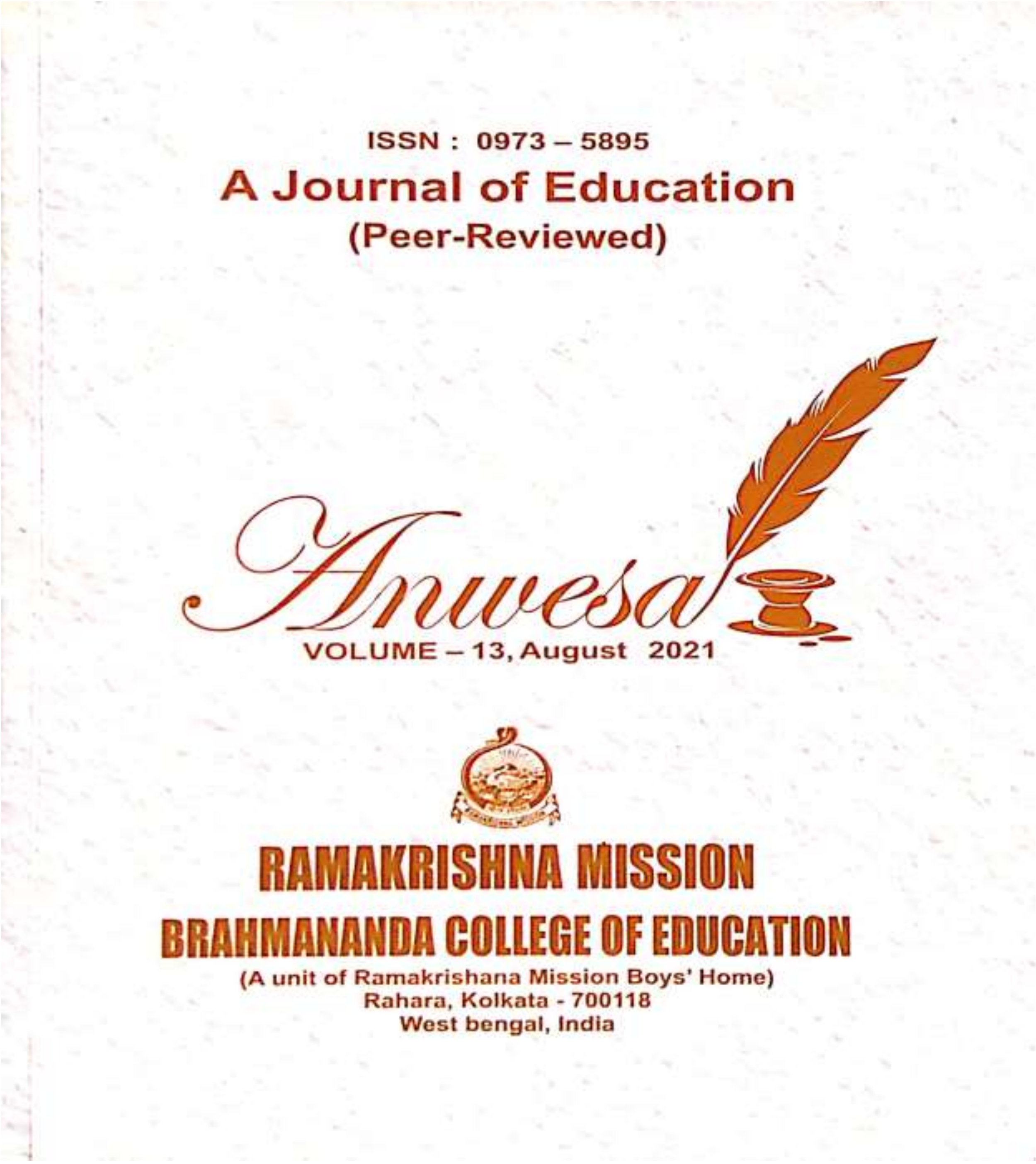

Anwesa
A Journal of Education

CONTENTS

Aggressive and Self-injurious Behaviors of Intellectually Challenged Adults : Two Case Studies 6
Pritam Biswas

Mental Health of Rural Adolescent School Students in South 24 Pargana District 16
Chattu Mondal

Effect of Hatha Yoga and Aerobic Dance Practice on Memory of Adolescent Girls 24
Dr. Sanjoy Mitra

Improving Reading Comprehension Skill Using Mind Mapping Technique 32
Souravi Ata

Student's Attitudes and Satisfaction Towards Online Teaching (E-learning) During Covid-19 Lockdown 42
Pitam Samanta

A Study on Listening Skills among the Students at Higher Education Level 56
Avishek Khanra

Quality Education from the Perspective of Environmental Sustainability 73
Sujan Das

A History of Prejudice: Sexual Harassment & Abuse of Domestic Workers During Covid-19 81
Amal Kumar Das

Education-an Important Tool for Women Empowerment 91
Dr. Subrata Biswas, Shuchismita Biswas, Dr. Debashis Dhar

Vision of Begum Rokeya and Present Educational Status of Muslim Women in West Bengal : A Textual Analysis 105
Payel Giri

ISSN : 0973 - 5895

VISION OF BEGUM ROKEYA AND PRESENT EDUCATIONAL STATUS OF MUSLIM WOMEN IN WEST BENGAL : A TEXTUAL ANALYSIS

Payel Giri
Ph.D. Scholar, Jadavpur University, West Bengal, India

ABSTRACT

Begum Rokeya was Bengal's first Muslim feminist thinker, writer and educationist. She has a great contribution on women's independence and education. She confessed that the women specially the Muslim women are deprived and they don't have the minimum courageous attitude to face the challenges of daily life. For the lack of proper education, they have lost their self-confidence. She tried to educate the women so that they can use it as a weapon to rejuvenate themselves in the modern society. In Islam, women hold a prestigious place but in practice, it is not very common in the current world due to the discrimination and patriarchal attitude. She realized that women have been suffering a lot but no voices are arising against it. Rokeya tried to make people understand about the rights and freedom of women. Her one and only vision was to educate the women so that they would reach their fullest potentials as a human being and do the necessary things according to their own interest without depending on men. She mainly focused on expansion of female education in the Bengali Muslim society. She strongly believed that proper education would enlighten women and liberate their selves from the barriers of rigid patriarchal and sexist norms. She always raised her voice against discrimination and any type of torturing of women. Her main target was to emancipate the women of Bengal. She has a lot of activities for empowering women but the real fact is that she did not have any formal education or training. This paper seeks to analyze the vision of Begum Rokeya and educational status of Muslim women in West Bengal. The observer tries to explore it using various primary and secondary sources like documents analysis, research articles, books, newspapers etc.

Keywords: Feminist thinker, Freedom of women, Patriarchal attitude, Social discrimination, Rational beings.

INTRODUCTION

In the History of women education in undivided India, Begum Rokeya (1880-1932) was a great personality for guiding the Muslim women and showing the right way in which they can go ahead towards the modernity denying all the social and religious obstacles. Her tireless efforts and struggle opened the door of education among the Muslim women. So, she

is considered as the pioneer of women education in Muslim society of undivided Bengal. She was born in 1880 at Pairabondh village in the Rangpur district of undivided Bengal. She belongs to an Islamic religious family and lived behind the curtain from the age of five like all female members of her family. She was crazy for her study in the early days of her life. At that time, when women education was neglected and less important, Rokeya's brother helped him secretly to learn Bengali and English. In the year 1896, she got married by force when she was sixteen years old. She got married with a widower named Khan Bahadur Syed Sakhawat Hossain who was nearly forty years old. But, fortunately Sakhawat Hossain was a liberal and progressive minded man. He helped Rokeya every moment in studies and made all the arrangements for her studies. He also helped her to publish her writings in Indian periodicals at that time. After her husband's sudden death in 1909, she went into the great sea of misery. But she did not break down. She accepted the challenges with full of confidence and continued her further activities. She struggled hard and devoted her life for emancipation of Bengali Muslim women. She felt the need of women education and founded a girl's school for that purpose. She died of heart problem on 9th December 1932. She was really a pathfinder for the upliftment of women education in Bengal. She worked hard till the last day of her life. She wrote so many books, essays, novels, utopias, poems, humor and satirical articles on the rights of women and other social issues of that time in both the language Bengali and also English. Her husband was the main inspiration in this regard. She established a school for Muslim girls in Kolkata and tried to enshrine her ideologies among the students. She started her literary career with a story Pipasa (The Thirst) in 1902 and also wrote two famous essays named 'Motichur-I' and 'Motichur-II'. In 1924, she wrote a novel named 'Padmarag'. She had few works in English also. Sultan's Dream (1908) is one of them. Through all her activities, she tried to educate and liberate the Muslim women in Bengal.

BEGUM ROKEYA: PIONEER OF WOMEN EDUCATION AND LIBERATION

Rokeya was a modern, self-educated woman with progressive thoughts and ideas. She observed the miseries of women and how they were deprived of education. She realized that awakening of women was a must to set them free from their miseries. She used her pen as a weapon of women education and wrote against the inhuman position of women in the society. She tried to make women aware of themselves. The women were not given freedom in the conservative society at Rokeya's time. The women could not live freely in the society. They were not so aware about their education and rights. Sometimes women themselves did not want to educate themselves and they were against female education. So, their awakening was not possible without removing the religious orthodoxy and social obstacles. Rokeya strongly believed that through education, a woman can be self-reliant and confident. For the fulfilment of that goal, she established a school (Sakhawat Memorial Girls School) and organization for women (Anjuman-e-Khawatin-e-Islam). She wrote several books, essays, poems in both Bengali and English. Through different activities, she has depicted the wretched condition of women in the family and in the society as well.

STATUS OF MUSLIM WOMEN I N BENGAL

Total number of Muslim women in West Bengal is approximately 12.16 % of total population. It cannot be neglected as they are also the part of Bengal. But their educational and socio-economic status are below then the average. Comparatively lower percentages of Muslim women literacy in West Bengal before 2001 and a little progress of Muslim women literacy in West Bengal after 2001 had been noticed. The literacy rate of Muslim women in West Bengal is lowest among all other persons in India and West Bengal, for the period from 1965 to 2015. There are several causes for lagging behind the Muslim women in West Bengal such as educational, social, economic, institutional, religious, cultural, and awareness related causes.

PRESENT EDUCATIONAL STATUS OF THE MUSLIM WOMEN IN WEST BENGAL

After passing seventy-three years of independence, a large number of Muslim women belong to the educationally backward, economically weak and politically marginalized section of the society. The least literacy rate is a common nature of the Muslim women in Bengal. They are lagging behind and not competing with other communities because of their attitude towards education. Among the 3.3 crore male literates, 74.56% are Hindus and 23.07% are Muslims and among the 2.77 crore female literates 73.89% are Hindus and 23.85% are Muslims (Times of India Report 31.12.2015). Muslim women were not educationally strong since the independence of India. The government of India tried to find out the reasons of educational and economical backwardness of Muslim Community through various committee and commissions. The Gopal Singh Committee was formed by the Government of India in 1983 and the committee recommended that the Muslims are a backward community in India as well as West Bengal. Sachar Comm ittee report (2006) announced that 'Poverty is the main cause of poor education among the Muslim in India". Ranganath Mishra Commission (2007) declared that "Muslims are socially, economically, educationally, politically and culturally underprivileged and are far behind the main stream of Indian society". According to the Sachar Committee report, only 4% Muslim children are enrolled in recognized school and 9% of this total attends some short of school recognized or unrecognized and remaining 91% do not have any school to attend. Those enrolled hardly complete school education and 90% of the enrolled get dropped out. The literacy rate and the levels of education of Muslim in West Bengal are so far from the national average rate. According to the Census 2011, the literacy rate in West Bengal is 77.08% which is significantly higher than national average rate of 74%. But the Muslim literacy rate is only 57.18% which is so far from the national average rate. In Bengal, Muslim literacy (57.18) is lower than Schedule Tribe literacy 57.92% (Census, 2011). In West Bengal, Muslim literacy rate are less than other socially disadvantaged community. It is terrible event that Muslim women literacy (49.75%) is less than the Muslim literacy (57.18%) in west Bengal. Muslim male literacy rate is 64.61 % whereas

female literacy rate is 49.75% (Ghosh & Kar, 2017). The situation of rural Muslim women is very worse in relation to their literacy. Only 47.87% rural Muslim women are literate and literacy in urban area is 59.23%.

CAUSES OF LAGGING BEHIND OF MUSLIM WOMEN

According to the study of Rahaman and Bhuimali (2011), they mentioned that "among various reasons, the major reasons for educational backwardness among the Muslim community have poor economic condition. One of the important causes of lagging behind in education of Muslim women is socio-cultural perspective. Lack of true education and awareness among the parents of Muslim women is a big obstacle for having education among the Muslim women. According to the report of "National Education Survey", Muslim women are seven times behind the Hindu women in high school education and they are nine times behind them in post high school. Most of the parents of Muslim girls believe that education of their girls is not so important due to wrong moral and cultural values. Primarily girls are enrolled in school education but before completion of a certain level, they are withdrawn and forced to get married at an early age. Some parents are not interested to send their girls to co-ed school because of parda system and some parents are interested to send their girls private Madrasha only for ritual education. They think that the purity of girls would have lost during the time of higher education or university education or travel aboard. This is why they did not support higher education for women.

CONTRIBUTION OF BEGUM ROKEYA FOR EDUCATING MUSLIM WOMEN IN BENGAL

Rokeya educated herself with her tireless self-effort and progressive ideas. She felt deeply the misery of Muslim women and their deprivation of education. She tried to make women feel that education is the only way for removing all the miseries of life. At a time, she was habituated with 'Purdah' system but always she was against conservative and Male dominated society. She said, "I worked and I wrote. I wrote about the evils of society. I wrote about the evils of Purdah, about the foolishness and cruelty of customs… I wrote about the laws that restrict women, and I wrote about the weakness of Bengalis. (Zaman 18-19)". She wrote several books, short stories and articles like Sultan's Dream (1908), Motichur- I (1904), Motichur-II (1922), Freedom Fables, Abarodh Basini (1931), Padmarag (novel-1924), God Gives Man Robs (essays-1927) etc. One of the great contributions of Begum Rokeya was "Sakhawat Memorial Girls School" in 1909. She tried to make a new era for the Muslim Community and worked as a real path finder through her various activities.

CONCLUSION

On basis of the above discussion, it can be concluded that Muslim women in West Bengal are lagging behind from the mainstream in various aspects of progress. There is no doubt that the education has the super power to build a progressive and liberal society. Though the Muslims are the part of the society, they should change their mind set and get involve in modern education system. Different researches show that Muslims specially the Muslim women of Bengal are in a backward position not only from educational status but also socio-economic situation, employment, health status, political awareness and political participation etc. Muslim women are very much deprived of the various opportunities due to cause of dominating power of male. It is a very common picture in the society that the education of Muslim women is very low, inadequate and negligible. The backwardness of any community in any part of the country is nothing but destroying of national resources and it is a big loss of a nation. To overcome all the problems of Muslim women, importance must be given to develop their self-awareness, self-reliance, self-corrections and self-realization. The over-all development of Muslim women is urgent need of the hour. For a holistic development and change of the Muslim society, they need to come out from their low level of aspiration, frustration, cultural retardation, societal depression. Begum Rokeya strongly realized the situation of Muslim women and tried to root out all the problems of them and shows a proper way of modern life.

REFERENCES

Biswas, M. Z. (2015, Sep). Socio Economic Conditions of Muslims of West Bengal: An Enquiry to Their Social Exclusion. *International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS),* 2 (2), 259-266.

Farzana Zaman., M. S. (2016, Feb). Women in Virginia Woolf and Begum Rokeya: A View from. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science* (IOSR -JHSS), 21(2), 31-38.

FirdausBano. (2017). Educational Status of Muslim Women in India: An Overview. IOSR *Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS),* 22(6), 10-13.

Hazra, M. (2018). An Overview of Educational Status of Muslim Women in India. *International Journal of Innovative Studies in Sociology and Humanities,* 3(6).

Islam, M. S. (2012). Emancipation of Women through Education and Economic. SUST *Journal of Social Sciences,* 11-19.

Mahmud, R. (2016). Rokeya Sakhawat Hossain: Tireless Fighter of Female Education. *International Journal on Studies in English Laguage and Literature (IJSELL),*(9), 40-48.

Roy, A. K. (2019, March). Educational Thoughts Of Begum Rokeya And Her Contribution In The Upliftment Of Women Education In Bengal. *International Journal of Research in Social Sciences,* 9(3).

Saha, S. (2020, January). Educational Status of Muslim Women in West Bengal: A Case Study of Chapra Block in Nadia District. *NSOU-OPEN JOURNAL*, 3 (1).

Vishwakarma, S. K. (2015). *Feminism and Literature Text and Context.* Allahabad: Takhtotaaz.

Disclaimer :
The sole responsibility of the writing belong to the auther only

পরিশিষ্ট - XII

আনন্দবাজার পত্রিকাতে প্রকাশিত খবর

আনন্দবাজার পত্রিকা ২ জুলাই ২০২৩

ভগিনী নিবেদিতার ব্রোঞ্জের মূর্তি বসল উইম্বলডনে

শ্রাবণী বসু

লন্ডন, ১ জুলাই: এখানেই স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে প্রথম বার দেখা হয়েছিল তাঁর। সালটা ১৮৯৫, মাস নভেম্বর। খাস লন্ডন শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে ছোট্ট সেই শহরতলি উইম্বলডনে এ বার বসল ভগিনী নিবেদিতার সমউচ্চতার পূর্ণাবয়ব এক ব্রোঞ্জ মূর্তি। ৬ ফুট ২ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের ওই মূর্তির উন্মোচন উপলক্ষে হওয়া এক বর্ণময় অনুষ্ঠানে আজ উপস্থিত ছিলেন মের্টনের মেয়র এবং ব্রিটেনের রামকৃষ্ণ মিশনের বেশ কিছু আধিকারিক ও প্রতিনিধি।

ব্রিটেনে ভগিনী নিবেদিতার ১৫৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের যাবতীয় দায়িত্বে যিনি ছিলেন, সেই সারদা সরকার আজ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল অতিথিকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তৃতায় বলেন, "আজ আমরা এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। ইতিহাস যেন আমাদের চোখের সামনে উন্মোচিত হচ্ছে। এটা আমাদের জন্য খুবই আনন্দ এবং গর্বের বিষয় যে, এই উইম্বলডনেই আমরা এই অতি অপূর্ব ব্রোঞ্জের মূর্তিটি উপহার হিসেবে পাচ্ছি।" গোটা বিষয়টি সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করা ও সহায়তার জন্য ব্রিটেনের রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টারকেও ধন্যবাদ জানান তিনি। উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেওয়ার জন্য নাম নেন মের্টনের প্রাক্তন কাউন্সিলর নাজিব লতিফেরও। স্থপতি মার্কাস বিয়েলের সঙ্গে প্রতিনিয়ত আলোচনা এবং সমন্বয় সাধন করে নাজিবই মূর্তি স্থাপনের জন্য স্থানীয় পুর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি আদায় করেছিলেন।

গত মাসে পশ্চিমবঙ্গের সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন থেকে মূর্তিটি লন্ডন পৌঁছেছিল। উইম্বলডনের রিচার্ডস লজ গার্লস হাই স্কুলের সামনের রাস্তার এক গুরুত্বপূর্ণ কোণায় মূর্তিটি রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ব্রোঞ্জের মূর্তিটি তৈরি করেছেন শিল্পী নিরঞ্জন দে। বিধাননগর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ কেন্দ্র এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ও ম্যানেজমেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের চঞ্চল দে সেটি দান করেছেন।

অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেন ব্রিটেনের রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টারের 'মিনিস্টার ইন চার্জ' স্বামী সর্বস্থানন্দ এবং ব্রাজিলের রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টারের 'মিনিস্টার ইন চার্জ' স্বামী নির্মলাত্মানন্দ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের বাংলা গান গেয়ে শোনান শিল্পী উমা বসু, চিরঞ্জীব চক্রবর্তী, সঞ্চিতা পাল এবং সবিতা সাহা।

আয়ারল্যান্ডে জন্ম নেওয়া মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল-ই পরবর্তী কালে ভারতে গিয়ে ভগিনী নিবেদিতা নামে পরিচিত হয়েছিলেন। ১৮৯৫ সালের নভেম্বর মাসে যখন স্বামীজির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, তখন এই উইম্বলডনেই ২১, হাই স্ট্রিটে ছিল তাঁর বাড়ি। ২০১৭ সালে এই বাড়িতে বসানো হয় 'ব্লু প্লাক'। স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৮৯৮ সালে মার্গারেট প্রথম বার কলকাতায় যান। পরের বছর, অর্থাৎ ১৮৯৯ সালের জুলাই মাসে তাঁর সঙ্গে উইম্বলডনে এসেছিলেন স্বামীজি। বেশ কয়েক দিন তাঁর ওই বাড়িতে ছিলেন বিবেকানন্দ।

আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আমেরিকান ইতিহাসবিদ রুথ হ্যারিস। 'গুরু টু দ্য ওয়ার্ল্ড: দ্য লাইফ অ্যান্ড লিগ্যাসি অব বিবেকানন্দ' বইটির লেখক তিনি। তাঁর বক্তৃতায় নারী শিক্ষায় ভগিনী নিবেদিতার অবদান এবং সমাজসেবায় স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর যাবতীয় কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন হ্যারিস।

■ ভগিনী নিবেদিতার সেই মূর্তি।

CS Scanned with CamScanner

পরিশিষ্ট - XIII

আনন্দবাজার পত্রিকাতে প্রকাশিত খবর

আনন্দবাজার পত্রিকা ৭ ডিসেম্বর, ২০২২

বন্ধ দুয়ার খোলার ডাক

আফরোজা খাতুন

"আমাদের যথাসম্ভব অধঃপতন হওয়ার পর দাসত্বের বিরুদ্ধে কখনো মাথা তুলিতে পারি নাই; তাহার প্রধান কারণ এই যে, যখনই কোন ভগ্নি মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছেন অমনই ধর্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচন-রূপ অস্ত্রাঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে। ...এই ধর্মশাস্ত্রগুলি পুরুষ রচিত বিধি ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে।" (*আমাদের অবনতি*: রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, ছবি)। বোনেদের প্রতি তাঁর আহ্বান ছিল, জেগে উঠুন, নিজের হাতে খুলুন উন্নতির দ্বার। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের (১৮৮০-১৯৩২) প্রয়াণ দিবস ৯ ডিসেম্বর, অনেকের মতে জন্মদিবসও একই।

বাল্য থেকে কঠোর অবরোধ প্রথায় মানুষ হয়েছিলেন রোকেয়া। অভিভাবকের আপত্তি ছিল বাংলা, ইংরেজি পড়ানোয়। সমাজ যে দরজা মেয়েদের জন্য বন্ধ রেখেছিল, তাকে খুলে মেয়েদের অধিকার-সচেতন করার চর্চায় আমৃত্যু নিযুক্ত ছিলেন রোকেয়া। বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, মুসলমান মহিলা সমিতি (আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম) গঠন বা সাহিত্যচর্চা, সবই করেছিলেন সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনে।

সমাজে নারীর স্বাধীন পদচারণার জন্য দরকার শিক্ষা ও আর্থিক স্বনির্ভরতা। তাই *সুলতানার স্বপ্ন* (১৯০৮)-এ নারীশিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে, অবরোধহীন স্বাধীন নারীর কল্প-কাহিনি শুনিয়েছেন রোকেয়া। তাঁর কর্মপদ্ধতি ও সমাজ গঠনের ভাবনা ধরা পড়ে *পদ্মরাগ* (১৯২৪) উপন্যাসের তারিণী-ভবনের চিত্ররূপে। পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোয় শোষিত, নির্যাতিত নারীদের ঠিকানা তারিণী-ভবন। সেখানে তারা শেখে কর্মশক্তি ও আত্মমর্যাদায় বাঁচতে। দাম্পত্যে অপমানিত সিদ্দিকা সেই সম্পর্কে আর ফিরতে না চেয়ে বলেছে, "একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারী জন্মের চরম লক্ষ্য নহে; সংসার ধর্মই জীবনের সার ধর্ম নহে।" মুসলিম মেয়েদের জাগ্রত করতে প্রাণপণ চেষ্টা করাই হবে তার জীবনের লক্ষ্য, জানাচ্ছে সে। প্রায় একশো বছর আগে সিদ্দিকার মুখে রোকেয়ার শোনানো এই সিদ্ধান্ত মুসলিম মেয়ের সক্ষমতা ঘোষণার এক বিরল নজির। মেয়েদের সংসার-স্বর্গের স্বপ্নকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছিলেন রোকেয়া, যিনি বাংলার নবজাগরণের যুক্তিবাদী লেখকদের মধ্যেও অগ্রগণ্য।

নকশাধর্মী, বিদ্রুপাত্মক রচনা 'অবরোধ-বাসিনী' (১৯৩১) চাক্ষুষ ঘটনা অবলম্বনে লেখা। অবরুদ্ধ নারীদের সামাজিক অবস্থানের করুণ চিত্র এখানে ফুটে উঠেছে। পর্দা ও বোরখার সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে কেউ চোরের হাতে পর্দার আড়াল থেকে নীরবে সব গয়না দিয়েছে, কারও রেল লাইনে প্রাণ গেছে, কেউ বা বাড়িতে আগুন লাগলেও পুরুষের সামনে বেরোনো যাবে না বলে আগুনেই পুড়ে মরেছে। অবরোধে আটকে পড়া এই নারীদের প্রতি পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে বেরিয়ে আসার বার্তা ছিল তাঁর লেখায়। এই সামাজিক আন্দোলনের প্রথম ধাপ হল নারীশিক্ষা। কিন্তু বিদ্যালয় পরিচালনা করতে গিয়েও রক্ষণশীল মুসলিমদের কাছ থেকে হুমকি চিঠি পান রোকেয়া। স্কুল বাসের জানলা দিয়ে বোরখা-পরা ছাত্রীদের হাত দেখা যাচ্ছে, এই ছিল অভিযোগ। অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ছাড়া নারীর মুক্তি সম্ভব নয়, এই উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছিল আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম-এর কর্মপদ্ধতিতে।

রোকেয়ার সময় থেকে একশো বছর এগিয়ে আজ হিজাব ও বোরখার বিরুদ্ধে নতুন করে বিশ্বে আন্দোলন শুরু হয়েছে। কর্নাটকের কোথাও কোথাও হিজাব-পরা ছাত্রীদের শিক্ষার অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। বাধাটা শুধু কলেজ কর্তৃপক্ষের নয়। রাষ্ট্রশক্তির জোরে হিন্দুত্ববাদী দলের সমর্থকদের মুসলিম বিদ্বেষ থেকে বাধা প্রয়োগও এর কারণ। কিন্তু সব ছাত্রীও তো কলেজের নির্দেশ মানেননি। এমনকি অনেকে পরীক্ষাও দেননি হিজাব ছাড়া ঢুকতে দেবে না বলে। এটা কি শুধু মেয়েদের গড়ে-ওঠা পছন্দ? সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁদের অনেকটা 'চয়েস' তৈরি করেছে। একটা পোশাকের উপর বাড়তি পোশাক না চাপালে অনেকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। কলেজে হিজাব পরতে বাধা দেওয়ায়, দেশের নানা প্রান্তের মুসলিম মেয়েরা শুধু গেরুয়া বাহিনীর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবেন বলেই হিজাব পরলেন। হিন্দু মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে মুসলিম পিতৃতন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন তাঁরা। তা হলে কি রোকেয়ার সামাজিক আন্দোলনের ধারা মিলিয়ে গেল?

এর বিপরীত চিত্র ইরান, আফগানিস্তানে। স্কুল কলেজে পড়ার অধিকার কেড়ে নিয়ে পোশাকের আড়ালে থাকার ফতোয়া চাপিয়েছে রাষ্ট্র। মৌলবাদী সমাজের চোখে নারীর যেন আত্মা ও সত্তা কিছু নেই। আছে শুধু হাড়, মাংস, রক্ত। তাই তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। তবে মৌলবাদের সেই চেষ্টা তো সফল হচ্ছে না। মাহসা আমিনির মৃত্যু বিপ্লবের সূচনা করেছে। ইরানের বহু মহিলা আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছেন হিজাব। মাথার চুল কেটে উড়িয়েছেন। 'নারী, জীবন, স্বাধীনতা' স্লোগান গিয়ে পৌঁছেছে আফগানিস্তানে। আফগানি মহিলারাও ইরান দূতাবাসের সামনে 'নারী, জীবন, স্বাধীনতা' স্লোগান দিয়ে প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন।

ধর্মীয় রাজনীতির অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী নারী-পুরুষের সংগ্রাম দেখে মনে হয়, রোকেয়া চর্চার আরও বেশি প্রয়োজন। কারন তিনি পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে, পুরুষের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে বলেছেন, "তোমরা নারী জাতিকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাক— যথা সীতা প্রমুখ দেবীদের পূজা কর, পয়গম্বর তনয়া হযরত ফাতেমাকে অসামান্যা নারী জ্ঞানে ভক্তি কর, এবং পয়গম্বর ঈসার মাতা মরিয়মকেও আদর কর, কিন্তু তাহাতে আমরা তৃপ্ত হইতে পারি না, কারন তোমরা যে, 'পুরুষ' এ কথাটি তোমরা ভুলিয়া যাও না। ঐ 'পুরুষ' শব্দেই অহংকার ঝরে।"

বাংলা বিভাগ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ফর উইমেন

দু'টি প্রবন্ধের বক্তব্য লেখকের নিজস্ব।
প্রবন্ধ পাঠানোর ঠিকানা: editpage@abp.in
অনুগ্রহ করে সঙ্গে ফোন নম্বর জানাবেন।

****

Ouriginal by Turnitin

Document Information

Analyzed document	Payel Giri.docx (D173140316)
Submitted	2023-08-26 07:01:00
Submitted by	Bijoy Krishna Panda
Submitter email	bkp.education@jadavpuruniversity.in
Similarity	9%
Analysis address	bkp.education.jaduni@analysis.urkund.com

Sources included in the report

SA	**Sudeep Theses final.docx** Document Sudeep Theses final.docx (D111297846)	45
SA	**Rabindranather Sikha Bhabnar Prasangikata.docx** Document Rabindranather Sikha Bhabnar Prasangikata.docx (D155610368)	41
SA	**ALL WORD FILE.docx** Document ALL WORD FILE.docx (D145099062)	366
SA	**Main thesis of Swapan Mondal, Deptt. of Bangla, Ist Submission.docx** Document Main thesis of Swapan Mondal, Deptt. of Bangla, Ist Submission.docx (D95349153)	71
SA	**Final Thesis for Plagiarism.docx** Document Final Thesis for Plagiarism.docx (D143211021)	144
SA	**BHASKAR ROY DISSERTATION (1).docx** Document BHASKAR ROY DISSERTATION (1).docx (D140821843)	41
SA	**PHD , GULSAN GHOSH, 2018,dox file.docx** Document PHD , GULSAN GHOSH, 2018,dox file.docx (D50093273)	50
W	URL: https://www.womennews24.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E... Fetched: 2021-12-09 03:24:43	13
SA	**Article of Ramkrishna o vivekananda.docx** Document Article of Ramkrishna o vivekananda.docx (D129119059)	20
SA	**Mudassar Nazar Baidya.docx** Document Mudassar Nazar Baidya.docx (D172243034)	72
SA	**GULSAN GHOSH,PHD , Total Thesis , 2019,dox file Introduction to conclution plagiarsm.06.docx** Document GULSAN GHOSH,PHD , Total Thesis , 2019,dox file Introduction to conclution plagiarsm.06.docx (D50517957)	171
SA	**Naribadi Tattver Alokey Bangla Rupkatha by Ayanti Karmakar.docx** Document Naribadi Tattver Alokey Bangla Rupkatha by Ayanti Karmakar.docx (D112930852)	116
SA	**PhD synopsis Rehana final.docx** Document PhD synopsis Rehana final.docx (D117397214)	12